গল্প সমগ্র

১

প্রফুল্ল রায়

পরিবেশক :
পুস্তক বিপণি
২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

মন্দিরা মিত্র
মনোজিৎ মিত্র
অনুজ প্রতিমেষু

লেখকের অন্যান্য বই

আকাশের নীচে মানুষ
মানুষের মহিমা
অতল জলের দিকে
মন্দ মেয়ের উপাখ্যান
সম্পর্ক
এক নায়িকার উপাখ্যান
এই ভুবনের ভার
ইস্পাতের ফলা
শান্তিপর্ব
মানুষী
অদিতির উপাখ্যান
সাধ-আহ্লাদ
চরিত্র
যুদ্ধযাত্রা
দুই দিগন্ত
জন্মভূমি
আলোছায়াময়
দায়দায়িত্ব
হৃদয়ের ঘ্রাণ
আক্রমণ
অন্ধকারে ফুলের গন্ধ
মানুষের জন্য
দায়বদ্ধ
চতুর্দিক
রামচরিত্র
ধর্মান্তর
সত্যমিথ্যা
মাটি আর নেই
মোহানার দিকে
বাঘবন্দী
স্বর্গের ছবি
একাকী অরণ্যে
বিন্দুমাত্র
শীর্ষবিন্দু
রাবণবধ পালা
তিনমূর্তির কীর্তি
সেনাপতি নিরুদ্দেশ
পাগল মামার চার ছেলে
হীরের টুকরো
আমাকে দেখুন ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ
আমাকে দেখুন (চার পর্ব একত্রে)
সুখের পাখী অনেক দূরে
রৌদ্রঝলক
শঙ্খিনী
আমার নাম বকুল
নয়না
নিজের সঙ্গে দেখা
আলোয় ফেরা
পূর্বপার্বতী
মহাযুদ্ধের ঘোড়া ১ম, ২য়
সিন্ধুপারের পাখি
নোনাজল মিঠে মাটি
শ্রেষ্ঠ গল্প
স্বনির্বাচিত গল্প
অনুপ্রবেশ
মোহর
ক্রান্তিকাল
ক্ষমতার উৎস

সূচী

এক রমণীর গল্প

বড় রাস্তায় বাস থেকে নামতেই ঝপ করে অন্ধকার নেমে গেল। ইদানীং লোডশেডিংটা ভীষণ বেড়েছে। অনেক দূরের পাওয়ার স্টেশনগুলোতে কী সব গোলমাল হয়েছে, তার ধাক্কায় কলকাতা মেট্রোপলিসে যখন তখন আলো চলে যাচ্ছে, মাথার ওপর পাখা ঘুরছে না। একবার আলো টালো গেল তো দু-তিন ঘন্টার ভেতর জ্বলার নাম নেই।

কিছুদিন আগে একটা বই পড়েছিলাম—'জিওগ্রাফি অফ ডার্কনেস'। খুব সম্ভব রাত্তিরের কলকাতার লোডশেডিং মাথায় রেখে বইটা লেখা হয়েছিল।

এদিকের পথঘাট আমার এত চেনা যে অন্ধকারে হাঁটতে অসুবিধা হয় না ; শুধু ক্যালকাটা টেলিফোন, সি. এম. ডি. এ বা কর্পোরেশন যে সব গর্তটর্ত খুঁড়ে রেখেছে, সেগুলোর দিকে একটু নজর রাখতে হয়।

বাস স্টপ থেকে বাঁ দিকের ফুটপাথ ধরে মিনিট খানেক হাঁটলে মণিময়দাদের মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং। কো-অপারেটিভ করে ওঁরা এই আটতলা বাড়িটা করেছেন। একসময় সেখানে পৌঁছে গেলাম।

মণিময়দাদের ফ্ল্যাটটা তেতলায়। লিফট ছাড়াও সেখানে উঠতে খুব একটা কষ্ট হয় না। ফ্ল্যাটটা আট তলায় হলেও সিঁড়ি ভেঙে এখন উঠতে হ'ত, কেননা নীলিমা বৌদি আমার জন্য সেই বিকেল থেকে অপেক্ষা করতে করতে এতক্ষণে নিশ্চয়ই হতাশ হয়ে পড়েছেন; ধরেই নিয়েছেন আজ আর আমি আসছি না।

বিকেল চারটেয় আমার এখানে পৌঁছুনোর কথা। এখন পৌনে আটটা। অফিস থেকে বেরুতে বেরুতেই সাড়ে ছ'টা হয়ে গেল। তারপর কোনওরকমে একটা বাসে ঝুলতে ঝুলতে এসে মৌলালির মুখে জ্যামে পড়ে গেলাম। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট সেখানে আটকে থাকতে হল। কলকাতার রাস্তাঘাট আর বাস-ট্রামের যা হাল, কোথাও ঠিক সময়ে পৌঁছুনো অসম্ভব ব্যাপার।

অন্ধকারে চল্লিশ সিঁড়ি ভেঙে মণিময়দার ফ্ল্যাটের সামনে এসে টের পেলাম, হৃৎপিণ্ডের ওপর দিয়ে যেন হাজারটা ঘোড়া ছুটে যাচ্ছে। দু'দিন আগে যখন মণিময়দার পেটের বায়োপ্সি করা হয় তখন থেকেই বুকের ভেতর চাপা উৎকণ্ঠা টের পাচ্ছিলাম। আজ বিকেলে বায়োপ্সির রিপোর্টটা নীলিমা বৌদির নিয়ে আসার কথা। ওটা পাওয়া গেলে মণিময়দার ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, সে সম্পর্কে পরামর্শের জন্য নীলিমা বৌদি আমাকে আসতে বলেছিলেন।

রিপোর্টে কী থাকতে পারে, ডাক্তার মনোজ সেন পরিষ্কার একটা আভাস আমাকে আগেই দিয়েছেন। সেটা অবশ্য নীলিমা বৌদিকে জানাই নি।

বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারি, ছ'দিন আগের সেই উদ্বেগটা হঠাৎ কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। অনেকক্ষণ পর আস্তে আস্তে টোকা দিতে থাকি।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এক হাতে কাচের লণ্ঠন নিয়ে দরজা খুলে দেন নীলিমা বৌদি।

ওঁর দিকে চোখ পড়তে চমকে উঠি। দু'দিন আগে শেষ দেখা হয়েছিল নার্সিং হোমে। এর মধ্যে তাঁর বয়স আচমকা যেন অনেক বেড়ে গেছে। পঞ্চাশ এখনও পেরোন নি, কিন্তু চুল অর্ধেক সাদা হয়ে গেছে। চোখের তলায় কালির পুরু ছোপ। কণ্ঠার হাড় ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে। গায়ের রং একসময় ছিল পাকা ধানের মতো, এখন তার ওপর কালচে আবরণ পড়েছে। মসৃণ ত্বক কুঁচকে কত যে সরু সরু দাগ ফুটে বেরিয়েছে, হিসেব নেই।

নীলিমা বৌদি এক পলক আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপর নির্জীব গলায় বলেন, 'আসুন।'

আমি ভেতরে ঢুকে যাই। নীলিমা বৌদি দরজা বন্ধ করে দেন।

এই ফ্ল্যাটে কম করে দু'আড়াইশ বার এসেছি। এখানকার নক্শা আমার মুখস্থ। মোট তিনখানা বেড রুম, কিচেন, স্টোর, তিন ঘরে তিনটে অ্যাটাচড বাথ, ডাইনিং-কাম-ড্রইং হল ইত্যাদি। এ ছাড়া রাস্তার দিকের ঘর দুটোর গায়ে দুটো মাঝারি ব্যালকনি। বছর পনের আগে কলকাতার মানুষ ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকাটা যখন বিশেষ পছন্দ করত না, বিল্ডিং মেটিরিয়ালের দাম ছিল যথেষ্ট কম, সেই সময় এই কো-অপারেটিভের ফ্ল্যাটটা বেশ সস্তায় কিনেছিলেন মণিময়দা।

লক্ষ করলাম, দেরি করে আসার জন্য কিছুই বললেন না নীলিমা বৌদি। অথচ আগে হলে হাজারটা কৈফিয়ৎ দিতে হ'ত।

সোজা ওঁদের শোওয়ার ঘরের দিকে যাচ্ছিলাম। নীলিমা বৌদি নিচু গলায় বলেন, 'আগে আমার সঙ্গে এ ঘরে আসুন।'

ডান পাশের ঘর থেকে মণিময়দার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, 'কে এল? সুধীশ?'

আমি সাড়া দিই, 'হ্যাঁ, মণিময়দা—'

'এখানে এস।'

'আসছি একটু পরে।'

বাঁ দিকের একটা ঘরে আমাকে নিয়ে আসেন নীলিমা বৌদি। লণ্ঠনটা নিচু সেন্টার টেবলে রেখে আমরা মুখোমুখি বসি।

আমি কিছু বলার আগেই হঠাৎ দু হাতে মুখ ঢেকে একেবারে ভেঙে পড়েন নীলিমা বৌদি। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ঝাপসা গলায় বলেন, 'আমার সর্বনাশ হয়ে গেল সুধীশ ঠাকুরপো।'

বুঝতে পারছিলাম, বায়োপ্সি পরীক্ষার ফলাফল জেনে গেছেন নীলিমা বৌদি। তাঁর কান্না এবং অসহায়তা আমার মধ্যেও যেন চারিয়ে যাচ্ছিল। তবু বললাম, 'বৌদি, কাঁদবেন না। এসময় অস্থির হয়ে পড়লে মণিময়দাকে কে সাহস দেবে?'

নীলিমা বৌদি উত্তর দিলেন না। কিছুক্ষণ কাঁদার পর খানিকটা শান্ত হলেন।

এবার জিজ্ঞেস করলাম, 'মণিময়দার ট্রিটমেন্টের ব্যাপারে ডাক্তার সেন কী বললেন?'

'খুব তাড়াতাড়ি আপনার দাদাকে ভর্তি করতে বললেন। পারলে দু' একদিনের ভেতর। অপারেশান করবেন উনি নিজে। কী বলব ঠিক করে উঠতে পারিনি। নার্সিং

হোম থেকে ফিরে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি।'

'অপারেশান করলে সেরে যাবার চান্স কতটা?'

'এ সম্বন্ধে আমি কিছু জিজ্ঞেস করিনি। তবে অপারেশানের ওপর উনি খুব জোর দিচ্ছেন।'

কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললাম, 'ওঁর মতো এতবড় একজন ডাক্তার যখন বলছেন তখন ওটা করে ফেলাই ভাল। মণিময়দাকে অপারেশানের কথা বলেছেন?'

নীলিমা বৌদি বলেন, 'বলেছি।'

'উনি কী বললেন?'

'ওঁর আপত্তি নেই।'

'তা হলে কালই নার্সিং হোমে ভর্তি করে দেওয়া যাক। আমি সকালে এসে আপনাদের দু'জনকে নিয়ে যাব। যা কষ্ট পাচ্ছেন মণিময়দা, চোখে দেখা যায় না। অপারেশানটা হয়ে গেলে নিশ্চয়ই উনি ভাল হয়ে উঠবেন।'

মুখ থেকে হাত সরিয়ে আমার দিকে এক পলক তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নেন নীলিমা বৌদি। অনেকক্ষণ পর দ্বিধান্বিতভাবে বলেন, 'কিন্তু—'

বুঝতে পারছি, অপারেশানের ব্যাপারে ভয় পাচ্ছেন নীলিমা বৌদি। বললাম, 'কিন্তু কী?'

'অপারেশানের আগে তো বন্ডে সই করতে হবে।'

'হ্যাঁ। সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে লিখিত কনসেন্ট দিতে হয়। আপনিও দেবেন।'

'আমি তা পারব না সুধীশ ঠাকুরপো।'

'মনে জোর আনুন বৌদি। অপারেশানটা খুব জরুরি।'

'জানি, কিন্তু বন্ডে সই দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব না।'

'কেন?'

কথা বলছিলাম ঠিকই, কিন্তু আমার চোখ নীলিমা বৌদির মুখের ওপর স্থির হয়ে আছে। অদম্য কোনও আবেগে তাঁর ঠোঁট ভীষণ কাঁপছিল, চোখ কুঁচকে যাচ্ছিল। ভেতরে দারুণ কোনও ভাঙচুর চলছে, সেটাই তাঁর তাকানোর মধ্যে ফুটে উঠছিল।

নীলিমা বৌদি একসময় বলেন, 'সই দেওয়ার অধিকার আমার নেই সুধীশ ঠাকুরপো।'

প্রথমটা অবিশ্বাস্য মনে হল। পরক্ষণে আমার সমস্ত অস্তিত্বের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ চমকের মতো কিছু একটা ঘটে যায়। বিমূঢ়ের মতো বললাম, 'কী বলছেন। আপনি ওঁর স্ত্রী। আপনার ছাড়া কার এ অধিকার আছে?'

ঝাপসা গলায় নীলিমা বৌদি বলেন, 'আমি ওঁর স্ত্রী নই।'

আমার মাথার ভেতর এবার বিস্ফোরণ ঘটে যায়। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকি। তারপর বলি, 'আপনি কী বলছেন, বুঝতে পারছেন?'

আমার মনোভাব ধরতে পারছিলেন নীলিমা বৌদি। স্পষ্ট গলায় বলেন, 'আমার মাথা ঠিকই আছে সুধীশ ঠাকুরপো। যা বললাম তার ভেতর এতটুকু মিথ্যে নেই।'

আমার বিমূঢ়তা কয়েক গুণ বেড়ে যায়। জিজ্ঞেস করি, 'তা হলে আপনার সঙ্গে

মণিময়দার সম্পর্কটা কী?'

'সব বলব, তার আগে আমাকে একটা কথা দিতে হবে।' বলতে বলতে ব্যাকুলভাবে আমার হাত জড়িয়ে ধরেন নীলিমা বৌদি।

বললাম, 'কী?'

'আপনাকে একবার পাটনায় যেতে হবে।'

আমি অবাক হয়ে যাই। বলি, 'সেখানে যাব কেন?'

এবার নীলিমা বৌদি যা বলেন তা এইরকম। পাটনার কদমকুঁয়াতে মণিময়দাদের বাড়ি। তিন জেনারেশান ধরে ওঁরা ওই শহরের বাসিন্দা। সেখানে মণিময়দার মা এবং ভাইরা থাকেন। তাঁদের কাছে আছেন তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী কণিকা। মণিময়দার এই শেষ সময়ে তাঁর আইনসঙ্গত আত্মীয়স্বজন এবং স্ত্রীর কাছে থাকা দরকার। তাঁরাই সিদ্ধান্ত নেবেন, অপারেশানটা করবেন কিনা। করলে কণিকাকেই বন্ডে সই দিতে হবে।

আমার হাত ধরেই রেখেছিলেন নীলিমা বৌদি। বলেন, 'ওদের আপনাকে নিয়ে আসতেই হবে।'

মণিময়দা এবং নীলিমা বৌদির সঙ্গে আমার কোনওরকম আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই। মণিময়দা আর আমি একটা মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানিতে কাজ করি। উনি যে ডিপার্টমেন্টের ইন-চার্জ, আমি সেখানকার টাইপিস্ট-কাম-স্টেনোগ্রাফার।

সতের বছর আগে কলেজ থেকে বেরিয়ে এই চাকরিটায় ঢুকেছিলাম। তারও ক'বছর আগে থেকে মণিময়দা এই কোম্পানিতে কাজ করছেন।

মণিময়দা আমার অফিস বস। কিন্তু কখনও তা বুঝতে দেননি। শুধু আমার সঙ্গেই না, ডিপার্টমেন্টের সবার সঙ্গেই তাঁর ব্যবহার চমৎকার। মাঝখানে দেওয়াল তুলে নিজেকে তিনি নাগালের বাইরে সরিয়ে রাখেননি। আমুদে, হাসিখুশি, হৃদয়বান এই মানুষটি চাকরিতে জয়েন করার দিন থেকেই আমাকে সস্নেহে কাছে টেনে নিয়েছিলেন।

কবে যে মণিময়দা প্রথম আমাকে ওঁর বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন, মনে পড়ে না। তখন ওঁরা ওল্ড বালিগঞ্জে একটা ভাড়া-করা ফ্ল্যাটে থাকতেন। তারপর কো-আপারেটিভ করে ওঁদের নিজস্ব ফ্ল্যাট হল।

প্রথম আলাপের দিনটি থেকেই স্নেহে মাধুর্যে আন্তরিকতায় আমাকে অভিভূত করে রেখেছেন নীলিমা বৌদি। মনেই হয় না, ওঁদের কাছে আমি একজন বাইরের উটকো লোক। সতের বছর ধরে সুখেদুঃখে ওঁদের জীবনের সঙ্গে মিশে গেছি।

একটা ব্যাপার বার বার আমার চোখে পড়েছে। এমন সুখী আদর্শ দম্পতি আর হয় না। কার কাছে যেন শুনেছিলাম বিবাহিত জীবন নাকি গোলাপ-বাগান নয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সবসময় একটা অঘোষিত যুদ্ধ লেগেই আছে। কিন্তু সতের বছরে একদিনের জন্য দেখিনি কোনও কারণে মণিময়দা আর নীলিমা বৌদির ভেতর খিটিমিটি হয়েছে বা দু'জনে কথা বন্ধ করে দিয়েছেন কিংবা নীলিমা বৌদি রাগ-টাগ করে বাপের বাড়ি চলে গেছেন। সর্বক্ষণ হাসি, রগড়, মজা এবং হাজার রকমের খুনসুটি। সমস্ত দিন নিজেদের মধ্যে তাঁরা মগ্ন হয়ে আছেন। এমন পরিতৃপ্ত নারী এবং

পুরুষ ক্বচিৎ দেখা যায়।

কিন্তু এই সতের বছরে কোনও ঘটনায় বা দু'জনের কোনও আচরণে এক মুহূর্তের জন্যও আমার সংশয় হয়নি যে মণিময়দার আইনসঙ্গত বিবাহিত একটি স্ত্রী আছেন। কণিকা নামের সেই মহিলাটি যদি থেকেই থাকেন, নীলিমা বৌদি তবে কে? আমার স্নায়ুতে তীব্র ধাক্কা লাগে। নিজের অজান্তেই মুখ থেকে বেরিয়ে আসে, 'তা হলে?'

আমার প্রশ্নটার মধ্যে যা রয়েছে তা ধরে ফেলতে অসুবিধা হয় না নীলিমা বৌদির। তিনি বলেন, 'আমি কে, আপনার দাদার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক, পাটনায় গেলেই সব জানতে পারবেন। সুধীশ ঠাকুরপো, দয়া করে কাল আপনি ওখানে চলে যান।'

'আপনি যে আমাকে পাটনায় পাঠাতে চাইছেন, মণিময়দা জানেন?'

'না।'

'বৌদি, একটা কথা বলব?'

মুখ তুলে পরিপূর্ণ চোখে আমার দিকে তাকান নীলিমা বৌদি, 'আপনি যা বলবেন, আমি তা জানি। তবু বলুন।'

বললাম, 'মণিময়দার সঙ্গে আপনার যে সম্পর্কটা সতের বছর ধরে জেনেছি তার বাইরে আর কিছু জানার ইচ্ছা আমার নেই। বৌদি, আপনিও আমাকে একটা ব্যাপারে দয়া করুন।'

নীলিমা বৌদি তাকিয়েই ছিলেন। আবছা গলায় বলেন, 'কী ব্যাপারে?'

'আমাকে পাটনায় যেতে অনুরোধ করবেন না।'

নীলিমা বৌদি হকচকিয়ে যান। কিছু বলতে চেষ্টা করেন কিন্তু গলায় স্বর ফোটে না, ঠোঁট দু'টো শুধু কাঁপতে থাকে।

আমি আবার বলি, 'জীবনের অনেকগুলো দিন কেটে গেল। এই শেষ বয়সে জটিলতা তৈরি করে কী লাভ?'

'লাভ-লোকসানের কথা ভাবছি না।' নীলিমা বৌদি এবার বলতে থাকেন, 'জীবনে এমন একটা সময় আসে যখন চুলচেরা হিসেব করে অনেক কিছু মিটিয়ে দিতে হয়। ধরুন, আমি সেইরকম কিছু একটা করতে চাইছি।'

বুঝতে পারি যৌবনের উন্মাদনায় একদিন গর্হিত কিছু করে ফেলেছিলেন নীলিমা বৌদি এবং মণিময়দা। এই মুহূর্তে মণিময়দার আয়ু যখন নিশ্চিতভাবেই ফুরিয়ে আসছে, তীব্র গ্লানি এবং পাপবোধে আক্রান্ত মহিলাটি বিপুল ঝুঁকি নিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে চান। কিন্তু এর জন্য কতটা দাম দিতে হবে, খুব সম্ভব সে সম্পর্কে আদৌ তিনি ভেবে দেখেননি। বললাম, 'বৌদি, আপনাদের অতীত সম্বন্ধে আমার এতটুকু কৌতূহল নেই। যা অনেকদিন আগেই শেষ হয়ে গেছে, তাকে কবর থেকে তুলে এনে কেন নিজের ক্ষতি করতে চাইছেন?'

একগুঁয়ে একটা জেদ নীলিমা বৌদির ওপর ভর করে। তিনি বলেন, 'সব কিছুই শেষ হয়ে যায় না সুধীশ ঠাকুরপো। আমার ওপর এই অনুগ্রহটুকু শুধু করুন—পাটনায় গিয়ে ওঁদের নিয়ে আসুন।'

'কিন্তু বৌদি, ওঁরা এলে কী হবে ভাবতে পারেন?'

'পারি। আমাকে এই ফ্ল্যাট থেকে চলে যেতে হবে। অফিসের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, গ্র্যাচুইটি আর এল. আই. সি পলিসিতে আপনার মণিময়দা আমাকে নামিনি করেছেন। সেগুলো খোয়াতে হবে। কিন্তু আমি সব কিছুর জন্য প্রস্তুত। কাউকে এ জন্যে কোর্টে যেতে হবে না। আমি নিজেই লিখিতভাবে সব স্বত্ব ছেড়ে দেব।'

আমি চমকে উঠি, 'কিন্তু এ ফ্ল্যাট ছেড়ে যাবেন কোথায়?'

নীলিমা বৌদি বলেন, 'তা এখনও ঠিক করিনি। একসময় স্কুল মাস্টারি করতাম। আমার নিজস্ব কিছু টাকা ব্যাঙ্কে ফিক্সড ডিপোজিট করা আছে। আর আছে বি. এ'র একটা ডিগ্রি। কোথাও না কোথাও একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

'এতদিন এ সব ভাবেননি কেন?' বলেই মনে হল, এ প্রশ্নটা না করলে ভাল হ'ত। নিজের অজান্তেই মুখ থেকে যেন এটা বেরিয়ে এসেছে। পরক্ষণে সঙ্কোচে মাথা নিচু হয়ে গেল। বললাম, 'আমার অন্যায় হয়ে গেছে বৌদি। কিছু মনে করবেন না।'

নীলিমা বৌদির কোনওরকম প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। বললেন, 'আপনার বিব্রত হবার কারণ নেই। এ কথা জিজ্ঞেস করতেই পারেন।' একটু থেমে বিষণ্ণ, ভারী গলায় ফের বলেন, 'এতকাল আচ্ছন্ন হয়ে ছিলাম। নিজের কথা ছাড়া আর কিছুই ভাবতাম না।'

বুঝতে পারছি, নীলিমা বৌদি নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মনস্থির করে ফেলেছেন। তাঁকে কিছুতেই ঠেকানো যাবে না। তবু মরিয়া হয়েই বললাম, 'এখন আপনি চলে গেলে আর মণিময়দার স্ত্রী যদি এখানে আসেন, ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাবে। তখন মণিময়দার সামাজিক মর্যাদা কোথায় নেমে যাবে, ভাবতে পারেন?'

'সেদিকটাও ভেবে দেখেছি। কিন্তু আমার আর ফেরার রাস্তা নেই। জীবনের কঠিন সত্যকে বহুকাল এড়িয়ে চলেছি, এবার ঘাড় ধরে সে আমাকে তার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।' নীলিমা বৌদি একটানা বলে যান, 'ডাক্তার সেনের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, অপারেশান হলেও আপনার দাদার বাঁচার আশা খুব কম। তিনি থাকতে থাকতেই আমাকে সব কিছু করে ফেলতে হবে।'

একটু চিন্তা করে বলি, 'মণিময়দাকে এ কথা জানিয়েছেন?'

'না। পরে জানিয়ে দেব।'

এইসময় সুধা এসে দরজার সামনে দাঁড়ায়। সে মণিময়দাদের কাজের মেয়ে। বয়স চল্লিশ-বেয়াল্লিশ।

সুধা বলে, 'দাদাবাবু আপনাদের ডাকছেন।'

নীলিমা বৌদি বলেন, 'তুই যা। আমরা এক্ষুণি আসছি।'

সুধা চলে যায়।

'চলুন, ও ঘরে যাওয়া যাক। দেরি করলে, ফের আপনার দাদা সুধাকে পাঠাবে।' উঠে পড়তে পড়তে নীলিমা বৌদি বলেন, "কাল আপনার পাটনায় না গেলেই নয়। ওদের নিয়ে ফিরে এলে তবেই অপারেশানের ব্যবস্থা হবে। আর—'

'আর কী?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'হাওড়ায় নেমেই আমাকে একটা ফোন করবেন।'

'কেন?'

'দরকার আছে।'

নীলিমা বৌদির উদ্দেশ্যটা কী, বুঝতে পারি না। তবে এ ব্যাপারে আর কোনও প্রশ্ন করলাম না।

আজ লোড শেডিংটা বেশিক্ষণ ভোগাল না। পাশের ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আলো এসে গেল।

মণিময়দা বিশাল জোড়া জানালার পাশে একটা খাটে শুয়ে আছেন।

এক বছর আগেও চমৎকার পেটানো স্বাস্থ্য ছিল তাঁর। মুখে সারাক্ষণ ঝলমলে সরল একটি হাসি লেগে থাকত। ওই হাসিটা দেখলে বোঝা যেত, এই মানুষটির মধ্যে নোংরা কোনও ব্যাপার থাকতে পারে না। ভরাট মুখে শৌখিন একটু গোঁফ ছিল।

এখন আর এক বছর আগের মানুষটাকে চেনা যায় না। গায়ের রং পুড়ে ঝামার মতো। চোখের তলায় গাঢ় কালির পোঁচ। শরীর বিছানায় লেগে গেছে। চামড়া ঢলঢলে রবারের মতো, কোন রকমে হাড়ের ওপর আটকে আছে যেন। সারা দেহে শাঁস বলতে কিছুই অবশিষ্ট নেই। মণিময়দার সেই উজ্জ্বল হাসিটা আমার স্মৃতির মধ্যেই রয়েছে। তার বদলে ওঁর সারা মুখ জুড়ে এখন শুধু নিদারুণ কষ্টের একটা ছাপ। মণিময়দাকে দেখামাত্র টের পাওয়া যায় তাঁর জীবনীশক্তি শেষ হয়ে এসেছে, খুব বেশিদিন আর বাঁচবেন না। ক্যানসার তাঁর আয়ু দ্রুত কমিয়ে দিচ্ছে।

মণিময়দা ক্ষীণ গলায় বলেন, 'বসো সুধীশ।'

খাটের পাশে একটা বেতের মোড়ায় বসে পড়ি। নীলিমা বৌদি একধারে দাঁড়িয়ে থাকেন।

মণিময়দা বলেন, 'আজ তোমার আসতে অনেক দেরি হয়েছে। তোমার বৌদি আর আমি খুব চিন্তা করছিলাম।'

দেরি হওয়ার কারণটা মণিময়দাকেও জানাতে হয়। তিনি এবার বলেন, 'তোমার বৌদি বায়োপ্সির রিপোর্ট নিয়ে এসেছে, নিশ্চয়ই শুনেছ?'

ধরা গলায় বলি, 'হ্যাঁ।'

'অপারেশানের কথাও শুনেছ?'

'হ্যাঁ।'

'ওটা করিয়েই ফেলতে হবে সুধীশ। এত যন্ত্রণা আর সহ্য করতে পারছি না।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর মণিময়দা তাঁর শীর্ণ হাত বাড়িয়ে আমার একটা হাত ধরে বলেন, 'সুধীশ, নার্সিং হোম থেকে আমি খুব সম্ভব আর ফিরব না।'

চমকে উঠে বলি, 'এ আপনি কী বলছেন দাদা! নিশ্চয়ই সুস্থ হয়ে উঠবেন, আমরা গিয়ে আপনাকে বাড়ি নিয়ে আসব।'

একদিন পর পাটনায় পৌঁছে মণিময়দাদের বাড়িটা খুঁজে বার করতে অসুবিধা হয়

না। ওঁরা ওখানে তিন জেনারেশান ধরে আছেন। কদমকুঁয়ায় এসে মণিময়দার বাবার নাম করতেই রাস্তার একটি লোক ওঁদের বাড়ি দেখিয়ে দিলেন।

চওড়া চওড়া পিলারের ওপর পুরনো আমলের প্রকাণ্ড তেতলা বাড়ি মণিময়দাদের। সামনের দিকে অনেকটা খোলা জায়গা। তার একধারে গ্যারেজে একটা পুরনো ফোর্ড গাড়ি, আরেকটা ঝকঝকে নতুন অ্যামবাসাডর। গেটে প্রকাণ্ড পাগড়ি মাথায় এক অতি বৃদ্ধ দারোয়ান।

এখন এই সকালবেলায় সবে বাড়ির লোকজনের ঘুম ভেঙেছে।

নীলিমা বৌদির কাছ থেকে জেনে এসেছিলাম, মণিময়দার তিন দাদা, তিন বৌদি, মা এবং দাদাদের ছেলেমেয়েরা এখানে থাকে।

প্রাচীন কালের ডাইনোসরদের মতো সারা দেশের যৌথ পরিবারগুলি যখন ধ্বংস হয়ে গেছে, সেই সময় মণিময়দারা এখনও একসঙ্গেই আছেন।

নীলিমা বৌদি জানিয়ে দিয়েছিলেন, মণিময়দাদের বাড়ির সবাই ল'ইয়ার। ওঁর বাবা ছিলেন পাটনা হাইকোর্টের জবরদস্ত অ্যাডভোকেট। তিন দাদাও ওখানে প্র্যাকটিশ করেন। শুধু মণিময়দাই এই ঘরানার বাইরে।

দারোয়ানকে জানালাম, মণিময়দার ভাইদের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

দারোয়ান একতলা ড্রইং রুমে আমাকে বসিয়ে ভেতরে খবর দিতে গেল। বড় বড় দুই ব্লেডওলা ত্রিশ বত্রিশ সালের মডেলের ফ্যান, বিশাল বিশাল সোফা, একধারে গির্দা বালিশে সাজানো ফরাস, কারুকাজ-করা সেন্টার টেবল, ইত্যাদি দেখে টের পাওয়া যায় এ বাড়িতে সাবেক চাল অনেকটাই বজায় আছে।

কিছুক্ষণ বাদে তিনজন ভারী চেহারার বয়স্ক ভদ্রলোক ড্রইং রুমে এসে ঢুকলেন। তাঁদের মুখ চোখের আদল দেখেই টের পাওয়া গেল, এঁরা মণিময়দার তিন দাদা।

আমি কোত্থেকে কী উদ্দেশ্যে এসেছি সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিয়ে তিন ভাই ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেলেন।

এরপর অনেকক্ষণ চুপচাপ। আমি ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করতে থাকি।

একসময় স্তব্ধতা ভেঙে বড় ভাই কান্তিময় কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করেন, 'সেই মেয়েমানুষটা এখন কোথায়? মণির কাছেই আছে?' একটু থেমে বলেন, 'বদ, নষ্ট মেয়েমানুষ!'

মেয়েমানুষটি কে, বুঝতে অসুবিধা হয় না। নীলিমা বৌদি সম্পর্কে মণিময়দাদের বাড়িতে কী নিদারুণ ঘৃণা এবং ক্রোধ জমা হয়ে আছে তা ওই কথায় টের পেয়ে যাই। একবার ভাবি অমন একজন অসাধারণ ভদ্র এবং মর্যাদাসম্পন্ন মহিলা সম্বন্ধে কান্তিময় যে নোংরা মন্তব্য করলেন তার প্রতিবাদ করি। পরক্ষণেই মনে হয়, তাতে অযথা খানিকটা তিক্ততাই সৃষ্টি হবে। নিজেকে যতখানি সম্ভব সংযত রেখে বলি, 'হ্যাঁ, উনি ওখানেই আছেন।'

কান্তিময় বলেন, 'আমরা কণিকাকে নিয়ে কলকাতায় যাব। অ্যাণ্ড উই উড অ্যাসার্ট আওয়ার রাইটস।'

মণিময়ের মেজদা প্রভাময় বলেন, 'কলকাতায় গিয়েই ঘাড় ধরে মেয়েমানুষটাকে

বার করে দেব।'

এবারও দাঁতে দাঁত চেপে মুখ বুজে থাকি। মণিময়দার ছোটদা আনন্দময় হঠাৎ আমার ব্যাপারে সচেতন হয়ে ওঠেন। বলেন, 'আপনি কোথায় উঠেছেন?'

একটা ছোট হোটেলের নাম করে বললাম, 'ওখানে।'

'গাড়ি বার করে দিচ্ছি। আপনার মালপত্র এখানে নিয়ে আসুন। রাতের দিকে কলকাতার একটা ট্রেন আছে। এখান থেকে আমরা একসঙ্গে চলে যাব।'

এ বাড়িতে ওঠার ইচ্ছা একেবারেই নেই। নীলিমা বৌদি সম্পর্কে এঁদের মনোভাব আমার মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছিল। এখানে এক একটা মিনিট আমার পক্ষে কী কষ্টদায়ক বোঝাতে পারব না। বললাম, 'আমি ওখানেই ঠিক আছি। কয়েক ঘন্টার জন্যে মালপত্র টানা হ্যাঁচড়া করে লাভ নেই। ট্রেন ক'টায়?'

আনন্দময় বলেন, 'আটটা নাগাদ।'

'আমি সাতটায় স্টেশনে পৌঁছে যাব। আপনারাও চলে যাবেন। স্টেশনে দেখা হবে। আচ্ছা চলি।' বলতে বলতে উঠে পড়ি।

এবার মণিময়দার ভাইরা বেশ লজ্জিত হয়ে পড়েন। তাঁদের খেয়াল হয়, কলকাতা থেকে যে লোকটা এত কষ্ট করে এতদূর ছুটে এসেছে তার সঙ্গে সঠিক ব্যবহার করা হয় নি। নীলিমা বৌদি সম্পর্কে তাঁদের বিতৃষ্ণা বা ক্রোধ থাকতে পারে, কিন্তু আমার অপরাধ কী? অতিথিকে আপ্যায়নের জন্য এবার তাঁরা অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তিন ভাই সমস্বরে বলে ওঠেন, 'উঠবেন না, উঠবেন না। অন্তত চা-টা খেয়ে যান।

'ক্ষমা করবেন।' মণিময়দার ভাইদের নতুন করে আর কোনও অনুরোধ করার সুযোগ না দিয়ে আমি বেরিয়ে পড়ি।

সাতটায় স্টেশনে মণিময়দার ভাইদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। ওঁদের সঙ্গে রোগা ফর্সা বিষণ্ণ চেহারার মধ্যবয়সী একটি মহিলাও রয়েছেন। তাঁর চোখেমুখে গভীর উৎকণ্ঠা এবং দুর্ভাবনার ছাপ।

আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেন প্রভাময়। বলেন, 'এ হল কণিকা, মণির স্ত্রী।'

ঠিক হয়, সব ভাই আমার সঙ্গে কলকাতায় যাবেন না। বড় ভাই কান্তিময় আর কণিকাই শুধু যাবেন। আটটায় ট্রেন এলে আমরা উঠে পড়ি। সারাটা পথ আমাদের মধ্যে একটি কথাও হয় না।

পরদিন হাওড়ায় পৌঁছেই কথামতো স্টেশন থেকে নীলিমা বৌদিকে ফোন করি, 'আমি কি ওঁদের নিয়ে সোজা ফ্ল্যাটে আসব?'

নীলিমা বৌদি বলেন, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

আমি হকচকিয়ে যাই। বলি, 'কিন্তু—'

'কোনও কিন্তু নেই। আপনি অবশ্যই ওঁদের নিয়ে আসুন।'

আমাকে আর কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে লাইন কেটে দিলেন নালিমা

বৌদি।

গভীর উদ্বেগ নিয়ে কান্তিময় এবং কণিকাকে সঙ্গে করে যখন মণিময়দার ফ্ল্যাটে পৌঁছে যাই, নীলিমা বৌদিকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

এরপর কান্তিময়রা মণিময়দার খাটের পাশে এসে দাঁড়ালে বিহ্বলের মতো তিনি তাকিয়ে থাকেন শুধু।

পাটনা থেকে কণিকাদের নিয়ে আসার তিন দিন পর মণিময়দার অপারেশান হল। শুরু হয়েছিল সকাল ন'টায়। শেষ হল একটায়। আমি কণিকাদের সঙ্গে উদ্বিগ্ন মুখে নার্সিং হোমের করিডরে অপেক্ষা করছিলাম। ডাক্তার সেন অপারেশান থিয়েটার থেকে বেরিয়ে এলে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেমন বুঝলেন?'

ডাক্তার সেন মৃদু হাসেন। বলেন, 'আমাদের হতাশ হতে নেই। দেখা যাক।'

একসময় কণিকারা চলে যান। আমি অন্যমনস্কর মতো নার্সিং হোমের বাইরে আসি। রাস্তা পেরুতে যাব, হঠাৎ ডাকটা কানে ভেসে আসে, 'সুধীশ ঠাকুরপো—'

চমকে মুখ ফেরাতেই চোখে পড়ে, ফুটপাথের একধারে দাঁড়িয়ে আছেন নীলিমা বৌদি। মুহূর্তের জন্য আমার শ্বাসক্রিয়া যেন বন্ধ হয়ে যায়। কান্তিময়রা আসার পর একটা চিঠিতে এ বাড়ির মালিকানা, মণিময়দার গ্র্যাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ইত্যাদি স্বত্ব ছাড়ার কথা লিখে দিয়ে তিনি যে কোথায় চলে গিয়েছিলেন, কে জানে। তারপর এই দেখা হল। একটা ঘোরের মধ্যে যেন তাঁর কাছে দৌড়ে চলে যাই। বলি, 'বৌদি আপনি!'

নীলিমা বৌদি বিষণ্ণ হাসেন, 'হ্যাঁ, আমিই। রোজ আমি এখানে এসে দাঁড়িয়ে থাকি। আপনারা চলে যাবার পর নার্সিং হোমে গিয়ে আপনার দাদার খবর নিই। আজ তো অপারেশান হয়ে গেল।'

'হ্যাঁ।'

'ডাক্তার সেন অপারেশানের পর কী বললেন?'

আসল কথাটা জানাই না। শুধু বলি, 'সাকসেসফুল অপারেশান।'

সোজা আমার চোখের দিকে তাকান নীলিমা বৌদি। অদ্ভুত একটু হাসেন শুধু।

চুপচাপ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর জিজ্ঞেস করি, 'আপনি এখন কোথায় আছেন বৌদি?'

নীলিমা বৌদি বলেন, 'সেটা জানাবার মতো কোনও জায়গা নয়।'

বুঝতে পারি, তাঁর ঠিকানা কিছুতেই দেবেন না নীলিমা বৌদি। একটু চিন্তা করে বলি, 'একটা কথা বলব?'

'বলুন না—'

'আপনাকে অন্য কোথাও থাকতে হবে না। আমাদের কাছে চলুন। আমরা মোটে তিনটে মানুষ—শুভা, আমি আর আমার ছেলে বিনু। ঠাকুরদার আমলের বাড়িটাও কত বড়। আপনার এতটুকু অসুবিধা হবে না।'

নীলিমা বৌদি বলেন, 'আপনার দাদা ছাড়া এভাবে কেউ আমাকে বলেনি। আমার

মন ভরে গেছে সুধীশ ঠাকুরপো। কিন্তু—'

'কী?'

'নতুন করে আমি আর কোথাও জড়াতে চাই না।'

এরপর আমার আর কিছু বলার থাকে না।

নীলিমা বৌদি খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলেন, 'আপনাকে আমার কিছু জানাবার আছে।'

'কী?'

'আমি মানুষটা কে। আপনার দাদা বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর জীবনে কেমন করে এলাম, এ সব সম্পর্কে নিশ্চয়ই আপনার কৌতূহল আছে। কণিকারা আপনাকে কি কিছু জানায় নি?'

'না। আপনি আমার বৌদি, এর বেশি আর কিছু জানার ইচ্ছে নেই।'

'তবু আমাকে বলতেই হবে। যাকে এতদিন বৌদি বলে সম্মান করে এসেছেন সে যে কত বড় পাপিষ্ঠা তা আপনার জানা দরকার।'

হাতজোড় করে বলি, 'আমাকে এসব বলবেন না বৌদি।'

নীলিমা বৌদি কিন্তু আমার কথা শোনেন না। তাঁর ওপর অপার্থিব কিছু যেন চেপে বসে। দুপুরের রোদে দাঁড়িয়ে যা বলে যান তা এইরকম।

নীলিমা বৌদি মণিময়দাদের দূর সম্পর্কে আত্মীয়। কম বয়সে বিয়ে হয়েছিল তাঁর, দু'বছরের মধ্যেই বিধবা হয়ে বাপের বাড়ি ফিরে আসেন। এই বিপর্যয়ের পর প্রথম প্রথম সহানুভূতি বোধ করতেন মণিময়দা। তারপর কবে যে সেটা গভীর ভালবাসায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, টের পাননি।

জানাজানি হয়ে যাওয়ায় দুই পরিবারে চরম অশান্তি হয়েছিল। ছেলেকে শোধরাবার জন্য মণিময়দার বাবা একরকম জোর করেই তাঁর সঙ্গে কণিকার বিয়ে দেন। কিন্তু সে বিয়ে মেনে নেন নি মণিময়দা। গোপনে নীলিমা বৌদির সঙ্গে যোগাযোগটা রেখেই যাচ্ছিলেন। তারপর একদিন তাঁকে নিয়ে যৌবনের অসীম দুঃসাহসে কলকাতায় পালিয়ে আসেন। এখানে আসার পর অনেকগুলো বছর কেটে গেছে।

কথা শেষ করে আচমকা একটা ট্যাক্সি ডেকে উঠে পড়েন নীলিমা বৌদি। আমি যে কিছু উত্তর দেব তার সুযোগ পাওয়া যায় না।

এরপর নার্সিং হোমে রোজই মণিময়দার খবর নিতে যাই আর ফুটপাথের দূর প্রান্তে নীলিমা বৌদিকে চোখে পড়ে। কণিকাদের এড়িয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলি।

অপারেশানের পরও মণিময়দা সুস্থ হচ্ছেন না, দিন দিন তাঁর অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। সে জন্য আমাদের সবার চেয়ে, এমন কি কণিকার চেয়ের বেশি উৎকণ্ঠিত নীলিমা বৌদি। দেখেই বোঝা যায়, নিয়মিত খান না, রাতের পর রাত হয়তো না ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিচ্ছেন।

চেহারা আগেই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এখন আর তাঁর দিকে তাকানো যায় না। ভেঙেচুরে দ্রুত তিনি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছেন।

দশদিন পর নার্সিং হোমেই মারা গেলেন মণিময়দা। সেদিনও নীলিমা বৌদিকে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। চোখ থেকে অবিরাম জলস্রোত বয়ে যাচ্ছে আর ঠোঁটদুটো সমানে কাঁপছে।

শেষ বার নীলিমা বৌদিকে দেখতে পাই শ্মশানে। একধারে নিজেকে সম্পূর্ণ আড়ালে রেখে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছেন।

মণিময়দার নশ্বর শরীর আগুনে শেষ হয়ে যাবার পর নীলিমা বৌদিকে খোঁজ করতে গিয়ে দেখি তিনি কখন যেন চলে গেছেন। এরপর তাঁর সঙ্গে আর দেখা হয়নি। এই বিশাল পৃথিবীর লক্ষ কোটি মানুষের মধ্যে তিনি চিরদিনের মতো হারিয়ে গেছেন।

জন্মদাত্রী

ধবধবে উর্দিপরা দারোয়ান গেট খুলে দিতেই লাল মারুতি-ওমনিটা ভেতরে ঢুকে নুড়ির রাস্তার ওপর দিয়ে যে উঁচু পিলারওলা বিশাল তেতলা বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল তার নাম 'মুখার্জি ভিলা'। ওটার দিকে তাকানো মাত্র গোথিক স্থাপত্যের কথা মনে পড়ে যায়।

ছড়ানো কম্পাউন্ডের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা এই বাড়িটার সামনে, পেছনে এবং দু'পাশে অনেকটা করে ফাঁকা জায়গা। সামনের দিকে চমৎকার ফুলের বাগান, নুড়ির রাস্তাটা তার মাঝখান দিয়ে চলে গেছে। পেছনে গ্যারাজ, সারভেন্টস কোয়ার্টার্সি ইত্যাদি। দু'পাশে লাইন দিয়ে রয়াল পাম, যেগুলোর মাথা উদ্ধত ভঙ্গিতে সোজা আকাশে গিয়ে ঠেকেছে। এই বনস্পতিগুলো 'মুখার্জি ভিলা'র অহঙ্কার। সত্তর-আশি বছর আগে তৈরি এই বাড়িটাকে কলকাতার হেরিটেজ বিল্ডিংয়ের তালিকায় রাখা যেতে পারে।

মারুতি-ওমনিটা চালিয়ে এনেছিল রাহুল। দারুণ সুপুরুষ, ছ'ফিটের মতো হাইট। তার লম্বাটে মুখ, চওড়া কপাল, ব্যাকব্রাশ-করা চুল, উজ্জ্বল চোখ, টকটকে রং—সব কিছুতে এমন এক রুচি আর আভিজাত্য রয়েছে যা মুহূর্তে তার বংশ-পরিচয় জানিয়ে দেয়। খুব বনেদি, বিত্তবান পরিবারে সে জন্মেছে।

চাবি দিয়ে গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করে বাঁ পাশে তাকাল রাহুল। পারমিতা দুই হাত কোলের ওপর রেখে আড়ষ্টের মতো বসে আছে।

আজ নভেম্বরের দু তারিখ। ক'দিন আগে দুর্গাপুজো শেষ হয়েছে। শরৎকালের পর হেমন্তের শুরু থেকে কলকাতার তাপমাত্রা নামতে থাকে। এখন, এই বিকেলবেলায় বাতাসে বেশ একটা ঠাণ্ডার আমেজ। তবু পারমিতার কপালে দানা দানা ঘাম জমেছে। ভেতরকার লুকনো টেনসন ফুটে উঠেছে চোখেমুখে।

পারমিতার মনোভাবটা বুঝতে পারছিল রাহুল। আজই প্রথম তার মা স্বর্ণলতা ওকে ডেকে পাঠিয়েছেন। নামটা যেমনই হোক, মায়ের স্বভাবে লতার মতো নমনীয়তা নেই। যা আছে তা হল রূঢ় কাঠিন্য ; কখনও কখনও সেটাকে নিষ্ঠুরতা মনে হতে পারে। স্বর্ণলতা সম্পর্কে আগেই পারমিতাকে সব জানিয়ে দিয়েছিল রাহুল ; কোনও কিছুই গোপন করেনি। আসলে মানসিক দিক থেকে প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য তাকে যথেষ্ট সময় দিয়েছে সে। কিন্তু ঘন্টাখানেক আগে টালিগঞ্জে এই মারুতি-ওমনিতে পারমিতা যখন উঠল তখনও তার যে মনোবলটুকু ছিল, 'মুখার্জি ভিলা'য় আসার সঙ্গে সঙ্গে তার সামান্যই অবশিষ্ট আছে।

পারমিতার বয়স তিরিশের কাছাকাছি। কিন্তু চব্বিশ-পঁচিশের বেশি দেখায় না। আশ্চর্য কোনও ম্যাজিকে বয়সটাকে সে যেন চার-পাঁচ বছর কমিয়ে রেখেছে। রং একটু চাপা হলেও তার ডিম্বাকৃতি নিটোল মুখমণ্ডল, বড় বড় দীর্ঘ চোখ, নাক, চিবুক, গ্রীবা, সতেজ স্বাস্থ্যের লাবণ্য—সব মিলিয়ে অলৌকিক একটা ব্যাপার আছে।

স্বর্ণলতা জাঁকজমক খুব পছন্দ করেন। তাই পারমিতাকে আজ তার একমাত্র দামি শাড়ি, একটা সবুজ কলাপাতা রঙের মাইশোর সিল্ক যার আঁচল আর পাড়ে দারুণ সব নকশা—পরতে হয়েছে। বিউটি পার্লারে গিয়ে চুল বেঁধেছে। যে সামান্য ক'টা গয়না আছে তাও পরেছে। তাকে মায়াকাননের কোনও পরীর মতো মনে হচ্ছে।

পারমিতার কাঁধটা আলতো করে ছুঁয়ে নিচু গলায় রাহুল বলল, 'বি স্টেডি—' সে বুঝতে পারছিল তার নিজের গলাও কাঁপছে। হয়তো পারমিতার টেনসনটা তার মধ্যেও চারিয়ে গেছে।

পারমিতা চুপ করে থাকে।

রাহুল এবার গাড়ি থেকে নেমে ওধারের দরজা খুলে দিতে দিতে বলল, 'নামো—'

অনেকটা যন্ত্রচালিতের মতো নিঃশব্দে নেমে এল পারমিতা। গাড়িটা যেখানে থেমেছে তার পাশ থেকে শ্বেতপাথরের চওড়া চওড়া সিঁড়ি। রাহুলের পাশাপাশি সেগুলো পেরিয়ে ওপরের চাতালে উঠে এল সে। এখানে দু'ধারে মোটা মোটা থামের সারি। তার মাঝখান দিয়ে খানিকটা এগুলে কারুকাজ-করা প্রকাণ্ড দরজা, যার মাথার দিকটা অর্ধগোলাকার।

দরজা খোলাই ছিল। ভেতরে পা দিতেই লাল কার্পেটে মোড়া মস্ত হল-ঘর। চার-পাঁচ সেট সোফা, সেন্টার টেবল, ছোট ছোট টিপয় নানা জায়গায় সাজানো রয়েছে। একধারে দারুণ একটা পিয়ানোও চোখে পড়ে। সিলিং থেকে নেমে এসেছে ঝাড়লণ্ঠন। দেওয়ালে প্রচুর অয়েল পেন্টিং। আর কী কী আছে, সে সব খুঁটিয়ে দেখার মতো মনের অবস্থা নয় পারমিতার। হল-ঘরের ভেতর দিয়ে সামনের প্যাসেজের দিকে যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেল সে।

রাহুলও থেমে গিয়েছিল। জিজ্ঞেস করল, 'কী হল?'

পারমিতা মুখ নামিয়ে বলল, 'আমি ফিরে যাব।'

'তার মানে?'

'আমার ভীষণ ভয় করছে।'

'কিসের ভয়? তুমি কি কোনও অন্যায় করেছ?' রাহুল বোঝাতে চেষ্টা করল।

পারমিতা উত্তর দিল না।

ভেতরে ভেতরে মায়ের ব্যাপারে উৎকণ্ঠা ছিলই রাহুলের। কিন্তু সেটা প্রকাশ করলে পারমিতা আরও ঘাবড়ে যাবে; তাই আগাগোড়া নিজেকে স্বাভাবিক রাখতে চেষ্টা করছে। সে বলল, 'কোনও চিন্তা নেই। আমরা যা ঠিক করেছি সেটাই হবে।' পারমিতার একটা হাত ধরে সামনের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলল, 'চল—'

হল-ঘরের ডান পাশে একটা প্যাসেজ। সেটা দিয়ে খানিকটা গেলে দোতলায় ওঠার জন্য পেতলের পাত-বসানো কাঠের ঘোরানো সিঁড়ি। সেখানে একটি মাঝবয়সী কাজের লোককে দেখা গেল। রাহুল জিজ্ঞেস করল, 'মা কোথায় অতুলদা?'

অতুল নামের লোকটা দ্রুত একবার পারমিতাকে দেখে নিয়ে বলল, 'দোতলার হল-ঘরে আপনাদের জন্যে বসে আছেন। বড় সাহেবও আছেন।' রাহুল যে পারমিতাকে নিয়ে আসবে খুব সম্ভব সে তা জানে। হয়তো স্বর্ণলতা বলে থাকবেন, কিংবা অন্য কোনওভাবে শুনেছে।

বড় সাহেব অর্থাৎ তার বাবা জ্যোতিভূষণও অপেক্ষা করছেন জেনে ভীষণ অবাক হল রাহুল। সাংসারিক কোনও ব্যাপারেই থাকেন না তিনি। পড়াশোনা, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা, ইতিহাস এবং পুরাতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণা—এ ছাড়া অন্য কোনও বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ নেই তাঁর। ঐতিহাসিক হিসেবে জ্যোতিভূষণের খ্যাতি আন্তর্জাতিক। শুধু এদেশেরই না; ইউরোপ আমেরিকার নাম-করা পাবলিশাররা তাঁর অনেক বই প্রকাশ করেছে। নানা কনফারেন্স, বিদেশের ইউনিভার্সিটিতে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে পড়ানো ইত্যাদি কারণে প্রায়ই লন্ডন, সিডনি, টোরোন্টোতে ছুটতে হয় তাঁকে। রাহুলরা তিন ভাইবোন। সে সবার ছোট, দিদিদের বিয়ে হয়ে গেছে। ছেলেমেয়েরা কে কী পড়বে, মেয়েদের কোথায় বিয়ে হবে—এ সব ব্যাপারে স্বর্ণলতার মতামতই শেষ কথা। রাহুলের ধারণা জ্যোতিভূষণ যে আজ দোতলায় বসে আছেন সেটা মা চেয়েছেন বলে। হয়তো পারমিতা সম্পর্কে তিনি একা কোনও সিদ্ধান্ত নিতে চান না।

ওপরেও হুবহু একতলার মতোই একটা হল-ঘর। তেমনই কয়েক সেট সোফা, ঝাড়বাতি, অয়েল পেন্টিং। বাড়তির মধ্যে রয়েছে টিভি, ভি সি আর, গোটা চারেক নানা রঙের টেলিফোন, অজস্র কিউরিও আর পেতলের অসংখ্য টবে বিচিত্র চেহারার সব অর্কিড। হল-ঘরটার তিন দিকে চার-পাঁচটা বেডরুম। নিচের তলার মতোই ডানদিকে প্যাসেজ। অর্থাৎ তেতলায় ওঠার সিঁড়িটা ওখানেই।

রাহুলের সঙ্গে দোতলায় আসতেই পারমিতার চোখে পড়ল, হল-ঘরের ঠিক মাঝখানে ঝাড়বাতির তলায় দুটো আলাদা সোফায় বসে আছেন স্বর্ণলতা আর জ্যোতিভূষণ। তাঁদের কথা এত বার রাহুলের মুখে সে শুনেছে যে দেখামাত্রই চিনতে পারল।

স্বর্ণলতার বয়স পঞ্চান্ন-ছাপান্ন। চুলের অনেকটাই সাদা হয়ে এসেছে, ত্বকের চিকন মসৃণতাও তেমন নেই, তবু সৌন্দর্যের যে রশ্মিগুলো এখনও থেকে গেছে, চোখ

ঝলসে দেওয়ার পক্ষে তা যথেষ্ট। তাঁর সাজসজ্জায় রয়েছে নিখুঁত বনেদিয়ানার ছাপ। ঘি-রঙের যে মূল্যবান সিল্কের শাড়িটি তিনি পরেছেন তার পাড়ে নানা রঙের সুতোর কারুকাজ। আংটি, নাকছাবি, ব্রেসলেট এবং সরু হারের পেনডান্ট—সব কিছুতেই হীরে বসানো। খুব সম্ভব বিউটি পার্লার থেকে তিনিও চুল বাঁধিয়ে এসেছেন। সৌন্দর্য আর আভিজাত্যের সঙ্গে তাঁর পা থেকে মাথা পর্যন্ত এমন এক অটুট গাম্ভীর্য রয়েছে যাকে দাম্ভিকতা মনে হতে পারে।

রাহুলের সঙ্গে জ্যোতিভূষণের চেহারার দারুণ মিল। ওঁরা যে বাবা এবং ছেলে, বলে দিতে হয় না। ত্রিশ-বত্রিশ বছর পর চুল পাকলে, শরীরে বেশি করে মেদ জমলে, ত্বকের উজ্জ্বলতা নষ্ট হলে রাহুল তার বাবার মতোই হয়ে যাবে।

জ্যোতিভূষণের পরনে ঘরোয়া পোশাক—ধবধবে পাজামা আর পাঞ্জাবি। এই বয়সেও তাঁর চুল বেশ ঘন। চোখে পুরু ফ্রেমের বাইফোকাল চশমা। হঠাৎ দেখলে তাঁকে রাশভারি মনে হবে। তবে খুঁটিয়ে লক্ষ করলে বোঝা যায় মানুষটা চুপচাপ, অন্যমনস্ক ধরনের।

পারমিতাকে নিয়ে স্বর্ণলতাদের সামনে চলে এল রাহুল। মা আর বাবার সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, 'এই হচ্ছে পারমিতা।'

পলকহীন তাকিয়ে ছিলেন স্বর্ণলতা। পারমিতাকে বললেন, 'বসো—'

পারমিতা নেহাতই মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। এমন বিশাল বাড়িতে স্বর্ণলতাদের মতো এত অভিজাত মানুষদের কাছাকাছি আসার সুযোগ আগে আর কখনও হয়নি। অদ্ভুত এক কাঁপুনি বুকের ভেতর থেকে স্রোতের মতো শরীরের নিচের দিকে নেমে যাচ্ছিল যেন। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না সে। স্বর্ণলতা বলামাত্র একটা সোফায় নিজের শরীরের ভার কোনওরকমে ছেড়ে দিল।

স্বর্ণলতা বললেন, 'সোনু তোমার ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অথচ তোমাকে আগে কখনও দেখিনি। তাই আজ ডেকে পাঠিয়েছি। আমার কিছু প্রশ্ন আছে। আশা করি সঠিক উত্তর পাব।'

রাহুলের ডাকনাম যে সোনু, পারমিতা তা জানে। মুখ নামিয়ে আস্তে মাথা নাড়ল সে, অর্থাৎ সব প্রশ্নেরই উত্তর দেবে।

আগে থেকেই বোধহয় বলা ছিল। একটা বেয়ারা নিচু গ্লাস-টপ ট্রলির ওপর নানা আকারের প্লেটে খাবার বোঝাই করে নিয়ে এল। এ সব ছাড়াও রয়েছে জলের গেলাস, ভাঁজ-করা ক'টা ন্যাপকিন, কাঁটা-চামচ এবং ফাঁকা কিছু প্লেট। মস্ত আয়তক্ষেত্রের মতো সেন্টার টেবলটায় সেগুলো দ্রুত সাজিয়ে দিয়ে ফাঁকা ট্রলিটা ঠেলতে ঠেলতে ডান দিকের প্যাসেজে সে অদৃশ্য হল।

পারমিতা বেশ কয়েক বার রাহুলের সঙ্গে নাম-করা, এয়ার-কণ্ডিশনড হোটেলে খেতে গেছে কিন্তু এত সুন্দর, কারুকার্যময় ক্রকারি আগে আর দেখেনি। সুখাদ্যেরও ছড়াছড়ি। দামি চকোলেট-কেক, তালশাঁস সন্দেশ, সিঙাড়া, সরভাজা, ক্ষীরের পান্তুয়া, চিকেন কাটলেট, নানা ধরনের বিস্কুট, কাজুবাদাম ইত্যাদি।

পারমিতা শুনেছে, বনেদি বাড়িতে আতিথেয়তায় কোনওরকম ত্রুটি হয় না।

এখানে এসে নিজের চোখেও তাই দেখতে পেল। স্বর্ণলতা একটা ন্যাপকিনের ভাঁজ খুলে তার ওপর প্লেট রেখে বিভিন্ন পাত্র থেকে কাটলেট, সন্দেশ এবং কাজুবাদাম তুলে নিয়ে পারমিতার হাতে সেটা দিতে দিতে বললেন, 'খাও। আর যা যা ইচ্ছে হয় নিজে নিয়ে নিও।'

জ্যোতিভূষণ এবং রাহুলও খাবার তুলে নিয়েছিল। পারমিতাকে দেওয়ার পর স্বর্ণলতাও নিলেন। বললেন, 'খেতে খেতে কথা বলা যাক।'

অত্যন্ত আড়ষ্ট ভঙ্গিতে কাটলেটের একটা টুকরো কেটে মুখে দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল পারমিতা।

স্বর্ণলতা এবার বললেন, 'সোনু তোমার সম্বন্ধে আমাকে কিছু জানিয়েছে। তবু তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই। শুনেছি তুমি একটা চাকরি কর।'

মেয়েদের চাকরি করাটা এ বাড়ির মানুষদের চোখে কতটা অন্যায় পারমিতা জানে না। আবছা গলায় বলল, 'হ্যাঁ। চাকরি না নিয়ে আমার উপায় ছিল না। তাই—'

স্বর্ণলতা কিছু একটা আন্দাজ করে বললেন, 'না না, চাকরি করাটা অপরাধ, এ আমি বলছি না। শুধু জানতে চাইছিলাম।'

জ্যোতিভূষণ এই প্রথম মুখ খুললেন, 'সবারই স্বাবলম্বী হওয়া উচিত। ইউরোপ আমেরিকায় সব মেয়েই কিছু না কিছু করে। অনেকে বড় বড় ইন্ডাস্ট্রি, বিরাট বিরাট বিজনেস অর্গানাইজেশন চালায়। ব্যাঙ্ক, স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে শুরু করে ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট পর্যন্ত কোথায় নেই মেয়েরা? আশার কথা, আমাদের দেশেও কাজ সম্পর্কে মেয়েদের এই অ্যাওয়ারনেসটা বাড়ছে। এটা ভাল লক্ষণ।'

স্বামীর কথায় স্বর্ণলতা খুব একটা কান দিলেন বলে মনে হল না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কোথায় কাজ কর?'

পারমিতা বুঝতে পারছিল, বিরুদ্ধ পক্ষের ঝানু ল'ইয়ারেরা যেভাবে উলটোপালটা জেরা করে নির্দিষ্ট একটা লক্ষ্যে পৌঁছুতে চায় ; স্বর্ণলতার উদ্দেশ্যও যেন তাই। সতর্ক ভঙ্গিতে সে উত্তর দিল, 'গোল্ডেন সার্কল ট্র্যাভেল এজেন্সিতে।'

'বড় কোম্পানি?'

'না, মাঝারি ধরনের।'

'এমপ্লয়ী কতজন?'

'সব মিলিয়ে বাইশ।'

'তোমাকে কী করতে হয়?'

'আমি কম্পিউটার সেকশনের চার্জে আছি। সেই সঙ্গে ক্লায়েন্টদের এয়ার আর রেলের টিকেটের ব্যবস্থা করতে হয়।'

স্বর্ণলতা জিজ্ঞেস করলেন, 'কম্পিউটারের কোর্স কোথায় করেছিলে?'

একটা বিখ্যাত ইনস্টিটিউটের নাম করে পারমিতা বলল, 'ওরাই কোর্স কমপ্লিট করার পর এই কাজটা পাইয়ে দিয়েছে।' সে জানে এই সব কথাবার্তা নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়। আসল লক্ষ্যে ঘা মারার আগে স্বর্ণলতা প্রস্তুতি সেরে নিচ্ছেন।

পারমিতার খেতে ইচ্ছা করছিল না। ধীরে ধীরে হাতের প্লেটটা সেন্টার টেবলে নামিয়ে রাখল সে।

স্বর্ণলতা বললেন, 'এ কি, তুমি তো কিছুই খেলে না।'

'আজ দুপুরে খেতে খেতে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। তাই—' কথাগুলো মিথ্যে করেই বলল পারমিতা। আজ এ বাড়িতে আসবে বলে ক্যাজুয়াল লিভ নিয়েছিল। অন্যদিনের মতো সাড়ে বারোটায় খেয়ে সে গিয়েছিল বালিগঞ্জের এক বিউটি পার্লারে। সেখানে প্রচণ্ড ভিড় ছিল। চুল বাঁধিয়ে বাড়ি ফিরতে তিনটে বেজে যায়। তার কিছুক্ষণ পরেই মারুতি-ওমনি নিয়ে চলে গিয়েছিল রাহুল। কোনও রকমে শাড়িটাড়ি পালটে তার সঙ্গে সে বেরিয়ে পড়ে। সাড়ে বারোটার পর এক কাপ চাও জোটেনি। স্বাভাবিকভাবেই খিদে পাওয়ার কথা। কিন্তু উত্তেজনা, ভয়, মানসিক চাপ, সব মিলিয়ে খিদের অনুভূতিটাই নষ্ট হয়ে গেছে।

স্বর্ণলতা জোর বা অনুরোধ কোনওটাই করলেন না। নিঃশব্দে নিজের খাওয়া শেষ করে চারটে কাপে টিপট আর মিল্কপট থেকে লিকার এবং দুধ ঢেলে পারমিতাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'চা নিশ্চয়ই খাবে?'

গরম চা হয়তো স্নায়ুগুলোকে খানিকটা স্বাভাবিক করে তুলতে পারে। পারমিতা মাথা হেলিয়ে দেয়—খাবে।

স্বর্ণলতা বললেন, 'তোমার চায়ে ক'টা সুগার কিউব দেব?'

পারমিতা বলল, 'দুটো।'

রাহুল আর পারমিতার কাপে দুটো করে, তাঁর এবং জ্যোতিভূষণের কাপে একটা করে সুগার কিউব দিয়ে চা তৈরি করে ফেললেন স্বর্ণলতা।

রাহুলদের খাবার খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। সবাই চায়ের কাপ তুলে নিল।

স্বর্ণলতা বললেন, 'শুনেছি তোমার মা-বাবা, ভাইবোন, কেউ নেই।'

পারমিতা বলল, 'না।'

'অন্য আত্মীয়স্বজন?'

'দুই কাকা আর এক মামা আছেন। কাকারা দু'জনেই দিল্লিতে। মামা আছেন জব্বলপুরে। ওঁদের সঙ্গে যোগাযোগ নেই বললেই হয়। দু-তিন বছর পর কলকাতায় এলে দেখা করে যান।'

স্বর্ণলতা সামনের দিকে ঝুঁকে এবার জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের বাড়িতে তুমি কি একলাই থাকো?'

পারমিতা বুঝতে পারছিল, স্বর্ণলতা তাকে অত্যন্ত সুকৌশলে অতল খাদের দিকে টেনে নিয়ে চলেছেন। নিচু গলায় বলল, 'আমার এক দূর সম্পর্কের বিধবা পিসিমাও আমার সঙ্গে থাকেন।'

স্বর্ণলতা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন। এবার প্রশ্ন করলেন, 'আর তোমার মেয়ে?'

এই প্রশ্নটা যে অনিবার্যভাবেই এসে পড়বে সেটা জানতো পারমিতা। তার হৃৎপিণ্ডের উত্থানপতন কিছুক্ষণের জন্য থমকে গেল যেন। মুখ নামিয়ে ঝাপসা গলায়

বলল, 'আমার কাছেই থাকে। আমি যতক্ষণ বাইরে থাকি, পিসিমা দেখাশোনা করেন।'

জ্যোতিভূষণ হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন।

স্বর্ণলতার ভুরু সামান্য কুঁচকে গেল। বললেন, 'কী হল? উঠলে যে?'

জ্যোতিভূষণ বললেন, 'আমার একটা জরুরি কাজ আছে। এখনই বেরুতে হবে।'

জ্যোতিভূষণকে আটকানো গেল না। 'তুমি যা ঠিক করবে তাই হবে—' বলতে বলতে ডান দিকের একটা বেডরুমে চলে গেলেন।

চকিতের জন্য পারমিতার মনে হল, এরপর যে অস্বস্তিকর প্রসঙ্গটা উঠতে চলেছে, জ্যোতিভূষণ সেটা শুনতে চান না।

স্বর্ণলতা একটু বিরক্ত হলেন, 'কোনও মানে হয়? প্রবলেম এলে অ্যাভয়েড করাটা ভদ্রলোকের চিরকালের স্বভাব।' বলে আবার পারমিতার দিকে তাকালেন, 'তোমার মেয়ের বয়েস কত?'

'পাঁচ।'

'স্কুলে দিয়েছ?'

'হ্যাঁ। বাড়ির কাছেই একটা প্রিপেরেটরি স্কুলে পড়ছে। মর্নিং ক্লাস। পিসিমাই ওকে দিয়ে আসেন, নিয়েও আসেন।'

খানিকটা সময় নৈঃশব্দ্যের মধ্যে কেটে যায়।

তারপর স্বর্ণলতা বলেন, 'এবার সবচেয়ে অপ্রিয় কথাটা বলতে হবে।'

পারমিতা কিছু বলল না। বধ্যভূমিতে চরম মুহূর্তের জন্য যেন অপেক্ষা করতে লাগল।

স্বর্ণলতা বললেন, 'তোমার আগের স্বামীর সঙ্গে ডিভোর্স হয়েছে কতদিন আগে?'

গলা শুকিয়ে গিয়েছিল পারমিতার। বলল, 'তিন বছর।'

'কারণটা কী ছিল?'

পারমিতা জানালো, তার প্রথম পক্ষের স্বামী মনোতোষ অত্যন্ত নিষ্ঠুর, দুশ্চরিত্র এবং মদ্যপ। তার সঙ্গে মানিয়ে চলার অনেক চেষ্টা করেছে সে। কিন্তু কোনওভাবেই সম্ভব হয়নি। আত্মরক্ষার জন্য বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা করা ছাড়া উপায় ছিল না।

স্বর্ণলতা বললেন, 'তোমার মেয়েকে যে নিজের কাস্টোডিতে রেখেছ, তাতে তোমার এক্স-হাজব্যান্ড আপত্তি করেনি?'

পারমিতা বলল, 'করেছিল। কিন্তু আমি নিজের রাইট ছাড়িনি। ওর কাছে থাকলে মেয়েটা মানুষ হ'ত না। মেয়ের ভবিষ্যতের কথা ভেবে কোর্টে আপিল করেছিলাম। জজ ওকে আমার হাতে তুলে দেন।'

স্বর্ণলতা এবার জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার যে পিসিমার কথা বললে তিনি কি তোমার ডিপেন্ডান্ট? মানে তুমি আশ্রয় না দিলে তাঁর অন্য কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই?'

'আছে। পিসির এক দেওরের ছেলে কানপুরে থাকে। সে অনেক বার ওঁকে নিয়ে যেতে চেয়েছে। আমিই নিজের স্বার্থে ধরে রেখেছি।'

‘তোমার পিসিমা সম্পর্কে তাঁর দেওরের ছেলে কি এখনও ইন্টারেস্টেড?’

‘নিশ্চয়ই। গত মাসেও চিঠি লিখেছিল।’

স্বর্ণলতা কিছুটা আরাম বোধ করলেন যেন। বললেন, ‘ওদিকে থেকে তা হলে সমস্যা থাকছে না। তোমার মেয়ের সম্বন্ধে কোনও ডিসিসন নিয়েছ?’

পারমিতা চুপ করে প্রশ্নটা বোঝার চেষ্টা করে।

স্বর্ণলতা ফের বললেন, ‘আমি বলতে চাইছি, সোনুর সঙ্গে তোমার বিয়েটা যদি হয়ই—যদিও এ জাতীয় বিয়ে আমাদের পছন্দ নয়—তোমার মেয়ের কী হবে? সে কোথায় থাকবে?’

পারমিতা এতটাই চমকে উঠল যে তার গলা থেকে দুর্বোধ্য গোঙানির মতো একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল।

স্বর্ণলতা থামেননি, ‘আমাদের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব আছেন, দুই মেয়ের শ্বশুরবাড়ির লোকজনেরা আছেন। এই বিয়েটা তাঁদের কাছে বাঞ্ছনীয় নয়। তবু সোনুর জেদে আমরা রাজি হয়েছি। মেয়ের ব্যবস্থা করে তোমাকে এ বাড়িতে আসতে হবে।’

পারমিতা বিহ্বলের মতো তাকিয়ে থাকে। একসময় রুদ্ধস্বরে জিজ্ঞেস করে, ‘কী ব্যবস্থা করব?’

‘সেটা তোমাকেই ভাবতে হবে। তবে একটা পরামর্শ দিতে পারি। সেটা করা যায় কিনা চিন্তা করে দেখতে পার।’

‘বলুন—’

‘তোমার আগের স্বামী কোথায় থাকে?’

‘বাঙ্গালোরে।’

‘মেয়েকে তার কাছে পাঠিয়ে দিতে পার।’

অবসন্ন গলায় পারমিতা বলল, ‘তা কী করে সম্ভব?’

স্বর্ণলতার চোখেমুখে কঠোরতা ফুটে বেরোয়। বলেন, ‘অসম্ভব কেন?’

পারমিতা বোঝাতে চেষ্টা করে, রীতিমত যুদ্ধ করে কোর্ট থেকে সন্তানের অধিকার সে আদায় করে নিয়েছে। এখন যেচে তাকে তার বাবার কাছে ফিরিয়ে দেওয়াটা শুধু অসম্মানজনকই নয়, সাঙঘাতিক পরাজয়ও। কিন্তু তার চেয়েও বড় কারণ, মনোতোষ ফের বিয়ে করেছে। তার নতুন সংসারে মেয়েটা কতটা যত্ন, সমাদর আর স্নেহ পাবে সে সম্পর্কে পারমিতার যথেষ্ট সংশয় রয়েছে।

স্বর্ণলতাকে এবার রোবোটের মতো দেখায়। ভাবলেশহীন মুখে তিনি বলেন, ‘আমার যা বলার বলেছি। এখন তুমি কী করবে, সেটা তোমাকেই ঠিক করতে হবে।’

রাহুল তার প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মাকে খুব ভয় পায় এবং তাঁর সামনে কুঁকড়ে থাকে। এতক্ষণে সে মুখ খুলল। ঢোক গিলে বলল, ‘মা, তুমি বাচ্চাটার কথা সিমপ্যাথেটিক্যালি—’

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে স্বর্ণলতা বললেন, ‘তোমরা যথেষ্টই অ্যাডাল্ট। ইচ্ছা করলে আমাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিয়ে করতে পার। তেমন কিছু করলে এ বাড়ির

সঙ্গে তোমাদের কোনও সম্পর্ক থাকবে না।' বলতে বলতে তিনি উঠে পড়লেন। অর্থাৎ এ নিয়ে আর কোনও আলোচনাই করবেন না।

আচ্ছন্নের মতো পারমিতাও উঠে দাঁড়াল।

কিছুক্ষণ পর রাহুলের পাশে বসে টালিগঞ্জের দিকে যেতে যেতে দূরমনস্কের মতো জানালার বাইরে তাকিয়ে ছিল পারমিতা।

কলকাতা মেট্রোপলিসে সন্ধে নেমে গিয়েছিল। কর্পোরেশনের আলো এবং বড় বড় মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানির নিওন সাইন এর মধ্যেই জ্বলে উঠেছে। অজস্র আলো, গাড়ির স্রোত, মানুষের ভিড়, দু'ধারের উঁচু উঁচু সব বাড়ি এবং অন্যান্য দৃশ্যাবলী, কিছুই যেন দেখতে পাচ্ছিল না পারমিতা। চোখের সামনে থেকে সব দ্রুত বিলীন হয়ে যাচ্ছিল। তারই মধ্যে দুরন্ত এক উজান টানে সে কয়েক বছর পেছনে ফিরে যেতে থাকে।

তার বাবা বনবিহারী দত্ত ছিলেন একটা বড় মার্চেন্ট ফার্মের বড়বাবু। আই. এ পাস করে ক্লার্ক হয়ে ঢুকেছিলেন। প্রোমোশন পেতে পেতে শেষ পর্যন্ত রিটায়ারমেণ্টের কিছু আগে একটা সেকশানের ইন-চার্জ হতে পেরেছিলেন। খুব একটা উচ্চাশা তাঁর ছিল না। চাকরিতে আরও উঁচুতে যে উঠতে পারেননি সে জন্য আক্ষেপও না। মাঝারি মাপের আশা-আকাঙক্ষা নিয়ে গতানুগতিক দিন কাটিয়ে গেছেন। অত্যন্ত শান্ত, নির্বিরোধ, ভদ্র মানুষ। মা-ও বাবার মতো সাদাসিধে, সরল। সংসারের ঘোরপ্যাঁচ বিশেষ বুঝতেন না। এঁদের মেয়ে পারমিতার কিন্তু কিছু উচ্চাকাঙক্ষা ছিল। ম্যাড়মেড়ে জীবনযাপনের কথা সে ভাবতে পারত না। তবে যা সে চায় সেটা না পেলে ছিনিয়ে নিতে হবে, এমন তীব্র, আগ্রাসী ব্যাপারও তার মধ্যে ছিল না। যা ছিল তা হল কোমল, রঙিন, গোপন একটি স্বপ্ন। ভাল বিয়ে হবে, স্বামী হবে সুদর্শন, শিক্ষিত, প্রচুর অর্থ থাকবে তাদের, হাতের সামনে সাজানো থাকবে আরামের অজস্র উপকরণ।

কখনও কখনও অলৌকিকভাবে ইচ্ছাপূরণ ঘটে যায়। পারমিতার জীবনেও তাই হয়েছিল। ইংরেজিতে মোটামুটি একটা অনার্স পেয়ে বি. এ পাস করার তিন মাসের মধ্যে মনোতোষের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গিয়েছিল তার। এর ভেতর প্রেমটেমের কোনও ব্যাপার নেই। তার মায়ের এক মাসতুতো বোন, সম্পর্কে মাসি, এই সম্বন্ধটা এনেছিলেন। মনোতোষরা একটি সুন্দরী মেয়ে খুঁজছে, তাদের দাবিদাওয়া কিছু নেই; খবরটা পেয়েই মাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন তিনি।

স্বাস্থ্যবান, এম বি এ স্বামী, মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানিতে তার একজিকিউটিভ পোস্ট, বিরাট স্যালারি, পর্যাপ্ত পার্কস, কেয়াতলায় বারো শ স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাট, চব্বিশ ঘণ্টার জন্য কোম্পানির গাড়ি, প্রতি বছর হিল্লি-দিল্লি ঘুরে বেড়ানোর জন্য অঢেল ট্র্যাভেল অ্যালাওয়েন্স অর্থাৎ পারমিতার স্বপ্নের মাপে মাপে সমস্ত কিছু মিলে গিয়েছিল।

দুটো বছর ঘোরের মধ্যে কেটে যায়। বিবাহিত জীবনের শুরু থেকেই পারমিতা জেনে গেছে, মনোতোষ ড্রিঙ্ক করে। মদ্যপানটা মধ্যবিত্ত বাড়িতে ট্যাবুর মতো। প্রথম

প্রথম পারমিতার মানিয়ে নিতে অসুবিধা হ'ত। মনোতোষ বুঝিয়েছে, বিশাল কোম্পানির একজিকিউটিভ পোস্টে কাজ করতে হলে পার্টিতে যেতে হয়, পার্টিতে গেলে ড্রিঙ্ক করতে হয়। ক্রমশ এটা মেনে নিয়েছিল সে। এর মধ্যে তাদের একটি মেয়েও হয়ে গেছে—রুনি।

কিন্তু একদিন জানা গেল, নারীঘটিত নানা স্ক্যান্ডালও রয়েছে মনোতোষের। এই নিয়ে রোজ খিটিমিটি, ঝগড়াঝাঁটি। মাঝরাতে আকণ্ঠ হুইস্কি খেয়ে এসে সারা তল্লাট মাথায় তুলে চিৎকার জুড়ে দিত সে। সারাক্ষণ অপমান আর লাঞ্ছনা। প্রতি মুহূর্তে মনোতোষ বুঝিয়ে দিত, দয়া করে একজন কেরানির মেয়েকে বিয়ে করেছে। পারমিতাকে মুখ বুজে সব সয়ে যেতে হবে। অশান্তি শেষ পর্যন্ত এমন একটা জায়গায় পৌঁছুল যে একসঙ্গে থাকা আর সম্ভব হল না। বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা এনে তারা আলাদা হয়ে গেল। মেয়েকে নিয়ে প্রচণ্ড টানাহেঁচড়া হয়েছে, পারমিতা তার স্বত্ব ছাড়েনি।

আলাদা হওয়ার পর রুনিকে নিয়ে টালিগঞ্জে মা-বাবার কাছে চলে এসেছিল সে। বনবিহারী ততদিনে রিটায়ার করেছেন। প্রভিডেন্ট ফান্ড আর গ্র্যাচুইটির যে টাকাটা পেয়েছিলেন, ব্যাঙ্কে ফিক্সড ডিপোজিট করে মাসে মাসে ইন্টারেস্ট তুলতেন। তাতে ওঁদের স্বামী-স্ত্রীর মোটামুটি চলে যাচ্ছিল কিন্তু পারমিতারা চলে আসায় বাড়তি চাপ পড়ল।

পারমিতা ইচ্ছা করলে মনোতোষের কাছ থেকে তার মেয়ের ভরণপোষণের টাকা আদায় করে নিতে পারত। কিন্তু যার সঙ্গে সম্পর্কই শেষ হয়ে গেছে তার টাকা হাত পেতে নিতে ঘৃণাবোধ করত সে।

তার আত্মসম্মান বোধ ছিল প্রচণ্ড। শুধু সেটা ধরে বসে থাকলে তো বাঁচা যায় না। পারমিতার চোখে পড়ছিল, সংসার চালাতে বনবিহারী নাস্তানাবুদ হয়ে যাচ্ছেন। সারা জীবন পরিশ্রম করেছেন। রিটায়ারমেন্টের পর কোথায় নিরুদ্বেগ শান্তিতে বাকি দিনগুলো কাটিয়ে দেবেন তা নয়। ফের একটা পার্ট টাইম কাজ জোগাড় করে নিতে হয়েছিল তাঁকে।

বাবার দিকে তাকিয়ে ভীষণ কষ্ট হ'ত পারমিতার। সে বুঝতে পারছিল, এভাবে চলতে পারে না। বনবিহারী অনন্ত কাল থাকবেন না; তাঁর মৃত্যুর পর তাদের কী হবে? ভবিষ্যতের কথা ভেবে নিজের পায়ে দাঁড়ানো উচিত।

ক' বছর ধরেই কম্পিউটারে ট্রেনিং নেওয়া লোকজনের চাহিদা বেড়ে গেছে। তাদের কাছে চাকরি-বাকরির প্রচুর সুযোগ। একটা নাম-করা ট্রেনিং সেন্টারে দশ মাসের কোর্স কমপ্লিট করার পর ওরাই পারমিতাকে 'গোল্ডেন সার্কল ট্র্যাভেল এজেন্সি'তে চাকরিটা পাইয়ে দেয়। মানসিক চাপ, দুশ্চিন্তা ক্রমশ কাটতে থাকে তার।

বছর খানেকের ভেতর পারমিতা জীবনটাকে যখন ফের গুছিয়ে নিতে শুরু করেছে সেই সময় একমাস আগে-পরে আচমকা মা আর বাবার মৃত্যু হল। পারমিতার সামনে চারিদিক একেবারে অন্ধকার হয়ে যায়। বাড়িতে সে এবং রুনি ছাড়া আর কেউ নেই। ওইটুকু বাচ্চা মেয়েকে একা ফেলে কী করেই বা অফিসে যায়? মেয়ের দেখাশোনা

করতে হলে চাকরি ছাড়তে হয় আর চাকরি ছাড়লে খাবে কী? পারমিতার যখন এইরকম দিশেহারা অবস্থা সেইসময় সমস্যাটা সামলে নেওয়া গেল। দূর সম্পর্কের বিধবা পিসি রাজলক্ষ্মীকে পেয়ে যায় সে। ষাটের কাছাকাছি বয়স, নিঃসন্তান, স্বাস্থ্য ভাল এবং পিছুটান বলতে কিছু নেই। তা ছাড়া মানুষটি অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ। সংসারের সব দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিলেন। বাড়ির ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হয়ে গেল পারমিতা।

স্বপ্নভঙ্গ আগেই হয়ে গিয়েছিল। ব্যক্তিগত সুখ বা সাধ কিছুই আর অবশিষ্ট ছিল না। পারমিতার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হল, রুনিকে বড় করে তোলা। রাজলক্ষ্মী যতদিন থাকবেন তার দুর্ভাবনা নেই কিন্তু কোনওদিন যদি তিনি চলে যেতে চান বা মারা যান? মানুষের মতিগতি বা আয়ুর কথা তো কিছু বলা যায় না। ভাবনাটাকে অবশ্য বিশেষ আমল দেয়নি সে। আগেভাগে মস্তিষ্ককে ভারাক্রান্ত করে তোলার মানে হয় না।

রাজলক্ষ্মী আসার পর মসৃণভাবেই দিন কাটতে থাকে। দুশ্চিন্তা হয়তো নেই, তবে সব কিছুই গতানুগতিক, একঘেয়ে। সকালে উঠে বাজারে যাওয়া, তারপর মেয়েকে পড়িয়ে চা খেতে খেতে সাড়ে আটটা বেজে যায়। সাড়ে ন'টার ভেতর স্নান সেরে, ভাত খেয়ে চার্টাড বাসে অফিসে ছোটা। সন্ধেবেলায় বাড়ি ফিরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম। তারপর মেয়েকে এ বেলাও কিছুক্ষণ পড়িয়ে ঘন্টাখানেক টিভি দেখে রাতের খাওয়া চুকিয়ে দশটা নাগাদ শুয়ে পড়া। এই তার দৈনন্দিন রুটিন। কোনও রকম উত্থানপতন নেই। একটা দিন আরেকটা দিনের যেন জেরক্স কপি।

জীবন যখন ধীর চালে সরলরেখায় এগিয়ে চলেছে, সেইসময় হঠাৎ একটা বাঁকের মুখে এসে পড়ল পারমিতা। একদিন দুপুরে রাহুল 'গোল্ডেন সার্কল ট্র্যাভেল এজেন্সি'তে এল। সে একটা বিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের অফিসার। 'গোল্ডেন সার্কল ট্র্যাভেল এজেন্সি' ওদের যাবতীয় ট্রেন আর প্লেনের টিকিটের ব্যবস্থা করে দেয়। রাহুলের জরুরি কাজে বম্বে যাওয়ার কথা। প্লেনের টিকিটও কাটা হয়ে গিয়েছিল কিন্তু কী একটা গোলমালের জন্য রাহুলকে ট্র্যাভেল এজেন্সিতে আসতে হয়েছিল।

এয়ার টিকেটের ব্যাপারগুলো পারমিতাই দেখাশোনা করে। রাহুল তার সঙ্গে দেখা করে সমস্যাটা জানাতেই আধ ঘণ্টার ভেতর সে সব ঠিক করে দেয়।

রাহুল যে তাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছে, সেটা প্রথম আলাপের দিনই টের পেয়েছিল পারমিতা। টিকেটের ঝঞ্ঝাট মিটে গেলেও তার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে গেছে রাহুল। মাঝে মাঝেই তাকে ফোন করত। খুবই সাধারণ কথাবার্তা। কেমন আছেন, নিজে থেকে আমার খোঁজ নেন না, আমাকেই খবর নিতে হয়, ইত্যাদি।

রাহুলের ফোন এলে গোড়ার দিকে অস্বস্তি বোধ করত পারমিতা। একটা বড় কোম্পানির সুদর্শন তরুণ অফিসার ট্র্যাভেল এজেন্সির কাজের বাইরে তার সম্বন্ধে একটু বেশিমাত্রায় আগ্রহী হয়ে উঠেছে, এটা ভেতর ভেতরে তাকে আড়ষ্ট করে তুলত। যতই চাকরি-বাকরি করুক, অনেকগুলো মধ্যবিত্ত ট্যাবু তার মধ্যে থেকে

গিয়েছিল। ব্যক্তিগতভাবে তার খোঁজখবর নেওয়াটা যে আদৌ শোভন নয় তা কিন্তু কিছুতেই রাহুলকে বলতে পারত না পারমিতা।

কেননা ওদের কোম্পানিকে সারভিস দিয়ে তাদের এজেন্সি বহু টাকা কমিশন পায়। রাহুল চটে গেলে ওরা হয়তো অন্য এজেন্টের কাছে চলে যাবে। কাজেই ভদ্রতা বজায় রেখে সংক্ষেপে তার কথার উত্তর দিত সে।

দু-একমাস এভাবে চলার পর একদিন রাহুল ফোনে বলল, 'বুঝলেন ম্যাডাম, ঠিক জমছে না।'

বুঝতে না পেরে পারমিত জিজ্ঞেস করেছে, 'কী জমছে না?'

'এই আলাপটা। দু-চারদিন পর ফোনে কয়েক মিনিটের কথাবার্তায় কি স্যাটিসফ্যাকশন হয়?'

পারমিতা চুপ করে থেকেছে।

রাহুল গলার স্বর অনেকখানি নামিয়ে এবার বলেছে, 'অফিসের বাইরে কোথাও আপনার সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্যে দেখা হতে পারে না?'

পারমিতা চমকে উঠেছে, 'কেন বলুন তো?'

রাহুল বলেছে, 'ধরুন গল্প করব।'

পারমিতা বলতে যাচ্ছিল কলকাতায় কয়েক লাখ সুন্দরী মেয়ে আছে ; ওদের বাদ দিয়ে গল্প করার জন্য তাকেই বা বেছে নেওয়া হল কেন?

শেষ পর্যন্ত বলা আর হল না।

রাহুল এবার বলেছে, 'আমাকে ভদ্রলোক ভাবতে পারেন। আপনার অস্বস্তির কারণ নেই।'

দ্বিধান্বিতভাবে পারমিতা বলছে, 'ঠিক আছে। কোথায় দেখা হবে, বলুন—'

'আমি আপনাদের অফিস থেকে আপনাকে তুলে নেব।'

'না। আমাদের অফিসে আসার দরকার নেই। আপনার গাড়িতেও উঠব না।'

'তা হলে?'

'আমাদের অফিস থেকে বিড়লা প্ল্যানেটেরিয়াম খুব কাছে। ছুটির পর আমি ওটার মেইন গেটের সামনে ওয়েট করব। তবে একটা কথা—'

'বলুন—'

'আমি সাড়ে ছ'টার ভেতর বাড়ি ফিরি। আজও ফিরব।'

'তাই হবে।'

সেই শুরু। তারপর অনেক বার তাদের বাইরে দেখা হয়েছে। ক্রমশ পারমিতা বুঝতে পেরেছে, রাহুল খুবই ভদ্র, প্রাণবন্ত, হৃদয়বান যুবক। কোনওদিন এমন একটি কথা উচ্চারণ করেনি কিংবা ইঙ্গিত দেয়নি যা অশালীন বা নোংরা।

কবে থেকে যে রাহুল সম্পর্কে সে আকর্ষণ বোধ করতে শুরু করেছে এবং কখন কীভাবে পরস্পরের অনেক কাছে এসে পড়েছে, নিজেরই খেয়াল নেই পারমিতার। প্রথম দিকের সেই আড়ষ্টতা বা অস্বাচ্ছন্দ্য কোনওটাই আর ছিল না। যত দেখছিল

ততই মনে হচ্ছিল রাহুল কখনও তার ক্ষতি করবে না। রাহুলের ওপর তার বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে, অসঙ্কোচে মাঝে মাঝে ওর সঙ্গে কোনও রেস্তোরাঁয় গিয়ে অনেকটা সময় কাটিয়ে আসত। রাহুলের সঙ্গে রোজ দেখা হওয়া সম্ভব ছিল না। তবে প্রতিদিন ফোনে একবার কথা বলতে না পারলে মন খারাপ হয়ে যেত। আগে ওর গাড়িতে ওঠার কথা বললে বুক কেঁপে উঠত। পরে সংশয় বা ভীতি পুরোপুরি কেটে গিয়েছিল। পারমিতা বুঝতে পেরেছিল, তার অমর্যাদা হয় এমন কিছুই করবে না রাহুল। কোনও কোনও দিন অফিস ছুটির পর ওর সঙ্গে গল্প করতে করতে দেরি হয়ে গেলে রাহুল তাকে বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে চলে যেত। পারমিতা কিন্তু তাকে ভেতরে যাওয়ার কথা বলত না। রাজলক্ষ্মী আছেন, রুনি আছে। ওরা রাহুলের বাড়িতে আসাটা কী চোখে দেখবে, সে সম্পর্কে তার প্রচণ্ড দুশ্চিন্তা এবং দ্বিধা ছিল। রাহুল এমনই ভদ্র যে একদিনও বাড়ি নিয়ে যেতে বলেনি। হয়তো ভেবেছে, পারমিতার নিশ্চয়ই অসুবিধা আছে।

রাহুল যে বিরাট অভিজাত বংশের ছেলে, ক্রমশ জেনে গিয়েছিল পারমিতা। নিজের কথা অবশ্য কিছুই বলেনি সে।

পরিচয়ের পর পাঁচ-ছ মাস কেটে গেছে। তারপর একদিন বিকেলে রেস্তোরাঁর নিরিবিলি কোণে বসে খেতে খেতে রাহুল হঠাৎ বলে উঠেছিল, 'বেশ কিছুদিন আমরা মিশছি। একজন আরেক জনকে এতদিনে জানা হয়ে গেছে। এবার বোধহয় আমাদের একটা ডিসিসন নেওয়া দরকার।'

মেলামেশা এবং গভীর বন্ধুত্ব যে অনিবার্য পরিণতির দিকে যাবে সেটা অনেক আগেই টের পেয়েছিল পারমিতা। শুরুতেই রাহুলের মোহভঙ্গ ঘটিয়ে দেওয়া উচিত ছিল তার কিন্তু পারেনি। বহুদিন গভীর রাতে সারা কলকাতা যখন গাঢ় ঘুমের আরকে ডুবে আছে, সেই সময় একা জানালার ধারে দাঁড়িয়ে তারায়-ভরা নিঝুম আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নিজের বুকের ভেতরটা তোলপাড় করে ফেলেছে সে। বুঝেছে রাহুলকে ঘিরে একটা রঙিন স্বপ্নকে সে-ও তো কম প্রশ্রয় দেয়নি। তার গোপন লোভও কম ছিল না। তবু ওর কথাগুলো শুনতে শুনতে পারমিতা চমকে উঠেছে। মুখ নামিয়ে অনেকক্ষণ নীরবে বসে থেকেছে সে ; তারপর খুব নিচু কাঁপা গলায় বলেছে, 'আমি তোমাকে জেনেছি ঠিকই, কিন্তু তুমি আমার কিছুই প্রায় জানো না।'

'যেটুকু জেনেছি সেটাই যথেষ্ট। তার বেশি কিছু দরকার নেই।'

'ডোন্ট বি ইমোশনাল রাহুল। আবেগ জিনিসটা ভাল কিন্তু বাড়াবাড়ি রকমের হলে পরে ভীষণ দুঃখ পেতে হয়। তখন দেখবে আজ যে সম্পর্কটা রয়েছে সেটা ভেঙেচুরে দু'জনের মধ্যে তিক্ততা ছাড়া আর কিছুই নেই।'

পারমিতার কণ্ঠস্বর এমনই ভারী, গম্ভীর এবং আবেগশূন্য যে চকিত হয়ে উঠেছিল রাহুল। তার মুখের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে বলেছে, 'এগ্‌জাক্টলি তুমি কী চাইছ?'

পারমিতা বলেছে, 'কোনও কিছু গোপন না রেখে নিজের সব কিছু জানাতে। আগেই বলতে পারতাম কিন্তু পারিনি। সেটা যেমন ছিল আমার দুর্বলতা, তেমনি অন্যায়ও।'

রাহুল খানিকটা নিরুপায়ভাবেই যেন বলেছে, 'ঠিক আছে, তোমার যখন ইচ্ছে, বল। তবে মনে মনে আমি যা ভেবে রেখেছি সেটা কোনওভাবেই বদলাবে না।'

তার কথা যেন শুনতেই পায়নি পারমিতা। দূরমনস্কর মতো নিজেদের মধ্যবিত্ত ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে শুরু করে মনোতোষের সঙ্গে বিয়ে, বিবাহ-বিচ্ছেদ, মা-বাবার মৃত্যু, রুনিকে নিয়ে টিকে থাকার জন্য ধারাবাহিক লড়াই—একটানা, প্রায় রুদ্ধশ্বাসে বলে গেছে সে।

তার কথা শেষ হওয়ার পর রেস্তোরাঁর সেই কোণটিতে অদ্ভুত স্তব্ধতা নেমে এসেছিল। তারপর কতক্ষণ কেটে গেছে, কারও খেয়াল নেই।

একসময় রাহুল বলে উঠেছে, 'সব শুনলাম।'

মুখ তুলে রাহুলের দিকে তাকিয়েই দ্রুত চোখ নামিয়ে নিয়েছিল পারমিতা। কিছু বলতে চাইছিল, পারেনি। হাজারটা এস্রাজে একসঙ্গে এলোপাথাড়ি ছড় টানলে যেমনটা হয়, তার বুকের ভেতর তাই যেন ঘটতে লাগল। রাহুল এরপর কী বলবে, সেটা বুঝিবা তার জানাই আছে। তবু সে অপেক্ষা করতে থাকে।

রাহুল বলেছে, 'আজকের সোসাইটিতে এমনটা ঘটতেই পারে। তুমি যে সো-কলড সতী সাধ্বীদের ট্র্যাডিশনের ফাঁদে পা দিয়ে একটা বাজে লোকের সঙ্গে থেকে বাকি জীবনটা নষ্ট করে দাওনি, বরং সাহস করে ডিভোর্স নিয়ে বেরিয়ে এসেছ, সে জন্যে শ্রদ্ধাই হচ্ছে। আমার দিক থেকে তোমার ব্যাপারে কোনওরকম হেজিটেশান নেই।'

তীব্র, অসহ্য আবেগে, নাকি সুখে, পারমিতার সমস্ত অস্তিত্ব যেন উথলপাথল হয়ে যাচ্ছিল। রাহুলের মতো এমন উদার, এমন সহৃদয় মানুষ আগে সে কখনও দেখেনি। কৃতজ্ঞতা, আনন্দ, সুখ—এ সবের মধ্যেও কিছুটা অনিশ্চয়তা যে ছিল না তা নয়। সে বলেছে, 'কিন্তু রুনি—'

এবার যেন একটু থমকে গেছে রাহুল। বলেছে, 'মনে হয় সমস্যা হবে না। তবে—'

'তবে কী?'

'আমাদের বংশে এমন বিয়ে তো কখনও হয়নি। মা-বাবাকে, বিশেষ করে মাকে বোঝাতে হবে।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর রাহুলই আবার বলেছে, 'সময় হয়তো লাগবে। বাট উই শ্যাল ডেফিনিটলি ওভারকাম।'

পারমিতা উত্তর দেয়নি।

রাহুল এবার বলেছে, 'অনেকদিন ধরেই তোমাদের বাড়ি যাওয়ার ভীষণ ইচ্ছে। সাহস করে বলতে পারিনি। একদিন নিয়ে যাবে?'

অর্থাৎ তারা কেমন পরিবেশে থাকে, সেটাই হয়তো দেখতে চেয়েছে রাহুল। পারমিতা বলেছি, 'আজই চল না—'

সেই যে টালিগঞ্জে আসা শুরু হয়েছিল, তারপর প্রায়ই আসত রাহুল। রুনি

এমনিতে গায়ে-পড়া, মিশুকে মেয়ে। যেমন আদুরে তেমনি হাসিখুশি। মায়ের সবটুকু সৌন্দর্য নিংড়ে নিয়ে সে অলৌকিক ফুলের মতো হয়ে উঠেছে। তাকে ভাল না লেগে পারা যায় না। প্রথম দিনই রাহুলের সঙ্গে তার দারুণ বন্ধুত্ব হয়ে গেল। শুধু রুনিই না, রাহুলের মার্জিত, মধুর ব্যবহারে রাজলক্ষ্মীও মুগ্ধ হলেন।

বার কয়েক যাতায়াতের পর একদিন রাজলক্ষ্মী বলেছিলেন, 'ছেলেটা খুব ভাল রে। ও কেন আসে বুঝতে পারি—'

মুখ লাল হয়ে উঠেছিল পারমিতার। সে পিসির দিকে তাকাতে পারেনি। বিব্রতভাবে লাজুক কিশোরীর মতো হাতের নখ খুঁটে যাচ্ছিল।

রাজলক্ষ্মী পারমিতার পাশে বসে সস্নেহে তার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে জিজ্ঞেস করেছেন, 'রাহুল কি তোকে কিছু বলেছে?'

মাথা হেলিয়ে অস্ফুট গলায় পারমিতা বলেছে, 'হ্যাঁ।'

রাহুল কী বলে থাকতে পারে, সেটা রাজলক্ষ্মী যেন জানেন। বলেছিলেন, ' তা হলে আর আপত্তি করিস না।'

পারমিতা চুপ।

রাজলক্ষ্মী বলেছেন, 'কী-ই বা বয়েস তোর! সামনে বিরাট ভবিষ্যৎ পড়ে রয়েছে। এভাবে তো চিরকাল চলতে পারে না। তুই রাজি হয়ে যা মা।'

দ্বিধান্বিতভাবে পারমিতা বলেছে, 'আমি রুনির কথা ভাবছি পিসি।'

'রাহুল যদি তোকে মেনে নিতে পারে, রুনিকেও পারবে।'

'গোল্ডেন সার্কল ট্র্যাভেল এজেন্সি'তে পারমিতার সঙ্গে কাজ করে রোহিণী। তার অনেক আগে থেকেই রোহিণী ওখানে চাকরি করছে। মেয়েটা পাঞ্জাবি হিন্দু, তার মতোই ডিভোর্সি, বৃদ্ধ রিটায়ার্ড বাবাকে নিয়ে ভবানীপুরের একটা ছোট ফ্ল্যাটে থাকে। তার মা নেই, নিজের ছেলেমেয়েও হয়নি। মোটামুটি ঝাড়া হাত-পা।

রোহিণী পারমিতার খুবই শুভাকাঙ্ক্ষী এবং সত্যিকারের বন্ধু। তাকেও রাহুলের ব্যাপারটা জানিয়েছে সে। কী করা উচিত সে সম্বন্ধে পরামর্শও চেয়েছে।

রোহিণী বলেছে, 'ছেলেটাকে তো ভীষণ সিমপ্যাথেটিক মনে হচ্ছে। তুই আপত্তি করিস না। তবে রুনির ব্যাপারটা ঠিক করে নিবি।' রোহিণীর জন্ম কলকাতায়। সে চমৎকার বাংলা বলতে পারে।

এরপর রাহুলের সঙ্গে যত বারই দেখা হয়েছে, পারমিতা জিজ্ঞেস করেছে, 'মাকে আমাদের কথা বলেছ?'

রাহুল বিব্রতভাবে বলেছে, 'এখনও বলিনি। মানে তেমন সুযোগ পাচ্ছি না।'

এভাবে কিছুদিন কেটে যাওয়ার পর হঠাৎ একদিন রাহুল এসে বলেছিল, 'মায়ের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।'

পারমিতার চোখেমুখে উৎকণ্ঠা ফুটে উঠেছিল। সে জিজ্ঞেস করেছে, 'আমি ডিভোর্সি, আমার যে একটা মেয়ে আছে, এ সব জানিয়েছ তো?'

'হ্যাঁ।'

'কিছু গোপন কর নি?'

অল্প হেসে রাহুল বলেছে, 'গোপন করে লাভ আছে? ধরা তো পড়তেই হবে। তা ছাড়া আমরা অন্যায় কিছু করছি না।'

পারমিতা এবারও চুপ করে থেকেছে।

রাহুল থামেনি, 'মা তোমাকে দেখতে চেয়েছে।'

পারমিতা চমকে উঠেছে, 'আমাকে!' পরক্ষণে মনে হয়েছে, ছেলে কাকে পুত্রবধূ করে ঘরে আনতে চাইছে তাকে দেখতে চাওয়াই তো স্বাভাবিক।

রাহুল বলেছে, 'হ্যাঁ। কবে যেতে পারবে বল—'

'যেতে যখন হবেই তখন আর দেরি করে কী হবে?' পারমিতা বলেছে, 'তুমি যেদিন বলবে—'

রাহুল আজকের দিনটা ঠিক করেছিল।

কতক্ষণ মারুতি-ওমনির জানালার বাইরে তাকিয়ে ছিল খেয়াল নেই পারমিতার। কখন যে গাড়িটা তাদের টালিগঞ্জের বাড়ির সামনে এসে ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়েছে, সেটাও লক্ষ করেনি।

রাহুল আস্তে ডাকল, 'পারমিতা—'

আশ্চর্য কোনও টাইম মেশিনে করে অতীতে চলে গিয়েছিল পারমিতা। আবার সে এই সময়ে ফিরে এল। ধীরে ধীরে গাড়ি থেকে নেমে কলিং বেল বাজাতে রাজলক্ষ্মী দরজা খুলে দিলেন। পারমিতা ক্লান্ত পায়ে ভেতরে ঢুকতেই রুনি এসে তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাকে জড়িয়ে ধরে একটা সোফায় বসে পড়ল সে।

রাহুলও সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল। সে কিন্তু বসল না। পারমিতার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করতে করতে বলল, 'অত ভেঙে পড়ো না। একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

পারমিতা কিছু বলল না।

রাহুল এবার বলল, 'আমি আজ যাই। কাল আবার আসব।'

রাহুল চলে যাওয়ার পর রুনি জিজ্ঞেস করল, 'মা, রাহুল আঙ্কেলদের বাড়িটা খুব সুন্দর, তাই না?' আজ যে পারমিতা রাহুলদের বাড়ি গিয়েছিল সেটা সে জানে।

অন্যমনস্কের মতো পারমিতা সাড়া দিল, 'হুঁ।'

'রাহুল আঙ্কল বলেছিল ওদের ছাদে অনেক পাখি, হরিণ আর খরগোস আছে। দেখেছ?'

পারমিতা উত্তর দিল না।

একধারে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ব্যগ্রভাবে তাকে দেখছিলেন রাজলক্ষ্মী। আজ বিকেলের দিকে পারমিতা যখন রাহুলের সঙ্গে বেরুল তখন থেকেই তিনি উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন। বললেন, 'ও বাড়িতে কী হল রে?' চাপা উদ্বেগ আর উত্তেজনায় তাঁর গলা যেন কেঁপে গেল।

স্বর্ণলতার সঙ্গে যা যা কথা হয়েছে সব জানিয়ে পারমিতা বলল, 'আমি কী যে

করব, বুঝতে পারছি না।' অসীম নৈরাশ্যে তার কণ্ঠস্বর বুজে যায়।

বিহ্বলের মতো তাকিয়ে থাকেন রাজলক্ষ্মী। এ এমন এক জটিল সমস্যা যে কী বলবেন, ভেবে পেলেন না।

প্রচণ্ড অস্থিরতা পারমিতাকে যেন ক্রমশ বিপর্যস্ত করে ফেলতে লাগল। তারই মধ্যে কোনও রকমে খাওয়া চুকিয়ে মেয়েকে নিয়ে শুয়ে পড়ল সে, কিন্তু ঘুম এল না। বার বার রুনির দিকে ফিরে তার গায়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে ভাবল, স্বর্ণলতার শর্ত অনুযায়ী এই মেয়েটাকে ছেড়ে সে থাকবে কী করে? কোথায়ই বা তাকে রাখবে?

পরদিন অফিসে গেল না পারমিতা। সমস্ত রাত ঘুম হয়নি। চোখ জ্বালা জ্বালা করছিল। সমস্ত শরীর জুড়ে গভীর অবসাদ। সে টের পাচ্ছিল ভেতরে ভেতরে ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে।

সন্ধের দিকে রাহুল এল। বলল, 'বিকেলে তোমাদের অফিসে ফোন করেছিলাম। তোমার বন্ধু রোহিণী বললে, তুমি যাওনি। কী ব্যাপার, শরীর খারাপ নাকি?'

পারমিতা বলল, 'না, তেমন কিছু নয়। বসো—'

রাহুলকে দেখে রুনি তার কাছে চলে এসেছিল। পারমিতা তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে অন্য ঘরে রাজলক্ষ্মীর কাছে পাঠিয়ে দিল।

রাহুল বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিল। জিজ্ঞেস করল, 'কী হল? রুনিকে—'

তাকে থামিয়ে দিয়ে পারমিতা বলল, 'তোমার সঙ্গে আমার আর্জেন্ট কিছু কথা আছে। রুনির এখানে থাকাটা ঠিক হবে না।'

উৎসুক সুরে রাহুল জিজ্ঞেস করল, 'কী কথা?'

পারমিতা কিছুক্ষণ ভেবে বলল, 'তোমার মা কাল স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, তোমাদের বাড়িতে রুনির জায়গা হবে না।'

রাহুল ভীষণ অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে লাগল। কিছু বলতে গিয়েও চুপ করে গেল সে।

পারমিতা তার চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার লাইফে আমার কতটা প্রয়োজন?'

রাহুল হকচকিয়ে যায়, 'এতদিন পর এরকম আননেসেসারি কথার কোনও মানে হয়?'

'হয়।'

'কিরকম?'

উত্তর না দিয়ে পালটা প্রশ্ন করল পারমিতা, 'জানতে চাইছি, আমার জন্যে তুমি কতদূর যেতে পার?'

হেসে হেসে রাহুল বলল, 'সে তো তুমি জানোই।'

তার দিকে ঝুঁকে তীব্র গলায় পারমিতা বলল, 'তোমার মা বলেছিলেন, রুনিকে ও

বাড়িতে নিয়ে গেলে তোমার সঙ্গে ওঁদের কোনও সম্পর্ক থাকবে না। তুমি রুনি আর আমার জন্যে বাড়ি থেকে চলে আসতে পার?'

'মা-বাবাকে ছেড়ে?'

'হ্যাঁ। কেননা রুনি কাছে না থাকলে আমি মরে যাব।'

অনেকক্ষণ মাথা নিচু করে বসে রইল রাহুল। তারপর শ্বাসটানা গলায় বলল, আমাকে কয়েক দিন ভাবতে দাও। মানে—'

পারমিতা উত্তর দিল না। রাহুলের আরেকটা দিক কালই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। স্বর্ণলতার মুখের ওপর জোর দিয়ে সে বলতে পারেনি, পারমিতার সঙ্গে রুনিকেও 'মুখার্জি ভিলা'য় নিয়ে যাবে। সে ভীরু, দুর্বল, দ্বিধান্বিত। সারা জীবন ভাবলেও রুনির সম্বন্ধে তার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া অসম্ভব। বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার মতো দুঃসাহস তার নেই।

আজ সামনাসামনি বলা যাবে না। কাল চিঠি লিখে পারমিতা জানিয়ে দেবে, তার এবং রুনির সম্বন্ধে আর ভাবার প্রয়োজন নেই রাহুলের।

মেরুদণ্ড

কাল রাতে শোবার আগে অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছিল সবিতা। নির্ভুল নিয়মে টেবল ক্লকটা তার ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। দক্ষিণ দিকের দেওয়াল ঘেঁষে একটা নড়বড়ে তক্তাপোষে শুয়ে ছিল সে। বিছানা থেকেই হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দেয়, মুহূর্তে ঘরটা আলোয় ভরে যায়।

সবিতার বিছানা যেখানে তার উল্টোদিকের দেওয়ালের কাছে খেলো কাঠের র‍্যাকে রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিম এবং শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী যত্ন করে সাজানো। এছাড়া এক খণ্ডে শেকসপিয়রের সমস্ত নাটক, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, আধুনিক লেখকদের কিছু বই ছাড়াও রয়েছে বাংলা এবং ইংরেজি ডিকশনারি। বইয়ের র‍্যাকটার পাশে একটা পালিশহীন কাঠের আলমারি। ওটার পাল্লায় একদা কাচ বসানো ছিল, কিন্তু কবেই সেটা ভেঙে গেছে। কাচের জায়গায় এখন প্লাইউড লাগানো হয়েছে। আরেক দেওয়ালে একটা তাকওলা সস্তা দামের আয়না আটকানো। তাকে চিরুনি, চুলের ক্লিপ, পাউডারের ছোট কৌটো, এমনি মেয়েলি টুকিটাকি জিনিস। আরেক কোণে পুরনো টেবল চেয়ার। টেবলটার ওপর খবরের কাগজ পেতে কিছু খাতা, দোয়াত, পেন, পেন্সিল রাখা হয়েছে। আর আছে একটা ওয়েস্ট এন্ড ওয়াচ কোম্পানির ওয়াল ক্লক।

ঘরের মেঝে থেকে সিমেন্ট চটে গিয়ে এবড়ো খেবড়ো হয়ে আছে। বর্ষায় ফাটা ছাদ চুঁইয়ে চুঁইয়ে জল পড়ে। সিলিংয়ে এবং দেওয়ালগুলোতে তার চিরস্থায়ী কালচে দাগ। দু-এক বছরের ভেতর ছাদটা সারাই না করলে এই ঘর, এই ঘরই বা কেন, গোটা বাড়িটাই বাসের অযোগ্য হয়ে উঠবে।

কিন্তু বাড়িঘর বা বর্ষার ভোগান্তি—এসব নিয়ে এই মুহূর্তে ভাবার সময় নেই সবিতার। দ্রুত বিছানা থেকে নিচে নেমে পড়ে সে। দূরে টেবলের ওপর ওয়েস্ট এন্ড ওয়াচ কোম্পানির প্রাচীন ঘড়িতে এখন সাড়ে চারটে। সময়ের বিরতিহীন হৃৎকম্পনের মতো সেটা অনবরত টিক টিক করে চলেছে।

বাইরে বেশ অন্ধকার রয়েছে। সূর্যোদয় হতে এখনও ঘন্টা দেড়েক বাকি। তারপরও দু-ঘন্টা সময় পাওয়া যাবে। আটটায় নিশিকান্ত পালচৌধুরির মোটর আসবে ভূপতিমোহনকে নিয়ে যেতে। ভূপতিমোহন সবিতার বাবা। বাবাকে একা ছাড়বে না সবিতা, সঙ্গে সে-ও যাবে।

নিশিকান্তর মোটর ভূপতিমোহন এবং সবিতাকে নিয়ে যাবে তাহেরগঞ্জে। সবিতাদের এই ছোট নগণ্য মফস্বল শহর থেকে তাহেরগঞ্জ মোটরে মাত্র এক ঘন্টার পথ। যদি সময়মতো নিশিকান্তর মোটর আসে, ন'টা নাগাদ তারা সেখানে পৌঁছে যাবে।

আজ তাহেরগঞ্জে যাওয়াটা সবিতাদের পক্ষে অত্যন্ত জরুরি। এই যাওয়ার ওপর তাদের ভবিষ্যতের অনেকটাই নির্ভর করছে।

আটটায় বেরুলে হাতে সাড়ে তিন ঘন্টার মতো সময় পাওয়া যাবে। এর ভেতর সবিতাকে সংসারের খুঁটিনাটি বহু কাজ সেরে ফেলতে হবে। তবে আজ আর পড়ানোর ঝঞ্ঝাট নেই। সকালে চার পাঁচটি এবং সন্ধেবেলায় আট দশটি ছেলেমেয়ে তার কাছে পড়তে আসে। অনেকটা কোচিং ক্লাসের মতো ব্যাপার। সবিতা আজ তার ছাত্রছাত্রীদের ছুটি দিয়েছে।

সবিতার বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ। টান টান চেহারা তার। মুখ ডিম্বাকৃতি, বড় বড় টানা চোখ, চিবুকের গড়নটা বেশ দৃঢ়। তাকে কোনওভাবেই ফর্সা বলা যায় না। এমনিতে হাসিখুশি, প্রাণবন্ত, তবু এই শ্যামবর্ণ মেয়েটিকে ঘিরে কোথায় যেন প্রবল এক ব্যক্তিত্ব রয়েছে—সেটা একটু লক্ষ করলেই টের পাওয়া যায়।

ক্ষিপ্র হাতে বিছানাটা গোছগাছ করে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসে সবিতা। অবাক হয়ে দেখে গোটা বাড়িটায় আলো জ্বলছে। অর্থাৎ কিনা সে ওঠার আগেই সবার ঘুম ভেঙে গেছে।

এ বাড়িতে মোট চারটি মানুষ। সবিতা, তার দাদা রণেশ, মা লীলাবতী এবং ভূপতিমোহন। তাহেরগঞ্জ যাওয়ার ব্যাপারে ক'দিন ধরেই তুমুল উত্তেজনা চলছে। সেটা চারিয়ে গেছে সমস্ত বাড়িটায়। খুব সম্ভব কাল রাতে কেউ ভাল করে ঘুমোতে পারেনি।

সবিতাদের একতলা এই বাড়িটা খুবই সাদামাঠা। পাশাপাশি চারখানা ঘর। সামনের দিকে টানা বারান্দার মাথায় ঢালু টালির চাল। নিচে অনেকটা জায়গা জুড়ে উঠোন। সেটার একধারে বাঁধানো তুলসী মঞ্চ, অন্য দিকে টিনের চালের রান্নাঘর, স্নানের ঘর, পাতকুয়ো এবং টিউবওয়েল। সমস্ত বাড়ির চৌহদ্দি ভাঙাচোরা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা।

ষাট সত্তর বছর আগে এই সেঞ্চুরির গোড়ার দিকে বাড়িটা তৈরি করেছিলেন সবিতার ঠাকুরদা। তারপর থেকে বোধহয় আর কলি ফেরানো হয়নি। দেওয়ালের নানা জায়গায় পলেস্তারা খসে খসে ইট বেরিয়ে পড়েছে। সেগুলোকে দগদগে ঘায়ের মতো

মনে হয়। সারা বাড়িটায় নোনা ধরেছে বহুদিন আগেই, ছাদের কোণায় বট এবং অশ্বত্থের চারাগুলি অদৃশ্য শিকড় চালিয়ে যাচ্ছে বছরের পর বছর। মোট কথা, ধ্বংসের কাজ অনেক দূর এগিয়ে আছে। এভাবে চললে ঠাকুরদার স্মৃতিচিহ্ন এই বাড়িটা আর কতদিন টিকে থাকবে কে জানে।

সবিতা উঠোনে নেমে সোজা স্নানের জায়গায় চলে যায়। দ্রুত মুখটুখ ধুয়ে রান্নাঘরে গিয়ে ঢোকে। এখন তার প্রথম কাজটি হল, চা করে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া। সে নিজেও এক কাপ খেয়ে নেবে। কাল সন্ধেবেলা আনাজটানাজ কেটে রেখেছিল। বাড়ির তোলা কাজের মেয়ে জবা মাছ কুটে নুন হলুদ মাখিয়ে দিয়ে গেছে। মাছ একেবারেই কাটতে পারে না সবিতা। যাই হোক, চায়ের পর্ব শেষ হলে সে রান্না চড়িয়ে দেবে। দু'বছর হল লীলাবতী বাতে প্রায় শয্যাশায়ী হয়ে আছেন। এ বাড়ির যাবতীয় কাজ তাই সবিতাকেই করতে হয়। জবা দু'বেলা এসে বাসন মেজে, ঘর মুছে, মাছটাছ কুটে দিয়ে যায়।

রান্নাবান্না চুকিয়ে এদিকের সব গুছিয়ে দিতে দিতে নিশিকান্তর মোটর এসে পড়বে। আজ একটু তাড়াতাড়িই জবাকে আসতে বলে দিয়েছে সবিতা। বাবাকে নিয়ে তাহেরগঞ্জ থেকে ফিরতে ফিরতে সন্ধে পেরিয়ে যাবে। যতক্ষণ না তারা ফিরছে, জবা এখানেই থাকবে। কেননা লীলাবতীর মতো রণেশও ভীষণ অসুস্থ, চলাফেরার শক্তি তার নেই বললেই হয়। সারাদিনই তাকে ঘরের মধ্যে আটকে থাকতে হয়। দু'টি পঙ্গু মানুষকে ফেলে কোথাও গিয়ে বেশিক্ষণ থাকতে সাহস হয় না সবিতার, তাই জবাকে তাদের দেখাশোনার জন্য গোটা দিন থাকতে বলা হয়েছে।

স্টোভ ধরিয়ে কেটলিতে চায়ের জল চড়ায় সবিতা। তারপর চাল ধুয়ে সিলভারের ডেকচিতে পরিমাণমতো জল দিয়ে হাতের কাছে রেখে দেয়।

চায়ের জল হয়ে গেলে কেটলি নামিয়ে স্টোভে ভাত চাপিয়ে দিল সবিতা। কিছুক্ষণ পর দেখা যায়, একটা স্টেনলেস স্টিলের থালায় চার কাপ চা সাজিয়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে উঠোন পার হয়ে সোজা বারান্দায় গিয়ে ওঠে সে। বাঁ দিকের শেষ ঘরখানা রণেশের। সবিতা প্রথমে সেখানে যায়।

রণেশ তার ময়লা বিছানায় বালিশে ঠেসান দিয়ে আধশোয়ার মতো করে পড়ে আছে। রোগা, দুর্বল শরীর তার। স্বাস্থ্য বলতে কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। মোটা মোটা হাড়ের ফ্রেমের ওপর পাতলা রুক্ষ কোঁচকানো চামড়া কোনওরকমে জড়ানো রয়েছে। চোখ ইঞ্চিখানেক গর্তে ঢোকানো, তার তলায় চিরস্থায়ী কালির পোঁচ। কণ্ঠার হাড় গজালের মতো ফুঁড়ে বেরিয়েছে। ভাঙাচোরা মুখে কাঁচাপাকা দাড়ি, মাথার চুলের বেশির ভাগটাই সাদা। কোমরের তলা থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত বহু জায়গায় তার হাড়গুলো ভাঙা। লাঠি ছাড়া একটা পা-ও ফেলতে পারে না সে।

রণেশ ছিল তাদের জেলার সবচেয়ে মেধাবী, সবচেয়ে উজ্জ্বল ছাত্র। সেই সঙ্গে অত্যন্ত বেপরোয়া এবং বেহিসেবিও। একদিন যে ঝড়ো রাজনীতি সোসাল সিস্টেম অর্থাৎ সমাজব্যবস্থাকে বদলে দেবার জন্য সারা দেশকে তোলপাড় করে দিয়েছিল, রণেশ তাতে ভেসে যায়। সে বছর তার বি. এসসির ফাইনাল ইয়ার। এর অনিবার্য

পরিণতি যা, তা-ই ঘটল। পুলিশের তাড়া খেয়ে কখনও নর্থ বেঙ্গলে, কখনও পুরুলিয়ায়, কখনও বা নদীয়ায় পালিয়ে বেড়াতে থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধরা পড়তেই হয়। তখন তার নামে পাঁচটা মার্ডারের চার্জ। পনেরো বছর এ জেল সে জেল ঘুরে শেষ পর্যন্ত মাসখানেক আগে মেদিনীপুর জেল থেকে ছাড়া পায় রণেশ। সবিতাই গিয়ে তাকে বাড়ি নিয়ে এসেছিল।

রণেশের বয়স পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ। তাকে দেখলে মনে হয় ষাট পেরিয়ে গেছে। অশক্ত বিকল শরীর, অন্ধকার ভবিষ্যৎ, দু'চোখে হতাশা আর অসীম শূন্যতা নিয়ে ঘরের কোণে পড়ে থাকে সে।

অন্যমনস্কর মতো ডান দিকের জানালার বাইরে তাকিয়ে ছিল রণেশ।

সবিতা বলে, 'দাদা, তোমার চা—'

চমকে মুখ ফেরায় রণেশ। বলে, 'ও, তুই।' তারপর সামান্য হেসে মজার গলায় বলে, 'একেবারে ব্রিটিশ পাংচুয়ালিটি। নিশ্চয়ই পাঁচটা বাজে।' বলতে বলতে বালিশের তলা থেকে কাচ-ফাটা গোলাকার একটা রিস্টওয়াচ বার করে বলে, 'কারেক্ট। তুই চা নিয়ে এলেই বুঝতে পারি ক'টা বেজেছে। এক মিনিট বেশিও না, এক মিনিট কমও না।'

সবিতা কিছু বলে না, একটু হাসে শুধু। কেননা এই কথাটা রণেশ প্রায়ই বলে থাকে। চায়ের কাপটা দাদার হাতে দিয়ে সে বেরিয়ে যাচ্ছিল, রণেশ পেছন থেকে ডাকে, 'খুকু—' সবিতার ডাকনাম খুকু।

সবিতা ঘুরে দাঁড়ায়।

রণেশ বলে, 'বাবা সত্যিই তাহেরগঞ্জ যাবে? না, লাস্ট মোমেন্টে মত বদলাবে?'

সবিতা অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। মুখ নামিয়ে নিচু গলায় বলে, 'না। বাবা কথা দিয়েছে।'

আস্তে আস্তে শীর্ণ মাথাটি নাড়ে রণেশ, 'হুঁ। বাবা কথা দিলে তার নড়চড় হয় না।'

সবিতা উত্তর দেয় না।

রণেশ এবার জিজ্ঞেস করে, 'আগেও তো নিশিকান্ত পালচৌধুরি বাবাকে নিয়ে যাবার জন্যে চেষ্টা করেছে।'

সবিতা বলে, 'এক-আধ বার নাকি! তুমি জেলে যাবার পর কতবার যে লোক পাঠিয়েছে! নিজেও এসেছে পঁচিশ তিরিশ বার। শুধু নিশিকান্ত নাকি?'

'আরও কেউ এসেছিল?'

'আমাদের ডিস্ট্রিক্টে যে-ই অ্যাসেম্বলি আর পার্লামেন্ট ইলেকশানে নেমেছে সেই এসে বাবার হাতে-পায়ে ধরেছে। কিন্তু বাবা সবাইকে একরকম তাড়িয়েই দিয়েছে। কিন্তু এবার—' বলতে বলতে থেমে যায় সবিতা।

বিষণ্ণ হাসে রণেশ, 'এবার আর না গিয়ে উপায় নেই, না রে খুকু?'

সবিতা চুপ করে থাকে।

রণেশের রুগ্‌ণ বুকের ভেতর থেকে হাঁপানির টানের মতো দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। সে বলে, 'আমাকে তো পুলিশ শেষ করে দিয়েছে। অন্তত চলাফেরাটা যদি

করতে পারতাম, স্বাস্থ্যটা যদি ভাল থাকত, বাবাকে কিছুতেই এভাবে যেতে দিতাম না। আমি একরকম মরেই আছি রে খুকু।' তার চোখমুখে এবং কণ্ঠস্বরে ক্লেশ এবং যন্ত্রণা ফুটে বেরোয়।

দাদার দুঃখটা বুঝতে পারছিল সবিতা কিন্তু কী উত্তর দেবে, ভেবে পায় না। সে শুধু বলে, 'আমি এবার যাই দাদা। দেরি হয়ে যাচ্ছে।' বলে আর দাঁড়ায় না।

রণেশের পরের ঘরটা সবিতার। তার পরেরটা বরুণের। এই ঘরটা দশ বছর তালা বন্ধ হয়ে আছে। বরুণ সবিতার ছোটদা।

রণেশের মতো না হলেও বরুণও ছাত্র হিসেবে বেশ ভাল। স্কুল ফাইনাল থেকে বি.এ পর্যন্ত সে ডিস্ট্রিক্ট স্কলারশিপ পেয়েছে। এম. এ'তেও ইকনমিক্সে ফার্স্ট ক্লাস। রণেশের মতো সে কিন্তু বেহিসাবি, বেপরোয়া নয়। বরুণ দারুণ স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক এবং কেরিয়ারিস্ট। দেশ, সমাজব্যবস্থা, রাজনীতি—এসব নিয়ে তার মাথাব্যথা নেই। ব্যক্তিগত উচ্চাশা, পার্থিব সুখ, আরাম, অঢেল টাকা ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারত না সে। প্রতিটি পা ফেলত মাপজোক করে, অত্যন্ত হিসেব কষে। এম. এ'র পর একটা স্কলারশিপ জুটিয়ে সে কানাডায় চলে যায়। প্যাসেজ মানি ছিল না। মায়ের শেষ গয়নাগুলো বেচে তার হাতে কয়েক হাজার টাকা তুলে দেওয়া হয়েছিল। আসলে সবিতাদের গোটা পরিবার ডার্বির ঘোড়ার মতো তার ওপর যেন সর্বস্ব ছুঁড়ে দিয়ে বাজি ধরেছিল। কিন্তু সবটাই জলে গেছে। কানাডা থেকে আর ফিরে আসেনি বরুণ, একটি স্প্যানিশ মেয়েকে বিয়ে করে ওখানকার ন্যাশনালিটি নিয়ে ও দেশেই থেকে গেছে। ভারতবর্ষে, বিশেষ করে এই ম্যাড়মেড়ে মফস্বল শহরের ভাঙাচোরা পুরনো বাড়িতে আর কখনও সে সস্ত্রীক ফিরে আসবে, এমন দুরাশা কেউ করে না। গোড়ায় গোড়ায় দু-এক বছর মাঝে মধ্যে চিঠি লিখত বরুণ, তারপর অনিবার্য নিয়মে সেটা কবেই বন্ধ হয়ে গেছে। এ বাড়িতে কেউ আজকাল ভুলেও তার নাম মুখে আনে না। সবিতাদের জীবন থেকে তাকে পুরোপুরি খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। অথচ সে একটু ইচ্ছা করলে বা আরেকটু কম স্বার্থপর হ্লে আজ ভূপতিমোহনকে নিশিকান্ত পালচৌধুরির মোটরে উঠে তাহেরগঞ্জে যেতে হ'ত না।

বরুণের পরের ঘরটা ভূপতিমোহন এবং লীলাবতীর। সেদিকে যেতে যেতে সবিতার চোখে পড়ে, টানা বারান্দার শেষ মাথায় একটা বেতের মোড়ার ওপর মেরুদণ্ড টান টান করে পুবদিকে তাকিয়ে বসে আছেন ভূপতিমোহন। এটা খুবই পরিচিত দৃশ্য। শীতগ্রীষ্ম বারোমাস ভোর হতে না হতেই তিনি বিছানা থেকে উঠে এসে ওখানে ওই মোড়াটায় এভাবে বসে থাকেন। শিরদাঁড়া সোজা করে সূর্যোদয় দেখাটা তাঁর চিরকালের প্রিয় অভ্যাস।

কয়েক পলক ভূপতিমোহনকে লক্ষ করে সবিতা। তারপর ধীরে ধীরে মা আর বাবার ঘরে ঢুকে যায়।

ভারী চেহারা লীলাবতীর। বাঁ-হাত আর ডান পা'টা অনেকদিন হল বাতে প্রায় অসাড়। রণেশ যখন জেলে এবং বরুণ কানাডায় তখন গোটা সংসারটা তাঁকেই চালাতে হ'ত। শুধু কি তখন থেকে, বিয়ের পর থেকেই এ সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব তাঁরই

কাঁধে। কারণ ভূপতিমোহন স্বাধীনতার আগে বছরের পর বছর জেল খেটেছেন। দেশের পরাধীনতা ঘোচানোই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। কাজেই লীলাবতীকে প্রাইমারি স্কুলে মাস্টারি, টুইশনি থেকে শুরু করে লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরে জামাপ্যান্ট সেলাইয়ের অর্ডার জোগাড় করা, ইত্যাদি নানারকম উঞ্ছবৃত্তি করে ছেলেমেয়ে মানুষ করতে হয়েছে।

এখন লীলাবতীর বয়স প্রায় সত্তর। বাত তাঁকে এমনই অথর্ব করে দিয়েছে যে মনেই হয় না একদিন তিনি ছিলেন অত্যন্ত কর্মঠ মহিলা। প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস ছিল তাঁর, ছিল নিজের কর্মক্ষমতার ওপর অগাধ আস্থা। স্বাধীনতাসংগ্রামী স্বামী, নাবালক ছেলেমেয়ে, টালমাটাল সংসার—এসব নিয়ে তাঁর ওপর দিয়ে বছরের পর বছর ঝড় বয়ে গেছে কিন্তু কোনওদিন তিনি ভেঙে পড়েননি, শক্ত হাতে সব কিছুর হাল ধরে রেখেছেন। কিন্তু এখন আর তাঁর দিকে তাকানো যায় না।

সবিতা ডাকে, 'মা—'

ধীরে ধীরে তাকান লীলাবতী। তাঁর জ্যোতিহীন চোখে ঘোলাটে দৃষ্টি।

সবিতা বলে, 'তোমার চা—' বলে লীলাবতীর শিয়রের কাছে একটা উঁচু টুলে চায়ের কাপটি রেখে দেয়।

লীলাবতী অন্যমনস্কর মতো জিজ্ঞেস করেন, 'ক'টার সময় যেন নিশিকান্তর মোটর আসবে?'

আজকাল মায়ের অনেক কিছুই মনে থাকে না। প্রায়ই ভুলে যান। বয়স, রোগ এবং এক ধরনের হতাশা তাঁর স্মৃতি নষ্ট করে দিচ্ছে। সবিতা সময়টা জানিয়ে দেয়।

লীলাবতী বলেন, 'তুই তোর বাবার সঙ্গে যাবি কিন্তু। উনি না বললেও শুনবি না।'

'হ্যাঁ, যাব তো। বাবা না বলেনি।'

'ওকে তো জানিস—কী ধাতের মানুষ! সবসময় নজর রাখবি, কোনও গোলমাল যেন করে না বসে। এটাই কিন্তু শেষ সুযোগ। নিশিকান্তকে খুশি করতে পারলে সংসারের হাল ফিরে যাবে।'

মায়ের জন্য দুঃখই হয় সবিতার। কতবার যে তিনি নিশিকান্তকে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছেন তার ঠিক নেই। আর আজ কিনা লোকটাকে খুশি করার জন্য তাঁর কী অসীম ব্যগ্রতা! পাছে ভূপতিমোহন কোনও ঝঞ্ঝাট বাধিয়ে বসেন, সে কারণে সবিতাকে তাঁর সঙ্গে নেবার জন্য ক'দিন ধরেই তিনি চাপ দিয়ে যাচ্ছেন। সবিতা যে আজ যাবে, সেটা লীলাবতীর জেদে। সে মায়ের কথার উত্তর দিল না।

লীলাবতী ফের বলেন, 'নিশিকান্ত যেমনটা বলবে, ঠিক সেই রকমই যেন করে তোর বাবা। যা বলতে বলবে তাই যেন বলে। সংসারের মুখ চেয়ে যেন ভুলে যায় সে একদিন স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিল। মনে থাকবে?'

মাথাটা সামান্য কাত করে সবিতা। প্রায় ফিসফিসিয়ে বলে, 'থাকবে।'

নিজের মনেই অনেকটা স্বগতোক্তির মতো লীলবতী বলতে থাকেন, 'কোনওদিন তো কোনও ব্যাপারে লোকটা আপস করেনি, ঘাড় নোয়ায়নি। কিন্তু দিনকাল যে বদলে গেছে। এখন অনেক কিছুই মেনে নিতে হয় রে।'

সবিতা উত্তর দেয় না।

লীলাবতী থামেননি, 'ইংরেজ আমলও দেখেছি, এ আমলও দেখছি। তখনকার মানুষের সঙ্গে এখনকার মানুষের কত তফাত!' বলতে বলতে গলার স্বর ক্ষীণ হয়ে আসে তাঁর, চোখ দু'টি বুজে যায়।

সবিতা ঘর থেকে বেরিয়ে এবার ভূপতিমোহনের কাছে এসে দাঁড়ায়। তাঁর মোড়ার পাশে সারাক্ষণই একটা নিচু জলচৌকি পাতা থাকে। সবিতা চায়ের কাপটা তার ওপর রেখে প্লেট দিয়ে ঢেকে রাখে।

মেয়ের পায়ের শব্দ কিংবা কাপ রাখার আওয়াজ কানে গিয়েছিল ভূপতিমোহনের। কিন্তু তিনি মুখ ফেরান না। পুব আকাশে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বলেন, 'নিশিকান্ত দুপুরে তার বাড়িতে আমাদের খেতে বলেছে, তাই না রে খুকু?'

সবিতা চলে যাবার জন্য পা বাড়াতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ে। রোজ ভোরে সূর্যোদয়ের আগের এই মুহূর্তে নিঃশব্দে চা দিয়ে চলে যায় সবিতা। এই সময়টা ভূপতিমোহন নিজের মধ্যে এমনই মগ্ন হয়ে থাকেন যে ডাকাডাকি করে তাঁর মনোযোগ নষ্ট করতে চায় না সে। ভূপতিমোহনও কোনও কথা বলেন না। কিন্তু আজ তিনি বলেছেন।

একটু অবাক হয়েই বাবাকে লক্ষ করে সবিতা। সে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে ভূপতিমোহনের মুখের একটা অংশ চোখে পড়ছে। নিশিকান্তর দিক থেকে তাহেরগঞ্জে যাবার প্রস্তাবটা সপ্তাহখানেক আগে এবার যখন নতুন করে আসে, প্রথমটা খেপে উঠেছিলেন তিনি। এই নিয়ে মায়ের সঙ্গে দু'দিন তুমুল ঝগড়া হয়ে গেছে বাবার। শেষ পর্যন্ত মায়ের ইচ্ছার কাছেই নিজেকে সঁপে দিতে হয়েছে তাঁকে। দু'দিন পর থেকে একেবারে চুপচাপ হয়ে গেছেন ভূপতিমোহন।

তাহেরগঞ্জে যাবার ব্যাপারে বাবার প্রতিক্রিয়া এই মুহূর্তে কী ধরনের, তাঁর মুখ দেখে তা বোঝার উপায় নেই। সবিতা মাথা হেলিয়ে জানায়, 'হ্যাঁ, খেতে বলেছে।'

ভূপতিমোহন জিজ্ঞেস করেন, 'ঘরে পাউরুটি আছে?'

'আছে দু'টো।'

'আমার সাইড ব্যাগে একটা দিয়ে দিস। সেই সঙ্গে খানিকটা চিনি।'

নিশিকান্ত পালচৌধুরি দুপুরে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করেছে। নিশ্চয়ই আয়োজনটা রাজকীয়ই হবে। তবু পাউরুটি চিনি কেন বাবা নিয়ে যেতে বলছেন, বুঝতে পারে না সবিতা। এ সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন না করে সে বলে, 'আচ্ছা।'

'তোর একটা ওয়াটার বটল ছিল না?'

'আছে।'

'ওটা ভর্তি করে জলও নিয়ে নিস। আর নিবি একটা তোয়ালে কি গামছা।'

বিস্ময়টা বেড়েই যায় সবিতার। তবে এ নিয়ে সে কিছু জিজ্ঞেস করে না। শুধু বলে, 'আচ্ছা—'

এবার স্বভাববিরুদ্ধ একটা কাজই করে বসেন ভূপতিমোহন। আচমকা ঘুরে বসে বলেন, 'তোর মা বলছিল নিশিকান্তকে সন্তুষ্ট করা আমাদের উচিত। সে-ই যখন

আমাদের ত্রাণকর্তা—' বলে হালকা শব্দ করে হেসে ওঠেন।

আবছা অন্ধকারে হাসির চেহারা স্পষ্ট বোঝা যায় না, তবে তার শব্দটা বুকের কোনও অদৃশ্য স্তরে হঠাৎ যেন তীরের ফলার মতো বিঁধে যায়। সবিতা কিছু বলতে চেষ্টা করে কিন্তু তার গলায় স্বর ফোটে না।

ভূপতিমোহন আগের মতোই শব্দ করে হাসতে হাসতে বলেন, 'তুই দেখে নিস খুকু, আমি কোনওরকম গোলমাল করব না। নিশিকান্ত যেভাবে বাঁদরনাচ নাচাবে সেইভাবে নাচব, যা বলতে বলবে তোতাপাখির মতো তাই আউড়ে যাব। আচ্ছা, তুই এখন যা—'

কাঁটায় কাঁটায় আটটায় রান্নাবান্না চুকিয়ে, স্নানটান সেরে, পরিষ্কার একখানা শাড়ি আর ব্লাউজ পরে সবিতা বাইরের বারান্দায় চলে আসে। এর মধ্যে এক ঢাল ঘন কালো চুল পরিপাটি করে আঁচড়ে একটা বড় খোঁপাও করে নিয়েছে।

বারান্দায় ভূপতিমোহন, লীলাবতী আর রণেশও অপেক্ষা করছিল। এর ভেতর ভূপতিমোহন দাড়ি কামিয়ে, স্নান সেরে, সাদা হাফ-হাতা পাঞ্জাবি আর ইস্তিরি-করা মোটা সুতোর ধুতি পরে নিয়েছেন। তাঁর কাঁধে কাপড়ের সাইড ব্যাগ। আগেই ব্যাগটার ভেতর চিনি পাউরুটি গামছাটামছা গুছিয়ে দিয়েছে সবিতা। তাঁর হাতে রয়েছে বড় লম্বা ধাঁচের ওয়াটার বটল।

ভূপতিমোহন বসে আছেন সেই বেতের মোড়াটায়। লীলাবতী আর রণেশ দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে সামনের দিকে পা ছড়িয়ে আধশোয়ার মতো করে রয়েছে। তাদের চোখেমুখে কিছুটা উত্তেজনা এবং কিছুটা উৎকণ্ঠা মেশানো।

এ বাড়ি থেকে থানা বেশি দূরে নয়। সেখান থেকে পেটা ঘড়িতে আটটা বাজার আওয়াজ ভেসে আসে।

সঙ্গে সঙ্গে কালো কারে বাঁধা গোল পকেট ঘড়িটা বার করে দেখে নেন ভূপতিমোহন। পঞ্চাশ বছর আগের পকেট-ওয়াচটা এখনও নির্ভুল সময় দেয়। এক মিনিট কমও নয় বেশিও নয়, তাঁর ঘড়িতেও এখন কাঁটায় কাঁটায় আটটা।

ভূপতিমোহন বলেন, 'কী আশ্চর্য, আটটা বেজে গেল; নিশিকান্তর লোক তো গাড়ি নিয়ে এখনও এল না!'

লীলাবতী বলেন, 'তুমি বড্ড ব্যস্তবাগীশ। সবে তো আটটা বাজল। কথা যখন দিয়েছে, এখনই এসে পড়বে।'

কিন্তু আটটার পর ন'টা বাজে, ন'টার পর সাড়ে ন'টা, পৌনে দশটা, তবু গাড়ির দেখা নেই। প্রথম দিকে মোড়ায় বসে ছিলেন ভূপতিমোহন। এখন উঠে দাঁড়িয়ে অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন। মানুষ হিসেবে তিনি অত্যন্ত নিয়মানুবর্তী। জীবনের প্রতিটি ব্যাপারে শৃঙ্খলা এবং সময় মেনে চলেন। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তাঁর সব কাজ ঘড়ির কাঁটায় বাঁধা। ভোরে কখন উঠবেন, কখন স্নান করবেন, কখন দুপুর বা রাতের খাওয়া খাবেন—সমস্ত কিছুই আগে থেকে ঠিক করা আছে। সময়ের এতটুকু হেরফের হবার উপায় নেই।

লীলাবতী স্বামীর টেনশন এবং বিরক্তি লক্ষ করেছিলেন। তিনি বলেন, 'শান্ত হয়ে একটু বসো তো। হয়তো কোনও কারণে আটকে গেছে। তোমাকে নিয়ে যাবার ব্যাপারে আমাদের চেয়ে ওদের গরজ কম নয়।'

ভূপতিমোহন বসেন না, বারান্দার এক মাথা থেকে আরেক মাথায় সমানে হাঁটাহাঁটি করতে থাকেন। বেলা যত চড়ে তাঁর চলার গতিও তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে। ভূপতিমোহনের কপাল এবং চোখ এখন কুঁচকে গেছে। চোয়াল বেশ শক্ত। দুই হাত বার বার মুঠো পাকিয়ে যাচ্ছে। কেউ নিয়ম, শৃঙ্খলা আর সময় মেনে না চললে তিনি খুবই অসন্তুষ্ট হন। অন্য কেউ হলে আজকের যাওয়াটা তিনি বাতিল করে দিতেন। কিন্তু সংসারের কথা ভেবে, ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে যেতে তাঁকে হবেই। সেই কারণে নিশিকান্তর চাইতে নিজের ওপর রাগটা হচ্ছে অনেক গুণ বেশি, কিন্তু অসহায় আক্রোশে মনে মনে হাত-পা কামড়ানো ছাড়া তাঁর আর কিছু করার নেই।

এগারোটা বাজতে যখন মিনিট পাঁচেক বাকি, সেইসময় হাত-কাটা ফটিক একটা নতুন মডেলের নীল অ্যামব্যাসাডরে চেপে হাজির হয়।

হাত-কাটা ফটিকের বয়স চল্লিশ বেয়াল্লিশ। একসময় ছিল দুর্ধর্ষ মস্তান। সবিতাদের এই ডিস্ট্রিক্টে তার মতো ছুরি, পিস্তল এবং বোমা চালাতে আর কেউ পারত না। তার দাপটে সমস্ত জেলা কাঁপত। কয়েক বছর আগে বোমা বাঁধতে গিয়ে কনুই থেকে বাঁ হাতের নিচের দিকটা পুরো উড়ে যায়। সেই থেকে 'হাত-কাটা' এই খেতাবটা তার নামের আগে স্থায়ীভাবে জুড়ে গিয়েছিল।

হাতটা খোয়া যাবার কিছুদিন পর কর্মপদ্ধতি একেবারে পালটে ফেলে ফটিক। প্রথম দিকে এক হাতেই ছুরিটুরি চালাত। এই সময় এক পলিটিক্যাল পার্টির নেতা তাকে তাঁর অ্যাকশন স্কোয়াডে ঢুকিয়ে নেন। তারপর কাজে এবং চরিত্রে দ্রুত তাঁর কোয়ালিটেটিভ চেঞ্জ বা গুণগত পরিবর্তন ঘটে যায়। ধাপে ধাপে সে ক্রমশ ওপরে উঠতে থাকে। এখন ফটিক আর লুমপেন বা মস্তান নয়, রাজনৈতিক দলের তুখোড় এক খেলুড়ে। নির্বাচনে কীভাবে বুথ জ্যাম করে, ফলস ভোট দিয়ে, ক্যান্ডিডেটকে জিতিয়ে দিতে হয়, সেটা এই জেলায় তার মতো আর কেউ রপ্ত করতে পারেনি। রাজনীতির খোলা বাজারে ফটিকের চাহিদা এখন মারাত্মক। নানা হাত ফেরতা হতে হতে শেষ পর্যন্ত নিশিকান্ত পালচৌধুরির ক্যাম্পে ঢুকে পড়েছে সে।

ফ্রন্ট সিটে ড্রাইভারের পাশে বসে ছিল ফটিক। সে দরজা খুলে দ্রুত নেমে আসে। তার পরনে ধবধবে সাদা চাপা পাজামা আর পাঞ্জাবি, পায়ে ফ্যাশনেবল চটি। মাথার মাঝখান দিয়ে সিঁথি কেটে চুল পাট করে দু'ধারে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। চোখ ফোলা ফোলা আর লালচে, গলায় পুরু চর্বির থাক। তার একমাত্র আস্ত হাতটির কবজিতে দামি ঘড়ি, মোটা মোটা থ্যাবড়া আঙুলে প্রবাল, হীরে, পোখরাজ ইত্যাদি বসানো গোটা চারেক আংটি।

ফটিক বারান্দায় উঠে ভূপতিমোহনের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে। তারপর ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে সসম্ভ্রমে বলে, 'মেসোমশায়, আমার আসতে একটু দেরি হয়ে গেল। মানে, হাজারটা ঝামেলায়—'

নিশিকান্তর পলিটিক্যাল এজেন্ট এই লোকটাকে অনেক আগে থেকেই চেনেন ভূপতিমোহন। তিন চার বছর ধরে ক্রমাগত এ বাড়িতে হানা দিয়ে সে নিশিকান্তর হয়ে তদ্বির করে যাচ্ছে। যতবার এসেছে, ততবারই ফটিককে হাঁকিয়ে দিয়েছেন ভূপতিমোহন। লোকটা কথায় কথায় একসময় বোমা-পিস্তল চালাত; এখন তাকে দেখলে তা একেবারেই বোঝা যায় না। ইদানীং তার ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতার তুলনা নেই। ভাগিয়ে দিলে হাসিমুখে সে শুধু বলেছে, 'আবার কিন্তু আমি আসব মেসোমশায়।' এবং এসেছেও ফটিক—বার বার, অসংখ্য বার। ভূপতিমোহনের গায়ে ঘ্যানঘ্যানে মাছির মতো সে লেগে থেকেছে। আজ যে তিনি নিশিকান্তর মোটরে উঠতে রাজি হয়েছেন তার পেছনে হাত-কাটা ফটিকের কৃতিত্ব শতকরা পঞ্চাশ ভাগ।

ভূপতিমোহন একটা বিস্ফোরণ ঘটাতে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ চোখে পড়ে একদৃষ্টে তাঁকে লক্ষ করছেন লীলাবতী। নিজেকে অনেকটাই সামলে নেন তিনি। তবু বেশ কড়া গলাতেই বলেন, 'আটটায় আসার কথা, আর তুমি এলে কিনা প্রায় এগারোটায়! পাংচুয়ালিটি বলে একটা কথা আছে, সেটা নিশিকান্তকে মনে করিয়ে দিয়ো।'

ভূপতিমোহনের কণ্ঠস্বর থেকে যে ঝাঁঝ বেরিয়ে আসে সেটা আদৌ গায়ে মাখে না ফটিক। ব্যস্তভাবে জিভ কেটে বলে, 'নিশিবাবুর কোনও দোষ নেই মেসোমশায়। উনি আমাকে আটটাতেই আসতে বলেছিলেন। কসুর-ফসুর যা করবার আমিই শ্লা করে ফেলেছি। এই বারটার মতো ক্ষমা করে দিন।' কয়েক বছর আগেও ফটিকের ভাষা শুনলে কানে আঙুল দিতে হ'ত। প্রতিটি সেনটেন্সের গোড়ার এবং শেষে বাছা বাছা দু-চারটি খিস্তি জুড়ে দিত সে। পলিটিক্যাল পার্টিতে ঘুরে ঘুরে তার ভাষাটা এখন পালিশ হয়ে গেছে, তবু পুরনো অভ্যাস বলে কথা, নিজের অজান্তেই মাঝে মাঝে খেউড় বেরিয়ে পড়ে।

শ্লা শব্দটা এ বাড়ির চারটি মানুষের অনভ্যস্ত কানে বন্দুকের গুলির মতো খট করে ধাক্কা দিয়ে যায়। তবে কেউ কিছু বলে না। শুধু ভূপতিমোহনের মুখচোখ আরও কঠোর হয়ে ওঠে।

ফটিক অত্যন্ত বিনীতভাবে বলে, 'আমার জন্যে আপনাদের তিনটে ঘন্টা টাইম ফালতু নষ্ট হয়ে গেল। আর দেরি করে কী হবে, দয়া করে এবার গাড়িতে উঠুন।'

নীল অ্যামব্যাসাডরটা সদর দরজার বাইরে দাঁড় করানো আছে। নিঃশব্দে বারান্দা থেকে নেমে ভূপতিমোহন আর সবিতা ফটিকের সঙ্গে সেখানে চলে আসে।

ফটিক পেছন দিকের দরজা খুলে দেয়। প্রথমে গাড়িতে ওঠে সবিতা। ভূপতিমোহন উঠতে গিয়ে একবার ঘুরে তাকান; বারান্দা থেকে লীলাবতী পলকহীন তাঁকেই দেখছেন। স্ত্রীর তাকানোর মধ্যে শেষ মুহূর্তে কোন অনিবার্য ইঙ্গিতটা রয়েছে, বুঝতে অসুবিধা হয় না ভূপতিমোহনের। মনে মনে বুঝিবা বলেন, 'আমি তো আপস করেই ফেলেছি। তোমার কোনও রকম দুশ্চিন্তা নেই।'

ভূপতিমোহন গাড়িতে ওঠার পর দরজা বন্ধ করে দিয়ে ফ্রন্ট সিটে উঠে বসে ফটিক। ড্রাইভারকে বলে, 'চালাও। যত জলদি পার তাহেরগঞ্জ পৌঁছে দেবে।'

সবিতাদের এই মফস্বল শহরটাকে পশ্চিমবাংলার মানচিত্রে খুঁজে পাওয়া যাবে

না—সেটা এমনই অখ্যাত, এতই তুচ্ছ। এখানে বেশির ভাগই টিনের আর টালির চালের বাড়ি। ফাঁকে ফাঁকে কুচিৎ কখনও দু-দশটা পাকা একতলা কি দোতলা। রাস্তাগুলোতে মান্ধাতার বাপের আমলে হয়তো পিচটিচ পড়েছিল, কবেই সে সব উঠে হাড়গোড় বেরিয়ে পড়েছে। দু'ধারে কাঁচা নর্দমাগুলো মশাদের চিরস্থায়ী মেটার্নিটি হোম। তবে এরকম ম্যাড়মেড়ে শহরেও একটা মিউনিসিপ্যালিটি আছে, স্কুল কলেজ, আদালত, থানা এবং কী আশ্চর্য বিজলি বাতিও। কয়েক বছর হল স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড এখানে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়ে একটা মহান জাতীয় কর্তব্য পালন করেছে।

শহরের চৌহদ্দি পেরিয়ে কয়েক মিনিট গেলেই ন্যাশনাল হাইওয়ের ঝকঝকে মসৃণ রাস্তা। তার ওপর দিয়ে নীল অ্যামব্যাসাডর যেন ডানা মেলে উড়তে থাকে।

এখন দু-পাশে যতদূর চোখ যায়, আদিগন্ত ফাঁকা ধানের খেত। মাস দুই আগে সেই অঘ্রানের শেষাশেষি জমির মালিকেরা ফসল কাটিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। এখন আগাগোড়া ধূসর ক্যানভাসে মাঝে মধ্যে মুগ তিল কি সর্ষের টুকরো জমিগুলি ওয়াটার কালারে আঁকা নানা রঙের ছবির মতো দেখায়। মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে চেনা অচেনা অগুনতি পাখির ঝাঁক। মনে হয়, মাটি থেকে অনেক উঁচুতে মহা শূন্যতায় রাশি রাশি রঙিন কাগজের টুকরো ভেসে বেড়াচ্ছে। ঝকঝকে নীলাকাশকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে ভারহীন হালকা তুলোর মতো মেঘ ঘোর আলস্যে বায়ুমণ্ডলে গা ভাসিয়ে দিয়েছে।

জানালার বাইরে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে ছিল সবিতা। কী উদ্দেশ্যে আজ ভূপতিমোহনের সঙ্গে সে এসেছে সেটা এক মুহূর্তের জন্যও ভোলেনি। সীমাহীন আকাশ, ফসলের বিপুল মাঠ, পাখি, অঢেল মুক্ত বাতাস—সব মিলিয়ে প্রকৃতি তার মানসিক চাপ অনেক কমিয়ে দিচ্ছিল। হঠাৎ ভূপতিমোহনের গলা কানে যেতে মুখ ফিরিয়ে তাকায় সবিতা। বাবা ফটিককে ডাকছেন।

ফটিক ঘুরে বসে ভূপতিমোহনের দিকে তাকায়। বশংবদ সুরে জিজ্ঞেস করে, 'কিছু বলবেন মেসোমশাই?'

'হ্যাঁ।' আস্তে মাথা হেলান ভূপতিমোহন।

সাগ্রহে ফটিক বলে, 'কী?'

'এখানে আসার ব্যাপারে আমার যে দুটো শর্ত ছিল, ভুলে যাওনি নিশ্চয়?' সরাসরি ফটিকের চোখের দিকে তাকান ভূপতিমোহন।

ফটিকের মতো একদা মস্তান, এখনকার পলিটিক্যাল এজেন্টও সামান্য অস্বস্তি বোধ করে। বলে, 'আজ্ঞে, আমি ঠিক—' আসলে কিছুই তার মনে পড়ছে না।

'আমি দুপুরে কখন খাই সে সম্বন্ধে কিন্তু জানিয়ে দিয়েছিলাম।'

এবার চট করে মনে পড়ে যায় ফটিকের। শশব্যস্তে সে বলে ওঠে, 'নিশ্চয়ই মেসোমশাই। দুপুর সাড়ে বারোটায় আপনি লাঞ্চ খান।'

ভূপতিমোহন বলেন, 'তোমার নেতাটিকে এই খবরটা দিয়েছ তো?'

'সিওর স্যার। নিশিদাকে সেদিনই জানিয়ে দিয়েছি। আপনি চিন্তা করবেন না। যে স্পিডে গাড়ি রান করছে, আমরা ধরুন গিয়ে বারোটার আগেই তাহেরগঞ্জে পৌঁছে যাব। ততক্ষণে রান্নাফান্না সব রেডি হয়ে যাবে। কয়েক মিনিট রেস্ট নেবেন, তারপর

খেতে বসিয়ে দেব।'

'ঠিক আছে। আরেকটা কথা—'

'বলুন মেসোমশাই—'

'তোমাদের মিটিংটা হচ্ছে কোথায়?'

'কোর্টপাড়ার পার্কে।'

'বিকেল পাঁচটায় তো?'

'হ্যাঁ।'

'তাহেরগঞ্জে পৌঁছেই নিশিকান্তকে বলবে ঠিক পাঁচটাতেই যেন মিটিং শুরু করে।'

'নিশ্চয়ই মেসোমশাই।'

এরপর কেউ আর কিছু বলে না।

অদৃশ্য বাতাস চিরে চিরে নীল অ্যামব্যাসাডর হাইওয়ের ওপর দিয়ে ছুটতে থাকে। একটানা সাঁ সাঁ আওয়াজ ছাড়া চরাচরে এখন আর কোথাও কোনও শব্দ নেই।

জানালার বাইরে থেকে সেই যে মুখ ফিরিয়ে সবিতা ভূপতিমোহনের দিকে তাকিয়ে ছিল, এখনও সেভাবেই তাকিয়ে আছে। বাবাকে দেখতে দেখতে এক ধরনের গ্লানি এবং অপরাধ বোধে তার মন ভরে যাচ্ছিল।

ভূপতিমোহন এই জেলার সবচেয়ে সৎ, সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় মানুষ। জীবনের যেটা সেরা সময় তার প্রায় সমস্তটাই ইংরেজের জেলে কাটিয়ে দিয়েছেন। আদর্শবাদ, ব্যক্তিগত সততা, অটুট চরিত্র এবং নিঃস্বার্থ দেশসেবা—তাঁর জীবনে এগুলির চেয়ে মূল্যবান আর কিছু ছিল না।

স্বাধীনতার পর বহু ফ্রিডম ফাইটারকে দেখেছেন মন্ত্রী, এম. এল. এ বা এম. পি হবার জন্য ছোটাছুটি করতে। ইংরেজরা চলে যাবার সময় দেশের মানুষের হাতে যে রাজনৈতিক ক্ষমতা তুলে দিয়ে গিয়েছিল তার ভাগ পাওয়ার জন্য তাঁদের অনেকেই মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। অন্তত একখানা তাম্রপত্র এবং কিঞ্চিৎ পেনসন চাই-ই চাই। এই লোকগুলো একদা তাঁর সহযোদ্ধা ছিল ভাবতেই কষ্ট হ'ত ভূপতিমোহনের। ইচ্ছা করলে মন্ত্রী, এম. পি বা একজন এম. এল. এ হওয়া তাঁর কাছে কোনও ব্যাপারই ছিল না। তিনি ক্ষমতার অলিন্দের ধারেকাছেও যাননি। তাম্রপত্র এবং পেনসন নেবার জন্য কত দিক থেকে অনুরোধ এসেছে। তিনি বলেছেন, দেশের কাজ করেছি বলে বকশিশ নিতে হবে নাকি? এ জাতীয় প্রস্তাব নিয়ে যেন তাঁর কাছে না আসা হয়। অন্য স্বাধীনতা সংগ্রামীরা সামান্য প্রাপ্তির জন্য যখন নিজেদের শিরদাঁড়া নুইয়ে দিয়েছে তখন নিজের মেরুদণ্ডটি দৃঢ় এবং সতেজ রাখতে পেরেছেন ভূপতিমোহন।

আদর্শবাদী, নির্লোভ মানুষদের ভেতর কোথায় যেন একটা অনমনীয় শক্তি থাকে। পিপল বা জনগণ সেটাকে শ্রদ্ধা করে, সম্ভ্রমের চোখে দেখে থাকে। গোটা জেলা জুড়ে ভূপতিমোহনের ভারমূর্তি বা ইমেজটি বড় উজ্জ্বল।

এদিকে স্বাধীনতার পর তিনটে প্রজন্ম কেটে গেছে। একটা নতুন ক্লাসের দেশসেবক তৈরি হয়েছে এর মধ্যে। এক কানাকড়িও স্বার্থত্যাগ নেই তাদের, আদর্শবাদ নামক ব্যাপারটি থেকে তাদের দূরত্ব হাজার মাইলের। ক্ষমতা দখল করে

টাকার পাহাড় জমানোই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। একবার মন্ত্রীটন্ত্রী হতে পারলে পরের দশ জেনারেশন নবাবি স্টাইলে জীবন কাটিয়ে যেতে পারবে। আসলে পৃথিবীর বৃহত্তম ডেমোক্রেসি দ্রুত চলে যাচ্ছে মাফিয়া এবং মস্তানদের হাতে। আর ভূপতিমোহনের মতো মানুষরা ততই রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন। তাঁদের মনে হয়, তাঁরা ভারতবর্ষের কেউ নন, নেহাতই উদাসীন অন্যমনস্ক প্রবাসীর মতো এখানে কোনওরকমে দিন কাটিয়ে যাচ্ছেন।

কিন্তু ডেমোক্রেসির কিছু ঝঞ্ঝাটও রয়েছে। যতই বুথ জ্যাম করা যাক, ফলস ভোট কাজে লাগানো হোক, এখনও বেশির ভাগ খাঁটি ভোটই পড়ে। আর এসব ভোট যারা দিয়ে থাকে, অর্থাৎ ভারতের জনগণ, তারা কিঞ্চিৎ বেয়াড়া। এখনও তারা সৎ নির্লোভ আদর্শবাদী মানুষকে শ্রদ্ধা করে। তাঁরা সামনে এসে কিছু বললে সাধারণ মানুষ তাকে মর্যাদা দিয়ে থাকে। ভোটটা গোপন ব্যালটে হয়ে থাকে বলে মাফিয়াদের অনেক হিসেব এখনও ওলটপালট হয়ে যায়। নইলে গুণ্ডা-মস্তানদের মাসল-পাওয়ার আর বন্দুকের জোরে তারা গোটা ভারতবর্ষকে হাতের মুঠোয় পুরে ফেলত।

পলিটিক্যাল মাফিয়াদের হাতে ইদানীং দু-ধরনের অস্ত্র। একদিকে গুলি বন্দুক আর মস্তানদের স্কোয়াড পোষা, অন্যদিকে আইডিয়ালিস্ট শ্রদ্ধেয় মানুষদের প্রচারের কাজে লাগানো।

নিশিকান্ত পালচৌধুরি তৃতীয় জেনারেশনের দেশসেবক। নানা ধরনের প্রকাশ্য এবং গোপন, বৈধ আর অবৈধ ব্যবসা তার। পয়সাও অঢেল। একরকম গায়ের জোরে গোটা ডিস্ট্রিক্টে, বিশেষ করে তাহেরগঞ্জের স্কুল কলেজ হাসপাতাল মিউনিসিপ্যালিটি—সব জায়গায় সব কমিটিতে হয় সে চেয়ারম্যান, নইলে অত্যন্ত প্রভাবশালী মেম্বার। এই জেলার সরকারি বেসরকারি কোনও স্তরে তার মতামত অগ্রাহ্য করে কিছু করার উপায় নেই।

সুবিখ্যাত হাত-কাটা ফটিকের মতো এজেন্টকে সে যখন পেয়ে গেছে তখন বোমা পিস্তলের ব্যাপার নিয়ে তার দুশ্চিন্তা নেই। কিন্তু নিশিকান্তর টেনশন একমাত্র ভূপতিমোহনকে নিয়ে। জেনারেল ইলেকশান আর বাই-ইলেকশান মিলিয়ে চার চার বার সে নির্বাচনের ময়দানে নেমেছে কিন্তু চার বারই জয়টা হাতের পাশ দিয়ে অল্পের জন্য বেরিয়ে গেছে। টাকাপয়সা, সুখ, আরাম, সবই নিশিকান্তর করতলে কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতাটা না পাওয়া পর্যন্ত তার শান্তি নেই। আজকের ভারতবর্ষে ওটাই হল আসল বস্তু।

নিশিকান্তর কেমন একটা ধারণা হয়েছে, জেতার জন্য যে হাজার দেড়-দুই ভোটের তফাতটা থেকে যাচ্ছে, ভূপতিমোহন যদি তার হয়ে একটা মিটিংয়েও কিছু বলেন সেটা ঘুচে যাবে। তার অবধারিত জয় কেউ রুখতে পারবে না। কিন্তু বছরের পর বছর ঘোরাঘুরি, কাকুতিমিনতি, হাতে-পায়ে ধরা—কোনওটাই বাদ দেয়নি নিশিকান্ত এবং তার পলিটিক্যাল এজেন্ট হাত-কাটা ফটিক। কিন্তু একগুঁয়ে জেদি মানুষটাকে নোয়ানো যায়নি।

কিন্তু কিছুদিন ধরেই খুব সম্ভব মনের জোরটা কমে আসছিল ভূপতিমোহনের।

লীলাবতী বাতে অকেজো হয়ে বিছানায় পড়ে আছেন। এম. এ পাস করার পরও চাকরি-বাকরি হচ্ছে না সবিতার। দু-বেলা দশ বারোটি ছেলেমেয়ে পড়িয়ে যা পাওয়া যায় তাই দিয়ে কোনওরকমে সংসারটা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সবিতা। অবশ্য তার মামারা ভূপতিমোহনকে না জানিয়ে মাসে মাসে কিছু টাকা দিয়ে যান। এইভাবেই চলছিল কিন্তু যেদিন রণেশ প্রায় পঙ্গু হয়ে জেল থেকে বেরিয়ে এল, খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন ভূপতিমোহন। এই ছেলেটাই তাঁর আদর্শ বা তাঁর সততার উত্তরাধিকার যা কিছু পেয়েছে। তাঁর মতোই সে ফায়ারব্র্যাণ্ড, যদিও রাজনৈতিক বিশ্বাস এবং ধ্যানধারণায় তাঁদের মধ্যে বিস্তার ফারাক।

রণেশ আসার পর ভূপতিমোহন এই প্রথম ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভাবতে শুরু করেছিলেন। লীলাবতী এবং রণেশ, এই দু'টি অসুস্থ রুগ্‌ণ মানুষকে নিয়ে টুইশনির অনিশ্চিত আয়ে কীভাবে সংসার চালাবে সবিতা?

এদিকে আবার ইলেকশান এসে গেছে। হাত-কাটা ফটিক গত নির্বাচনের পর থেকে বার বার ভূপতিমোহনের সঙ্গে যোগাযোগটা রেখে যাচ্ছিল। নিশিকান্তও সপ্তাহে দু-তিন বার করে যাতায়াত করছিল। তাদের একটাই আর্জি, নিজেদের স্বার্থে ভূপতিমোহনের নিষ্কলঙ্ক ইমেজটি কাজে লাগানো।

ভূপতিমোহন আগের মতোই নিশিকান্তদের তাড়িয়ে দিচ্ছিলেন, কিন্তু অতীব ধূর্ত নিশিকান্ত এবং তার পলিটিক্যাল এজেন্ট এর মধ্যে চোরা বানের মতো কীভাবে লীলাবতীর ভাবনাচিন্তার ভেতর ঢুকে পড়েছিল, কে জানে। চিরকালই ভূপতিমোহন সম্পর্কে তাঁর গর্বের শেষ নেই। স্বামী দেশের জন্য বার বার জেলে গেছেন আর হাসিমুখে তিনি তাঁর সংসার সামলেছেন, দিবারাত্রি খেটে তাঁর সন্তানদের মানুষ করেছেন। ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আরামের কথা কখনও চিন্তা করেননি। স্বাধীনতার পর অন্য ফ্রিডম ফাইটাররা যখন আখের গুছিয়ে নিয়েছে তখনও ভূপতিমোহন যে নিজের আদর্শবাদী নির্লোভি চরিত্রটি অটুট রাখতে পেরেছেন, এ জন্য স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা তাঁর বেড়েই গেছে। কিন্তু নিজে পঙ্গু হয়ে যাবার পর এবং রণেশকে দেখে লীলাবতীর মধ্যে অনেক ভাঙচুর ঘটে গেছে।

চতুর নিশিকান্তরা নিয়মিত হানা দেবার ফলে সবিতাদের সংসারে হাড়হদ্দ জেনে গেছে। তারা লীলাবতীকে কথা দিয়েছে, ভূপতিমোহন যদি দয়া করে তাদের ইলেকশান মিটিংয়ে গিয়ে দাঁড়ান, সামান্য কিছু বলেন, তাহেরগঞ্জ কলেজে একমাসের ভেতর একটা লেকচারশিপ পেয়ে যাবে সবিতা। 'আপনি আমার জন্যে কিছু করলে আমি আপনার জন্যে কিছু করব—' এই ব্যবসাদারি নীতিতে নিশিকান্ত পুরোপুরি বিশ্বাসী। এ ব্যাপারে সে আদ্যোপান্ত প্রফেশনাল। জগতে মাগনায় যে কিছু পাওয়া যায় না, এই আপ্তবাক্যটি নিশিকান্ত শুধু জানেই না, এটাকে অক্ষরে অক্ষরের মান্য করে চলে।

লীলাবতী যা কখনও করেননি, স্বামীর প্রতিটি কাজে এবং কথায় যাঁর নিঃশর্ত সায়, তিনিই শেষ পর্যন্ত ভূপতিমোহনকে চাপ দিতে শুরু করেছেন। প্রথমটা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন ভূপতিমোহন, তারপর খেপে উঠেছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমস্ত দিক ভেবে জীবনের শেষ মাথায় পৌঁছে মাথা নিচু করে নিশিকান্তর প্রস্তাবে তাঁকে সায় দিতে

হয়েছে এবং আজ, এই মুহূর্তে নির্জন হাইওয়ের ওপর দিয়ে হাত-কাটা ফটিকের সঙ্গে নীল অ্যামব্যাসাডরে করে সেই উদ্দেশ্যেই ভূপতিমোহনকে তাহেরগঞ্জ যেতে হচ্ছে।

সবিতা বাবার দিকে তাকিয়ে ছিল। ভূপতিমোহনের চোখ দু'টি এখন বোজা। দুই হাত মাথার পেছনে নিয়ে হেলান দিয়ে এখন চুপচাপ বসে আছেন তিনি। এতক্ষণ ছিল অপরাধ এবং গ্লানিবোধ। এবার সেই সঙ্গে বুকের ভেতর একটা চাপা কষ্ট অনুভব করতে থাকে সবিতা। একবার ভাবে, দরকার নেই তার কলেজের চাকরির। বাবাকে এখনই নামিয়ে কোনও একটা বাস টাস ধরে তারা ফিরে যাবে।

আচমকা রাস্তায় চাকার ঘষটানির কর্কশ আওয়াজে চমকে ওঠে সবিতা এবং ভূপতিমোহন। প্রায় হুমড়ি খেয়ে সামনের দিকে আছড়ে পড়তে গিয়ে ফ্রন্ট সিটের পেছন দিকটা ধরে কোনওরকমে টাল সামলে নেয় তারা। ততক্ষণে গাড়িটা বিরাট ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেছে।

সোজা হয়ে বসতে বসতে সবিতারা বহু মানুষের গলা শুনতে পায়। সামনের দিকে তাকাতেই চোখে পড়ে পঁচিশ তিরিশটা ঝকঝকে, তেজী যুবক যুবতী গোটা হাইওয়ে জুড়ে হাত তুলে হই চই করতে করতে এগিয়ে আসছে। ওরা অন্তত দু-আড়াই শ গজ দূরে। তাই কী বলছে, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না; তবে অনেকটা স্লোগানের মতো মনে হচ্ছে।

ভূপতিমোহনের কপাল সামান্য কুঁচকে যায়। নিরুৎসক গলায় ফটিককে জিজ্ঞেস করেন, 'কী ব্যাপার? এরা কারা?'

কিছু একটা আন্দাজ করে নিয়েছিল ফটিক। তাকে বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছে। সামনের দিকে চোখ রেখে বলে, 'ঠিক বুঝতে পারছি না মেসোমশাই।'

'কী বলছে ওরা?'

'আজকালকার ছোকরা-ছুকরি, কখন যে শ্লাদের মাথায় কী চাপে! এ নিয়ে ভাববেন না।'

ভূপতিমোহন বিরক্ত হচ্ছিলেন, 'রাস্তা আটকে এ কী ধরনের অসভ্যতা! এক ধার দিয়ে এরা যেতে পারে না? অন্যের অসুবিধে করার অধিকার এদের কে দিয়েছে?'

ফটিক উত্তর দেয় না।

একসময় তরুণ তরুণীরা কাছাকাছি এসে যায়। টগবগে সব ছেলেমেয়ে। দেখেই বোঝা যায়, কলেজের ছাত্রছাত্রী। এবার তাদের স্লোগানগুলো স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

'ভূপতিমোহন ঘোষকে—'

'তাহেরগঞ্জে যেতে দেওয়া হবে না।'

'ভূপতিমোহন—'

'গো ব্যাক।'

সবিতা চমকে ওঠে। ভূপতিমোহন প্রথমটা হকচকিয়ে যান। কিছুক্ষণ আগের বিরক্তি কেটে গিয়ে রীতিমত অবাকই হয়ে গেছেন তিনি। ফটিককে বলেন, 'এদের তুমি চেনো?'

ফটিকের মতো দুর্ধর্ষ পলিটিক্যাল এজেন্টও খানিকটা নার্ভাস হয়ে পড়েছিল। সে

পেছন দিকে না ফিরেই বলে, 'নাম ফাম জানি না, তবে মুখ চিনি। টেরিফিক হারামি ছেলেমেয়ে।'

তরুণ তরুণীরা এবার গাড়িটার যেদিকে ভূপতিমোহন বসে আছেন, শ্লোগান দিতে দিতে সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে।

ভূপতিমোহন জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'দেখে মনে হচ্ছে তোমরা ছাত্র।'

ছুরির ফলার মতো ঝকঝকে যে লম্বা ছেলেটি একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে আছে, খুব সম্ভব সে দলটার নেতা। হাত তুলে কর্তৃত্বের ভঙ্গিতে সবাইকে থামিয়ে দিয়ে ভূপতিমোহনের উদ্দেশে সসম্ভ্রমে জানায়, তারা তাহেরগঞ্জ কলেজের ছাত্রছাত্রী। ভূপতিমোহনকে তারা চেনে এবং খুবই শ্রদ্ধা করে।

ভূপতিমোহন বলেন, 'তা না হয় জানলাম কিন্তু তোমরা আমাকে তাহেরগঞ্জ যেতে দিতে চাইছ না কেন?'

যুবকটি বলে, 'আপনি নিশ্চয়ই নিশিকান্ত পালচৌধুরির ফেভারে ইলেকশান মিটিং করতে যাচ্ছেন। তাকে ভোট দেবার জন্যে পিপলকে রিকোয়েস্ট করবেন তো?'

ভূপতিমোহনের বিস্ময় বাড়ছিল। দেখা যাচ্ছে, এরা তাঁর সমস্ত খবর রাখে। বলেন, 'তোমরা জানলে কী করে?'

যুবকটি বলে, 'সারা তাহেরগঞ্জ শহর আর আশপাশের গ্রামগুলো পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে দিয়েছে নিশিকান্তর লোকেরা। তাতে লেখা আছে বিখ্যাত এবং পরম শ্রদ্ধেয় স্বাধীনতা সংগ্রামী ভূপতিমোহন ঘোষ তার হয়ে নির্বাচনী মিটিং করবেন। তা ছাড়া ক'দিন ধরে জিপে আর সাইকেল রিকশায় ঘুরে ঘুরে ওরা আপনার মিটিং করার কথা প্রচার করে বেড়াচ্ছে।'

'তাই নাকি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমরা চাই না আপনার মতো মানুষ এর ভেতর থাকেন। দয়া করে বাড়ি ফিরে যান।'

'তোমরা আমাকে নিশিকান্তর হয়ে মিটিং করতে বারণ করছ কেন?'

যুবকটি আরও কাছে এগিয়ে আসে। তীব্র গলায় বলে, 'আপনি কি জানেন না নিশিকান্ত লোকটা কেমন নোটোরিয়াস টাইপের?'

পেছন থেকে আরেক জন বলে ওঠে, 'একটা আস্ত স্কাউন্ড্রেল—'

সেই যুবকটি ফের বলে, 'আমাদের এই বর্ডার ডিস্ট্রিক্ট দিয়ে যত স্মাগলিং হয় তার নাটের গুরু ওই লোকটা।'

ভূপতিমোহনকে অত্যন্ত বিচলিত দেখায়। বলেন, 'কী বলছ!'

হাত-কাটা ফটিক চেঁচিয়ে ওঠে, 'সব ফলস্ মেসোমশাই। ওদের কথা একদম বিশ্বাস করবেন না।' তারপর ছেলেমেয়েগুলোর দিকে ফিরে গলার স্বর কয়েক পর্দা চড়িয়ে শাসাতে থাকে, 'খবরদার। বেশি ঝামেলা করলে লাশ ফেলে দেব। যা, ফোট—'

যুবকটি বিন্দুমাত্র ঘাবড়ায় না। তার কণ্ঠস্বর হাত-কাটা ফটিকের শাসানি ছাপিয়ে

যায়, 'তোমার কথায় চলে যাব রাসকেল? মুখ বন্ধ করে বসে থাকো।' ভূপতিমোহনকে বলে, 'আপনি নিজের চোখেই দেখুন, এই টাইপের গুণ্ডা মস্তান হচ্ছে নিশিকান্তর পলিটিক্যাল অ্যাডভাইসার। সত্যি কথা বলছি বলে আমাদের লাশ ফেলে দিতে চাইছে। আপনাকে আরও খবর দিচ্ছি—'

হাত-কাটা ফটিকের কালো মুখ তাতানো লোহার পাতের মতো দেখাচ্ছিল। চোখ দুটো থেকে আগুনের হলকা বেরিয়ে আসছে। সে আগের মতোই শাসাতে থাকে, 'আমি বলছি, গলা থেকে আর একটা আওয়াজও বার করবে না। চলে যাও—'

'তোমার হুকুমে—সোয়াইন?' ছেলেটার ভয়ডর বলতে কিছু আছে বলে মনে হয় না। ফটিককে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করে সে ভূপমোহনকে বলতে থাকে, 'বলতে লজ্জা হয় কিন্তু তবু না বলে পারব না। নিশিকান্ত কী ক্যারেক্টারের লোক, সেটা আপনার জনা উচিত। স্মাগলিং ছাড়াও সে আর কী করে, জানেন?'

এমন বিভ্রান্ত এমন হতবাক আগে আর কখনও হননি ভূপতিমোহন। বিমূঢ়ের মতো বলেন, 'কী?'

ছেলেটি যাতে আর কিছু বলতে না পারে সেজন্য উৎকটভাবে হাত এবং মাথা নেড়ে আর চেঁচিয়ে সমানে বাধা দিয়ে যাচ্ছিল হাত-কাটা ফটিক। কিন্তু যুবকটিকে থামনো যায়নি। সে বলছিল, 'নিশিকান্ত একটা ব্রথেল পর্যন্ত চালায়। এই লোক ভোটে জিতে পিপলস রিপ্রেজেন্টেটিভ হতে চাইছে। আর সেই কাজে আপনাকে ব্যবহার করতে চায়। সারা জীবন ধরে যে সুনাম, যে সম্মান আপনি—'

তার কথা শেষ হবার আগেই বিস্ফোরণ ঘটে গেল। ফটিক তার গলার শির ছিঁড়ে ড্রাইভারের উদ্দেশে গর্জে ওঠে, 'শ্লা মাকড়া, হাঁ করে কী শুনছিস? গাড়ি চালিয়ে দে—টপ স্পিড—'

ছেলেমেয়েরা ভূপতিমোহনের জানালার দিকে চলে আসায় হাইওয়ের সামনের দিকটা ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। ড্রাইভার মুহূর্তে স্টার্ট দিয়ে দু-চার মিনিটের ভিতর সত্তর মাইল স্পিড তুলে ফেলে।

অত্যন্ত অবসন্ন বোধ করছিলেন ভূপতিমোহন। নিশিকান্ত সম্পর্কে আগে কিছু কানাঘুষো শুনেছেন কিন্তু ছেলেটি যা বলে গেল তা ভয়াবহ। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা হতে থাকে তাঁর, কপালের দু'পাশের রগগুলো যেন ছিঁড়ে পড়বে।

সামনের সিট থেকে ফটিক অনবরত বলে যাচ্ছিল—ওই ছেলেমেয়েগুলো ভীষণ ত্যাঁদোড়, নিশ্চয়ই ইলেকশানে নিশিকান্তর প্রতিদ্বন্দ্বী সুরেশ নিয়োগী ওদের প্রচুর টাকাপয়সা খাইয়ে কাজে লাগাচ্ছে। ওরা ভূপতিমোহনের মন ভেঙে দেবার জন্য আজেবাজে কুৎসা গেয়ে গেল। এ সব অভিযোগ ডাহা মিথ্যা, ভিত্তিহীন এবং আজগুবি। শ্রদ্ধেয় মাননীয় মেসোমশায় কোনটা সত্যি আর কোনটা মিথ্যে, অবশ্যই বুঝবেন। তাঁকে ভাংচি দেওয়া অত সোজা নয়, ইত্যাদি।

ছেলেমেয়েগুলোর নিষ্পাপ, সতেজ মুখ চোখ দেখে মনে হয় না, নিশিকান্ত সম্পর্কে তারা মিথ্যে বলেছে। ওদের টাকাপয়সা খাওয়ার কথাটাও পুরোপুরি বিশ্বাস হচ্ছে না। ওই ছেলেটি যা বলে গেল তার শতকরা এক ভাগও যদি ঠিক হয়, সেটা

তো মর্মান্তিক। মেয়ের একটা চাকরির জন্য কি একটা বদ, আদর্শহীন শয়তানের পক্ষে প্রচার করতে এসেছেন? চুয়াত্তর পঁচাত্তর বছর পর্যন্ত যে মেরুদণ্ডটি তিনি সোজা রাখতে পেরেছিলেন ফটিকের সঙ্গে নীল অ্যামব্যাসাডরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সেটা অনেকখানি দুমড়ে গেছে। স্বোপার্জিত সুনাম আর সম্মান দিয়ে তৈরি ভাবমূর্তির গায়ে ইতিমধ্যেই নিজের হাতে কয়েক পোঁচ কালি লাগিয়ে দিয়েছেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন না, এখন তাঁর কী করা উচিত। তাহেরগঞ্জে না গিয়ে তাঁদের মফস্বল শহরে ফিরে যাবেন কি?

পাশে বসে সবিতা বাবার দিকে তাকাতে পারছিল না। তার জন্য এই বয়সে এমন সম্মানিত মানুষটির কী মারাত্মক ক্ষতিই না হয়ে গেল! সে কি ফটিককে বলবে, এখনই গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে যেন তাদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসে?

দু'জনের ভাবনা একই খাতে বইছিল কিন্তু হাত-কাটা ফটিককে ফিরিয়ে দিয়ে আসার কথা বলার আগেই নীল অ্যামব্যাসাডর ঝড়ের গতিতে তাহেরগঞ্জ পৌঁছে যায়।

তাহেরগঞ্জ সীমান্তের কাছাকাছি এক গমগমে শহর। চওড়া চওড়া মসৃণ অ্যাসফাল্টের রাস্তা, নতুন নতুন আর্কিটেকচারের বাড়ি, বিশাল বিশাল সুপার মার্কেট, সাত-আটটা ডিগ্রি কলেজ, একটা করে ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেডিক্যাল কলেজ, তিন চারটে হাসপাতাল, নানা ধরনের কারখানা, প্রচুর মিনিবাস, প্রাইভেট কার, সাইকেল রিকশা ইত্যাদি ইত্যাদি মিলিয়ে সারাক্ষণ তাহেরগঞ্জ একেবারে জমজমাট। পা দেওয়া মাত্র টের পাওয়া যায়, এখানে হাওয়ায় টাকা উড়ছে। বর্ডারের কাছাকাছি থাকায় এখানে স্মাগলিং-এর প্রচণ্ড রমরমা। বলা যায়, ওটা বিরাট শিল্পের স্তরে পৌঁছে গেছে।

এ শহরে মানুষ থিক থিক করছে। পপুলেশন এক্সপ্লোসন অর্থাৎ জনবিস্ফোরণ কাকে বলে, এখানে পা দিলেই টের পাওয়া যায়।

তাহেরগঞ্জের শেষ মাথায় পুরনো ধাঁচের বিশাল তেতলা বাড়ি নিশিকান্তর। অগুনতি গাড়ি এবং মানুষজনের ভিড় কাটিয়ে একসময় নীল অ্যামব্যাসাডর ভূপতিমোহনদের নিয়ে সেখানে পৌঁছে যায়।

গেটের কাছে নিশিকান্ত এবং আর কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছে। খুব সম্ভব ভূপতিমোহনদের জন্যই ওরা অপেক্ষা করছিল। গাড়িটা থামতেই পাশের লোকটিকে ব্যস্তভাবে নিশিকান্ত বলে, 'ওদের তাড়াতাড়ি আসতে বল।' বলেই প্রায় দৌড়ে নীল অ্যামব্যাসডারটার কাছে এসে নিজের হাতে দরজা খুলে দেয়। হাত জোড় করে বলে, 'আসুন, আসুন—'

ততক্ষণে সেই লোকটা সঙ্গে করে নানা বয়সের পনেরো ষোলটি মেয়ে এবং মহিলাকে নিয়ে এসেছে। তাদের কারও হাতে শাঁখ, কারও হাতে রুপোর রেকাবিতে ফুল, চন্দন।

নিশিকান্তর বয়স পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন। লোকটার নিরেট চেহারা, গায়ে প্রচুর মাংস। গোলাকার মুখ, গোল চোখ, কাঁচাপাকা কোঁচকানো চুল ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছে। তার কালো কুচকুচে রংয়ে চকচকে পালিশ। পরনে ধবধবে ধুতি আর হাতা-গোটানো

পাঞ্জাবি।

ভূপতিমোহন থমথমে মুখে নেমে আসেন। তাঁর পেছন পেছন সবিতা। ওদিকে হাত-কাটা ফটিকও নেমে পড়েছে।

ভূপতিমোহন নামতেই তাঁর পায়ের ওপর মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে নিশিকান্ত। তারপর চোখের কোণ দিয়ে মেয়েদের সেই বাহিনীটাকে কিছু একটা ইঙ্গিত করেই ভূপতিমোহনকে বলে, 'রাস্তায় কোনও কষ্ট হয়নি তো?'

অস্পষ্ট গলায় ভূপতিমোহন কী বলেন, বোঝা যায় না। ওধারে মেয়েরা শাঁখ বাজিয়ে তাঁর গায়ে মাথায় ফুল ছুঁড়তে শুরু করেছে।

ভূপতিমোহন অস্বস্তি বোধ করছিলেন। ভ্রূকুটি করে তিনি বলেন, 'এ সব কী?'

নিশিকান্ত বলে, 'আপনার মতো এত বড় মানুষের পায়ের ধুলো আগে আর কখনও এ বাড়িতে পড়েনি। তাই একটু—আসুন স্যার—' বলে পিঠ নুইয়ে হাত বাড়িয়ে গাইডের মতো রাস্তা দেখাতে দেখাতে সামনে এগুতে থাকে।

ভূপতিমোহন বলেন, 'আমি এসব পছন্দ করি না।'

নিশিকান্ত কাঁচুমাচু মুখে বিনীত ভঙ্গিতে বলে, 'আর কোনওদিন হয়তো আপনাকে এ বাড়িতে পাব না।' সে বলতে থাকে, শাঁখ বাজানো ফুল ছিটানো ছাড়া আর কীভাবে ভূপতিমোহনকে স্বাগত জানানো সম্ভব সেটা তাদের জানা নেই।

ভূপতিমোহন এবারও চুপ। শাঁখের আওয়াজ আর পুষ্পবৃষ্টি সমানে চলছেই।

ওদিকে হাত-কাটা ফটিক পেছন দিক থেকে ভিড়ের ফাঁক দিয়ে দিয়ে নিশিকান্তর কাছে এসে তার কানে চাপা গলায় গুজগুজিয়ে কিছু বলে। বোঝা যায়, রাস্তায় সেই ছাত্রছাত্রীরা গাড়ি থামিয়ে যে মারাত্মক কাণ্ডটি ঘটিয়েছিল সে সম্পর্কেই জানিয়েছে। পলকের জন্য নিশিকান্তর মুখটা বেঁকেচুরে জান্তব দেখায়, তার চোখ থেকে আগুনের ঝলক বেরিয়ে আসে। পরক্ষণেই আগের মতো বশংবদ দীনতায় ঝুঁকে ঝুঁকে হাত দিয়ে পথ দেখাতে দেখাতে ভূপতিমোহনকে বলে, 'এই যে স্যার, দয়া করা এদিকে—'

গেটের পর থেকে সোজা খানিকটা যাবার পর বাঁদিক ঘুরে পাঁচটা সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠলে চওড়া বারান্দা। সেটার ডান পাশে বিশাল বসার ঘর। শোভাযাত্রা করে ফুল ছড়িয়ে, শাঁখ বাজাতে বাজাতে সেখানে নিয়ে আসা হয় ভূপতিমোহন আর সবিতাকে।

এখন আর হাত-কাটা ফটিক আশেপাশে নেই, পেছনে পড়ে গেছে। ভূপতিমোহনরা পুরোপুরি নিশিকান্তর কাছে হস্তান্তরিত হয়ে গেছেন।

ঘরের ভেতরটা ফুলপাতায় চমৎকার সাজানো। একধারে ধবধবে ফরাস পাতা, আরাম করার জন্য মখমলের বেশ কিছু তাকিয়া সেখানে ছড়ানো রয়েছে। ফরাসের ধার ঘেঁষে কারুকাজ-করা জয়পুরী ফুলদানিতে গোছা গোছা রজনীগন্ধার স্টিক। তাছাড়া বোধহয় আতর-টাতর কিছু ছড়ানো হয়েছে। ফলে ড্রইংরুমের বাতাস সুগন্ধে ম ম করছে।

কিন্তু ঘরে পা দিয়ে ফরাস না, তাকিয়া না, ফুলদানি বা রজনীগন্ধা না, ভূপতিমোহনের চোখ চলে যায় সামনের দেওয়ালের দিকে। সেখানে একটা

ক্যালেন্ডারে আলুথালু-বসনা সেক্সি ফিল্মি হিরো-ইনের ছবি ঝুলছে। মেয়েটার শরীরের বেশির ভাগটাই খোলা, খুব সামান্য অংশই ঢেকে রাখা হয়েছে। ছবিটা দেখতে দেখতে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে ভূপতিমোহনের নাকমুখ কুঁচকে যায়। গা ঘিন ঘিন করতে থাকে।

ফিল্মের নায়িকাটি সবিতার চোখেও পড়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে তার মাথা বুকের ওপর ঝুলে পড়ে। সে মুখ তুলতে পারছিল না। বাবার সামনে এমন অস্বস্তিকর বিশ্রী অবস্থায় আগে আর কখনও পড়তে হয়নি তাকে।

নিশিকান্ত ভূপতিমোহনের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করেছিল। হঠাৎ উন্মত্তের মতো চাকরবাকরদের ডেকে চিৎকার করে, ধমকে, গালাগাল দিয়ে একেবারে তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে দেয়, 'শোরের বাচ্চারা, কে এই ক্যালেন্ডার ওখানে রেখেছে! এক্ষুনি ওটা নামিয়ে পুড়িয়ে ফেলবি। যত বদমাশ হারামজাদার দল! লাথি মেরে তোমাদের বাড়ি থেকে বার করে দেব।'

চোখের পলক পড়তে না পড়তে দেওয়াল থেকে ক্যালেন্ডারটা অদৃশ্য হয়। সঙ্গে সঙ্গে নিশিকান্তর চোখেমুখে এবং কণ্ঠস্বরে আগের মতো বংশবদ দীনতা ফিরে আসে, 'বসুন স্যার, বসুন—'

অসীম বিরক্তি এবং অনিচ্ছায় ফরাসের এক কোণে পিঠ টান টান করে বসেন ভূপতিমোহন। এমন একটা ঘৃণ্য পরিবেশে এসে পড়ার জন্য নিজেকে খুব সম্ভব মনে মনে হাজার বার ধিক্কার দিচ্ছিলেন তিনি।

বাবার কাছাকাছি মুখ নিচু করে বসেছে সবিতা। ভূপতিমোহনকে যে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, এখন তারও উপায় নেই। নিরুপায়, চিন্তাগ্রস্ত সবিতা কী করবে, ভেবে উঠতে পারছে না। তার চাকরির জন্য বাবাকে যেখানে নামিয়ে নিয়ে এসেছে, সে জন্য ক'দিন ধরেই গ্লানি বোধ করছিল। সেটা এখন এতই বেড়ে গেছে যে শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হয়ে আসছে তার।

ওধারে মেয়েদের যে বাহিনীটা শাঁখ বাজিয়ে ভূপতিমোহনকে এ ঘরে নিয়ে এসেছিল তারা তাঁকে একে একে প্রণাম করে ফের শোভাযাত্রা করে বেরিয়ে যায়। ঘরে এখন নিশিকান্ত, হাত-কাটা ফটিক এবং অচেনা চার-পাঁচটা লোক রয়েছে।

নিশিকান্ত অপরিচিতদের সঙ্গে ভূপতিমোহনের আলাপ করিয়ে দেয়। সবাই বেশ বয়স্ক লোক। এদের একজন নিশিকান্তর মামা, একজন সম্পর্কে কাকা, একজন ভায়রা ভাই। এরা ভূপতিমোহনের মতো পূজনীয় মানুষকে দেখার জন্য এখানে এসেছে।

নিশিকান্তর আত্মীয়স্বজনরা জানায়, ভূপতিমোহনের কথা তারা অনেক শুনেছে, নিজেদের চোখে দেখে ধন্য বোধ করছে, ইত্যাদি।

পরিচয়-পর্ব চুকিয়ে নিশিকান্ত ভূপতিমোহনকে বলে, 'আপনি অনুমতি করলে আমরা একটু ভেতরে যেতে পারি। রান্নাবান্নার কতদূর কী হল দেখি। ফটিক এখানে রইল। কিছু দরকার হলে ওকে বলবেন। আমি মিনিট পাঁচেকের ভেতর আবার আসছি।'

ভূপতিমোহন উত্তর দেন না। নিশিকান্ত তার ভায়রা টায়রাদের সঙ্গে করে ভেতরে

চলে যায়।

এই বসবার ঘর থেকে সোজাসুজি তাকালে চোখে পড়ে টানা বারান্দার শেষ মাথায় একটা বিশাল রান্নাঘরে রাজসূয়ের মতো কাণ্ডকারখানা চলছে। দু-তিনটি বিধবা মেয়েমানুষ কেউ মশলা বাটছে, কেউ আনাজ কাটছে। দুটো রান্নার ঠাকুর গলদঘর্ম হয়ে বড় বড় কড়ায় মাছ মাংস টাংস চাপিয়ে হাতা দিয়ে কী সব করছে। যে সব রান্না হয়ে গিয়েছিল সেগুলো বিরাট বিরাট কাঠের পরাত বা সিলভারের ডেকচিতে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। দই এবং মিষ্টির অগুনতি হাঁড়িও চোখে পড়ছে।

ভূপতিমোহন বুক পকেট থেকে ঘড়ি বার করে একবার দেখে জায়গামতো রাখতে রাখতে ফটিককে বলেন, 'বারোটা বেজে তিন। আমার লাঞ্চ টাইমটা মনে আছে?'

ফটিক শশব্যস্তে বলে ওঠে, 'হ্যাঁ মেসোমেশাই, নিশিকান্তদা সব জানেন। তিনি খাবার ব্যবস্থা করতেই গেলেন। তবু একবার গিয়ে ফের মনে করিয়ে দিয়ে আসি।'

ফটিক দৌড়ে ভেতরে গিয়ে একটু পরেই ফিরে এসে বলে, 'চিন্তা করবেন না মেসোমশাই, নিশিদা সাড়ে বারোটায় আপনাদের খেতে বসিয়ে দেবে।'

মিনিট সাতেক বাদে আবও একবার ফটিককে সময়টা মনে করিয়ে দেন ভূপতিমোহন। ফটিক আবার ভেতরে যায় এবং ফিরে এসে ভূপতিমোহনকে নিশ্চিন্ত করে। এইভাবে তাকে বেশ কয়েক বার ছোটাছুটি করতে হয়।

ঠিক বারোটা পঁচিশে শেষ বার ফটিককে সতর্ক করে দেন ভূপতিমোহন। যথারীতি আবার দৌড়ে ভেতরে যায় ফটিক কিন্তু এবার আর তাড়াতাড়ি ফিরে আসে না।

কাঁটায় কাঁটায় বারোটা তিরিশে ঝোলা থেকে পাউরুটি আর চিনি বার করে ভূপতিমোহন বলেন, 'আমি খেয়ে নিচ্ছি রে খুকু—'

সবিতা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিল। বলে, 'কিন্তু বাবা, ওরা এত আয়োজন করেছে। আরেকটু অপেক্ষা—'

'একেবারেই না। আমি ওদের অনেক বার ওয়ার্নিং দিয়েছি। তোর তো বেলা করে খাওয়ার অভ্যাস। খুব খিদে না পেয়ে থাকলে একটু ওয়েট করতে পারিস। নইলে এই পাউরুটিটাই ভাগাভাগি করে খাব।'

সবিতা তার একগুঁয়ে নিয়মানুবর্তী জেদী বাবাকে ভাল করেই চেনে। পৃথিবীর যাবতীয় সুখাদ্যও যদি সাড়ে বারোটার পর সোনার থালাবাটিতে সাজিয়ে দেওয়া হয়, তিনি ফিরেও তাকাবেন না। এদিকে তাদের জন্য রান্নাবান্নার বিপুল আয়োজন করেছে নিশিকান্তরা। তারাই যদি না খায়, সেটা ভাল দেখাবে না। সবিতা বলে, 'তুমি খেয়ে নাও বাবা—'

মেয়ের মনোভাব খানিকটা আন্দাজ করে নেন ভূপতিমোহন। কয়েক পলক সবিতাকে লক্ষ করে খাওয়া শুরু করেন।

সোয়া একটা নাগাদ নিশিকান্ত তার মামা কাকা ভায়রাদের বাহিনী নিয়ে আবার এ ঘরে এসে হাজির। তাদের পেছনে হাত-কাটা ফটিক। সে যে বারোটা পঁচিশে চলে গিয়ে তখুনি ফিরে আসেনি তার কারণ রান্নাটা তখনও শেষ হয়নি। বার বার মিথ্যে বলতে তার মতো হতচ্ছাড়া ত্যাঁদোড়েরও মুখে আটকাচ্ছিল। তাই একেবারে

নিশিকান্তদের সঙ্গে মিছিল করে এসেছে।

নিশিকান্তরা হাতজোড় করে সবিনয়ে বলে, 'আসুন স্যার, আসুন বোনটি, সামান্য একটু আয়োজন করেছি।'

ভূপতিমোহন সুরহীন নীরস গলায় বলেন, 'আমার খাওয়া হয়ে গেছে।'

নিশিকান্ত এবং তার সঙ্গীরা চমকে ওঠে, 'কী বলছেন স্যার!'

ভূপতিমোহন এবার যা বলেন তা এইরকম। নিশিকান্তর পলিটিক্যাল এজেন্ট এবং প্রতিনিধি ফটিকের সময়ানুবর্তিতার নমুনা গত কয়েক বছর ধরেই তিনি পেয়ে আসছেন। যখন যাবার কথা তার দু-আড়াই ঘন্টা পরে গিয়ে হাজির হয়। আজও আটটায় তিনি তৈরি হয়ে বসে ছিলেন। সে গিয়ে পৌঁছল এগারোটা নাগাদ। ফটিকের দৃষ্টান্ত থেকেই ভূপতিমোহন আঁচ করে নিয়েছিলেন তার প্রভু নিশিকান্ত সময়ানুবর্তিতাকে কতটা মর্যাদা দেবে। তাই সঙ্গে করে পাউরুটি নিয়ে এসেছিলেন।

নিশিকান্তর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায়। হাতজোড় করে বলে, 'স্যার, আপনি প্রথম আমাদের বাড়ি দু'টি শাক-ভাত খাবেন। আয়োজন করতে করতে—'

তাকে থামিয়ে দিয়ে ভূপতিমোহন বলেন, 'আমি তোমার লোককে বার বার বলেছি, দুপুরের খাওয়াটা আমি সাড়ে বারোটায় সেরে নিই। সে তোমাকে জানায় নি?'

'জানিয়েছে স্যার। ভেবেছিলাম—'

'ভাবাভাবির কিছু নেই।'

'দয়া করে অন্তত যদি একবারও পাতের সামনে বসেন—'

'দুপুরে আমি দু'বার খাই না। অবশ্য সবিতাকে নিয়ে গিয়ে তোমরা খাইয়ে দিতে পার—'

নিশিকান্ত এবার ভূপতিমোহনের দু'পা জড়িয়ে ধরে। এরই মধ্যে কে যেন বাড়ির ভেতর থেকে নিশিকান্তর মেয়ে, স্ত্রী, মা এবং অন্যান্য মহিলাদের ডেকে নিয়ে আসে। শুরু হয়ে যায় কান্নাকাটি, কাকুতি-মিনতি, ক্ষমাপ্রার্থনা কিন্তু ভূপতিমোহনকে কোনওভাবেই টলানো যায় না। গম্ভীর মুখে তিনি শুধু বলেন, 'তোমার মিটিং পাঁচটায় শুরু করার কথা। সময়টা ভুলে যেও না।'

ঘাড় নেড়ে, মুখ চুন করে নিশিকান্তরা শেষ পর্যন্ত সবিতাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির ভেতরে চলে যায়।

আরও ঘন্টা দুই কেটে যায়।

নিশিকান্তরা এমনই ভয় পেয়ে গিয়েছিল যে পাঁচটা বাজার ঢের আগেই ভূপতিমোহন এবং সবিতাকে সেই নীল অ্যামব্যাসাডরটায় তুলে নিয়ে আদালত পাড়ার পার্কে নিয়ে আসে।

একধারে লাল সালু দিয়ে ঘিরে বিশাল উঁচু মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। সেখানে যা যা থাকা দরকার সবই মজুদ রয়েছে। তাহেরগঞ্জের মান্যগণ্য বিশিষ্ট মানুষদের বসার জন্য সারি সারি চেয়ার, মাইক, ভূপতিমোহনের জন্য ফুলের মালা ইত্যাদি। একটা কম বয়সের ছোকরা মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে সমানে বলে যাচ্ছিল, 'হ্যালো, মাইক টেস্টিং, মাইক টেস্টিং, ওয়ান টু থ্রি ফোর—'

ভূপতিমোহনরা সভায় পৌঁছে দেখতে পান, মঞ্চের বেশ কিছু চেয়ারে কয়েকজন চারিদিক আলো করে বসে আসেন। তাঁকে দেখে গার্ড অফ অনার দেবার ভঙ্গিতে ওঁরা উঠে দাঁড়ান। নিশিকান্ত সবার সঙ্গে ভূপতিমোহনের আলাপ করিয়ে দেয়। ওঁদের কেউ তাহেরগঞ্জ বার লাইব্রেরির প্রেসিডেন্ট, কেউ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, কেউ বা স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান।

সবাই সসম্ভ্রমে ভূপতিমোহন এবং সবিতাকে মাঝখানের দুটো চেয়ারে বসান।

ওদিকে মঞ্চের সামনের মাঠে লোক জড়ো হতে শুরু করেছে। দুপুরে নিশিকান্তর মেয়ে, স্ত্রী ইত্যাদি যখন ভূপতিমোহনকে খাওয়াবার জন্য মড়াকান্না জুড়ে দিয়েছিল সেই সময়ে হাত-কাটা ফটিককে শেষ বার দেখা গিয়েছিল। তারপর কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছিল কে জানে। এখন দেখা যাচ্ছে সে লম্বা একটা মিছিল নিয়ে আসছে। অর্থাৎ লোক জড়ো করার জন্য বেরিয়ে পড়েছিল। শুধু সে-ই না, নিশিকান্তর আরও কিছু এজেন্ট ছোট বড় মিছিল নিয়ে আসতে শুরু করেছে।

তাহেরগঞ্জের অনেক বিশিষ্ট মানুষ—ব্যবসাদার, আড়তদার, কারখানার মালিক—মঞ্চে এসে ভূপতিমোহনের সঙ্গে আলাপ করে এক-একটি ফাঁকা চেয়ার দখল করে জাঁকিয়ে বসছেন। মাইক টেস্টিং হয়ে গিয়েছিল। একটি ঢ্যাঙা চেহারার মাঝবয়সী লোক সেই ছোকরাটাকে সরিয়ে দিয়ে সমানে গাঁক গাঁক করে চেঁচিয়ে যাচ্ছে, 'বন্ধুগণ, আমাদের অসীম সৌভাগ্য যে পরম পূজনীয়, আদর্শবাদী, মহান স্বাধীনতা-সংগ্রামী ভূপতিমোহন ঘোষ মহাশয়ের পদধূলি এই শহরে পড়েছে। তিনি মঞ্চে উপস্থিত। কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটায় সভার কাজ আরম্ভ হবে। আজকের এই সভার মহামান্য সভাপতি, প্রধান অতিথি এবং মূল বক্তা ভূপতিমোহনবাবুই। আপনারা দলে দলে যোগ দিন। যার যে কাজই থাক, ফেলে চলে আসুন। ভূপতিমোহনবাবুকে দেখার, তাঁর কথা শোনার এমন দুর্লভ সুযোগ আর কখনও পাবেন না।'

ভূপতিমোহন যে ধমক দিয়েছিলেন তাতে বেশ কাজ হয়েছে। ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে মিলিয়ে ঠিক পাঁচটায় মিটিং আরম্ভ হয়ে যায়। তার মধ্যে আদালত পাড়ার পার্ক বোঝাই হয়ে গেছে। তারপরও শহর ভেঙে চারিদিক থেকে লোক আসছে। ক'দিন ধরেই এই মিটিংয়ের ব্যাপারে জমকালো প্রচার চলছিল। ভূপতিমোহন শুধু হোর্ডিং আর পোস্টারের কথাই শুনেছেন কিন্তু নিশিকান্তর লোকেরা সাইকেল রিকশা এবং জিপে করে গোটা শহর চষে দিনরাত প্রচারও চালিয়ে গেছে। শেষের খবরটা ভূপতিমোহন জানেন না। পাবলিসিটির জোরালো মহিমা তো আছেই। তা ছাড়া নিশিকান্তর নির্বাচনী সভায় ভূপতিমোহনের মতো বরেণ্য স্বাধীনতা-সংগ্রামী কী বলেন তা শোনার কৌতূহলও লোকজনকে এখানে টেনে এনেছে।

এ জাতীয় সভার যাবতীয় পদ্ধতি মেনেই প্রথমে সভাপতি, প্রধান অতিথি এবং প্রধান বক্তা হিসেবে ভূপতিমোহনকে মালা এবং ফুলের স্তবক দিয়ে বরণ করা হয়। তারপর তিনটি সুন্দরী তরুণী উদ্বোধনী সঙ্গীত গায়। অবশেষে তাহেরগঞ্জ বার লাইব্রেরির প্রেসিডেন্ট জ্যোতিভূষণ চট্টরাজ শ্রোতাদের উদ্দেশে বলেন, 'এবার মাননীয় ভূপতিমোহন ঘোষ মশায় তাঁর ভাষণ দেবেন।'

ভূপতিমোহন ধীরে ধীরে উঠে মাইকের সামনে গিয়ে দাঁড়ান। কিন্তু তিনি একটি শব্দ উচ্চারণ করার আগেই গোলমাল শুরু হয়ে যায়। মঞ্চের সামনে যে শ্রোতারা বসে ছিল তাদের ভেতর থেকে বেশ কয়েকজন উঠে দাঁড়িয়ে উত্তেজিতভাবে আকাশে মুঠোপাকানো হাত ছুঁড়তে ছুঁড়তে চিৎকার করে বলছে, 'গো ব্যাক ভূপতিমোহন, গো ব্যাক—'

দেখামাত্রই ভূপতিমোহন ওদের চিনতে পারেন। এরাই রাস্তায় তাঁর গাড়ি আটকেছিল। সেই ঝকঝকে চেহারার তরুণ ছাত্রটি রয়েছে সবার আগে। ওরা তাঁকে চলে যেতে তো বলছেই, সেই সঙ্গে মাফিয়া, স্মাগলার, দুশ্চরিত্র নিশিকান্তর এই নির্বাচনী সভায় বক্তৃতা না করার জন্য দাবি জানাচ্ছে।

ভূপতিমোহন লক্ষ করেননি, তাঁর ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বিক্ষোভকারী ছাত্রছাত্রীদের দিকে হিংস্র চোখে তাকিয়ে আছে নিশিকান্ত। এখন তাকে দেখলে মনে হয়, লোকটা যে কোনও মুহূর্তে মঞ্চ থেকে লাফিয়ে ছেলেমেয়েগুলোর গলা টিপে শেষ করে দেবে। মঞ্চের আরেক মাথায় ওপরে ওঠার সিঁড়িগুলির মাঝামাঝি একটা ধাপে দাঁড়িয়ে ছিল হাত-কাটা ফটিক। এ জাতীয় ছেলেছোকরাদের গলার স্বর কী করে চিরকালের মতো বন্ধ করতে হয় সে কৌশল তার ভালই জানা আছে।

নিশিকান্ত তার একান্ত বিশ্বস্ত এজেন্টটিকে হাত নেড়ে ডাকতে যাচ্ছিল, তার আগেই মাইকে ভূপতিমোহনের গলা শোনা যায়। বিক্ষোভকারীদের লক্ষ করে তিনি বলেন, 'আপনারা শান্ত হন। মাত্র কয়েকটা মিনিট আপনাদের কাছে সময় চেয়ে নিচ্ছি। আমি কী বলি, একটু ধৈর্য ধরে শুনুন। তারপরও যদি আপনাদের ক্ষোভের কারণ থাকে, যা ভাল বুঝবেন করতে পারেন। আমি আপত্তি করব না, বাধাও দেব না।'

ভূপতিমোহনের প্রবল ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর গম্ভীর গমগমে কণ্ঠস্বরে এমন কিছু রয়েছে যাতে ক্ষুব্ধ ছেলেমেয়েরা স্লোগান থামিয়ে আস্তে আস্তে বসে পড়ে। নিশিকান্ত ফটিককে ডাকার জন্য যে হাতটা তুলেছিল সেটা নামিয়ে নেয়। তার চোখ থেকে ধীরে ধীরে হিংস্রতা মুছে যেতে থাকে।

ভূপতিমোহন তাঁর সামনের বিপুল জনতাকে একবার ভাল করে দেখে নেন। তারপর কণ্ঠস্বর সামান্য তুলে শুরু করেন, 'আমি কী কারণে এই সভায় এসেছি আপনারা সবাই তা জানেন। শ্রীনিশিকান্ত পালচৌধুরি ক'বছর ধরে আপনাদের এই তাহেরগঞ্জ নির্বাচনকেন্দ্র থেকে বিধানসভার প্রার্থী হিসেবে দাঁড়াচ্ছেন। ওঁর ইচ্ছা, আমি তাঁর পক্ষে প্রচার করি, সভায় সভায় ওঁকে ভোট দেবার জন্য লোকজনের কাছে বক্তৃতা দিই। কিন্তু আগের দুই ইলেকশানে আমি রাজি হইনি। বহুবার নিশিকান্তবাবু এবং তাঁর পলিটিক্যাল এজেন্ট হাত-কাটা ফটিকবাবু আমার কাছে গেছেন, ওঁদের হয়ে প্রচার করার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছেন। ইদানীং যাঁরা রাজনীতি করেন, তাঁদের হালচাল দেখেশুনে ও ব্যাপারটায় আমার কোনওরকম শ্রদ্ধা নেই। ওঁদের অনুরোধে কান দিইনি। আসলে এখনকার রাজনীতির সঙ্গে আমার সংস্রব নেই। আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন, পলিটিক্স সম্পর্কে আমার যখন এতই বিতৃষ্ণা তা হলে এতকাল পর কেন

একজনের হয়ে ভোটদাতাদের কাছে ওকালতি করতে এলাম? এখনকার রাজনীতি সম্পর্কে এই শেষ বয়সে আমার মতামত, ধ্যানধারণা সবই কি রাতারাতি পালটে গেল? নাকি আপনাদের তাহেরগঞ্জের নির্বাচনপ্রার্থী নিশিকান্তবাবুর মধ্যে হঠাৎ কোনও অলৌকিক গুণ আবিষ্কার করে ফেললাম যা কিনা এতদিন আমার চোখে পড়েনি?

'আমার নিজের সম্বন্ধে কোনওরকম সাফাই গাইব না। আমি যে এখানে এত বছর বাদে মাথা ঝুঁকিয়ে সভা করতে এলাম তাতে আমার কিছু স্বার্থ আছে। সেটা কী, পরে জানাব। প্রথমে ক্যান্ডিডেট নিশিকান্তবাবু সম্পর্কে আমার কিছু জানানো কর্তব্য। অর্থাৎ যাঁর পক্ষে আমাকে বলতে হবে তাঁকে আমি কতটা চিনি, তাঁর সম্বন্ধে আমার ধারণা কী, সেটা না বললে ঘোর অন্যায় হবে।

'নিশিকান্তবাবুর সময়নিষ্ঠা সম্পর্কে গোড়ায় বলা যাক। চার-পাঁচ বছর ধরে উনি আর ওঁর পলিটিক্যাল এজেন্ট ফটিকবাবু আমার কাছে যাতায়াত করছেন কিন্তু কোনওদিনই ঠিক সময়ে যাননি। যদি বলেন সকাল সাতটায় যাব, যান বারোটায়। আজ ফটিকবাবুর আমাকে আনতে যাবার কথা ছিল আটটায়, উনি গেলেন প্রায় এগারোটায়।

'নিশিকান্তবাবুদের আগেই বলে দিয়েছিলাম দুপুরের খাওয়াটা আমি সাড়ে বারোটায় সেরে নিই। বারংবার জানানো সত্ত্বেও ওঁরা আমাকে খাওয়ার জন্যে ডাকতে এলেন সোয়া একটায়।'

ভূপতিমোহনের পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল নিশিকান্ত। সে রীতিমত ঘাবড়ে গেছে। চাপা গলায় বলে, 'স্যার, আপনি এসব কী বলছেন! আমি তো দেরি হওয়ার জন্যে আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছি।'

ভূপতিমোহন নিশিকান্তর কোনও কথা শুনতে পাচ্ছিলেন না কিংবা শুনলেও গ্রাহ্য করছিলেন না। তিনি একটানা বলতে থাকেন, 'যিনি আপনাদের প্রতিনিধি হিসেবে বিধানসভায় যেতে চান, তাঁর কাছে সময়ের মূল্য কী এবং কতটা, বুঝতেই পারছেন। সে যাই হোক, তাহেরগঞ্জে পৌঁছুবার পর আমার মেয়ে এবং আমাকে নিশিকান্তবাবুর বাড়ির বৈঠকখানায় নিয়ে যাওয়া হয়। ঘরে ঢুকেই দেখি দেওয়ালে একটি অতি কুৎসিত ক্যালেণ্ডার ঝুলছে। তাতে একটি প্রায়-উলঙ্গ স্ত্রীলোকের ছবি রয়েছে। এমন কুরুচিপূর্ণ চিত্র যিনি ঘরে টাঙিয়ে রাখতে পারেন তিনি কোন স্তরের জীব টের পেতে অসুবিধে হয় না। বন্ধুগণ, লজ্জায় আমার কন্যা মাথা তুলে কারও দিকে তাকাতে পারেনি। মনে হচ্ছিল এই বয়সে নরক দর্শন করলাম।'

নিশিকান্ত এখন একেবারে ভূপতিমোহনের কাছে চলে এসেছে। সে গলগল করে ঘামছিল। চাপা গলায় বলে, 'স্যার, আমি একেবারে ডুবে যাব। দয়া করে এসব বলবেন না।'

ভূপতিমোহন থামেন নি, 'তাছাড়া, তাহেরগঞ্জে আসার পথে কলেজের কিছু ছাত্রছাত্রী আমাদের গাড়ি থামিয়ে দিয়েছিল। শিক্ষিত আর্দশবাদী উজ্জ্বল সব ছেলেমেয়ে। দেশ সম্পর্কে এরা ভাবে। স্বার্থপরতা এখনও তাদের গ্রাস করেনি। এই জনসভায় ওই ছেলেমেয়েদের দেখতে পাচ্ছি, ওরা আমাকে নিশিকান্তর ব্যাপারে মারাত্মক কিছু খবর দেয়। প্রথমটি হল—'

তাঁর কথা শেষ হতে না-হতেই নিশিকান্ত টেবলের তলায় ঢুকে ভূপতিমোহনের দু'টি পা জড়িয়ে ধরে। বলে, 'মরে যাব স্যার, এভাবে আমার সর্বনাশ করবেন না।'

পা ছাড়াবার চেষ্টা করেন ভূপতিমোহন কিন্তু এত জোরে নিশিকান্ত আঁকড়ে ধরেছে যে ছাড়ানো অসম্ভব। সেই অবস্থাতেই তিনি বলতে থাকেন, 'প্রথমটি হল দেশের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে নিশিকান্তবাবু এই শহরে বসে নাকি স্মাগলিং চালিয়ে যাচ্ছেন, আর অসহায় গরিব পরিবারের মেয়েদের নিয়ে নাকি তিনি পাপ ব্যবসা চালান।'

হঠাৎ দেখা যায়, মঞ্চের গণ্যমান্য মানুষগুলি একে একে নিঃশব্দে সরে পড়তে শুরু করেছেন। নিশিকান্তও টেবলের তলা থেকে বেরিয়ে আরক্ত চোখে একবার ভূপতিমোহনকে দেখে মঞ্চের আরেক দিক দিয়ে দ্রুত নেমে যায়। ফটিককেও এখন আর দেখা যাচ্ছে না। ওধারে মঞ্চের নিচে প্রচণ্ড হই চই শুরু হয়ে গেছে।

এরই মধ্যে ভূপতিমোহন বলে যান, 'নিশিকান্ত পালচৌধুরি সম্পর্কে আমার যা যা জানা ছিল সবই আপনাদের কাছে খুলে বললাম। এরপরও যদি তাঁকে নিজেদের যোগ্য প্রতিনিধি মনে করেন, ভোট দিতে পারেন। সবশেষে নিজের কথা একটু বলি। আমার বয়েস এখন পঁচাত্তর। এই বয়েসে আমার অধঃপতন ঘটেছিল। আমার মেয়ে সবিতাকে মঞ্চে দেখতে পাচ্ছেন। ওর একটা চাকরির জন্যে নিশিকান্তর মতো লোকের পক্ষে আপনাদের কাছে আর্জি জানাতে এসেছিলাম। আমার জীবনে এর চেয়ে বড় অন্যায়, বড় পাপ আর কখনও করিনি। এসব কথা জানিয়ে এখন অনেকটা হালকা হতে পারলাম। আমার আর কিছু বলার নেই। নমস্কার।'

জনতার ভিড়ে যে শোরগোল শুরু হয়েছিল সেটা এখন তুমুল হয়ে উঠেছে। কলেজের সেই ছেলেমেয়েরা সমস্ত হই চই ছাপিয়ে স্লোগান দিয়ে যাচ্ছে।

'ভূপতিমোহন—'

'জিন্দাবাদ।'

'দেশগৌরব ভূপতিমোহন—'

'জিন্দাবাদ।'

'নিশিকান্ত পালচৌধুরিকে—'

'গ্রেপ্তার কর।'

'স্মাগলার নিশিকান্ত—'

'মুর্দাবাদ।'

স্লোগান দিতে দিতে ছাত্রছাত্রীরা মঞ্চে উঠে আসে। সবচেয়ে ঝকঝকে, সবচেয়ে উজ্জ্বল সেই ছেলেটি ভূপতিমোহনকে প্রণাম করে বলে, 'আমরা আপনাকে ভুল বুঝেছিলাম। আমাদের ক্ষমা করবেন। আমাদের কাছে আপনার অন্যরকম ইমেজ। সেটা নষ্ট হয়ে যাবে ভেবে মন ভীষণ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তাই—'

ছেলেটির কাঁধে হাত রেখে ভূপতিমোহন সস্নেহে বলেন, 'ক্ষমার প্রশ্ন নেই। তোমাদের মতো ছেলেমেয়েদের জন্যে গর্ববোধ করছি। মনে হচ্ছে দেশটা এখনও একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। তোমরা ঠিক সময়ে গাড়ি থামিয়ে নিশিকান্ত সম্পর্কে ওই খবরগুলো দিয়েছ। সে যাক কিন্তু বাবা, এখানে যা ঘটল তারপর ওরা তো আর

আমাদের বাড়ি পৌঁছে দেবে না। তোমরা যদি কোনও ব্যবস্থা করে দিতে পার—'

ছেলেটি বলে, 'নিশ্চয়ই। কোনও চিন্তা করবেন না।'

ওরাই ছোটাছুটি করে কোত্থেকে একটা গাড়ি জোগাড় করে আনে। আধ ঘন্টা পর সেই গাড়িটার ব্যাক সিটে পাশাপাশি বসে বাড়ি ফিরছিল সবিতা আর ভূপতিমোহন। ফ্রন্ট সিটে বসে আছে সেই ঝকঝকে ছেলেটি। তার নামটাও এর ভেতর জানা হয়ে গেছে—আনন্দ। আনন্দ তাদের পৌঁছে দিয়ে আবার তাহেরগঞ্জে ফিরে আসবে।

ভূপতিমোহন আনন্দর সঙ্গে কথা বলছিলেন। এখনকার কোনও বিষয়, এমন কি সব চাইতে যা উত্তেজক সেই নিশিকান্ত সম্পর্কেও এই মুহূর্তে আনন্দর বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই। ব্রিটিশ আমলে ভূপতিমোহনরা কীভাবে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিলেন, সেই লড়াইয়ের পদ্ধতি কী ছিল, কত বছর তিনি জেল খেটেছিলেন, ইত্যাদি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিচ্ছিল আনন্দ। এমন একজন মনোযোগী উৎসুক শ্রোতা পেয়ে তার প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছিলেন ভূপতিমোহন। ছেলেটির সঙ্গে কথা বলতে যে ভাল লাগছে, সেটা তাঁর চোখমুখ দেখেই টের পাওয়া যাচ্ছে।

পাশে বসে পলকহীন ভূপতিমোহনকে দেখে যাচ্ছিল সবিতা। আনন্দর সঙ্গে তিনি কী কথা বলছিলেন সে সবের কিছুই তার কানে ঢুকছিল না। বাবা তার একটি চাকরির কারণে যা করতে তাহেরগঞ্জ এসেছিলেন সে জন্য গ্লানি এবং অপরাধবোধে ক'টা দিন যেন শ্বাস আটকে আসছিল। কিন্তু তাহেরগঞ্জে এসে চিরদিনের চেনা আদর্শবাদী, সৎ, অসীম সাহসী এবং আপসহীন মানুষটি কিছুক্ষণ আগে যা করে গেলেন সে জন্য নিজেকে খুবই ভারমুক্ত মনে হচ্ছে সবিতার। না, তার জন্য বাবাকে শেষ পর্যন্ত এই বয়সে মাথা নোয়াতে হয়নি। ভূপতিমোহন শক্ত মেরুদণ্ডটি অটুট রেখেই বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন।

রাজা যায় রাজা আসে

ভোরবেলা পুবের ঘরের দাওয়ায় বসে পা নাচাচ্ছিল রাজেক। পরনে সবুজ জমির ওপর হলুদ হলুদ রেখ-কাটা লুঙ্গি আর জালি গেঞ্জি। এই সাত সকালেই চুলে কাঁকই পড়েছে, মাথায় পেখম তুলে টেরি কেটে নিয়েছে সে। তার বুকে এখন সুখের ঢেউ খেলে যাচ্ছে। আজই শুধু? ক'মাস ধরেই সুখের নদীতে বান ডেকে আছে তার।

পুবের ঘর বাদ দিলে উত্তর এবং পশ্চিমের ভিটেয় বড় বড় পাঁচিশের বন্দের চার খানা ঘর। সেগুলোর মাথায় ঢেউটিনের নকশা-করা চাল, শালকাঠের খিলান-দেওয়া দেওয়াল, বিলিতি মাটির পাকা মেঝে।

রাজেক যেখানে বসে আছে, তার তলা থেকে ঢালা উঠোন। উঠোনটার একধারে সারি সারি ধানের ডোল, আরেক ধারে শিউলি গাছ। উঠোনের পর খানিকটা নাবাল জমি, পিঠক্ষিরা আর সোনালের ঝোপে জায়গাটা ছেয়ে আছে। তারপর পুকুর। পুকুর

পেরিয়ে ধানের খেত। বর্ষায় পুকুর এবং ধানখেত ভেসে একাকার হয়ে গিয়েছিল। এখনও তেমনিই রয়েছে, দুইয়ের মাঝখানে সীমারেখা নেই কোথাও।

এতগুলো বড় বড় টিনের ঘর, প্রকাণ্ড উঠোন, পুকুর, পুকুরের পর একলপ্তে নব্বুই কানি দো-ফসলা জমি—সমস্ত মিলিয়ে রাজা-বাদশার ঐশ্বর্য। আর এ সবই এখন রাজেকের। অথচ আট মাস আগে? আট মাস আগের কথা এখন নয়।

আশ্বিন মাস যায় যায়। সারা বর্ষার জলে ধুয়ে ভাদ্রের গোড়ায় আকাশ সেই যে আশ্চর্য রকমের নীল হয়ে গিয়েছিল এখনও তা-ই আছে। তার গায়ে থোকা থোকা ভবঘুরে মেঘ। উঠোনের শিউলি গাছটা ফুলে ফুলে সেজে রয়েছে। সেই কবে থেকে, শরৎ আসার আগেই বুঝি, সারা গায়ে ফুল ফোটাতে শুরু করেছিল গাছটা। এখনও ফুটিয়েই যাচ্ছে।

দেখতে দেখতে সূর্য উঠে গেল। গলানো সোনার মতো রোদের ঢল নামল চারিদিকে। কোত্থেকে দুটো মোহনচূড়া পাখি উত্তরের ঘরের চালে উড়ে এসে ঠোঁটে ঠোঁট ঘষে খুনসুটি জুড়ে দিল। সামনে-পেছনে, পুবে-পশ্চিমে—যেদিকেই চোখ ফেরানো যায়, শরৎকাল যেন যাদুকরের বেশে দাঁড়িয়ে।

পা নাচাতে নাচাতে অন্যমনস্কর মতো ধানখেতের দিকে তাকিয়ে ছিল রাজেক। ক'মাস ধরে রোজ সকালবেলা এমনিভাবে পুবের ঘরের দাওয়ায় বসে অলস চোখে তাকিয়ে থাকছে সে। এটা যেন বিলাসের মতো, কিংবা তার মনেরই কোনও প্রিয় খেলা।

দূরে, অনেক দূরে ধানখেত চিরে একটা নৌকো আসছিল। নৌকোটা ঠিক দেখা যাচ্ছিল না। ধানবনের ওপর গোল ছই, একটা কালো কুচকুচে মাঝি আর উঁচু লগির ওঠানামা চোখে পড়ছিল।

রোজ সকালে কত নৌকোই তো ধানখেত ভেঙে কত দিকে চলে যায়। ওই নৌকোটা কোথায় কোন দিকে চলেছে তা নিয়ে দুশ্চিন্তা নেই রাজেকের। চারধারে আশ্বিনের নরম রোদের ছড়াছড়ি, মোহনচূড়া পাখি দুটোর নাচানাচি কিংবা আকাশের ভাসমান মেঘ—কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না সে। রাজেক ভাবছিল নিজের কথা, নিজের তিরিশ বছরের একটানা দীর্ঘ জীবনটার কথা।

হায় রে, কী জীবন ছিল তার! আজ এই যে জালি গেঞ্জিটি গায়ে দিয়ে মাথায় শৌখিন টেরিটি কেটে, সুখের নদীতে গা ভাসিয়ে রাজেক পা নাচাচ্ছে, আট মাস আগে তা ছিল অসম্ভব। দেশখানা যদি দু-ভাগ না হ'ত, বৈকুণ্ঠ সাহারা যদি এই ছিপতিপুর গ্রাম ছেড়ে চলে না যেত, এত সুখ কপালে ছিল না।

ভাবনাটা পুরো হল না। তার আগেই কী আশ্চর্য, ধানখেতের সেই নৌকোটা পুকুর পাড়ি দিয়ে ঘাটে এসে ভিড়ল।

ভুরু কুঁচকে খাড়া হয়ে বসল রাজেক। ভেবেই পেল না, সকালবেলায় তার কাছে কে আসতে পারে। সে জন্য অবশ্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। একটু পর নৌকো থেকে যে নামল সে আর কেউ না, স্বয়ং তোরাব আলি—ছিপতিপুর গ্রামের সব চাইতে বড় ধানী গৃহস্থ।

দুশো কানি তে-ফসলা জমি তোরাব আলির, হাল-হালুটি অগুনতি, গোরু আর বলদ পঞ্চাশ-ষাটটা, নৌকো গোটা চল্লিশেক। পঁচিশ-তিরিশটা কামলা বারো মাসই তার বাড়ি আর জমিতে খাটছে। ধান-পাট-মুগ-মুসুর সব মিলিয়ে এলাহী কাণ্ড। মাস আষ্টেক আগেই তার বাড়ি কামলা খেটেছে রাজেক। এই ছিপতিপুর গ্রামের সে মাথা, সব চাইতে গণ্যমান্য ব্যক্তি।

বড় গৃহস্থই শুধু না, তোরাব আলি মানুষটি ভারি শৌখিনও। এই সকালবেলাতেই পরিপাটি সাজসজ্জা করে বেরিয়েছে। পরনে সিল্কের লুঙ্গি, কলিদার পাঞ্জাবি, পায়ে কাঁচা চামড়ার নাগরা, চুলে-দাড়িতে কলপ। রাজেক জানে কাছে গেলে তার চোখে সুর্মার টান দেখতে পাবে, আতরের ভুরভুরে গন্ধ নাকে এসে লাগবে।

তোরাব আলি কি তার কাছেই এসেছে? প্রথমটা বুঝতে পারল না রাজেক। তোরাব আলির মতো মানুষ তার কাছে আসতে পারে, এর চাইতে বিস্ময়কর ঘটনা জগতে আর বোধ হয় কিছু নেই। বিমূঢ়ের মতো কিছুক্ষণ একভাবে বসে থেকে হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে পড়ল রাজেক, তারপর উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে পুকুরঘাটে চলে এল। হাত কচলাতে কচলাতে খুব সম্ভ্রমের সুরে বলল, 'আপনে!'

দু হাতে দাড়ি তোয়াজ করতে করতে সামান্য হাসল তোরাব আলি। বলল, 'হ, আমিই। তর কাছে আইলাম—'

হায় আল্লা! শুনেও যেন বিশ্বাস করতে পারল না রাজেক। প্রতিধ্বনির মতো করে বলল, 'আমার কাছে!'

'হ—হ, তরই কাছে।'

কী উত্তর দেবে, রাজেক ভেবে পেল না।

খুব তরল গলায় তোরাব আলি এবার বলল, 'পুকৈর (পুকুর) ঘাটেই খাড়া করাইয়া রাখবি নিকি! ঘরে নিয়া যাবি না?'

সুরটা অন্তরঙ্গ। সেই ছোটকাল থেকে তোরাব আলিকে দেখছে রাজেক, এভাবে তাকে কথা বলতে আগে আর কখনও শোনেনি।

রাজেক খুব লজ্জা পেয়ে গেল। ব্যস্তভাবে বলল,'আসেন—আসেন—'

বাড়ি এনে তোরাব আলিকে কোথায় বসাবে, কীভাবে আপ্যায়ন করবে, ঠিক করে উঠতে পারল না রাজেক। প্রথমে ছুটে গিয়ে একটা পাটি এনে দাওয়ায় বিছিয়ে দিল। কিন্তু নিজের কাছেই তা মনঃপূত হল না। তক্ষুনি সেটা গুটিয়ে একটা জলচৌকি নিয়ে এল।

তোরাব আলি কিন্তু বসল না। তার সমাদরের জন্য রাজেকের ছোটাছুটি, ব্যস্ততা দেখে সে খুব সন্তুষ্ট। প্রসন্ন গলায় বলল, 'আমার লেইগা অস্থির হইস না রাজেক। বসুম পরে। আগে তর ঘরদুয়ার দেখা—'

চমকে সংশয়ের চোখে তোরাব আলিকে একবার দেখে নিল রাজেক। তবে বাড়িঘর দেখার জন্যই কি সকালবেলা ছুটে এসেছে লোকটা? তোরাব আলির মনে কী আছে, কে জানে।

রাজেকের মুখচোখের সন্দিগ্ধ চেহারা দেখে কিছু একটা আন্দাজ করে নিল তোরাব আলি। মৃদু কৌতুকের সুরে বলল, 'ডর নাই, তর বাড়িঘর আমি কাইড়া নিমু না। তর জিনিস তরই থাকব।'

মুখে ফুটে তোরাব আলি একবার যখন দেখতে চেয়েছে তখন আর 'না' বলা যাবে না। মনের ভেতর স্তূপাকার সন্দেহ নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখাল রাজেক।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সমস্ত দেখে জলচৌকির ওপর জাঁকিয়ে বসল তোরাব আলি। বলল, 'তামুক আছে রে?'

খেয়াল করে তামাক-টামাক নিজেরই দেওয়া উচিত ছিল। রাজেক দিতও, কিন্তু সংশয়ে দুশ্চিন্তায় মনটা হঠাৎ আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়ায় ভুলে গিয়েছিল।

ছুটে গিয়ে তামাক সেজে নিয়ে এল রাজেক। আয়েশ করে হুঁকো টানতে টানতে তোরাব আলি বলল, 'বৈকুণ্ঠ সা বাড়িঘর তরে দেখাশুনা করতে দিয়া গেছে না?'

লোকটার উদ্দেশ্য ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। প্রায় দম বন্ধ করে রাজেক উত্তর দিল, 'হ।'

সামনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে তোরাব আলি বলল, 'ওই পুকৈরও তো বৈকুণ্ঠ সা'র?'

'হ।'

'পুকৈরের ওই পারের জমিন?'

'হেয়াও (তাও) সা'কত্তার।'

'কত জমিন আছে?'

'নব্বই কানি।'

'হগলই অখন তর হ্যাফাজতে?'

আবছা গলায় রাজেক বলল, 'হ।'

একটু নীরবতা। দ্রুত বারকতক হুঁকো টেনে গল গল করে ধোঁয়া ছাড়ল তোরাব আলি। তারপর বলল, 'বৈকুণ্ঠ সা'রা আট মাস আগে গেরাম ছাইড়া গেছে না?'

লোকটা দেখা যাচ্ছে, অনেক খবর রাখে। আগের সুরেই রাজেক বলল, 'হ।'

'কই গেছে জানস?'

'শুনছিলাম কইলকাতার দিকে যাইব।'

'খোজখপর কিছু পাইছস?'

'না।'

'এইর ভিতরে তরে চিঠিপত্তর দিছে?'

'না।'

একটু চুপ করে থেকে কপাল কুঁচকে কী ভাবল তোরাব আলি। তারপর বলল, 'তর কী মনে লয়?'

প্রশ্নটা বুঝতে পারল না রাজেক। জিজ্ঞেস করল, 'কোন ব্যাপারে?'

বৈকুণ্ঠ সা'রা আর ফিরব?'

'কেমনে কমু?'

রাজকের কথা যেন শুনতে পেল না তোরাব আলি। অনেকটা আপন মনেই বলে উঠল, 'আমার মনে লয় অরা ফিরব না।'

রাজেক উত্তর দিল না।

তোরাব আলি আবার বলল, 'বৈকুণ্ঠ সা'রা না ফিরলে তার জমিন, বাড়িঘর, পুকৈর, সগল তর হইয়া যাইব। হইয়া যাইব কি, হইয়া গেছেই।'

রাজেক এবারও চুপ।

বৈকুণ্ঠ সাহা এবং তার বিপুল সম্পত্তি সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করে আরও কিছুক্ষণ খবর-টবর নিল তোরাব আলি। তারপর হঠাৎ বলে উঠল, 'এইবার কামের কথাখান সাইরা লই।'

দম বন্ধ করেই ছিল রাজেক। আবছা গলায় বলল, 'কী কাম?'

'আমার ইচ্ছা, কাইল দুফারে আমাগো বাড়িত চাউরগা ডাইল-ভাত খাবি।'

সামনে বাজ পড়লেও এতখানি চমকাত না রাজেক। ছিপতিপুর গ্রামের সব চাইতে বড়, সব চাইতে সম্মানিত, সব চাইতে মর্যাদাসম্পন্ন গৃহস্থ—যার বাড়ি ক'দিন আগেও সে কামলা খেটেছে, সেই তোরাব আলি কিনা নিজে এসে তাকে নেমন্তন্ন করছে! কিছু একটা বলতে চেষ্টা করল রাজেক, কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুল না।

এদিকে হাতের ভর দিয়ে উঠে পড়েছে তোরাব আলি। বলল, 'তাইলে ওই কথাই রইল। কাইল দুফারে আসবি কিলাম।'

সজ্ঞানে না, অনেকটা ঘোরের মধ্যেই যেন ঘাড় কাত করল রাজেক।

তোরাব আলি বলল, 'আবার ভুইলা যাইস না। আমরা কিন্তুক তর লেইগা বইসা থাকুম।' বলে আর দাঁড়াল না। সামনের ঢালা উঠোন, তারপর সোনাল আর পিঠক্ষিরা গাছের জঙ্গল পেরিয়ে পুকুরঘাটে চলে গেল। একটু পর তার নৌকো দূর ধানখেতের ভেতর অদৃশ্য হল।

তোরাব আলি চলে যাবার পরও অনেকক্ষণ একই ভাবে বসে থাকল রাজেক। পুকুরঘাট পর্যন্ত যে তাকে এগিয়ে দিয়ে আসা উচিত ছিল, এই কথাটা রাজেকের একবারও মনে পড়েনি। আসলে এত বিস্মিত, এত স্তম্ভিত, এত বিহ্বল আগে আর কখনও হয়নি সে। এমন ভয়ও কখনও পায়নি।

তোরাব আলি তার কাছে এসেছিল, কাল দুপুরবেলা খাবার জন্য নেমন্তন্ন করে গেছে—সমস্ত ব্যাপারটাই যেন অবিশ্বাস্য। তোরাব আলির মতো মানুষ তার কাছে আসতে পারে, শুধু আসাই না, এত খাতির করতে পারে—এমন ঘটনা ভাবাই যায় না। আজ না হয় বৈকুণ্ঠ সাহারা দেশ ছেড়ে যাবার পর একটু সুখের মুখ দেখেছে। নইলে আট মাস আগেও তার দিন যে কীভাবে চলত!

আশ্বিনের এই সকালে বিমূঢ়ের মতো পুবের ঘরের দাওয়ায় বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ সময়ের উজান ঠেলে পেছন দিকে ফিরে গেল রাজেক।

হায় রে, কী জীবন ছিল রাজেকের! ছোটকালেই তো বাপ-মা খেয়ে বসেছে। তারপর থেকে দু গরাস ভাতের জন্য কুকুরছানার মতো ছিপতিপুরের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়াত। কখনও যেত মৃধাদের বাড়ি, কখনও সর্দারদের, কখনও বা খানেদের। তবে সব চাইতে বেশি যেত হিন্দুপাড়ায়। কোথাও কিছু জুটত, কোথাও আবার কিছুই না। খিদে ছাড়া সে সময় আর কোনও অনুভূতি ছিল না। সর্বক্ষণ খিদেটা তার পায়ে পায়ে ফিরত।

একটু বড় হবার পর রাজেকের মনে হয়েছিল, অন্যের করুণার ওপর চিরকাল বাঁচা যায় না, আর তা সম্মানজনকও নয়। কাজেই খানিকটা টোন সুতো আর বঁড়শি জোগাড় করেছিল সে। লোকের বাড়ি থেকে চেয়েচিন্তে এনেছিল খান দুই মূলি বাঁশ। বাঁশ চিরে 'পলো' এবং 'চাই' বানিয়েছিল আর বুনে নিয়েছিল একখানা 'ধর্মজাল'। তখন থেকে কঠিন জীবন-সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়েছিল তার।

এ দেশে সারা বছরই জল। খাল শুকোয় তো বিল আছে, বিল শুকোয় তো গাঙ তার বুক ভরে রেখেছে। বঁড়শি নিয়ে, ধর্মজাল নিয়ে, পলো নিয়ে খাল বিল কি দু-মাইল দূরের বড় নদীতে চলে যেত রাজেক। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত একটানা পরিশ্রমের মূল্যস্বরূপ যে মাছ মিলত তাই নিয়ে সে ছুটত ইনামগঞ্জের হাটে। মাছ বেচে সন্ধের পর ছিপতিপুরের এক কোণে যে গরিব মুসলমান পল্লীটা আছে সেখানে চলে যেত। ওদের রান্নাবান্না হয়ে গেলে কারও উনুনে চাট্টি চাল ফুটিয়ে নিত। তারপর খেয়েদেয়ে তাদেরই ঘরের দাওয়ায় টান হয়ে শুয়ে পড়ত।

সারাটা বছর জলে জলেই কেটে যেত রাজেকের। ফাঁকে ফাঁকে সময় পেলে লোকের বাড়ি কামলা খাটত। এর ধান কেটে দিত, ওর পাট 'তুলে' দিত। বেশির ভাগ সময় সে খাটত তোরাব আলির কাছে। পৌষ মাঘ মাসে ধান উঠে গেলে মাঠে যে শস্যের দানাগুলো কৃষাণদের চোখ এড়িয়ে পড়ে থাকত সেগুলো খুঁটে খুঁটে তুলে আনত রাজেক, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ইঁদুরের গর্ত থেকে ধান বার করত। কুড়নো ফসল থেকে এক-আধটা মাস ভালই কেটে যেত তার।

জলে-স্থলে সারা বছরই তখন তার নিদারুণ জীবন সংগ্রাম। ডাঙায় অবশ্য বেশিদিন থাকতে পেত না রাজেক। প্রায় বারো মাস জলে ভিজে ভিজে চামড়া ফেটে ফেটে গিয়েছিল, গা থেকে সর্বক্ষণ খই উড়ত। চুল-দাড়িতে জট পাকিয়ে গিয়েছিল, চোখ দুটো থাকত ঘোলাটে হয়ে। নখের কোণে পাঁক ঢুকে 'কুনি' হয়েছিল, হেজে হেজে আঙুলের ফাঁকে থকথকে ঘা। রাজেকের চোখের সামনে দিনরাতের একটাই মোটে রং তখন। তার নাম দুঃখ, অসীম অন্তহীন দুঃখ।

হায় রে, কী জীবন ছিল রাজেকের!

শীত-গ্রীষ্ম, শরৎ-হেমন্ত—ঋতুর চাকায় পাক খেয়ে খেয়ে তিরিশটা বছর কীভাবে কেটে গেছে, রাজেক জানে না।

একদিন সকালবেলা এক কোমর স্রোতে নেমে ধর্মজাল বাইতে বাইতে হঠাৎ তার চোখে পড়েছিল, স্কুলবাড়ির সামনের বড় মাঠটায় কাতারে কাতারে মানুষ গিয়ে জমা

হয়েছে। চিত্রবিচিত্র পোশাক-পরা একদল লোক বিলিতি বাজনা বাজাল। কারা যেন গলার শির ফুলিয়ে ফুলিয়ে, প্রচুর মাথা নেড়ে বক্তৃতা করল। সিল্কের নতুন পতাকা উঠল আকাশের দিকে।

সকালবেলা বর্ণশূন্য ধূসর চোখে স্কুলবাড়ির মাঠের দিকে তাকিয়ে ছিল রাজেক। সন্ধের পর ওখানেই যখন বাজি পোড়াবার ধুম পড়ে গেল, তখন আর দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে শুধিয়েছিল, 'এত রং তামশা ক্যান? বাজি ফুটানের হইল কী?'

ভিড়ের ভেতর থেকে কে একজন ধিক্কারের গলায় বলে উঠেছিল, 'আরে আহাম্মক, তুই আলি (এলি) কইথন (কোথা থেকে)? দেখি, দেখি তর চোপাখান (মুখখানা)।' পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভাল করে দেখে নিয়ে লোকটা এবার বলেছিল, 'তাই কই, আমাগো রাজেইকা ছাড়া এমুন কথা আর কার মুখ দিয়া বাইর হইব! জলে থাইকা থাইকা বুদ্ধিসুদ্ধি তর গেছে। কুনো খপরই রাখস না—'

'প্যাচাল না পাইড়া কী হইছে হেই কথাটা কও—'

লোকটা এবার বুঝিয়ে দিয়েছিল। সে একটা দিনের মতো দিন। সেদিন দেশ স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীনই শুধু না, কোটি কোটি মানুষ যার স্বপ্ন দেখেছে, যার জন্য মৃত্যুপণ সংগ্রাম করেছে, সেই পাকিস্তানেরও প্রতিষ্ঠা সেই দিনটিতে। এমন একটা দিন বছরের, এক-আধ বছরের কেন, বহু-বহু বছরের লক্ষ লক্ষ ম্যাড়মেড়ে আটপৌরে দিন থেকে আলাদা। তাকে তো অন্যমনস্কের মতো উদাসীনভাবে হাত পেতে নেওয়া যায় না। বিপুল সমাদরে রাজকীয় সমারোহে বরণ করে নিতে হয়। তাই এত লোকজন, এত বাজি পোড়াবার ধুম, এত উদ্দীপনা।

মনে আছে, অনেক রাত পর্যন্ত সেদিন স্কুলবাড়ির মাঠে ভিড়ের ভেতর দাঁড়িয়ে ছিল রাজেক। এত আলো, এত হই চই, এত উত্তেজনা, এত রোশনাই, এত রং—সবই ভাল লেগেছিল তার, নতুন নতুন মনে হয়েছিল। কিন্তু ভাল লাগার আয়ু মোটে একটা রাত। পরের দিনই 'পলো' নিয়ে খালে গিয়ে নামতে হয়েছিল তাকে।

সেই চমকপ্রদ বিশেষ দিনটির পর বছরখানেক কাটল। হঠাৎ একদিন কার্তিক মাসের পচা জলে 'চাই' পাততে পাততে রাজেক খবর পেল, ছিপতিপুর গ্রামে ভাঙন লেগেছে। গোঁসাই বাড়ির লোকেরা নাকি জমিজমা ঘরদুয়ার বেচে কলকাতায় চলে গেছে। গোঁসাইদের পর গেল ভুঁইমালীরা, তারপর একে একে বারুইরা, কুমোররা, যুগীরা। দেখতে দেখতে ছিপতিপুর একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল।

বারো মাস জলে থেকে থেকে অনুভূতিগুলো প্রায় অসাড় হয়ে গিয়েছিল রাজেকের। গ্রামে কারা থাকল, কারা গেল—তা নিয়ে আদৌ দুর্ভাবনা নেই। তার দিনরাতের একমাত্র চিন্তা—জলের তলা থেকে কেমন করে জীবন্ত রুপোলি ফসলগুলোকে তুলে আনবে।

দেশভাগ, স্বাধীনতা দিবসের জমকালো উৎসব কিংবা গ্রামের ভাঙন—সমস্ত কিছুই রাজেককে আলতোভাবে ছুঁয়ে গিয়েছিল। সেসব নিয়ে বসে থাকার মতো

যথেষ্ট সময় তার নেই। কেননা, শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য তাকে এত খাটতে হ'ত যে তারপর আর কোনও ব্যাপারে মেতে ওঠার মতো উৎসাহ থাকত না।

কিন্তু খুব বেশিদিন চারপাশের জগতের দিকে পিঠ ফিরিয়ে থাকা গেল না। মাঘ মাসের এক শীতল দুপুরে মাঠে মাঠে ফেলে যাওয়া শস্যের দানা কুড়োচ্ছিল রাজেক। হঠাৎ বুড়ো বৈকুণ্ঠ সাহা তার সামনে এসে দাঁড়াল।

রাজেক শুধিয়েছিল, 'আমারে কিছু কইবেন সা-মশয়?'

'হ—' বৈকুণ্ঠ সাহা মাথা নেড়েছিল।

'ক'ন।'

'আমরা তো গেরাম ছাইড়া চললাম—'

'কই চললেন?'

'কইলকাতা।'

'ফিরবেন কবে?'

'ফিরনের ঠিক নাই।'

রাজেক আর কিছু জিজ্ঞেস করেনি।

বৈকুণ্ঠ সাহা আবার বলেছিল, 'তর লগে একখান কামের কথা আছে।'

'কী?'

'আমরা কইলকাতা গেলে আমাগো ঘরদুয়ার জমিন-পুকৈর সগল তুই দেখবি। এমনে এমনে দেখতে কই না, ধান পাট যা হয় সব তুই পাবি। যদি কুনোদিন ফিরি তখন বাড়িঘর ফিরাইয়া দিস। না ফিরলে বেবাক তরই হইয়া যাইব।'

বৈকুণ্ঠ সাহারা সত্যিই চলে গেল। তার বিপুল সম্পত্তি, বিশাল ঐশ্বর্য এসে পড়ল রাজেকের হাতে। ইদানীং আট মাস ধরে জীবনধারণের জন্য জলে-স্থলে আর উঞ্ছবৃত্তি করে বেড়াতে হচ্ছে না তাকে। এ ব্যাপারে এখন সে নিশ্চিন্ত। আরামে আর সুখে থেকে পায়ের হাজা, নখের কুনি-টুনি সেরে গেছে রাজেকের। খই-ওড়া চামড়ায় চকচকে মসৃণতা এসেছে, মাথায় ঢেউখেলানো টেরি দেখা দিয়েছে। মেজাজটিও হয়ে উঠেছে শৌখিন। আজকাল সিল্কের লুঙ্গি, জালি গেঞ্জি, কলিদার পাঞ্জাবি ছাড়া চলে না। গন্ধতেলটি না হলে মন খুঁতখুঁত করে।

ক'মাস ধরে সব সময় রাজেকের মনে হয়, ভাগ্যি দেশখানা দু-ভাগ হয়েছিল, ভাগ্যি বৈকুণ্ঠ সাহারা চলে গিয়েছিল! না হলে তার কপাল কি খুলত! এত সুখের মুখ কি সে দেখতে পেত!

দিনগুলো ভালোই কাটছিল কিন্তু ছিপতিপুর গ্রামের এত মানুষ থাকতে আজ তোরাব আলি কেন যে বেছে বেছে হঠাৎ তার কাছে আসতে গেল! শুধু আসা না, দাওয়াতও করে গেল। লোকটার মনে কী আছে কে জানে।

তোরাব আলি নেমন্তন্ন করে গেছে। না গেলেও নয়, আবার যেতেও ভরসা হয় না। পরের দিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বসে বসে ভাবল রাজেক, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার তোরাব আলির উদ্দেশ্যটা বুঝতে চেষ্টা করল। তারপর নিজের অজান্তেই

এক সময় চানটান সেরে, রঙচঙে লুঙ্গি আর পাঞ্জাবিটি পরে কাঁচা চামড়ার নাগরা পায়ে দিয়ে নৌকোয় গিয়ে উঠল।

ছিপতিপুর গ্রামের শেষ মাথায় একটা দ্বীপের মতো জায়গায় তোরাব আলির বাড়ি। যেমন তেমন বাড়ি না, রীতিমত পাকা দালান। অনেকখানি জায়গা জুড়ে বাড়িটা, অসংখ্য ঘর। মানুষজনও প্রচুর।

ধানবন ঠেলে রাজেক যখন সেখানে পৌঁছল, আশ্বিনের বেলা অনেকখানি হেলে গেছে। রোদে হলুদ আভা লাগতে শুরু করেছে।

ঘাটে নৌকো ভিড়তে না ভিড়তেই তোরাব আলি ছুটে এল। সমাদরের গলায় বলল, 'আইছ মেঞা! আমি তো ভাবছিলাম, তুমি ভুইলাই গেছ—'

উত্তর দেবে কি, রাজেক স্তম্ভিত। এই সেদিনও অবজ্ঞার সুরে তাকে 'তুই' বলত তোরাব আলি, সম্ভাষণের ভাষাটা ছিল 'রাজেইকা'। বেশি দূরে পিছিয়ে যেতে হবে কেন, কালও তাকে 'তুই তোকারি' করে এসেছে। রাতারাতি হঠাৎ এমন কী ঘটে গেল যাতে সে অত সম্মানিত হয়ে উঠেছে! 'তুই' থেকে 'তুমি', 'রাজেইকা' থেকে 'মেঞা'—এতখানি বিস্ময় রাজেক সহ্য করতে পারছে না।

তোরাব আলি বলল, 'আসো—আসো—'

নিঃশব্দে নৌকো থেকে পারে নামল রাজেক। তাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির দিকে যেতে যেতে তোরাব আলি বলতে লাগল, 'এত দেরি হইল ক্যান?'

জড়ানো গলায় রাজেক কিছু একটা বলতে চেষ্টা করল কিন্তু তার একটি বর্ণও বোঝা গেল না।

তোরাব আলি বলল, 'আরেট্টু দেখতাম। হে'র (তার) পরও যদি না আইতা, তোমার বাড়িত্ লোক পাঠাইতাম।'

অনেক কষ্টে স্বরটাকে গলার ভেতর থেকে এবার মুক্ত করে আনল রাজেক, 'আপনে কাইল কইয়া আইলেন। না অইসা কি পারি? ঘেটিতে (ঘাড়ে) আমার কয়টা মাথা?'

তোরাব আলি কিছু না বলে হাসল।

বাড়ির ভেতরে এনে ধবধবে ফরাসের ওপর খুব যত্ন করে রাজেককে বসানো হল। তক্ষুনি সরবত এল, মিঠাই এল, পান-তামাক এল। বাড়ির যত বয়স্ক মেয়ে-পুরুষ সবাই এসে রাজেককে ঘিরে বসল। বাচ্চাগুলো দরজার সামনে ভিড় করে দাঁড়াল।

রাজেক ঘামতে শুরু করেছিল। আট মাস আগেও যে সে এ বাড়িতে কামলা খেটেছে, মাঠ থেকে ধান কেটে এনেছে, পাট 'জাগ' দিয়েছে—এই কথাগুলো কিছুতেই ভুলতে পারছে না। তোরাব আলিরা কিন্তু সে সব ভুলে গেছে। অন্তত তাদের আদর যত্ন এবং খাতিরের ঘটা দেখে তাই মনে হয়। সে যেন এ-বাড়ির অত্যন্ত সম্মানিত অতিথি।

তোরাব আলি বলল, 'খাও মেঞা, শরবত খাও। রান্ধনের (রান্নার) দেরি আছে। দুই-একখান পদ অখনও বাকি।'

বাড়ির অন্য লোকেরাও সায় দিল, 'হ-হ, খাও—'

কাঁপা কাঁপা হাতে শরবতের গেলাস তুলে নিল রাজেক।

শরবতের পর তামাক সাজা হল। তোরাব আলি হুঁকোয় দু-চারটে টান দিয়ে রাজেকের দিকে এগিয়ে দিল।

সঙ্কোচে একেবারে এতটুকু হয়ে গেল রাজেক। দু-হাত এবং মাথা নেড়ে বলতে লাগল, 'না-না, না-না—'

তোরাব আলি হুঁকোটা প্রায় তার হাতে গুঁজেই দিল, 'আরে মেঞা, ধর ধর। মাইয়া মাইনষের লাখান অত শরম ক্যান?'

মুখ নিচু করে আবছা গলায় রাজেক বলল, 'আপনের সুমখে নিশা (নেশা) করুম! না-না—'

'আমার সুমখে বইলা কী? খাও খাও—'

অনেক বলার পর তোরাব আলির দিকে পেছন ফিরে বার কয়েক দ্রুত হুঁকো টানল রাজেক। তারপর কাছে যাকে পেল তার হাতে সেটা ধরিয়ে দিয়ে আবার ঘুরে বসল।

মিঠাই শরবত আর তামাকের পর গল্প শুরু হল। দেশভাগের গল্প, গ্রামে ভাঙন লাগার গল্প। ধান-পাট, এবারের বর্ষা—কিছুই বাদ গেল না। তবে বেশির ভাগ কথাই হল বৈকুণ্ঠ সাহা আর তার বিষয় আশয় নিয়ে।

কথায় কথায় বেলা আরও হেলে গেল। পশ্চিম আকাশের ঢালু পাড় বেয়ে সূর্যটা যখন অনেকখানি নেমে গেছে সেই সময় ভেতর-বাড়ি থেকে খবর এল রান্নাবান্না শেষ।

তোরাব আলি ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'ইস, বেইল (বেলা) যায়। তোমার বড় কষ্ট হইল মেঞা।'

রাজেক বলল, 'না, কষ্ট কীসের।'

'লও লও, খাইতে যাইবা।'

খাবার ব্যবস্থা ভেতর-বাড়িতে। তোরাব আলি আয়োজনও করেছে প্রচুর। পাঁচ-ছ রকমের মাছ, মাংস, পায়েস, পাতক্ষীর, বড় বড় মোহনবাঁশি কলা, পুরু সরওলা হলুদবর্ণ ঘন দুধ।

একা রাজেক না, তার সঙ্গে তোরাব আলি এবং এ বাড়ির বর্ষীয়ান ক'টি মানুষও খেতে বসল। খেতে খেতে আবার বৈকুণ্ঠ সাহাদের কথা উঠল, তাদের ফেরার সম্ভাবনা আছে কিনা তাই নিয়ে আলোচনা হল।

রাজেক অবশ্য বিশেষ কথা বলছিল না। সে এত বিস্মিত এত স্তম্ভিত হয়ে আছে যে তোরাব আলির প্রশ্নের উত্তরে খুব সংক্ষেপে এক-আধটা 'হুঁ' 'হাঁ'র বেশি তার মুখ থেকে বেরুচ্ছিল না।

মাথা নিচু করেই খাচ্ছিল রাজেক। হঠাৎ তোরাব আলির এক বুড়ো চাচার কথায় মুখ তুলে পাশের দিকে তাকাতে গিয়েই ওধারের এক জানালায় তার চোখ আটকে গেল। সেখানে কামরন দাঁড়িয়ে আছে। তোরাব আলির মেয়ে কামরন। কাঁচা হলুদের মতো গায়ের রং, দীঘল টান দেওয়া নাক-চোখ-চিবুক। মুখখানা পানপাতার মতো।

ছোট্ট কপালের ওপর থেকে থাক থাক কোঁচকানো চুল, ফুরফুরে ঠোঁট। পরম্ভাবে (রূপকথায়) সেই যে গুলেবাখালি রাজকন্যার কথা আছে, কামরন যেন তাই।

মেয়েটা খুব সম্ভব একদৃষ্টে পলকহীন তাকিয়ে ছিল। চোখাচোখি হতেই সলজ্জ মধুর হেসে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

কামরনকে অবশ্য এই প্রথম দেখল না রাজেক। কামলা খাটতে এসে কত বার দেখেছে। কী দেমাক ওই মেয়ের! রূপের দেমাক, বড়মানুষীর দেমাক। দুনিয়াখানাকে যেন পায়ের তলায় রেখে দিয়েছে। মানুষকে মানুষ বলেই সে ভাবত না।

সেই কামরন যে এমন হাসতে পারে, তা যেন এক অভাবনীয় ব্যাপার।

খাওয়া-দাওয়ার পর বাইরের ঘরের ফরাসে এসে বসতে না বসতেই সন্ধে নেমে গেল। রাজেক বলল, 'অখন আমি যাই।'

তোরাব আলি আর তাকে আটকাল না, 'আইচ্ছা যাও, আবার আইসো।' ঘাট পর্যন্ত গিয়ে রাজেককে নৌকোয় তুলে দিয়ে এল সে।

যতদূর চোখ যায় এখন গাঢ় অন্ধকার। সমস্ত চরাচর জুড়ে লক্ষ কোটি জোনাকি জলছে। আশ্বিনের এলোমেলো ঝিরঝিরে হাওয়া ছুটছে দিগ্বিদিকে।

ধানখেতের ওপর দিয়ে নৌকো চালিয়ে যেতে যেতে রাজেক সেই পুরনো কথাটাই ভাবছিল। তোরাব আলির এত খাতির, এত সমাদর—এ সবের উদ্দেশ্য কী? এগুলো ফাঁদ নয় তো? ভুলিয়ে-ভালিয়ে বৈকুণ্ঠ সাহার জমিজমা বাড়িঘর সে গ্রাস করতে চায় কী?

সেই যে নেমন্তন্ন খাওয়া শুরু হল, কার্তিকের শেষাশেষি পর্যন্ত একটানা তার জের চলল। দু-চারদিন পর পরই একটা না একটা উপলক্ষে তোরাব আলির বাড়ি যেতে হয়েছে রাজেককে। প্রথম দিনের মতোই প্রতিবার সেখানে আদর-যত্ন-খাতির মিলেছে।

একটা ব্যাপার লক্ষ করেছে রাজেক, ইদানীং কামরন তার সামনে আসে না। খেতে বসে কিংবা গল্প করতে করতে জানালার ফাঁকে চকিতের জন্য এক-আধবার তাকে দেখা যায়। অথচ আট-দশ মাস আগেও বাড়িতে যখন সে কামলা খাটতে আসত, সর্বাঙ্গে রূপ আর গর্বের ঝিলিক দিয়ে গরবিনী মেয়েটা তাদের সামনে দিয়ে ঘুরে বেড়াত। সেই কামরনের এজাতীয় আচরণের কোনও কারণ খুঁজে পায় না রাজেক। ভেবে ভেবে কূলকিনারা চোখে পড়ে না তার।

শেষ পর্যন্ত রহস্যটা পরিষ্কার হল। অঘ্রাণ মাসের গোড়ায় একদিন সকালবেলা তোরাব আলি রাজেকের কাছে এল, 'তোমার লগে কামের কথা আছে মেঞা—'

এতদিন বাড়িতে নিয়ে গিয়ে শুধু নেমন্তন্নই খাইয়েছে তোরাব আলি আর প্রচুর খাতির-যত্ন করেছে। এলোমেলো গল্প ছাড়া বিশেষ কোনও কথা বলেনি। তবে সে যে বলবে, নিদারুণ উদ্দেশ্যপূর্ণ কিছু তার মুখ দিয়ে বেরুবে, তা আন্দাজ করতে পারছিল রাজেক। সেজন্য রাজেকের ঘুম নেই, একটা ধারাল কাঁটা বুকের ভেতর সবসময় যেন আড় হয়ে বিঁধে আছে।

তোরাব আলির কাজের কথাটা কী, কে বলবে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে রাজেক তাকিয়ে থাকল।

তোরাব আলি বলল, 'আমার মাইয়া কামরনরে দেখছ তো?'

লোকটা কী বলতে চায় বুঝতে না পেরে বিমূঢ়ের মতো মাথা নাড়ল রাজেক, 'হ—'

'আমার ইচ্ছা, কামরনের লগে তোমার শাদি দিমু—'

ভীষণভাবে চমকে উঠল রাজেক, 'এ আপনে কী ক'ন বড় মেঞা!'

তোরাব আলি শুধলো, 'ক্যান, কী কই?'

'আপনে কত বড় মানুষ, কত বড় ঘর আপনেগো। আপনের কাছে হেই দিনও কামলা খাইটা গেছি। হেই মাইন্‌ষের মাইয়ারে শাদি! না-না—'

'কামলা খাটার কথা ভুইলা যাও মেঞা। আর বড় মানুষ, বড় ঘরের কথা যখন তুললা তখন কই তুমিও ছোট না। বৈকুণ্ঠ সা'র অত জমিন পাইছ, ঘর-দুয়ার হাল-হালুটি পাইছ। তুমি কম কিসে? জাতে উইঠা গেছ মেঞা—'

দ্বিধান্বিত সুরে রাজেক বলল, 'কিন্তুক—'

'আবার কী?'

'আমার লগে মাইয়ার শাদি দিলে মাইন্‌ষে আপনারে কী কইব?'

'কুনো হালায় কিছু কইব না। সুমখা-সুমখি কওনের মতো বুকের পাটা কারও নাই। হেয়া ছাড়া—'

'কী?'

'আমার দেখতে হইব মাইয়া কোনখানে সুখে থাকব। তুমি ছাড়া আর কোন সুমুন্দির পুতের নব্বই কানি জমিজেরাত আছে, এমুন সোন্দর ঘরদুয়ার আছে? লোক না পোক। মাইন্‌ষের কথায় আমি কান দেই না।'

এ একেবারে আশাতীত, অকল্পনীয়। জামাই করবে বলেই তবে তোরাব আলির এত ছোটাছুটি, এত সমাদর, এত মেজবান খাওয়াবার ঘটা! সুখের নদীতে ভাসতে ভাসতে রাজেক বলল, 'তাইলে আমি আর কী কমু, আপনে যা ভাল বোঝেন—'

একটু ভেবে তোরাব আলি বলল, 'ভাবছি, ধান-টান উইঠা গেলে তোমাগো শাদিটা সারুম—'

রাজেক উত্তর দিল না, মুখ নিচু করে বসে থাকল।

তোরাব আলি আবার বলল, 'তাইলে ওই কথাই রইল। অখন আমি যাই—'

তোরাব আলি চলে যাবার পরও উঠল না রাজেক। বসে বসে ভাবতে লাগল, ভাগ্যি দেশখানা দু-ভাগ হয়েছিল, ভাগ্যি বৈকুণ্ঠ সাহারা গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিল। নইলে এত সুখ কি তার কপালে ছিল!

অঘ্রাণের মাঝামাঝি ধান কাটার মরসুম শুরু হল। মাঠ থেকে ধান তুলে এনে সেই ধান ঝেড়ে শুকিয়ে, ডোলের ভেতর সেঁতে রাখতে রাখতে মাঘ মাস পেরিয়ে গেল।

তারপর আবার এল তোরাব আলি। বলল, 'ফসল-টসল তো উঠল, এইবার মোল্লামুচ্ছুল্লিগো খপর দেই—'

নখ খুঁটতে খুঁটতে রাজেক বলল, 'আপনের যা ইচ্ছা—'

খানিক চিন্তা করে তোরাব আলি বলল, 'আইজ কী বার?'

'বুদ (বুধ)—'

'শনিবার দুফারে নাও পাঠাইয়া দিমু, তুমি আমাগো বাড়িত্ যাইও। মোল্লামুচ্ছুল্লিগো কইয়া রাখুম, তারাও আইব। হেইদিন শাদির কথা, দেনমোহরের কথা পাকা হইব।'

রাজেক বলল, 'নাও পাঠাইতে হইব না, আমি এমনেই যামু গা—'

তোরাব আলি শুনল না। জোরে জোরে প্রবল বেগে মাথা নেড়ে বলল, 'এট্টা ভাল কামে আইবা, নাও না পাঠাইলে হয়! তোমার সোম্মান নাই?'

বুধবার তোরাব আলি চলে যাবার পর দিন যেন আর কাটতেই চায় না। শিরায় শিরায় সীমাহীন উত্তেজনা নিয়ে সর্বক্ষণ অস্থির হয়ে থাকল রাজেক।

তবু একে একে বেস্পতি গেল, শুক্র গেল। শনিবার সকাল থেকে সময় যেন একেবারে থেমেই গেছে। সূর্যটা অন্য দিনের চাইতে অনেক দেরি করেই বুঝি আজ উঠেছে, আর চলছে দেখ না! এক ঘন্টার রাস্তা পাড়ি দিতে আজ দশ ঘন্টা লেগে যাচ্ছে তার।

রাজেক ঘুরছে ফিরছে আর দূর মাঠের দিকে তাকাচ্ছে। সকাল থেকে কত বার যে পুকুরের ওধারের মাঠটার দিয়ে তাকিয়েছে তার হিসাব নেই।

এই ফাল্গুনে মাঠে অবশ্য জল নেই। কিন্তু তার পাশ দিয়ে একটা বড় খাল আছে, খালটা সোজা এসে বৈকুণ্ঠ সাহার পুকুরে থেমেছে। তোরাব আলির নৌকো ওই খাল দিয়েই আসবে।

সময় যত ধীরেই চলুক, এক সময় দুপুর হল। আর তখনই অনেক দূরে নৌকোর গোল ছই চোখে পড়ল রাজেকের। সঙ্গে সঙ্গে দোতারায় এলোপাথাড়ি ছড় টানার মতো বুকের ভেতর ঝড় বইতে লাগল তার। এটা যেন সাধারণ দু-মাল্লাই নৌকো না, পরস্তাবের মনোহারিণী রাজকন্যা তার জন্য একখানা ময়ূরপঙ্খীই পাঠিয়ে দিয়েছে।

দেখতে দেখতে নৌকোটা পুকুরঘাটে এসে ভিড়ল। পলকহীন তাকিয়ে ছিল রাজেক। ভাবছিল ঘাটে যাবে কিনা।

ভাবনাটা সম্পূর্ণ হবার আগেই নৌকো থেকে যে নামল, এই মুহূর্তে—এই মুহূর্তে কেন, দু-তিন মাসের ভেতর তার কথা স্বপ্নেও ভাবেনি রাজেক। সে চমকে উঠল, সামনে বাজ পড়লেও মানুষ এত চমকায় না। হৃৎপিণ্ডের ভেতর দিয়ে ঠাণ্ডা স্রোতের মতো সিরসিরিয়ে কী যেন বয়ে গেল তার।

একা বৈকুণ্ঠ সাহাই না, তার সঙ্গে আর একজনও নেমেছে। পোশাক-আশাক এবং চেহারা-টেহারা দেখে মুসলমান বলেই মনে হয়। বয়েস ষাটের কাছাকাছি।

পুকুরঘাট থেকে সঙ্গীকে নিয়ে সোজা বাড়িতে চলে এলে বৈকুণ্ঠ সাহা। রাজেককে দেখে ভারি খুশি সে। বলল, 'ভালই হইল রাজেক, বাড়িতে পা-ও দিয়াই তরে পাইয়া গেলাম। ভাবছিলাম, পামু না। তা আছস কেমুন? শরীল-গতিক ভাল তো?'

বাজ-পড়া অসাড় মানুষের মতো দাঁড়িয়ে ছিল রাজেক। কোনওরকমে বলতে পারল, 'আপনে সা-মশয়!'

বৈকুণ্ঠ সাহা বলল, 'হ, আমিই। তরে খপর দিয়া আইতে পারি নাই। হঠাৎ সুযুগ হইল, আইসা পড়লাম।'

'অ্যাদ্দিন আছিলেন কই?'

'মেলা জায়গায়। কইলকাতা, বনগাঁ, দত্তপুকৈর—কতখানের নাম কমু? শ্যাষম্যাষ মুশ্‌শিদাবাদে থিতু হইছি।' বলতে বলতে সঙ্গী সম্বন্ধে সচেতন হল বৈকুণ্ঠ সাহা। তার উদ্দেশে বলল, 'বসেন বসেন আমিন সাহেব। দে রে রাজেক, একখান জলচৌকি বাইর কইরা দে। তামুক-টামুক থাকলে সাজ—'

জলচৌকি এলে আমিন সাহের বসল। বৈকুণ্ঠ সাহাও বারান্দার একধারে বসে পড়ে। তারপর গল্প-টল্প শুরু হয়। দেশের হালচাল, গ্রামে কারা কারা আছে, কারা কারা ভিটে মাটি ছেড়ে চলে গেছে—ইত্যাদি ইত্যাদি নানা কথা। বৈকুণ্ঠ সাহাই এক তরফা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে গেল। রাজেক মনে মনে অবসন্ন বোধ করছিল, নির্জীব গলায় উত্তর দিয়ে যেতে লাগল।

টুকরো টুকরো অনেক কথার পর আসল কথা পাড়ল বৈকুণ্ঠ সাহা, 'তারপর ঘর দুয়ার ভাল কইরা গুছাইয়া সাফসুফ রাখছস তো?'

এতকাল পরে হঠাৎ কেন বৈকুণ্ঠ সাহা গ্রামে ফিরে এল, বোঝা যাচ্ছে না। আর এল এমন দিনে যেদিন শাদির কথা পাকা হবে। অন্যমনস্কের মতো রাজেক বলল, 'দ্যাখেন না, কেমুন কইরা রাখছি—'

বৈকুণ্ঠ সাহা তক্ষুনি উঠে পড়ল। আমিন সাহেবকে ডেকে বলল, 'আসেন, আসেন। নায়ে কইরা আসনের সময় আমার জমিন দেখাইছিলাম। অখন আমার বাড়িঘর দ্যাখেন—'

ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমিন সাহেবকে চারিদিক দেখাতে লাগল বৈকুণ্ঠ সাহা। রাজেক কিন্তু তাদের সঙ্গে গেল না, আকণ্ঠ দুর্ভাবনা আর উদ্বেগ নিয়ে বসে থাকল। বুকের ভেতর ঢেঁকির পাড় পড়তে লাগল তার।

বৈকুণ্ঠ সাহা এতদিন পর বউ-ছেলেমেয়ে বা সংসারের অন্য কাউকে নিয়ে আসেনি সত্যি কিন্তু আমিন সাহেবকে সঙ্গে এনেছে। আমিন সাহেব এ দিককার লোক না। হলে রাজেক নিশ্চয়ই চিনতে পারত। এই মুসলমান ভদ্রলোকটির সঙ্গে বৈকুণ্ঠ সাহার সম্পর্ক কী? আসবার সময় তাকে ধানজমি দেখিয়েছে বৈকুণ্ঠ, এখন বাড়িঘর দেখাচ্ছে। সমস্ত ব্যাপারটাই রাজেকের কাছে রহস্যময় লাগছে। কিছুই বুঝতে পারছে না সে।

কিছুক্ষণ পর আমিন সাহেবরা ফিরে এল। দাওয়ায় বসতে বসতে বৈকুণ্ঠ সাহা

শুধলো, 'বাড়িঘর কেমুন দেখলেন?'

আমিন সাহেব বলল, 'ভাল।'

'পছন্দ হইছে তো?'

'হ্যাঁ।'

আমিন সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ কী মনে পড়ে গেল বৈকুণ্ঠ সাহার। তাড়াতাড়ি রাজেকের দিকে ফিরে বলল, 'ভাল কথা, তর লগে তো আমিন সাহেবের আলাপ-সালাপই কইরা দেই নাই। উনি মুশ্‌শিদাবাদের মানুষ, আমার বন্ধু।' আমিন সাহেবকে বলল, 'আর ও হইল রাজেক মেঞা, বড় বিশ্বাসী। আমরা যখন দ্যাশ ছাইড়া যাই অর উপর বাড়িঘর জমিজিরাতের ভার দিয়া গেছিলাম। দ্যাখেন কেমুন সোন্দর পরি (পাহারা) দিয়া রাখছে।'

আমিন সাহেব কিছু বলল না, মাথা নাড়ল শুধু।

আলাপ-পরিচয়ের পর বৈকুণ্ঠ সাহা বলল, 'বুঝলি রাজেক, দ্যাশে আমরা আর ফিরুম না। হেইর লেইগা আমিন সাহেবরে লইয়া আইলাম। ক্যান আনছি বুঝছস?'

রাজেক মাথা নাড়ল, অর্থাৎ বোঝেনি।

চারিদিক ভাল করে দেখে নিয়ে চাপা গলায় এবার বৈকুণ্ঠ সাহা বলল, 'আমার সগল সম্পত্তি আমিন সাহেবরে দানপত্তর কইরা দিমু। আসলে ব্যাপারটা কী জানস?'

'কী?'

'আমিন সাহেব ইণ্ডিয়ায় থাকব না। মুশ্‌শিদাবাদে তেনার ঘরদুয়ার খ্যাতখামার যা আছে, আমারে দানপত্তর কইরা দিব। পাকিস্তানে আমার যা আছে, তেনারে দিমু। ব্যাপারটা অইল 'এচ্চেঞ্জ' (এক্সচেঞ্জ), বাংলায় কয় বিনিময়—'

রাজেক কী উত্তর দিতে যাচ্ছিল, সেইসময় তোরাব আলির দুই মাঝি এসে দাঁড়াল সামনে। বলল, 'লন মেঞাসাব, তরাতরি লন। আমাগো আইতে এট্টু দেরি হইয়া গেল—'

আমিন সাহেবকে সব সম্পত্তি দানপত্তর করে দেবে বৈকুণ্ঠ সাহা। এ কথা শুনবার পরও তোরাব আলির বাড়ি যাবার আর প্রয়োজন আছে কিনা, রাজেক বুঝতে পারছে না। মোট কথা, গুছিয়ে কিছু ভাবতে পারছিল না সে।

এদিকে মাঝি দুটো সমানে তাগাদা দিতে শুরু করেছে। হঠাৎ তোরাব আলির সহৃদয় ব্যবহারের কথা মনে পড়ল রাজেকের, খাতির যত্নের কথা মনে পড়ল। রাজেক ভাবল, শাদির ব্যাপারে এতদূর এগিয়ে এখন আর না-ও পিছোতে পারে তোরাব আলি।

একরকম ঘোরের মধ্যেই উঠে দাঁড়াল রাজেক। বৈকুণ্ঠ সাহাদের বলল, 'আপনেরা বসেন সা-মশয়। আমি এট্টু ঘুইরা আসি—' বলে মাঝি দুটোর সঙ্গে গিয়ে নৌকোয় উঠল।

তোরাব আলির বাড়ি আসতেই দেখা গেল বার-বাড়ির আসর একেবারে জমজমাট। মোল্লামুছুল্লিরা ইতিমধ্যেই এসে গেছে। সর্দারদের বাড়ি থেকে, খানেদের

বাড়ি থেকে, মৃধাদের বাড়ি থেকে—ছিপতিপুর গ্রামের হেন বাড়ি নেই যেখানে থেকে মান্যগণ্য লোকেরা এসে হাজির হয়নি।

রাজেক ঢুকতেই সাড়া পড়ে গেল। পিচকিরি দিয়ে প্রচুর গোলাপ জল ছিটানো হল। পান এল, তামাক এল, মিঠাই এল, ভুরভুরে আতর এল। ফাঁকে ফাঁকে ঠাট্টা-ঠিসারা চলল। রঙের কথায়, রসের কথায় হাসি উথলে উথলে উঠতে লাগল।

কিছুই যেন শুনতে পাচ্ছিল না রাজেক, দেখতে পাচ্ছিল না। নির্জীবের মতো, বিহ্বলের মতো বসে ছিল সে।

তোরাব আলি রাজেককে লক্ষ করছিল। মেজাজখানা আজ তার খুব ভাল। মনে গোলাপি আভা লেগেছে। ভাবী জামাইকে একটু ঠাট্টা করার লোভ কিছুতেই সে সামলাতে পারল না। রাজেকের কাছে ঘন হয়ে বসে বলল, 'আইজের দিনে এমুন মনমরা ক্যান মেঞা? ব্যাপারখান কী?'

ফস করে নিজের অজান্তেই রাজেক বলে ফেলল, 'আইজ বৈকুণ্ঠ সা আইছে।'

তোরাব আলি চকিত হয়ে উঠল, 'বৈকুণ্ঠ সা আইছে!'

'হ। লগে আমিন সাহেব বইলা একজনেরে আনছে। তারে নিকি জমিনজিরাত বাড়িঘর লেইখা দিয়া যাইব।'

মুহূর্তে সমস্ত ঘরখানায় স্তব্ধতা নেমে এল। অনেকক্ষণ পর তোরাব আলি বলল, 'তাইলে শাদির কথার দরকার কী? খোদা যা করে ভালর লেইগাই করে। ভাগ্যে আইজই বৈকুণ্ঠ সা আইছে—' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল এবং বড় বড় পা ফেলে ভিতর-বাড়ির দিকে চলে গেল।

একটু পর একে একে মোল্লা-মুছুল্লিরা, গ্রামের গণ্যমান্য লোকেরা চলে গেল। ফাঁকা ঘরে একা একা অনেকক্ষণ বসে থেকে একসময় বাইরে চলে এল রাজেক।

তারপর দিন যায়, দিন আসে।

আবার পলো নিয়ে, ধর্মজাল নিয়ে, টোন সুতোর বঁড়শি নিয়ে খালে বিলে নদীতে নামল রাজেক. আবার হেমন্তের মাঠে শস্য কুড়োতে শুরু করল। দেখতে দেখতে তার পা ফেটে গেল. আঙুলের ফাঁকে থকথকে হাজা হল, চামড়া থেকে খই উড়তে শুরু করল।

মাছ আর শস্যকণার সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে আজকাল রাজেক নিজেকে শুনিয়ে শুনিয়ে আপন মনে বলে, 'দ্যাশখান দু-ভাগ হয়, সাহারা-ভূঁইমালীরা-যুগীরা গ্রাম ছাইড়া যায়, দ্যাশের এক রাজা যায়, আরেক রাজা আসে, তাতে তর কী রে, তর কী?'

শেষ যাত্রা

পড়ন্ত বেলায় উত্তুরে হাওয়ার মুখে কুটোর মতো লাট খেতে খেতে খবরটা নিয়ে এল লগা, 'সব্বোনাশ হয়ে গেছে গ মাসিরা—'

কলকাতা থেকে অনেক দূরে অখ্যাত এই মফস্বল শহরটার নাম মহারাজপুর। তার এক কোণে ওঁচা মেয়েমানুষদের যে সৃষ্টিছাড়া কলোনিটা ঘাড় গুঁজে পড়ে আছে সেটা চকিত হয়ে উঠল।

কলোনি আর কি, একটা চৌকো উঠোন ঘিরে ফুটিফাটা টিনের চালের কোমর-বাঁকা সারি সারি সাতাশটি ঘর, সেগুলোর সামনে দিয়ে টানা বারান্দা। পৃথিবীর সবচেয়ে জঘন্য ছাব্বিশটা মেয়েমানুষ এখানকার একটি করে ঘরের স্থায়ী বাসিন্দা। সাতাশ নম্বর ঘরটা এই কলোনির স্বত্বাধিকারিণী বা মালকিন কেষ্টভামিনীর।

মেয়েমানুষগুলোর বেশির ভাগেরই ফুল বা পাখির নামে নাম। তারা কেউ চাঁপা, কেউ জবা, কেউ মালতী, কেউ টিয়া, ময়না বা কোকিলা। বয়স কুড়ি থেকে চল্লিশের ভেতর। তাদের জীবনযাপনের স্পষ্ট ছাপ পড়েছে তাদের ক্ষয়াটে চেহারায়। ভাঙা গাল, চোখের তলায় চিরস্থায়ী কালির পোঁচ, কণ্ঠার হাড় গজালের মতো চামড়া ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে।

শীতের বিকেল ফুরিয়ে আসছে দ্রুত। এর মধ্যে মিহি কুয়াশা পড়তে শুরু করেছে। সূর্য ডুবতে আর দেরি নেই। হঠাৎ লজ্জা-পাওয়া মেয়ের মুখের মতো পশ্চিমের আকাশ আরক্ত হয়ে আছে। কিন্তু কতক্ষণ আর, দেখতে দেখতে শীতের সন্ধে নেমে আসবে ঝপ করে। চরাচর ঢেকে যাবে হিমে আর অন্ধকারে।

এই মুহূর্তে উঠোনের মাঝখানে বিকেলের নিভু নিভু রোদের আঁচ গায়ে মেখে মেয়েমানুষগুলো কেউ খোঁপা বেঁধে রুপোর কাঁটা গুঁজে দিচ্ছিল, কেউ ঠোঁটে রং ঘষে মুখে পাউডার আর সস্তা ক্রিম লাগিয়ে ক্ষয়ের চিহ্নগুলো ঢাকছিল। চেহারায় চটক না ফোটালে রাতের নাগরেরা তাদের দিকে ফিরেও তাকাবে না।

সন্ধে নামলেই লুচ্চা-মাতালেরা ঝাঁকে ঝাঁকে এখানে হানা দেবে। রাত যত বাড়বে, জমে উঠবে নরকের এই খাসতালুক। তারই প্রস্তুতি চলছে সারা বিকেল ধরে।

মেয়েমানুষগুলো যেখানে বসে আছে সেখান থেকে খানিকটা দূরে নিজের ঘরের সামনের দাওয়ায় বসে একা সাপলুডো খেলছিল কেষ্টভামিনী। বেঢপ মাংসল চেহারা তার, একেবারে ঘাড়ে-গর্দানে ঠাসা। গায়ের কালো রংটি যেন পালিশ করা, এমনই তার জেল্লা। চাকার মতো গোল মুখ, বড় বড় লালচে চোখ, থুতনির তলায় চর্বির তিনটি পুরু থাক। নাকে সোনার ফাঁদি নথ, কানে মাকড়ি, গলায় তেঁতুল-পাতা হার। কেষ্টভামিনীর দাপটে গোটা মেয়েপাড়াটা সর্বক্ষণ তটস্থ হয়ে থাকে।

লগা ঘুণে-খাওয়া সদর দরজাটা পেরিয়ে উঠোনের মাঝ বরাবর চলে এসেছিল। ফের সে পাগলের মতো হাউমাউ করে ওঠে, 'এ কী হল গ!'

লগার গলার স্বরে এমন তীব্র আকুলতা ছিল যে সাতাশ জোড়া চোখ তার দিকে চকিতে ঘুরে তাকায়।

লগার বয়স উনিশ কুড়ি। রোগা ডিগডিগে পোকায়-কাটা চেহারা, গালে খাপচা খাপচা নরম দাড়ি, জট-পাকানো রুক্ষ চুল ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছে। সেগুলোর সঙ্গে সাত জন্ম চিরুনি বা তেলের সম্পর্ক নেই। তার পরনে তালি-মারা ফুলপ্যান্ট আর হাত-কাটা ফতুয়া ধরনের জামা।

এখন যারা এ পাড়ার বাসিন্দা তাদের আগের জেনারেশানের একটি মেয়েমানুষ একদা লগাকে জন্ম দিয়েছিল। সেই গর্ভধারিণী কবেই মরে ফৌত হয়ে গেছে কিন্তু লগা এখানেই পড়ে আছে। তার মতো বেজন্মা, বিষ্ঠার পোকাদের এই নরক ছাড়া যাবার জায়গাই বা কোথায়? চাঁপা, জবা, ময়না, টিয়া, এখানকার সবাই তার মাসি। দিনরাত সে তাদের ফাই-ফরমাশ খাটে, তার বদলে একেক দিন একেক জনের কাছে খেতে পায়। বারান্দা থেকে কেষ্টভামিনী বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, 'হেই রে মড়াখেগো, অমন চেল্লাচ্ছিস কেন? কী হয়েছে পষ্ট করে বল।'

লগা বলে, 'বাবামাশায় বুঝিন আর বাঁচবে নি গ মাসিরা, তেনার মুখ দে গ্যাঁজলা বারুচ্চে, চোখ উলটে গেচে।'

মুহূর্তে গোটা মেয়েপাড়াটা একেবারে ঝিম মেরে যায়। এমন যে জবরদস্ত কেষ্টভামিনী, যার গলার আওয়াজে এ পাড়ার ত্রিসীমানায় কাক চিল ঘেঁষে না, সে পর্যন্ত স্তব্ধ হয়ে গেছে।

লগা আরও ক'পা এগিয়ে কেষ্টভামিনীর কাছাকাছি চলে আসে। ব্যাকুলভাবে বলে, 'বসে থেকো নি গ কেষ্টমাসি, শীগ্‌গিরি চল। দ্যাকো যদিন বাবামাশায়রে বাঁচাতি পার।'

এতক্ষণে গলায় স্বর ফোটে কেষ্টভামিনীর। সে শুধোয়, 'বাবামাশায়ের অমন অবস্তা, তুই জানলি কী করে?'

'বা রে, বিকেল বেলা আমি ওনার ডাক্তেরখানা সাফ করতে যাই না?'

কেষ্টভামিনীর এবার খেয়াল হয়, এ পাড়ার মেয়েমানুষদের হাজার রকম হুকুম তামিল করার পর সকাল বিকেল, দু'বেলা বাবামাশায়ের ডাক্তারখানায় গিয়ে ঝেড়েমুছে সব ফিটফাট করে দেয় লগা, তার জন্য রাস্তার টিউবওয়েল থেকে কুঁজোয় ভরে জল নিয়ে আসে, কোনও কোনও দিন কেরোসিন কুকারে চাট্টি ভাতও ফুটিয়ে দেয়। আজ এবেলা গিয়ে বাবামাশায়কে ওভাবে পড়ে থাকতে দেখে দৌড়ে চলে এসেছে।

কেষ্টভামিনী আর বসে থাকে না, ধড়মড় করে উঠে পড়ে। নিজের ঘরে ঢুকে টিনের তোরঙ্গ থেকে কিছু টাকা বার করে আঁচলে বেঁধে বাইরে এসে দরজায় তালা লাগিয়ে বলে, 'চল।'

অন্য মেয়েমানুষগুলো ততক্ষণে উঠোনের মাঝখানে উঠে দাঁড়িয়েছে। রুদ্ধশ্বাসে তারা কেষ্টভামিনীকে বলে, 'আমরাও যাব কেষ্টমাসি।'

আর কিছুক্ষণের মধ্যে এ পাড়ায় খদ্দেরদের আনাগোনা শুরু হয়ে যাবে। সারারাত শরীর বেচে মেয়েমানুষগুলো যা পায়, এলাকার মালকিন হিসেবে তার চার ভাগের এক ভাগ কেষ্টভামিনীর প্রাপ্য। এখন যদি ওরা তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে, আজকের ব্যবসাটি একেবারে মাটি। ছাব্বিশটি মেয়েমানুষের রাতভর রোজগারের সিকিভাগ তো কম কথা নয়। মনে হচ্ছে আজ আর সে আশা নেই। অনেকগুলো টাকা পুরো বরবাদ।

অন্যদিন এ সময় কেউ বেরুবার কথা মুখে আনলে মাথায় আগুন ধরে যেত কেষ্টভামিনীর। চেঁচিয়ে, গালাগাল দিয়ে তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে দিত সে। কিন্তু বাবামাশায়ের কথা আলাদা। তার জন্য একদিন কেন, দশদিন ব্যবসা বন্ধ রাখা যায়। ওই লোকটার কাছে এ পাড়ার বাসিন্দাদের ঋণের শেষ নেই। তার সম্বন্ধে এমন একটা খারাপ খবর শোনার পর কেউ কি হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারে?

কেষ্টভামিনী বলে, 'আচ্ছা, চল—'

মেয়েমানুষগুলো যে জামাকাপড়ে ছিল তাই পরেই, নিজের নিজের ঘরে তালা লাগিয়ে কেষ্টভামিনী আর লগার সঙ্গে বেরুতে যাবে, এমন সময় বাধা পড়ে। উটকো দু-একটা খদ্দের এর মধ্যেই দিশি মদ গিয়ে টং হয়ে হানা দেয়। মানুষের আদিম প্রবৃত্তির তো বিনাশ নেই। এই জন্তুগুলো দিনরাতের বাছবিচার করে না।

একটা মাঝবয়সী লোক, তার নাম মহীন, ভারী থলথলে চেহারা, মাথার মাঝখান দিয়ে সিঁথি, চোখের তলায় কালি, দৃষ্টি ঢুলুঢুলু এবং আরক্ত, এ অঞ্চলে একটি ছোট যাত্রাদলের মালিক, জড়ানো গলায় বলে, 'ই কী, মিছিল করে সব চললে কুথায়!'

কেষ্টভামিনী বলে, 'আজ আমাদের ক্ষেমা করেন মহীনবাবু, কাল আসবেন।'

মহীন চিড়বিড়িয়ে ওঠে, 'শরীল তেতে উঠল আজ, আর চান করব কিনা কাল! মাইর আর কি!'

তার সঙ্গী আরেকটা ক্ষয়াটে চেহারার লোক নেশার ঘোরে সমানে টলছিল। ডাইনে বাঁয়ে এলোমেলো পা ফেলে কোনও রকমে নিজেকে খাড়া রেখেছে সে। কেষ্টভামিনীর থুতনির কাছে হাত ঘুরিয়ে বলে, 'সোনামণি, যে দোকান খুলেচ তার ঝাঁপ বন্ধ করা যায় না। কত ট্যাকা চাও, অ্যাঁ? এই লাও।' বলে পকেট থেকে একগোছা নোট বার করে হাওয়ায় নাচাতে থাকে।

কেষ্টভামিনীর মুখ শক্ত হয়ে উঠছিল, কিন্তু শত হলেও খদ্দের লক্ষ্মী, তাদের চটানো ঠিক নয়। যতটা সম্ভব শান্ত মুখে বলে, 'দয়া করে আজ আপনারা যান।'

মহীন ওধার থেকে চেঁচিয়ে ওঠে, 'যাব মানে! মোজ করার জন্যি এলাম, মেজাজটা চটকে দিওনি।'

এদিকে একটা নিরেট চেহারার লোক টগর নামে মেয়েটির হাত ধরে টানাটানি শুরু করে দেয়, 'চল শালী, ঘরে চল।'

এবার, আর নিজেকে সামলে রাখতে পারে না কেষ্টভামিনী। তার ভেতর থেকে মেয়েপাড়ার জাঁদরেল স্বত্বাধিকারিণীটি বেরিয়ে আসে। আগুনখাকীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরেট লোকটার হাত থেকে টগরকে ছিনিয়ে নিতে নিতে গলার শির ছিঁড়ে

চিৎকার করতে থাকে, 'অ্যাই পুষ্প, অ্যাই টিয়া, তোরা হাঁ করে দেকছিস কী! লুচ্চো জানোয়ারগুলোনরে গলাধাক্কা দে বার করে দে।'

কেষ্টভামিনীর হুকুমটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েমানুষগুলো মহীনদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুরু হয়ে যায় প্রচণ্ড ধস্তাধস্তি। সেই সঙ্গে দুই পক্ষে চলতে থাকে পৃথিবীর সবচেয়ে কুৎসিত কিছু গালাগালির আদানপ্রদান।

একদিকে চারটে নেশাখোর মাতাল, আরেক দিকে সাতাশটা মেয়েমানুষ। হোক মেয়ে, এত জনের সঙ্গে চারজন পারবে কেন? টেনে হিঁচড়ে টগরেরা তাদের বাইরে বার করে দিয়ে নিজেরাও বেরিয়ে পড়ে।

মেয়েমানুষদের এই পাড়াটা মহারাজপুরের শেষ মাথায়। এর বাঁ পাশ দিয়ে একটা মজা নদী বয়ে গেছে। নদীটার পারে শ্মশানঘাটা, পুরনো শিবমন্দির।

পাড়াটার ডান পাশ দিয়ে একটা খোয়া-ওঠা আঁকাবাঁকা রাস্তা শহরের দিকে চলে গেছে। রাস্তাটার দু'ধারে ধানকল, সুরকি কল, লেদ মেশিনের ছোটখাটো ক'টা কারখানা। আর আছে ধানচালের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অনেকগুলো আড়ত। সেসব পেরিয়ে গেলে একটা হেলে-পড়া পুরনো ঘরে 'ভুবন ফার্মেসি'। ঘরটার মাথায় টুটোফুটো টিনের চাল। দেওয়াল আর মেঝে অবশ্য পাকা, কিন্তু চুনবালি আর সিমেন্ট খসে খসে দগদগে ঘায়ের মতো দেখায়। রাস্তার দিকের দরজার মাথায় মান্ধাতার আমলের যে সাইনবোর্ডটা তেরছা অবস্থায় ঝুলে আছে, বছরের পর বছর জলে ধুয়ে এবং রোদে পুড়ে তার বেশির ভাগটাই অস্পষ্ট হয়ে গেছে; দু-চারটে অক্ষর ছাড়া আর কিছুই পড়া যায় না।

'ভুবন ফার্মেসি' যার নামে সেই ভুবন চক্রবর্তী হল কেষ্টভামিনীদের বাবামাশায়। এই ফার্মেসি বা ডাক্তারখানাটার পর খানিকটা জায়গা জুড়ে আগাছায় ভরা একটা উঁচুনিচু মাঠ। মাঠের ওপার থেকে শুরু হয়েছে মূল শহর। আসলে মহারাজপুরের সুখী সংসারী মানুষেরা মেয়েপাড়া আর 'ভুবন ফার্মেসি'র ছোঁয়াচ থেকে নিজেদের অনেক দূরে সরিয়ে রেখেছে। যারা কোনও বিশেষ কারণে ধানকল, সুরকি কল বা শ্মশানঘাটার দিকে চলে আসে, দ্রুত কাজ টাজ শেষ করে ফিরে যায়। এখানকার বিষাক্ত আবহাওয়ার ভাইরাস যাতে কামড় দিতে না পারে সেজন্য তাদের সতর্কতার শেষ নেই।

মেয়েপাড়া সম্পর্কে মহারাজপুরবাসীদের মনোভাব না হয় বোঝা যায় কিন্তু 'ভুবন ফার্মেসি'র ব্যাপারে কেন তাদের এত ঘৃণা, নোংরা জীবাণুর মতো কেন তারা ওটাকে এড়াতে চায়, সে কথা পরে।

কেষ্টভামিনীরা যখন 'ভুবন ফার্মেসি'তে এসে পৌঁছুল, সন্ধে নামতে শুরু করেছে। ক'টি লোক ফার্মেসির সামনে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে নিচু গলায় কথা বলছিল, খুব সম্ভব ভুবন চক্কোত্তি সম্পর্কেই। ওদের চোখে মুখে উদ্বেগের ছাপ।

কেষ্টভামিনী লোকগুলোকে মোটামুটি চেনে, এই অঞ্চলেরই ধানকল বা সুরকি

কল-টলের মজুর। ওরা নিশ্চয়ই বাবামাশায়ের খবরটা পেয়ে ছুটে এসেছে।

এক পলক লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে ডাক্তারখানায় ঢুকে পড়ে কেষ্টভামিনী এবং তার পেছন পেছন অন্য মেয়েরা।

ঘরটা বিরাট। মাঝখানে পর পর চারটে ওযুধ বোঝাই পুরনো আলমারি, সেগুলোর বেশির ভাগেরই পাল্লার কাচ নেই। সামনে টেবিল চেয়ার। টেবিলটার অবস্থা কহতব্য নয়, তার একটা পা আবার ভাঙা, কোনও রকমে জোড়াতোড়া দিয়ে সেটা খাড়া রাখা হয়েছে।

একটা ময়লা চিটচিটে চাদর দিয়ে টেবিলটা ঢাকা, তার ওপর ডাঁই-করা কাগজপত্র, স্টেথোস্কোপ, দোয়াত, কালি, ব্লাড প্রেসার মাপার মেশিন ইত্যাদি। এখানে বসেই রোগী দেখে থাকে ভুবন চক্কোত্তি। টেবিলের সামনের দিকে দুটো কাঠের বেঞ্চ। সেগুলো রোগীদের বসার জন্য।

ওযুধের আলমারির পেছন দিকে রান্নাবান্নার ব্যবস্থা। বাঁ দিকে একটা বড় তক্তাপোষে সর্বক্ষণ তেলচিটে অনন্ত শয্যা পাতা থাকে। ভুবন চক্কোত্তি ওখানে শোয়। মোট কথা, এই ঘরখানা একসঙ্গে ভুবন চক্কোত্তির রান্নাঘর, শোওয়ার ঘর এবং ডাক্তারখানা।

ঘরের মাঝখানে একটা বেশি পাওয়ারের বাল্ব জ্বলছিল। তার আলোয় দেখা গেল বাঁ ধারের তক্তাপোষটায় কাত হয়ে পড়ে আছে ভুবন চক্কোত্তি। তার বয়স সত্তরের কাছাকাছি। ভারী চেহারা, গোল মাংসল মুখ। মাথার একটি চুলও কালো নেই। গালে সাত আট দিনের দাড়ি। পরনে খাটো ধুতি আর ফতুয়া।

লগা যা খবর দিয়েছিল তার একটি বর্ণও মিথ্যে নয়। কেষ্টভামিনীরা তক্তাপোষের কাছে এগিয়ে এসে দেখল, ভুবনের চোখ আধবোজা, মুখ বাঁ দিকে খানিকটা বেঁকে গেছে আর গাল বেয়ে গাঁজলা বেরুচ্ছে।

দু'দিন আগেও মেয়েপাড়ায় গিয়েছিল ভুবন চক্কোত্তি। তখনও তাকে যুবকদের মতো তাজা, টগবগে দেখাচ্ছিল। মেয়েদের সঙ্গে কত রগড় টগড় করল। কে ভাবতে পেরেছিল দু'দিনের মধ্যে তার এমন হাল হবে!

কেষ্টভামিনী অনেকখানি ঝুঁকে আস্তে আস্তে ডাকে 'বাবামাশায়—বাবামাশায়—'

ভুবনের দিক থেকে সাড়া নেই।

কেষ্টভামিনী আরও বারকয়েক ডাকাডাকি করল। কিন্তু একই ভাবে নিশ্চল পড়ে থাকে ভুবন। এই পৃথিবীর কোনও শব্দ তার কানে পৌঁছেছে কিনা বোঝা যায় না।

কেষ্টভামিনী এবার কাঁপা গলায় তার সঙ্গিনীদের শুধোয়, 'কী করি বল দিকিন?'

মেয়েমানুষগুলো শ্বাসরুদ্ধের মতো গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের মধ্যে থেকে জবা নামের মেয়েটি বলে ওঠে, 'দ্যাকো তো বাবামাশায়ের নাড়ি চলচে কিনা।'

ব্রাহ্মণ হলেও ভুবন চক্কোত্তিকে ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপারে তাদের ভয় বা সঙ্কোচ নেই। ভুবন নিজেই সেসব অনেক আগে ভাঙিয়ে দিয়েছে। কত বার মেয়েপাড়ার বাসিন্দারা তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছে তার কি হিসেব আছে? তা ছাড়া রোগবালাই

হলে মেয়েদের গায়ে হাত দিয়ে তাকেও তো পরীক্ষা করতে হয়।

কেষ্টভামিনী ভুবনের হাতটা তুলে আঙুল দিয়ে নাড়ি টিপে ধরে। একবার মনে হয় তিরতির করে চলছে। পরক্ষণে মনে হয়, না, ওটা একেবারেই থেমে গেছে।

খুব সন্তর্পণে ভুবনের হাতটা বিছানায় নামিয়ে রেখে তার কপালে নিজের ডান হাতটা রাখে কেষ্টভামিনী। ভুবনের গা বরফের মতো ঠাণ্ডা। এবার আরও ঝুঁকে তার ফতুয়ার বোতাম খুলে বুকের ওপর কান ঠেকিয়ে রাখে কিছুক্ষণ। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলে, 'মনে লাগচে আশা আচে। বুকটা ধুকুর ধুকুর করচে।'

টগর বলে, 'বাবামাশায়রে বাঁচানোর জন্যি কিচু তো করা দরকার।'

প্রথম দিকটায় একটু দিশেহারা হয়ে পড়লেও নিজেকে সামলে নিয়েছে কেষ্টভামিনী। তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে মেয়েপাড়ার ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মালকিনটি, কোনও কারণেই যে সহজে বিচলিত হয় না, ভেঙে পড়ে না। বলে, 'আমি এক্ষুণি ডাক্তের ডেকে আনচি।' বলে অন্য মেয়েদের 'ভুবন ফার্মেসি'তে রেখে শুধুমাত্র জবাকে সঙ্গে করে বেরিয়ে যায়।

ভুবনের ডাক্তারখানার পর আগাছা-ভর্তি ডাঙাটা পার হতেই একটা ফাঁকা সাইকেল-রিকশা পাওয়া গেল। জবাকে নিয়ে সেটায় উঠে কেষ্টভামিনী বলে, 'বাজার পাড়ায় চল।' মহারাজপুরের এক কোণে ঘাড় গুঁজে পড়ে থাকলেও এ শহরের নাড়িনক্ষত্রের খবর তার জানা। বাজার পাড়াতেই রয়েছে এখানকার সবগুলো ডাক্তারখানা।

'ভুবন ফার্মেসি'র পর আগাছায় ভর্তি এবড়ো খেবড়ো ডাঙাটা পেরুলে ছাড়া ছাড়া কিছু বাড়িঘর। সেখান থেকে আরও খানিকটা গেলে শহরের জমজমাট চেহারাটা চোখে পড়ে। মেয়েপাড়ার বিষাক্ত আবহাওয়া থেকে বহুদূরে সুখী, ভদ্র, সংসারী মানুষদের নিজস্ব এই পৃথিবী, যেখানে কেষ্টভামিনীরা দূষিত জীবাণুর মতো অবাঞ্ছিত।

চলতে চলতে পঁচিশ তিরিশ বছর আগের কথা মনে পড়ছিল কেষ্টভামিনীর। সেই সময়টায় বর্ধমানের গাঁ থেকে তাকে ফুসলে বার করে নিয়ে এসেছিল তারই দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়। শহরে নিয়ে তাকে রানী করে রাখবে, পটের বিবির মতো সেজে গুজে পায়ের ওপর পা তুলে দিন কাটাবে সে, ইত্যাকার নানা রঙিন স্বপ্নে তাকে একেবারে জাদু করে ফেলেছিল সেই ফন্দিবাজ লুচ্চাটা। তার আগে হাজার হাজার যুবতী ঘোরের মধ্যে উদ্‌ভ্রান্তের মতো যা করে বসে তা-ই করেছিল কেষ্টভামিনী। এমন এক ফাঁদে সে পা দিয়েছিল যেখান থেকে বেরিয়ে আর কোনও দিন বাড়ি ফেরা যায় না।

দিন কয়েক ফুর্তি টুর্তি লোটার পর মহারাজপুরের মেয়েপাড়ায় তাকে পৌঁছে দিয়ে সেই আত্মীয়টি উধাও হয়ে যায়। প্রথম প্রথম যা হয়, খুবই কান্নাকাটি করেছিল কেষ্টভামিনী, তিনদিন এক ফোঁটা জল পর্যন্ত খায়নি। কতবার আত্মহত্যার চিন্তাটা তার মাথায় এসেছে তার লেখাজোখা নেই। কিন্তু জীবন এক বিষম ব্যাপার। ধীরে ধীরে

কবে যে মেয়েপাড়ার আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল, এতকাল পর আর মনে পড়ে না।

সেই পঁচিশ বা তিরিশ বছর আগে এখনকার মতো বেঢপ আর থলথলে ছিল না কেষ্টভামিনী। কালো হলেও চেহারাটা ছিল ছুরির ফলার মতো। এমন একটা চটক ছিল যে তার দিক থেকে চোখ ফেরানো যেত না। তার মেয়েপাড়ায় আসার খবরটা চারপাশে আগুনের হলকার মতো ছড়িয়ে পড়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে মহারাজপুরের যত জঘন্য লুচ্চার পাল এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তার ওপর। তার ফল হল এই, বছরখানেকের ভেতর চাকা চাকা ঘায়ে ভরে গেল সারা শরীর।

সেই সময় মেয়েপাড়ার মালকিন ছিল প্রমদা। ভয়ঙ্কর জাঁদরেল মেয়েমানুষ। চিলের মতো ধারাল গলায় চেঁচিয়ে সে বলেছে, 'পারার ঘা লিয়ে আমার একেনে থাকা চলবে নি। খদ্দেররা জানতে পারলে এধার মাড়াবে নি। ব্যবসাটি পুরো লষ্ট। তাড়াতাড়ি যদিন সারাতে পারিস, থাকতে পাবি, লইলে দূর করে দুবো।'

কেষ্টভামিনীর তো বাড়ি ফেরার উপায় নেই। এই নরকেই তাকে ঘাড় গুঁজে পড়ে থাকতে হবে। কাজেই রোগ না সারালেই নয়। কিন্তু কোথায় ডাক্তার কোথায় বদ্যি, কিছুই জানত না সে। যে মেয়েরা তখন এখানকার বাসিন্দা ছিল তাদের হাতেপায়ে ধরে বলেছে, যদি একজন ডাক্তারের কাছে তাকে নিয়ে যায়। কিন্তু তার ওপর সবার ছিল ভীষণ হিংসে, পারলে ওরা তাকে ছিঁড়ে খেত। কেননা সে আসার পর খদ্দেররা কেউ আর ওদের দিকে তাকাত না। মুখ ঝামটা দিয়ে ওরা সাফ বলে দিয়েছিল, 'আমাদের কাচে মরতে এসিচিস কেন লা মাগী! যে লাগরেরা তোরে পারার ঘা দে পালিয়েচে তারা কুথায়? যা যা, তাদের কাচে যা।'

কেষ্টভামিনী বুঝতে পেরেছিল, ওদের কারও কাছেই সাহায্যের আশা-ভরসা নেই। মরিয়া হয়ে শেষ পর্যন্ত সে একা একাই সকালে বেরিয়ে পড়েছিল। ধানকল, সুরকি কল, তেলকল, বড় বড় গুদাম আর মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটা পেছনে ফেলে আসল শহরে চলে গিয়েছিল সে।

এখনকার প্রায় কিছুই তখন চিনত না কেষ্টভামিনী। একে ওকে জিজ্ঞেস করে করে শেষ পর্যন্ত বাজার পাড়ায় এসে হাজির হয়।

সেই সময় মহারাজপুরের সবচেয়ে নাম করা ডাক্তার ছিল ত্রৈলোক্য হালদার। দুর্দান্ত পসার তার। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। চৌকো মুখ, শুঁয়োপোকার মতো ভুরু দুটো সবসময় কুঁচকেই আছে। অত্যন্ত খেঁকুরে, রগচটা ধরনের লোক। তার ডাক্তারখানায় গিয়ে দাঁড়াতেই রুক্ষ গলায় জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী চাই?'

কেষ্টভামিনী হালদারের মুখচোখের চেহারা দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। বলেছে, ডাক্তারবাবু, আমার বড় ব্যারাম।'

ত্রৈলোক্য তাকিয়েই ছিল। মেয়েপাড়ার বাসিন্দাদের চেহারায় মার্কামারা একটা ছাপ থাকে। কেষ্টভামিনীকে দেখামাত্রই বুঝে নিয়েছে, সে কোত্থেকে এসেছে। তীব্র ঘৃণায় তার ভুরু আরও কুঁচকে গিয়েছিল। গলার স্বর অনেকটা উঁচুতে তুলে ত্রৈলোক্য চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'সক্কালবেলায় নরক দর্শন! যা যা, বেরো এখান থেকে।'

তবু দাঁড়িয়ে ছিল কেষ্টভামিনী। হাতজোড় করে কাতর গলায় বলেছে, 'ডাক্তারবাবু, তাড়ায়ে দেবেন না। রোগ না সারলে আমি মরে যাব।'

'যত সব নর্দমার পোকা! তোরা বেঁচে থাকলে দুনিয়ার কোন উপকারটা হবে শুনি?' ডাক্তারখানার কমপাউণ্ডারকে ডেকে ত্রৈলোক্য বলেছিল, 'মাগীটাকে লাথি মের বার করে ওই জায়গায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে দাও।'

লাথি আর মারতে হয়নি, নিজেই বেরিয়ে এসেছিল কেষ্টভামিনী।

মহারাজপুরে তখন আরও চার পাঁচজন পাস-করা ডাক্তার ছিল। হালদারের অমন চমৎকার অভ্যর্থনার পরও তাদের সবার কাছে গেছে কেষ্টভামিনী কিন্তু সকলেই তাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে। বেশ্যার চিকিৎসা তারা করবে না।

ফলে ভীষণ হতাশ হয়ে পড়েছিল কেষ্টভামিনী। সেই সঙ্গে আতঙ্কিতও। যে রোগটি তার হয়েছে সেটা কতখানি মারাত্মক তা সে জানে। তবে কি বিনা চিকিৎসায় পচে গলে, যন্ত্রণায় ধুঁকে ধুঁকে তাকে মরতে হবে? মাসি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, ব্যারাম না সারালে পাড়ায় থাকতে দেবে না। যা ছোঁয়াচে রোগ, অন্যদের ধরলে আর দেখতে হবে না, মেয়েপাড়া উজাড় হয়ে যাবে। তাকে থাকতে দিয়ে মাসি ওইরকম কোনও ঝুঁকি নিতে পারে না। কিন্তু মেয়েপাড়া ছাড়তে হলে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সে?

উদ্‌ভ্রান্তের মতো মহারাজপুরের খোয়া-ওঠা রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ কেষ্টভামিনীর নজরে পড়ল, প্রকাণ্ড এক পুরনো দোতলা বাড়ির সামনের দিকের একটা ঘরের দরজার মাথায় টিনের সাইনবোর্ডে বাংলায় লেখা আছে, 'ভুবন ফার্মেসি'। তার নিচে ডাক্তার ভুবন চক্রবর্তী। বাংলাটা মোটামুটি পড়তে আর লিখতে পারত সে, তাই জানতে পেরেছিল ওটা ডাক্তারখানা।

থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল কেষ্টভামিনী। আগের ডাক্তারখানাগুলোতে তার যা অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে ভেতরে ঢুকবে কি ঢুকবে না, ঠিক করতে পারছিল না। শেষ পর্যন্ত মনস্থির করে ফেলে সে। বড় জোর অন্য জায়গার মতো এখান থেকেও তাকে বার করে দেবে, তার বেশি তো কিছু নয়।

কেষ্টভামিনী যখন এসব ভাবছে, সেইসময় ভেতর থেকে একটা ভারী গলা ভেসে এসেছিল, 'কে, কে ওখানে?'

ভারী হলেও কণ্ঠস্বরটি ভয়-ধরানো নয়। পায়ে পায়ে দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে কেষ্টভামিনী বলেছে, 'আমি, আমি—'

ভেতরে ক'টা ওষুধের আলমারি, টেবিল চেয়ার। এক কোণে আধময়লা একটা পর্দা টাঙিয়ে তার ওপাশে রোগী দেখার ব্যবস্থা।

টেবিলের ওধারে যে ডাক্তারবাবুটি বসে ছিল তার বয়স চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ। নাকের তলায় ঝুপো গোঁফ। পরনে গলাবন্ধ কোট আর ধুতি। ডাক্তারের ডান পাশে একটা লোক, খুব সম্ভব তার কমপাউণ্ডার। সেই সকালবেলায় রোগী টোগী ছিল না, ডাক্তারখানা একেবারে ফাঁকা।

ভুবন চক্রবর্তী পুরোপুরি পাস-করা ডাক্তার নয়। বাঁকুড়া না কোথায় যেন

মেডিক্যাল স্কুলে বছর দুই যাতায়াত করেছিল। সেই পঁচিশ তিরিশ বছর আগে এই বিদ্যেতেই কাজ চলে যেত। পাস-করাদের মতো পসার না হলেও রোগীটোগী কম হ'ত না তার ডাক্তারখানায়।

ভুবন বলেছিল, 'ভেতরে এস।'

ডাক্তারখানায় ঢুকে টেবিলের এপারেই মেঝেতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করেছে কেষ্টভামিনী। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে কাঁপা গলায় বলেছে, 'আমারে বাঁচান বাবামাশায়।' কেন যে তার মুখ দিয়ে বাবামাশায় শব্দটা বেরিয়ে এসেছিল, নিজেই জানে না। শুধু মনে হয়েছিল এই মানুষটির করুণা পাওয়া যেতে পারে।

ভুবন বলেছিল, 'আগে বোস। তারপর বল কী হয়েছে তোমার।'

মেয়েপাড়ার বাইরের কেউ তাকে বসতে বলবে, কেষ্টভামিনীর কাছে এটা একেবারে আশাতীত। সেই সকাল থেকে যে লাঞ্ছনা আর ঘৃণা জুটেছে, তারপর ভুবন চক্রবর্তীর এই সদয় ব্যবহারে তার চোখে জল এসে গিয়েছিল। একটা চেয়ারে খুব জড়সড় হয়ে বসে মুখ নামিয়ে রেখে সে বলেছে, 'আমি কুথায়, কুন লরকে থাকি, লিচ্চয় বুঝতে পারচেন।'

বিব্রতভাবে ভুবন বলেছে, 'ঠিক আছে, ব্যারামের কথাটা বল।'

কোন বিষম রোগ তাকে ধরেছে, এরপর তার বিবরণ দিয়ে ব্যাকুলভাবে কেষ্টভামিনী বলেছে, 'আপনি ছাড়া আমাকে বাঁচাবার আর কেউ লেই বাবামাশায়।'

একটু চুপ করে থেকেছে ভুবন। বাজারের একটি মেয়ের চিকিৎসা করবে কি করবে না, সেটাই যেন ভেবে উঠতে পারছিল না।

উৎকণ্ঠায় শ্বাসপ্রশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছিল কেষ্টভামিনীর। সে বলেছে, 'বাবামাশায়, আপনার দয়া কি পাব না? রাস্তায় পড়ে পড়ে মরে যাব?'

কেষ্টভামিনীর শেষ কথাগুলো ভুবনকে যেন প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে গেছে। স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছে গিয়েছিল সে, বলেছিল, 'চিন্তা করিস না, আমি তোকে সারিয়ে তুলব।' তুমি থেকে এক লহমায় তুইতে নেমে গিয়েছিল সে।

সেদিন থেকেই চিকিৎসা শুরু হয়েছিল। কেষ্টভামিনীর গা ভর্তি ঘা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে ওষুধ দিয়েছিল ভুবন। ওষুধে কতটা কাজ হচ্ছে তা দেখার জন্য রোজ সকালে একবার করে ডাক্তারখানায় আসতেও বলেছিল। কৃতজ্ঞতায় দু'চোখে জল এসে গেছে কেষ্টভামিনীর। ধিক্কার, ঘৃণা আর লাঞ্ছনা ছাড়া তারা তো এই নিষ্ঠুর পৃথিবীর কাছ থেকে কিছুই পায় না। ভুবনের সহানুভূতি তাকে একেবারে অভিভূত করে ফেলে।

মাসখানেকের ভেতর রোগ সেরে গিয়েছিল কেষ্টভামিনীর। কিন্তু বাবামাশায়ের সঙ্গে তার সম্পর্কটা থেকেই যায়। সারা রাত জন্তুর দল তার শরীরটাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে কামড়ে আঁচড়ে শেষ করে দেবার পর সকালে চান করে সে চলে আসত 'ভুবন ফার্মেসি'তে। ভেতরে ঢুকত না, বাইরে দাঁড়িয়ে দরজার চৌকাঠের ওপর মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে চলে যেত।

এইভাবেই চলছিল।

খারাপ রোগ বেছে বেছে শুধু কেষ্টভামিনীকেই ধরবে, এমন কোনও কথা নেই। যে লুচ্চার পাল রাতে হানা দেয়, শুধু কেষ্টভামিনীরই না, অন্য মেয়েদের শরীরেও তারা বিষাক্ত বীজাণু ঢুকিয়ে দিয়ে যায়। ফলে অনিবার্য নিয়মে তাদের গায়েও একদিন না একদিন দগদগে পারার ঘা ফুটে বেরুতে থাকে।

রোগাক্রান্ত দিশেহারা মেয়েরা গিয়ে ধরে কেষ্টভামিনীকে, 'যে ডাক্তার তোরে সারায়ে দেচেন আমাদের তেনার কাচে নে চল। যন্ত্রনায় মরে যাচ্চি রে।'

এরাই একদিন ডাক্তারদের হদিস দিয়ে তাকে এতটুকু সাহায্য যে করেনি সেটা আর মনে করে রাখেনি কেষ্টভামিনী। সে ওদের সঙ্গে করে 'ভুবন ফার্মেসি'তে নিয়ে গিয়েছিল। ভুবন তাদেরও ফিরিয়ে দেয়নি। বরং বলেছে, 'কেষ্টভামিনী যখন নিয়ে এসেছে তখন ভেবো না। ধরে নাও রোগ সেরেই গেছে।'

এইভাবে মেয়েপাড়ার বাসিন্দাদের সঙ্গে ভাল রকমের সম্পর্ক হয়ে গেল ভুবন ডাক্তারের। কিন্তু অন্য দিকে প্রচণ্ড ধুন্ধুমার বেধে যায়। যে বাড়িটায় ভুবনের ডাক্তারখানা সেটা তার পৈতৃক আমলের। তার বাবা-মা বহুদিন আগেই মারা গেছে, স্ত্রীও বেঁচে নেই, তার ছেলেমেয়ে হয়নি। সে একেবারে ঝাড়া হাত-পা মানুষ। কিন্তু বাড়িতে ছিল সাত সাতটা ভাই। তারা বাজারের মেয়েদের নানা কুৎসিত রোগ নিয়ে রোজ আসাটা আদৌ পছন্দ করছিল না। এই নিয়ে অশান্তি চলছিল বেশ কিছুদিন ধরে। ভাইরা বলছিল, এই বিষ্ঠার পোকাদের বাড়িতে আনা চলবে না। ভুবনের জন্য তাদের এত বড় চক্রবর্তী-বংশ একেবারে অপবিত্র হয়ে গেল। শুধু তা-ই নয়, এরা নিয়মিত আসার কারণে তলায় তলায় আরও কত সর্বনাশ হয়ে গেছে কে জানে। কেননা বাড়িতে যুবক ছেলেছোকরা তো কম নেই। তারা এইসব নোংরা ওঁচা মেয়েমানুষগুলোর ফাঁদে যে লুকিয়ে লুকিয়ে পা দিয়ে বসেনি তারই বা গ্যারান্টি কোথায়? চক্রবর্তীরা নিষ্ঠাবান সৎ ব্রাহ্মণ, তাদের শুদ্ধতা আর রইল না। বাড়িটা বাজারের মেয়েদের একটা কালোনি হয়ে উঠল। ওদের আর এখানে আসা চলবে না।

ভাইদের সঙ্গে গোলমালের ব্যাপারটা তখনই জানতে পারেনি কেষ্টভামিনী, জেনেছিল অনেক পরে।

যাই হোক, মেয়েপাড়ার বাসিন্দাদের মুখের ওপর 'না' বলে দেওয়া সম্ভব ছিল না ভুবনের পক্ষে। প্রথমত, এই দুঃখী অসহায় মেয়েগুলোর ওপর কেমন যেন একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল তার। তার চেয়েও জোরালো কারণটা হল পয়সা। বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজ থেকে মহারাজপুরে এসে সে যখন ডিসপেনসারি খুলে বসল তখন এখানে পাস-করা ডাক্তার ছিল হাতে-গোনা তিন চারজন। কিন্তু স্বাধীনতার পর সারা দেশ জুড়ে যে জনবিস্ফোরণ ঘটতে শুরু করেছিল তার হাওয়া এসে লেগেছিল এই শহরেও। তা ছাড়া সে আমলের পূর্ব পাকিস্তান থেকে হু হু করে শরণার্থীর ঢলও নেমেছিল এখানে। অনিবার্য নিয়মে ডাক্তারের সংখ্যাও বেড়ে চলল। নতুন যেসব ডাক্তার এল তাদের নামের পাশে লম্বা ডিগ্রি। তাদের ছেড়ে রোগ সারাতে কেউ ভুবন ডাক্তারের কাছে আসবে কেন? তার হাতে রয়ে গেল কিছু গরিব গুর্বো, ধানকল সুরকি

কলের মজুর আর মেয়েপাড়ার ওঁচা ক'টি মেয়েমানুষ। এদের, বিশেষ করে মেয়েমানুষগুলোর তার ওপর অগাধ আস্থা। তাদের আনুগত্যের ভেতর কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই। বাঁচুক মরুক, ভুবনের হাতের ওষুধটি ছাড়া তাদের চলবে না। ভুবনেরও ওদের ছাড়া গতি নেই।

ভুবন ভাইদের বুঝিয়েছে, 'মেয়েগুলো ভাল রে, নেহাত কপালের ফেরে পাঁকে নামতে হয়েছে।'

ভাইরা বলেছে, 'বেশ্যা আবার ভাল! নচ্ছার পাপীর দল।'

'পাপী হয়ে কেউ জন্মায় না। ওদের এই অবস্থার জন্যে আমাদের সোশাল সিস্টেমটাই দায়ী।'

সমাজতত্ত্বের এসব গূঢ় ব্যাখ্যা শোনার মতো ধৈর্য ছিল না ভাইদের। তাদের সাফ কথা, বাজারের মেয়েদের বাড়িতে আনা চলবে না। ডিসপেনসারিটা যদিও রাস্তার দিকে, তবু সেটা বাড়িরই একটা অংশ তো।

এই নিয়ে একদিন তুলকালাম কাণ্ড ঘটে গেল। ভুবন চক্রবর্তী ঠিক করে ফেলল, ভাইদের সংস্রবে আর থাকবে না। বাড়ি থেকে ডিসপেনসারি তুলে নিয়ে সে চলে এল গুদাম ঘরগুলোর কাছাকাছি একটা টিনের চালায়। সেই থেকে পঁচিশ তিরিশটা বছর এখানেই কেটে গেল তার। মহারাজপুরের যে অংশে সুখী, ভদ্র, সামাজিক শৃঙ্খলায় আবদ্ধ মানুষেরা থাকে তার সঙ্গে ভুবনের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই।

তিরিশ বছর কম সময় নয়। এর মধ্যে মহারাজপুর যেমন বদলে গেছে তেমনি পরিবর্তন হয়েছে মেয়েপাড়াতেও। সেদিনের ছিপছিপে পাতলা গড়নের যুবতী কেষ্টভামিনী এখন থলথলে ভারী চেহারার মধ্যবয়সী মেয়েমানুষ এবং সে আমলের অন্য যুবতী মেয়েরা বেশির ভাগই মরে হেজে সাফ। কেউ কেউ পাড়া ছেড়ে কোথায় চলে গেছে তার হদিস কেষ্টভামিনীরা রাখে না। পৃথিবীর কোথাও ফাঁকা জায়গা তো পড়ে থাকে না। অনিবার্য নিয়মেই নতুন জেনারেশানের মেয়েরা এসে গেছে।

এতগুলো বছর সুখে দুঃখে বিপদে আপদে মেয়েগুলোর পাশেপাশেই আছে ভুবন চক্রবর্তী। রোগ বালাইয়ের চিকিৎসা তো করেই, পুলিশ বা লুচ্চারা হামলা করলে সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটে যায়। যেন দশ হাত দিয়ে মেয়েগুলোকে আগলে রেখেছে ভুবন। দুই প্রজন্ম ধরে, কেষ্টভামিনী থেকে এখনকার টগর বা টিয়া-ময়নাদের সে বাবামাশায়।

আগাছায় ভরা ফাঁকা জায়গা পেরিয়ে কখন যে কেষ্টভামিনীদের রিকশাটা মহারাজপুরের বাজারপাড়ায় চলে এসেছিল, খেয়াল নেই। এটাই শহরের সবচেয়ে জমকালো অংশ। তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগের সেই বাজারপাড়ার সঙ্গে এখনকার বাজারপাড়ার মিল সামান্যই। আগে বেশির ভাগই ছিল টিনের চালের ঘর, ফাঁকে ফাঁকে ক্বচিৎ দু-চারটে বেঢপ চেহারার একতলা কি দোতলা। এখন যেদিকে যতদূর চোখ যায় লাইন দিয়ে নতুন নতুন তেতলা আর চারতলা বাড়ি। সেগুলোর নিচের তলায় বিরাট বিরাট সব দোকান। কলকাতার ধাঁচে দুর্দান্ত সব শো-উইণ্ডো। কোনওটা টিভির, কোনওটা টেক্সটাইল মিলের। ওষুধের দোকান, রেস্তোরাঁ, ব্যাঙ্ক, ডাক্তারদের

চেম্বার, সিনেমা হল, সব এখানেই। সারাদিন তো বটেই, অনেক রাত পর্যন্ত জায়গাটা গমগম করতে থাকে।

এখানকার সমস্ত কিছুই কেষ্টভামিনীর মুখস্থ। তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগে সেই যে প্রথম এখানে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ডাক্তারের খোঁজে ছুটে এসেছিল, তারপর কতবার এসেছে তার হিসেব নেই।

'রিলায়েন্স ফার্মেসি' নামে একটা বড় ডাক্তারখানার সামনে এসে রিকশা থামায় কেষ্টভামিনী। ভাড়া মিটিয়ে নেমে পড়ে।

ডাক্তারখানার সামনের দিকে সারি সারি কাচের আলমারি দিয়ে সাজানো ওষুধের দোকান, পেছন দিকে ডাক্তার হিরণ্ময় সেনের চেম্বার। হিরণ্ময়ের বয়স বেশি না, চল্লিশের অনেক নিচে। কিন্তু এর মধ্যেই যথেষ্ট নাম করে ফেলেছে। উঠতি ডাক্তারদের মধ্যে তার পসার সবচেয়ে বেশি। সর্বক্ষণ তার চেম্বারে লাইন লেগে থাকে।

ওষুধের আলমারিগুলোর ডান পাশ দিয়ে একটা সরু প্যাসেজ চলে গেছে ভেতর দিকে। তার শেষ মাথায় রোগীদের জন্য ওয়েটিং রুম, তারপর দরজায় পর্দা-লাগানো ডাক্তারের চেম্বার।

ওয়েটিং রুমে ভিড় ছিল। সেখানে এসে ঘন্টাখানেক অপেক্ষা করার পর কেষ্টভামিনীর ডাক পড়ল।

বড় টেবিলের ওধার থেকে লম্বা ঝকঝকে চেহারার হিরণ্ময় ডাক্তার বলে, 'বলুন কী হয়েছে?'

দিনকাল এখন অনেক বদলে গেছে। তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগে কেষ্টভামিনীকে দেখামাত্র এই মহারাজপুরের ডাক্তাররা তাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এখনকার ডাক্তাররা একেবারে অন্যরকম। রোগটা কার তা নিয়ে আদৌ মাথা ঘামায় না। টাকাটা কার কাছ থেকে এল—চোর, লুচ্চা না বেশ্যা, সে সম্বন্ধে তাদের দুর্ভাবনা নেই। ওদের কাছে রোগ সারিয়ে টাকা পাওয়াটাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, আর সব কিছুই অর্থহীন।

হাতজোড় করে কেষ্টভামিনী বলে, 'ডাক্তারবাবু আপনারে আমার সন্‌গে যেতি হবে। বাবামাশায় মরতি বসেচে, আপনি তেনারে বাঁচান।'

হিরণ্ময় হকচকিয়ে যায়, 'বাবামাশায় কে?'

ভুবন ডাক্তারের নাম বলে কেষ্টভামিনী কিন্তু নামটা আদৌ হিরণ্ময় আগে শুনেছে কিনা বোঝা গেল না। আসলে ভুবন সেই যে মহারাজপুরের আদি এলাকা ছেড়ে ধানকল সুরকি কলের কাছে চলে যায়, তারপর এদিকে আর বিশেষ আসেনি। তার সঙ্গে এ অঞ্চলের যোগাযোগ একেবারেই ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। মহারাজপুরের ভদ্রপাড়ার মানুষজন তাকে মনে করে রাখেনি।

হিরণ্ময় ভুবন সম্পর্কে আর কোনওরকম কৌতূহল প্রকাশ করে না। শুধু জিজ্ঞেস করে, 'তাঁকে দেখতে কোথায় যেতে হবে?'

কেষ্টভামিনী বলে, 'ওই যে ধানকল খড়কলগুলোন যেখেনে আচে সেখেনে—'

'এক্ষুণি বেরুতে পারব না। অনেক রোগী অপেক্ষা করছে, তাদের দেখতে ঘন্টাখানেক লেগে যাবে। তারপর যেতে পারি।'

'আমরা বসচি ডাক্তারবাবু। আপনি কাজ সেরে লিন।'

'আমার ভিজিট কত জানা আছে?'

' না।'

'রোগীর বাড়ি গেলে চৌযট্টি টাকা নিই আর যাতায়াতের রিকশা ভাড়া।'

এতগুলো টাকা! বুকের ভেতরটা ধক করে ওঠে কেষ্টভামিনীর। পরক্ষণে মনে পড়ে, ভুবন চক্রবর্তী একদিন তার নতুন জীবন দিয়েছিল। শুধু তা-ই না, মেয়েপাড়ার বাসিন্দাদের জন্য নিজেদের বাড়িঘর আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে চলে এসেছিল। তার জন্য সামান্য ক'টা টাকা সে খরচ করতে পারবে না? তা ছাড়া কেষ্টভামিনী জানে, সুস্থ হবার পর ভুবন চক্রবর্তী হিসেব করে তার প্রতিটি পয়সা ফেরত দিয়ে দেবে। কারও কাছেই সে ঋণী হয়ে থাকতে চায় না।

কেষ্টভামিনী বলে, 'দেব ডাক্তারবাবু, আপনি যা কইলেন তা-ই দেব।'

এরপর ভুবন ডাক্তারের রোগের লক্ষণগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিয়ে কেষ্টভামিনীকে ওয়েটিং রুমে গিয়ে অপেক্ষা করতে বলে হিরণ্ময়।

কিন্তু একঘন্টা নয়, প্রায় ঘন্টাদেড়েক বাদে কেষ্টভামিনীদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে হিরণ্ময়। রাস্তায় এসে দুটো সাইকেল রিকশা নেওয়া হয়। সামনের রিকশায় ওঠে কেষ্টভামিনী আর জবা, পেছনেরটায় হিরণ্ময়, তার সঙ্গে ওষুধপত্রে বোঝাই ঢাউস মেডিক্যাল ব্যাগ। আগে আগে থেকে কেষ্টভামিনীরা হিরণ্ময়ের রিকশাটাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়।

'ভুবন ফার্মেসি'তে যখন ওরা পৌঁছল, বেশ রাত হয়ে গেছে। এ পাড়ায় এমনিতে লোক চলাচল যেটুকু হয় তার বেশির ভাগটাই দিনের বেলায়। সন্ধের পর, বিশেষ করে শীতকালে জায়গাটা নির্জন হয়ে যায়। এখন তো একেবারেই নিঝুম।

লগার মুখে সেই পড়ন্ত বেলায় ভুবনের খবরটা পাওয়ার পর মেয়েপাড়া ফাঁকা করে যারা কেষ্টভামিনীর সঙ্গে দৌড়ে এসেছিল সেই টগর টিয়া ময়নারা এখনও ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। কয়েকজন ভুবনের বিছানার কাছাকাছি ঠাণ্ডা মেঝেতে বসে আছে। তাদের মধ্যে লগাকেও দেখা যাচ্ছে। তবে ধানকল, সুরকিকল কি লেদ মেশিনের মজুররা আর নেই, তারা সন্ধের পর পরই চলে গেছে।

মেয়েমানুষগুলোর চোখেমুখে ঘোর উৎকণ্ঠা। কেষ্টভামিনী কখন ডাক্তার নিয়ে ফিরবে সেজন্য তারা পথের দিকে তাকিয়ে ছিল।

সাইকেল রিকশা থেকে নেমে কেষ্টভামিনী তাড়া লাগানোর সুরে লগাকে বলে, 'তাড়াতাড়ি ডাক্তরবাবুর বাক্সটা লাবিয়ে নে আয়।'

হিরণ্ময় নেমে পড়েছিল। কেষ্টভামিনী তাকে সঙ্গে করে 'ভুবন ফার্মেসি'র ভেতর চলে আসে। পেছন পেছন মেডিক্যাল ব্যাগ নিয়ে আসে লগা এবং অন্য মেয়েরা।

যে মেয়েমানুষগুলো ভুবনকে ঘিরে বসে ছিল, হিরণ্ময়দের দেখে উঠে দাঁড়ায়।

হিরণ্ময় বলে, 'রোগীর ঘরে এত ভিড় কেন? আপনারা বাইরে যান।'

কেষ্টভামিনী বলে, 'আমিও যাব?'

'না। আপনি থাকুন।'

মেয়েরা বাইরে গিয়ে দরজার কাছে উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়িয়ে থাকে। ভুবনকে পরীক্ষা করতে করতে হিরণ্ময় বুঝে যায় মারাত্মক ধরনের হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। মুখের বাঁ দিকে আর শরীরের নিচের অংশটায় পক্ষাঘাতের সমস্ত লক্ষণই স্পষ্ট।

কেষ্টভামিনী শ্বাসরুদ্ধের মতো বলে, 'বাবামাশায়ের কী হয়েছে ডাক্তারবাবু?'

'স্ট্রোক।' বলেই হিরণ্ময়ের খেয়াল হয়, ইংরেজি শব্দটা বোধহয় বুঝতে পারবে না কেষ্টভামিনী। সোজা বাংলায় বুঝিয়ে দেয়, 'বুকের অসুখ।'

'বাঁচবে তো?'

'দু'দিন না কাটলে বলতে পারব না।'

কেষ্টভামিনী বলে, 'বাবামাশায়রে বাঁচায়ে তোলেন ডাক্তারবাবু।'

হিরণ্ময় বলে, 'বাঁচা মরা মানুষের হাতে নেই, তবে ডাক্তার হিসেবে চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু—'

'কিন্তু কী?'

'অনেক রকম পরীক্ষা করতে হবে রোগীর। তার ওপর ট্যাবলেট, ইঞ্জেকশান, এ সব তো আছেই। প্রচুর খরচ।'

খরচের কথায় ভেতরে ভেতরে ঘাবড়ে যায় কেষ্টভামিনী। ঢোক গিয়ে বলে, 'কিরকম লাগবে যদিন বলেন—'

হিরণ্ময় জানায়, রোগীর যা হাল তাতে আজই দু-একটা পরীক্ষা করা দরকার। সেগুলো করা না হলে ভাল করে চিকিৎসা শুরু করা যাবে না। প্রাথমিক পরীক্ষার জন্য আপাতত শ'তিনেক টাকা চাই।

কেষ্টভামিনীর ঘরে জমানো টাকা নিশ্চয়ই আছে। তার থেকে শ'খানেকের মতো নিয়ে এসেছিল। ভেবেছিল তাতেই হয়ে যাবে। কিন্তু আরও তিন'শ বার করাটা খুবই দুশ্চিন্তার ব্যাপার। ওই তিন শ'তেও যে হবে না, সেটাই হিরণ্ময় ডাক্তার পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে।

কেষ্টভামিনীর সঞ্চয় তো অফুরন্ত নয় যে ভুবনের চিকিৎসার যাবতীয় খরচ যুগিয়ে যেতে পারবে। তা ছাড়া তারও ভবিষ্যৎ বলে একটা কিছু আছে। হাতের সম্বল ভেঙে ফেললে বিপদে পড়তে হবে।

কেষ্টভামিনী বলে, 'খরচার ব্যাপারটা আমাদের এট্টু ভাবতে দ্যান ডাক্তারবাবু।'

হিরণ্ময় বলে, 'তা ভাবুন। তবে একটা কথা জেনে রাখুন, রোগীর অবস্থা খুব খারাপ। যা করার আজই করে ফেলতে হবে কিন্তু।'

একটু চিন্তা করে কেষ্টভামিনী বলে, 'আজই আপনারে জানায়ে দেব।'

'আমি ন'টা পর্যন্ত চেম্বারে থাকব। এলে তার ভেতর আসবেন।'

'আচ্ছা।'

এবার ভুবনকে একটা ইঞ্জেকশান দেয় হিরণ্ময়। তারপর কয়েকটা ট্যাবলেট কেষ্টভামিনীকে দিয়ে বলে, 'এখন জ্ঞান নেই ভুবনবাবুর, জ্ঞান ফিরলে তিন ঘন্টা পর পর একটা করে ট্যাবলেট খাইয়ে দেবেন। আর রাত্তিরে সবসময় ওঁর কাছে লোক রাখবেন। আরও খারাপ কিছু বুঝলে আমাকে খবর দেবেন। চেম্বারের ওপরেই দোতলায় আমি থাকি।'

কেষ্টভামিনী ঘাড় কাত করে বলে, 'দেব।'

হিরণ্ময় সাইকেল রিকশাটা বাইরের রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। নিজের ফি, ট্যাবলেট ইঞ্জেকশানের দাম এবং রিকশাভাড়া নিয়ে একসময় চলে যায়।

যে মেয়েরা বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের ঘরে ডেকে এনে কেষ্টভামিনী শুধোয়, 'সবই তো শুনলি। অখুন কী করা?'

মেয়েরা চুপ করে থাকে।

কেষ্টভামিনী আবার বলে, 'আমার একলার পক্ষে এত বড় রোগের চিকিচ্ছা চালানো অসোম্ভব।'

কেউ উত্তর দেবার আগে জবা নামের মেয়েটি বলে ওঠে, 'ট্যাকার জন্যি বাবামাশায় মরে যাবে? তুমি আমাদের কী করতে বল?'

তক্ষুণি কিছু বলে না কেষ্টভামিনী। বেশ কিছুক্ষণ বাদে আস্তে আস্তে শুরু করে, 'তোদের হাল তো জানি। তবু না বলে পারচি না। সব্বাই মিলে কিচু কিচু দিলে একজনার ওপর চাপটা পড়ে না। এদিকে বাবামাশায়ের পেরানটা বেঁচে যায়। অখুনি ভেবেচিন্তে দ্যাক কী করবি।'

অনেকক্ষণ মেয়েমানুষগুলো নিজেদের ভেতর চাপা গলায় আলোচনা করে নেয়। কেউ কি আর প্রাণ ধরে জমানো টাকায় হাত দিতে চায়! কিন্তু ভুবন চক্রবর্তীর কথা আলাদা। তার জন্য ওরা সব পারে।

ভিড়ের ভেতর থেকে টগর বলে ওঠে, 'আমি দেব কিছু ট্যাকা। আমারে বাবামাশায় যে ব্যারাম থিকে বাঁচায়েছিল তা কি কুনোদিন ভুলব! আমি বেঁচে থাকতি বিনি চিকিচ্ছায় বাবামাশায়রে মরতি দেব নি।' তার গলা আবেগে কাঁপতে থাকে।

টগরের আবেগ বিদ্যুৎগতিতে অন্য মেয়েদের মধ্যেও চারিয়ে যায়। তারা একসঙ্গে বলতে থাকে, 'ট্যাকার জন্যি ভেবো না মাসি। আমরাও দেব।'

কে কত দিতে পারবে, জেনে নেয় কেষ্টভামিনী। দেখা গেল সাতশ' টাকার মতো পাওয়া যাবে। ঠিক হল, আপাতত এই দিয়েই ভুবন চক্রবর্তীর পরীক্ষা-টরীক্ষাগুলো শুরু হোক, পরে আরও টাকার দরকার হলে দেখা যাবে।

কেষ্টভামিনী বলে, 'তোরা তো কেউ ট্যাকা সন্‌গে করে আনিস নি?'

মেয়েরা বলে, 'না। লগা খবর দিতেই তো তোমার সন্‌গে দৌড়ে চলে এলাম।'

'তা হলে যা, নে আয়।'

টিয়া ময়নারা মেয়েপাড়ায় গিয়ে টাকা নিয়ে আসে।

কেষ্টভামিনী এবার আর নিজে হিরণ্ময় ডাক্তারের চেম্বারে গেল না, তিনশ' টাকা দিয়ে জবা আর টিয়াকে পাঠিয়ে দিল। তারপর অন্য মেয়েদের উদ্দেশে বলে,

'ঘরগুলোন সব ফাঁকা পড়ে আচে। সবাই একেনে থেকে কী হবে? আমি তো রইচিই, দু-চারজন আমার সন্‌গে থাক। বাকিরা পাড়ায় ফিরে যা। লইলে চোর-ছ্যাঁচোড়ে ঘরের তালা ভেঙে চেঁচেপুচে সব নে যাবে। ব্যবসাটি তো আজ একরকম মাটিই হল। যারা যাবি, দ্যাক যদিন দুটো পয়সা কামাই হয়।'

কিন্তু ভুবনকে এই অবস্থায় ফেলে একটি মেয়েও তাদের পাড়ায় ফিরে যেতে রাজি হল না। তারা এখানেই থেকে যাবে। রোগবালাই হলে কত রাত তো রোজগার বন্ধ থাকে। ধরা যাক, আজ তেমন কিছু একটা হয়েছে তাদের।

কেষ্টভামিনী বলে, 'তা না হয় থাকলি, কিন্তুন ঘরদোর পাহারা দেবার জন্যি কারুর না কারুর থাকা তো দরকার।'

অনেক পরামর্শের পর লগাকে পাঠানো হল। রাতটা সে মেয়েপাড়ার বাসিন্দাদের পার্থিব সম্পত্তিগুলি পাহারা দেবে।

কিছুক্ষণের মধ্যে জবা আর টিয়ার সঙ্গে হিরণ্ময় আবার 'ভুবন ফার্মেসি'তে এল। সঙ্গে সেই ঢাউস মেডিক্যাল ব্যাগটা তো রয়েছেই, তা ছাড়া এনেছে একটা বড় সুটকেশ। সুটকেশটা খুলে নানারকম যন্ত্রপাতি আর ফিতে বার করে ভুবনের হাতে পায়ে বুকে লাগিয়ে কী একটা কল চালিয়ে দিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে লম্বাটে ফালি কাগজে উঁচু নিচু দাগ পড়তে লাগল। দমবন্ধ করে কেষ্টভামিনীরা সেদিকে তাকিয়ে থাকে।

একসময় কাগজটা বার করে চোখের সামনে ধরে কী যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ করে হিরণ্ময়। তারপর বলে, 'কাল সকালে এসে রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা করব। রোগী যেমন শুয়ে আছে তেমনি থাকবে। নাড়াচাড়া করবেন না।'

কেষ্টভামিনী ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কেমন দেখলেন ডাক্তারবাবু?'

উত্তর না দিয়ে সামান্য হাসে হিরণ্ময়। তার ওই হাসিটাই বুঝিয়ে দেয়, ভুবনের অবস্থা আশাপ্রদ কিছু নয়।

ভুবনকে আরও একটা ইঞ্জেকশান দিয়ে হিরণ্ময় চলে যায়। আর ভুবনের বিছানার চারপাশ ঘিরে মেঝেতে চুপচাপ বসে থাকে মেয়েমানুষগুলো। সেই দুপুরে খেয়েছে তারা, তারপর এতটা রাত হল। স্বাভাবিক নিয়মেই খিদে পাওয়া উচিত। কিন্তু খিদে তেষ্টার কোনও বোধই এখন তাদের নেই। মনে মনে তারা বিড় বিড় করতে থাকে, 'হেই মা কালী, বাবামাশায়রে সারায়ে দাও। হেই মা—'

মাঝরাতে চারিদিক যখন আরও নিষুতি হয়ে যায়, অন্ধকারে আর কুয়াশায় যখন ডুবে যায় সমস্ত চরাচর, সেই সময় শিকারী কুকুরের মতো গন্ধ শুঁকে শুঁকে একদল মাতাল লুচ্চা এসে হানা দেয় 'ভুবন ফার্মেসি'তে। মেয়েপাড়ায় জবা টগরদের না পেয়ে তারা এখানে হানা দিয়েছে। সেই আদিম জৈব প্রবৃত্তি, তার তো বিনাশ নেই।

বেহুঁশ, রোগাক্রান্ত বাবামাশায়ের আরোগ্য কামনায় সাতাশটি মেয়েমানুষ তদ্গত হয়ে যখন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছে তখন এই জন্তুগুলো এসে পড়ায় তারা মারাত্মক খেপে ওঠে। জানোয়ারেরা তাদের টেনে হেঁচড়ে মেয়েপাড়ায় নিয়ে যাবে, কিন্তু তারা যাবে না। এই নিয়ে মধ্যরাতের স্তব্ধতাকে ভেঙেচুরে দু-পক্ষে তুমুল

গালাগাল চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত মেয়েমানুষগুলো আঁচড়ে, লাথি মারতে মারতে লুচ্চার পালকে তাড়িয়ে দেয়। তারপর বাকি রাতটা নির্বিঘ্নেই কেটে যায়।

সেই যে ভুবন চক্রবর্তী চোখ বুজে অচৈতন্য হয়ে শুয়ে ছিল তার কোনও হেরফের ঘটেনি। জ্ঞান ফেরেনি তার, বরং মুখের বাঁ ধারটা আরও খানিকটা বেঁকে যেন শক্ত হয়ে গেছে।

মেয়েমানুষগুলো সারারাত কেউ দু'চোখের পাতা এক করে নি, পলকহীন ভুবনের দিকে তাকিয়ে বসে ছিল।

ভুবনকে দেখতে দেখতে বুকের ভেতরটা আমূল কেঁপে যায় কেষ্টভামিনীর। বার বার আবছাভাবে কেউ যেন জানিয়ে দেয় লক্ষণটা ভাল নয়। ভুবনের মুখের ওপর ঝুঁকে সে কাঁপা গলায় ডাকতে থাকে, 'বাবামাশায়, বাবামাশায়—'

সাড়া নেই।

এবার ভুবনের বুকে কপালে হাত দিয়ে চমকে ওঠে কেষ্টভামিনী। শরীরটা বরফের মতো ঠাণ্ডা আর শক্ত হয়ে গেছে। দ্রুত হাত সরিয়ে অন্য মেয়েদের বলে, 'আমি ডাক্তারবাবুর কাচে যাচ্চি।'

এই ভোরবেলায় রাস্তা একেবারে ফাঁকা, কোথাও জনপ্রাণী চোখে পড়ছে না। রিকশার চিহ্নমাত্র নেই। অগত্যা একরকম দৌড়ুতে দৌড়ুতেই কেষ্টভামিনী বাজার পাড়ায় এসে হিরণ্ময় ডাক্তারের ঘুম ভাঙায়।

চোখ রগড়াতে রগড়াতে হিরণ্ময় নিজেই দরজা খুলে দিয়েছিল। সাত সকালে কেষ্টভামিনীকে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছে?'

কেষ্টভামিনী বলে, 'আমার বড্ড ভয় করচে ডাক্তারবাবু। দয়া করে চলেন।'

'রোগীর জ্ঞান ফিরেছিল?'

'না।'

কিছু একটা আন্দাজ করে নেয় হিরণ্ময়। আর কোনও প্রশ্ন না করে বলে, 'রাস্তায় গিয়ে দেখুন রিকশা পাওয়া যায় কিনা। আমি আসছি।'

এর মধ্যে রোদ উঠে গিয়েছিল। দু-চারটে রিকশাও বেরিয়ে পড়েছে।

কিছুক্ষণ বাদে হিরণ্ময় ডাক্তারকে সঙ্গে করে 'ভুবন ফার্মেসি'তে ফিরে আসে কেষ্টভামিনী।

ভুবনের গায়ে একবার হাত দেয় হিরণ্ময়, তারপর দ্রুত নাকের কাছে হাতটা এনে শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়াটি বুঝতে চেষ্টা করে। পরক্ষণে স্টেথোস্কোপ বুকে লাগিয়েই তুলে নেয়। তার মুখে হতাশা আর বিষাদের ছাপ ফুটে উঠতে থাকে।

সাতাশটি মেয়েমানুষের হৃৎপিণ্ডের উত্থানপতন থেমে গিয়েছিল। শঙ্কাতুর মুখে একদৃষ্টে তারা তাকিয়ে আছে হিরণ্ময়ের দিকে।

কেষ্টভামিনী একসময় রুদ্ধ স্বরে জিজ্ঞেস করে, 'কেমন দেখলেন ডাক্তারবাবু?'

বিমর্ষ সুরে হিরণ্ময় বলে, 'কিছুই করা গেল না। ভুবনবাবু মারা গেছেন।'

'ভুবন ফার্মেসি'তে টিনের চালের প্রকাণ্ড ঘরটার ভেতর সময় যেন থমকে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর দমকা হাওয়ার মতো শোকের উচ্ছ্বাস ভেঙে পড়ে। সাতাশটি মেয়েমানুষ ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

এই শোকের পরিবেশেই কাগজে কী যেন লিখে কেষ্টভামিনীকে দিতে দিতে হিরণ্ময় বলে, 'এটা ডেথ সার্টিফিকেট। ভুবনবাবুকে সৎকার করতে নিয়ে গেলে শ্মশানে এটা লাগবে।'

আচ্ছন্নের মতো হাত বাড়িয়ে সার্টিফিকেটটা নেয় কেষ্টভামিনী।

মেডিক্যাল ব্যাগটা আজ আর খুলতে হয়নি। সেটা হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে হিরণ্ময় বলে, 'আচ্ছা চলি।'

আঁচলের গিঁট খুলে টাকা বার করতে করতে কেষ্টভামিনী বলে, 'আপনার ট্যাকাটা ডাক্তারবাবু—'

কী ভেবে হিরণ্ময় বলে, 'থাক। ওটা আর দিতে হবে না।' বলে চলে যায়।

এদিকে প্রাথমিক শোকের উচ্ছ্বাস কিছুটা থিতিয়ে এলে কেষ্টভামিনী বলে, 'এখন কী করা—হ্যাঁ রে মেয়েরা?' আসলে ভুবনের এমন আচমকা মৃত্যুতে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছে সে। কী করবে, কী করা উচিত, ভেবে উঠতে পারছে না।

মেয়েমানুষগুলোর মনের অবস্থাও কেষ্টভামিনীর মতোই। বিহ্বলের মতো তার দিকে ওরা তাকিয়ে থাকে।

বেলা ক্রমশ বাড়ছিল। সূর্য পুব আকাশের খাড়া পাড় বেয়ে অনেকখানি ওপরে উঠে এসেছে। গাঢ় কুয়াশা কেটে গিয়ে ঝলমলে রোদে ভরে গেছে চারিদিক।

মৃত্যুর গন্ধ কীভাবে যেন হাওয়ায় হাওয়ায় ছড়িয়ে যায়। সুরকি কল ধানকল আর বড় বড় গুদামের মজুরেরা একজন দু'জন করে 'ভুবন ফার্মেসি'র সামনে এসে জড়ো হতে থাকে। তাদের কেউ কেউ চাপা শব্দ করে কাঁদছিল, কেউ বা হাতের পিঠে চোখের জল মুছছিল। আসলে ভুবন চক্রবর্তীর মতো আপনজন তো তাদের কেউ ছিল না।

মেয়েমানুষগুলো মুহ্যমানের মতো দলা পাকিয়ে বসে আছে। কেষ্টভামিনী বলে, 'কী রে, তোরা চুপ করে আচিস কেন? কিছু বল।' বাইরে থেকে তাকে যতই জবরদস্ত মনে হোক, আসলে মানুষটা ভেতরে ভেতরে খানিকটা দুর্বল, বিশেষ করে মৃত্যু টৃত্যুর ব্যাপারে খুব অস্থির হয়ে পড়ে।

বয়স কম হলেও মেয়েপাড়ার বাসিন্দাদের মধ্যে সবচেয়ে ঠাণ্ডা মাথা মুক্তার। বয়স তিরিশ বত্রিশ। শ্যামলা চেহারার শান্তশিষ্ট মেয়েমানুষটি মেয়েপাড়ার অন্য বাসিন্দাদের থেকে একটু আলাদা। সে বলে, 'বাবামাশায়রে তো একেনে ফেলে রাখা যাবে নি, শ্মোশানে নে যেতি হবে। কিন্তুন—'

কেষ্টভামিনী বলে, 'কিন্তুন কী?'

'বাবামশায়ের ভাইরা তো এই শহরে থাকে। এ সময় তেনাদের খবর না দিলে আমরা পাপের ভাগী হয়ে থাকব। তাছাড়া মুখে আগুন দেবার জন্যি নিজেদের লোক দরকার।'

এই কথাটা আগে মাথায় আসে নি কেষ্টভামিনীর। সত্যিই তো, শেষ সময়ে ছেলে, ভাই বা রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়স্বজনের হাতের আগুনটুকু না পাওয়াটা খুবই দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। বাবামাশায় তাদের যতই কাছের মানুষ হোক, তার ভাইদের এই অন্তিম মুহূর্তে খবর দিতেই হবে। কেষ্টভামিনী বলে, 'ঠিক বুলেচিস। আমি নিজে যাব তেনাদের কাচে। কিন্তু—' বলতে বলতে হঠাৎ দমে যায়।

'কী?'

'বাবামাশায়ের সন্‌গে ওনাদের তো কোনও সম্পক্ক ছিলনি। অ্যাদ্দিন পর গিয়ে বুললে কি আসবে?'

'আমাদের দিক থেকে এট্টা কত্তব্য তো আচে। এলে এল, না এলে আর কী করব। মনকে বুঝোতে পারব, আমরা তিরুটি (ত্রুটি) করি নি।'

কাজেই একটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে রিকশায় করে বেরিয়ে পড়ে কেষ্টভামিনী। বহুকাল আগে সারা গায়ে পারার ঘা নিয়ে প্রথম যে বাড়িতে ভুবন চক্রবর্তীর সঙ্গে সে দেখা করতে এসেছিল, ভুবনের ভাইরা এখনও সেখানেই আছে।

মহারাজপুর মাঝখানের পঁচিশ তিরিশ বছরে অনেক বদলে গেছে কিন্তু ভুবন চক্রবর্তীদের পৈতৃক বাড়িটা সেই আগের মতোই আছে। ঠিক আগের মতো নয়, আরও পুরনো এবং জীর্ণ হয়েছে। দেওয়াল থেকে পলেস্তারা খসে খসে যে ইট বেরিয়ে পড়েছে সেগুলোতে নোনা লেগে বাড়িটার ধ্বংসের কাজ অনেকখানিই এগিয়ে আছে। ওটা যে ভাগের বাড়ি, একটু লক্ষ করলেই টের পাওয়া যায়। সর্বত্র অযত্ন আর উদাসীনতার ছাপ। আসলে কেউ টাকা খরচ করতে চায় না।

বাড়িটার কাছে রিকশা থামিয়ে নেমে পড়ে কেষ্টভামিনী। যেখানে একদা 'ভুবন ফার্মেসি' ছিল, এখন সেটা একটা লন্ড্রি। হয়তো ভুবনের ভাইরা ভাড়া দিয়েছে লন্ড্রিওলাকে।

ভয়ে ভয়ে সদর দরজায় কড়া নাড়তে একটা মধ্যবয়সী থলথলে চেহারার লোক বেরিয়ে আসে। চোখমুখের যা ছাঁচ তাতে তাকে ভুবন চক্রবর্তীর ভাই বলে সহজেই শনাক্ত করা যায়।

কেষ্টভামিনীকে দেখামাত্র ঘৃণায় লোকটির কপাল কুঁচকে যায়। কেষ্টভামিনী কোত্থেকে আসছে সেটা না বলে দিলেও চলে। মেয়েপাড়ার জীবনযাপনের চিরস্থায়ী ছাপ তো আর মুখ থেকে এ জন্মে তুলে ফেলা যাবে না।

লোকটি যে খুবই তেরিয়া মেজাজের সেটা তার গলা শুনেই টের পাওয়া যায়, 'কী চাই?'

বুক কাঁপছিল কেষ্টভামিনীর। হাতজোড় করে সে বলে, 'বাবামাশায় মারা গেচে।'

লোকটা খেঁকিয়ে ওঠে, 'কে বাবামাশায়?'

'ভোবন—ভোবন চক্কোত্তি মাশায়।'

লোকটা এবার চেঁচাতে গিয়েও থমকে যায়। এদিকে তার চিৎকার শুনে আরও কয়েক জন বাড়ির ভেতর থেকে সদর দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। তারা ওই লোকটাকে জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছে মেজদা?'

লোকটা বলে, 'এই মাগীটা বলছে, দাদা নাকি মারা গেছে।'

কেষ্টভামিনী বলে, 'তেনারে শ্মোশানে নে যেতি হবে। মুখে আগুন দেওয়ার জন্যি আপনার লোক দরকার। তাই—'

লোকটা অন্য ভাইদের সঙ্গে নিচু গলায় ফিস ফিস করে কী পরামর্শ করে নেয়। তারপর ঝাঁঝালো স্বরে বলে, 'বেশ্যার নাড়ি টিপে যে এতকাল বেঁচে ছিল তার সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই। যাও, ভাগো।'

'কিন্তু মুখে আগুন—'

কথা শেষ হবার আগে দড়াম করে মুখের ওপর দরজা বন্ধ হয়ে যায়। কেষ্টভামিনী কিছুক্ষণ বিভ্রান্তের মতো দাঁড়িয়ে থাকে ; তারপর ক্লান্তভাবে পা টেনে টেনে রিকশায় গিয়ে ওঠে।

'ভুবন ফার্মেসি'তে ফিরে এসে কেষ্টভামিনী সব জানালে অন্য মেয়েমানুষরা বলে, 'এখুন তা হলে উপায়?'

কেউ উত্তর দেয় না।

অনেকক্ষণ পর কেষ্টভামিনী বলে, 'আমি একটা কথা ভেবিচি।'

'কী?'

'কারোরে যখন পাচ্চি না, বাবামাশায়ের মুখে আমরাই আগুন দেব।'

মেয়েমানুষগুলো ভীষণ চমকে ওঠে। টগর বলে, 'কিন্তুক বাবামাশায় যে বামুন।' অর্থাৎ তাদের কাছে ব্রাহ্মণের মুখাগ্নি করার মতো মহাপাপ আর হয় না।

ভুবন চক্রবর্তীর ভাইদের কাছে যাবার আগে কেষ্টভামিনীর মধ্যে যে দুর্বলতা আর দিশেহারা ভাবটা ছিল সেটা এর মধ্যে অনেকখানি কাটিয়ে নিয়েছে সে। কেষ্টভামিনী জানায়, বামুন হোক আর যা-ই হোক, ভুবন চক্রবর্তী তাদের বাবামাশাই। জন্মটাই নেহাত দেয়নি, নইলে পিতার যাবতীয় কর্তব্যই অকাতরে পালন করে গেছে। মৃত্যুর পর মুখাগ্নি ছাড়া তার সৎকার হবে, তা ভাবা যায় না। মুখে সামান্য একটু অগ্নিস্পর্শের জন্য ভুবনের পরলোকের পথ দুর্গম হয়ে উঠুক সেটা একেবারেই চায় না সে।

মেয়েমানুষগুলোর দ্বিধা তবু কাটে না। তারা বলে, 'কিন্তুন—'

কেষ্টভামিনী বলে, 'লরকে তো ডুবেই আচি। বামুনের মুখে আগুন ঠেকিয়ে আর কত ডুবব! মরার পর আমাদের কী হবে, তা লিয়ে ভেবে কী হবে!'

মেয়েরা আর আপত্তি করে না।

কাজেই খেলো কঠের সস্তা একখানা খাট আসে, সেই সঙ্গে ফুল, খই। সযত্নে খাটে তোলা হয় ভুবনকে।

আরও কিছুক্ষণ পর এ অঞ্চলের মানুষজন অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করে সাতাশটি ওঁচা মেয়েমানুষ খই ছড়িয়ে হরিধ্বনি দিতে দিতে খাটে শায়িত ভুবন চক্রবর্তীর নশ্বর দেহ কাঁধে তুলে শ্মশানের দিকে এগিয়ে চলেছে। এমন দৃশ্য মহারাজপুরে আগে আর কখনও দেখা যায়নি।

শ্মশানটা শহরের শেষ মাথায় একটা মজা নদীর পাড়ে। সেখানে এসে ডোমকে দিয়ে চিতা সাজায় কেষ্টভামিনীরা। কাছাকাছিই থাকে শ্মশানের পুরুত নীলকণ্ঠ

ভটচায। টগর গিয়ে তাকে ডেকে আনে।

এক সময় মন্ত্র পড়ে সাতাশটি মেয়েমানুষকে দিয়ে ভুবনের মুখাগ্নি করায় নীলকণ্ঠ। তারপর ডোম, যার নাম জগা, চিতায় আগুন ধরিয়ে দেয়।

ভুবনের দেহ এই পৃথিবী থেকে চিরকালের মতো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার পর মেয়েমানুষগুলো নদীতে স্নান করে মেয়েপাড়ায় ফিরে যায়।

কয়েক দিন বাদে শ্মশানের লাগোয়া নদীর পাড়ে সকাল বেলায় শ্রাদ্ধের আসর বসে। সাতাশটি মেয়ে স্নান করে নতুন কাপড় পরে, শুদ্ধ মনে জোড়হাতে আসর ঘিরে বসে থাকে।

সবার বড় বলে শ্রাদ্ধের অধিকারটা কেষ্টভামিনীর ওপরেই বর্তেছে। পুরুত নীলকণ্ঠ ভটচাযের সঙ্গে গলা মিলিয়ে সে মন্ত্র পড়ে যায়........

'ইদং নীরমিদং ক্ষীরং স্নাত্বা পীত্বা সুখী ভবঃ

নমঃ আকাশস্থঃ বায়ুভূতঃ নিরাশ্রয়ঃ।

ইদং নীরমিদং—'

মন্ত্রোচ্চারণের একটানা গম্ভীর সুর সমস্ত চরাচরের ওপর ছড়িয়ে যেতে থাকে।

অনুপ্রবেশ

এখনও ভাল করে ভোর হয়নি, রোদ উঠতে অনেক দেরি, এই সময় দলটা নর্থ বিহারের উঁচু হাইওয়ে থেকে নিঃশব্দে, পোকার মতো চুপিসারে কাচ্চী অর্থাৎ কাঁচা সড়কে নেমে আসে।

দুই পরিবারের নানা বয়সের মেয়ে পুরুষ মিলিয়ে মোট আটটি মানুষ। এক পরিবারে ফরিদ এবং তার দাদী হাবিবা। অন্যটায় রাশেদারা। রাশেদা, তার আব্বা, আম্মা, দুই ছোট ভাই আর এক বয়স্ক রুগ্ণ ফুফু অর্থাৎ পিসি।

পুরুষদের পরনে লুঙ্গি বা পাজামা, শার্ট, তার ওপর চাদর কিংবা মোটা রোঁয়াওলা পুলওভার। মেয়েরা পরেছে ঢোলা সালোয়ার কামিজ আর চাদর। সবার মাথায় বা হাতে নানা লটবহর—টিনের ঢাউস বাক্স, বেতের টুকরি, বাঁশের ঝুড়ি, কাপড়ের ব্যাগ, পোঁটলা-পুঁটলি ইত্যাদি।

এরা ছাড়া সকলের আগে আগে রয়েছে মধ্যবয়সী শওকত। সে ফরিদের দূর সম্পর্কের চাচা এবং আট জনের মনুষ্যবাহিনীটির গাইড।

ফাল্গুনের আধাআধি কেটে গেল। তবু বিহারের এই অঞ্চলে শীতের মেজাজ খানিকটা থেকেই গেছে। বিশেষ করে সন্ধের পর থেকে রোদ ওঠার আগে পর্যন্ত সময়টায়।

কিছুক্ষণ আগে চাঁদ ডুবে গেছে। মাথার ওপর বিশাল আকাশ জুড়ে রুপোর বুটির

মতো অগুনতি তারা। একফোঁটা মেঘ নেই কোথাও। তবে অন্ধকারের সঙ্গে সাদা কুয়াশা মিশে চারিদিক ঝাপসা হয়ে আছে। অদৃশ্য, টান টান স্রোতের মতো ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে যাচ্ছে হু হু করে। গায়ে লাগলে কাঁটা দেয়।

কাঁচা সড়কের দু'ধারে ঝোপঝাড়, উঁচু উঁচু ঝাঁকড়া পিপর গাছ। তারপর দু'পাশেই ফাঁকা মাঠ। দূরে বা কাছাকাছি গাঁ আছে কিনা বোঝা যায় না। যেদিকে যতদূর চোখ যায় সব অসাড়, নিঝুম। ঘুমের আরকে সমস্ত চরাচর ডুবে আছে।

চারপাশে অন্ধকারে আলোর ছুঁচের মতো ফোঁড় দিয়ে দিয়ে হাজার জোনাকি উড়ছে। পিপর গাছের ফোকর থেকে মাঝে মাঝে কামার পাখিদের কর্কশ চিৎকার ভোররাতের অগাধ শান্তিকে চুরমার করে দিচ্ছে। এ ছাড়া এই স্তব্ধতার মধ্যে একটানা সাঁই সাঁই একটা শব্দ অনবরত শোনা যাচ্ছে। সেটা হল রাশেদার ফুফু আনোয়ারার বুকের ভেতর থেকে উঠে আসা হাঁপানির টানের আওয়াজ। বোঝা যায়, তার চিরস্থায়ী শ্বাসকষ্টটা মারাত্মক বেড়ে গেছে।

চাপা, ক্ষীণ গলায় টেনে টেনে আনোয়ারা জিজ্ঞেস করে, 'আউর কিতনি দূর শওকতভাই?' কথা শেষ করে জোরে জোরে হাঁপাতে থাকে সে। এখানে, এই আকাশের নিচে এত বিশুদ্ধ বাতাস, তবু তার অকেজো ফুসফুসকে চাঙ্গা করে তোলার পক্ষে যেন পর্যাপ্ত নয়।

শওকত চলার গতি কমায় না। চলতে চলতেই দ্রুত পেছন ফিরে একবার তাকায় শুধু। বলে, 'এই নজদিগ। জোরে পা চালিয়ে এস।'

'আর যে পারছি না। বহোত কমজোর লাগছে। চোখের সামনে বিলকুল সব আন্ধেরা, কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। জরুর মাটিতে পড়ে যাব।' আনোয়ারার গলার ভেতর থেকে কথাগুলো গোঙানির মতো বেরিয়ে আসতে থাকে।

'উপায় নেই বহেন। সূরয ওঠার আগে আমাদের পৌঁছুতেই হবে। এখনও লগভগ তিন মিল (মাইল) রাস্তা।' বলতে বলতে মুখ ফিরিয়ে নেয় শওকত, 'দুনিয়ার কার নজরে পড়ার আগেই এই সড়ক পেরিয়ে যেতে হবে। কেউ দেখে ফেললে বহোত মুসিবত।'

এরপর আনোয়ারার আর কিছু বলার থাকে না। তার মাথা টলছিল। তবু তারই মধ্যে প্রাণপণে, দুর্বল জীর্ণ শরীরের শেষ শক্তিটুকু জড়ো করে অন্ধের মতো এলোপাথাড়ি পা চালাতে থাকে।

আনোয়ারার ঠিক পেছনেই ছিল ফরিদ। তার মাথায় প্রকাণ্ড টিনের ট্রাঙ্ক, ডান হাত দিয়ে সেটা ধরে রেখেছে। বাঁ কাঁধ থেকে ঝুলছে একটা বড় চটের ব্যাগ। সে আনোয়ারাকে লক্ষ করছিল। টলতে টলতে আনোয়ারা যখন প্রায় হুড়মুড় করে পড়ে যাচ্ছে, সেই সময় বাঁ হাত বাড়িয়ে তাকে ধরে ফেলে ফরিদ। বলে, 'আমাকে ধরে ধরে চলুন ফুফু।'

আনোয়ারা বলে, 'তোমার মাথায় এত ভারী সামান। আমি হাত ধরলে সামলাতে পারবে না।'

'পারব।'

ফরিদের বাঁ হাত এবং কাঁধের ওপর শরীরের খানিকটা ভার রেখে হাঁটতে থাকে আনোয়ারা। বলে, 'বেটা ফরিদ, আমার কী মনে হচ্ছে জানো?'

ফরিদ বলে, 'কী?'

'শেষ পর্যন্ত আর পৌঁছুতে পারব না। তার আগেই এই সড়কের ধারে আমাকে তোমাদের গোর দিতে হবে।'

'এ সব বলতে নেই। আমরা সবাই জিন্দা পৌঁছুব। হুঁশিয়ার হয়ে পা ফেলুন।'

আনোয়ারা আর কিছু বলে না। তার ফুসফুসের ভেতর থেকে সাঁই সাঁই আওয়াজটা বেরুতেই থাকে।

মালপত্র এবং একটি মানুষের ভার নিয়ে চলতে চলতে ফরিদের মনে হয়, পরিচিত দুনিয়ার বাইরে কোনও তুখোড় বাজিকরের ম্যাজিকে তারা বহুদূরের অচেনা ঘুমন্ত, এক গ্রহে এসে পড়েছে।

তিনদিন আগে টাউটেরা মাথাপিছু দুশ' টাকা আদায় করে তাদের আট জনকে পশ্চিম বাংলার বর্ডার পার করিয়ে দেয়। এপারেও সেই একই ব্যবস্থা। প্রতিটি মানুষের জন্য দুশ' টাকাই গুনে দিতে হয়, এক পয়সা কমবেশি না।

বর্ডার থেকে সোজা কলকাতায়। সেখান থেকে ট্রেনে কাটিহার। কাটিহার থেকে ব্রাঞ্চ লাইনের অন্য একটা ট্রেনে সন্ধেবেলা ফরিদরা কামতাপুরে এসে নেমেছিল। সেখানে অপেক্ষা করছিল শওকত। সে-ই তাদের খানিকটা রাস্তা বয়েল গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে আসে। তারপর মাঝরাত থেকে শুরু হয়েছে অনবরত হাঁটা। শওকতের কথা যদি ঠিক হয়, আরও মাইলতিনেক তাদের হাঁটতে হবে।

ফরিদের বয়স তেইশ। তার জন্ম সাবেক ইস্ট পাকিস্তানে, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার ছ'বছর আগে।

সে শুনেছে, সাতচল্লিশে ইণ্ডিয়া দু ভাগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার দাদা অর্থাৎ ঠাকুরদা মুদাস্‌সর আলি বিবি এবং ছেলেমেয়ে নিয়ে বিহার থেকে ঢাকায় চলে যায়। ছেচল্লিশে বিহারে যে মারাত্মক দাঙ্গা হয়েছিল, সেই সময় তাদের বাড়িঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ফরিদদের কেউ মারা না গেলেও, চেনাজানা অনেকেই খুন হয়েছিল। তখন চারিদিকে শুধু হত্যা, আগুন, রক্তস্রোত, লাশের পাহাড়, অবিশ্বাস, ঘৃণা আর উন্মত্ততা। এই বিষাক্ত আবহাওয়ায় আতঙ্কে মুদাস্‌সরদের শ্বাস আটকে আসছিল। একটা মুহূর্তও আর নিরাপদ মনে হচ্ছিল না। পুরুষানুক্রমে দুশ' বছর ধরে যেটা তাদের স্বদেশ, তা ফেলে এক শীতের রাতে তারা পালিয়ে যায়। পেছনে পড়ে থাকে জমিজমা এবং পোড়া বাড়ির ধ্বংসস্তূপ।

ঢাকায় গিয়ে বেশিদিন বাঁচেনি মুদাস্‌সর আলি। এক বছরের ভেতরেই তার এন্তেকাল হল। তখন তার একমাত্র ছেলে রহমত পূর্ণ যুবক। সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব সে নিজের কাঁধে তুলে নেয়। প্রথম দিকে এটা সেটা করে নানারকম উঞ্ছবৃত্তিতে দিন কেটেছে। সকাল থেকে মাঝরাত পর্যন্ত সংসারটাকে বাঁচাবার জন্য জিনের মতো খেটে গেছে সে। হাতে কিছু টাকা জমলে এবং আরও কিছু 'করজ' নিয়ে একটা রেডিমেড

পোশাকের দোকান দেয়। দু-তিন বছরের মধ্যে ব্যবসা জমে ওঠে। এরপর একমাত্র বোন মালেকার বিয়ে দিয়ে নিজেও শাদি করে রহমত। সাদির সাত বছরের মাথায় ফরিদের জন্ম।

নানা দুর্যোগ এবং টালমাটালের পর জীবনটাকে রহমত যখন মোটামুটি গুছিয়ে এনেছে, সেই সময় পর পর দু'টি মৃত্যু তাকে অনেকটা টলিয়ে দিয়ে যায়। প্রথমে মারা যায় মালেকা, তারপর ফরিদের আম্মা আমিনা। এই শোকও একসময় থিতিয়ে আসে। তবে মন এতই ভেঙে গিয়েছিল যে ঘর-সংসার বা রোজগারের দিকে তেমন নজর ছিল না। নেহাত যেটুকু না করলে নয়, সেটুকুই করে গেছে। বাড়িতে ফরিদকে আগলে রাখত তার দাদী হাবিবা।

এইভাবে কোনওরকমে চলে যাচ্ছিল। তারপর হঠাৎ একদিন পূর্ব পাকিস্তানে শুরু হয়ে যায় মুক্তিযুদ্ধ। একই ধর্ম, তবু বাঙালি আর অবাঙালি মুসলমানদের মধ্যে তখন চরম অবিশ্বাস, ঘৃণা এবং বিদ্বেষ, ঠিক যেমনটি দেখা গিয়েছিল দেশভাগের ঠিক আগে আগে সেই ভয়াবহ দাঙ্গার দিনগুলোতে। তখন প্রতিপক্ষ ছিল অন্য ধর্মের মানুষ। পাকিস্তানের খুনী সাঁজোয়া বাহিনী ব্যারাক থেকে ট্যাঙ্ক, মেশিনগান আর অটোমেটিক রাইফেল নিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিল। গাঁয়েগঞ্জে এবং শহরে শহরে গড়ে উঠেছিল প্রবল প্রতিরোধ। তখন সারাদিনই চারিদিকে গুলির শব্দ, ট্যাঙ্কের কর্কশ আওয়াজ, বারুদের গন্ধ, লাশের পাহাড়, রক্তের নদী, ধর্ষণ, হত্যা, আগুন আর বিপন্ন বিধ্বস্ত মানুষের আর্ত চিৎকার।

রহমত আলি নিতান্ত সাদাসিধে মানুষ। রাজনৈতিক কূটকচাল তার মাথায় ঢুকত না। নিজের দোকান আর ভাঙাচোরা সংসারের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে অন্য কোনওদিকে তার নজর যেত না। কিন্তু চারপাশে যখন আগুন জ্বলছে, তার আঁচ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা অসম্ভব। একদিন তার দোকান জ্বালিয়ে দেওয়া হল, প্রচণ্ড মারও দেওয়া হয় তাকে, নেহাত আয়ুর জোরে সে বেঁচে যায়।

একদিন নিরাপত্তার কারণে হিন্দুস্থান থেকে ঢাকায় চলে এসেছিল সে। পূর্ব পাকিস্তানকেই গভীর আবেগে নতুন স্বদেশ ভেবে নিয়েছিল। মনে হয়েছিল, সব আতঙ্ক ভয় অনিশ্চয়তা আর দুর্ভাবনা কেটে গেল। কিন্তু এবার তারা কোথায় যাবে?

একদিন মুক্তিযুদ্ধ থামে। জন্ম নেয় নতুন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। বাতাস থেকে বারুদের গন্ধ, মাটি থেকে রক্তের দাগ মুছে যায়। কিন্তু উর্দুভাষী অবাঙালি মুসলমানদের সম্পর্কে বিদ্বেষ সন্দেহ আর ঘৃণাটা থেকেই যায়।

তবু বেঁচে তো থাকতে হবে। রহমত জোড়াতাড়া দিয়ে আবার দোকান খোলে কিন্তু আগের মতো বেচাকেনা নেই। কামাই ভীষণ কমে যায়।

এদিকে স্থির হয়েছিল, পাকিস্তান উর্দুভাষী বিহারী মুসলমানদের ঢাকা থেকে নিয়ে যাবে। দু-চারজনকে নিয়েও যায় কিন্তু কয়েক লাখ মানুষ বাংলাদেশে পড়ে থাকে প্রচণ্ড অনিশ্চয়তার মধ্যে।

দিনের পর দিন কেটে যায়। বছরের পর বছর। পাকিস্তান থেকে রহমতদের নেবার জন্য প্লেন বা জাহাজ কোনওটাই আসে না।

এদিকে ফরিদ বড় হচ্ছিল। ক্রমশ স্কুল পেরিয়ে সে কলেজে যায়। কিন্তু বি. এ পরীক্ষায় বসার আগেই রহমত আলি দশ দিনের জ্বরে মারা গেল। এরপর পড়ার খরচ জোগাবে কে? ফরিদ কলেজ ছেড়ে দেয়। শুধু পয়সার অভাবের জন্য না, তীব্র হতাশায় তখন সে ভুগছে। কষ্ট করে বি. এ'র ডিগ্রিটা জোগাড় করতে পারলেও তার চাকরি হবে না। বাংলাদেশে তার ভবিষ্যৎ কী?

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেখতে দেখতে সতের বছর কেটে যায়। ইণ্ডিয়ার পার্টিশনের সময় যে বিহারী মুসলমানেরা তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে চলে এসেছিল তাদের বেশির ভাগই এখনও স্বপ্ন দেখে, লাহোর করাচি বা ইসলামাবাদ থেকে যে কোনওদিন প্লেন এসে তাদের তুলে নিয়ে যাবে। কিন্তু কিছু মানুষ আছে, তাদের বিশ্বাসে রীতিমত চিড় ধরে গেছে। আর তারা করাচি লাহোরের প্লেনের ভরসা করে না। রাত্তিরে মীরপুরের উর্দুভাষীদের এলাকায় বসে গোপনে পরামর্শ করে, ইন্ডিয়াতে, পূর্বপুরুষের ভিটেয় ফিরে গেলে কেমন হয়? তারা খবর পেয়েছে পাকিস্তান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই সাতচল্লিশে যে উর্দুভাষীরা করাচিতে চলে গিয়েছিল সেখানকার আদি বাসিন্দারা তাদের আদৌ পছন্দ করে না। উড়ে এসে জুড়ে বসা মোহাজিরদের সম্পর্কে তাদের প্রচণ্ড বিরূপতা। দাঙ্গা এবং খুন সেখানে লেগেই আছে। রুটির ভাগ কে আর অন্যকে দিতে চায়?

বেশ কিছুদিন পরামর্শের পর তারা মনস্থির করে ফেলে। সুদূর লাহোর বা করাচি থেকে বিহারের সেই গ্রামগুলি—যেখানে পুরুষ পরম্পরায় তাদের বাপ-দাদারা বাস করেছে—অনেক বেশি পরিচিত এবং কাছের। কিন্তু মুখের কথা খসালেই তো সেখানে যাওয়া যায় না। এক স্বাধীন দেশ থেকে আরেক স্বাধীন দেশে যাওয়া সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু আইন-কানুন যা-ই থাক, দুনিয়ায় টাউটেরাও থাকে। রাতের অন্ধকারে তারা মীরপুরে হানা দিতে শুরু করে। তারাই জানিয়ে দিয়েছিল প্রথমে কোথায় গিয়ে উঠতে হবে। এমন একটা ফাঁকা জায়গার খোঁজ টাউটেরা দিয়েছিল যার আশেপাশে বসতি নেই। তা ছাড়া একসঙ্গে অনেকের যাওয়া বিপজ্জনক। লোকের চোখে পড়ে গেলে হই চই হবে। তাদের পরামর্শ হল, ছোট ছোট দলে আট-দশজন করে যাওয়া অনেক নিরাপদ। কিছুদিন পর যাওয়া বিলকুল বন্ধ। তারপর প্রতিক্রিয়া দেখে ফের অন্যদের যাবার ব্যবস্থা করা হবে।

ছক মাফিক প্রথম দলটা আসে পনের দিন আগে। তাদের সঙ্গে এসেছিল শওকত। সে চটপটে, চৌখস, ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। তারপর থেকে প্রায় রোজই দু-তিনটে করে ফ্যামিলি আসছে। আজ এসেছে ফরিদরা।

রাশেদাদের আজ আসার কথা ছিল না। তার ফুফু আনোয়ারার খুবই শ্বাসকষ্ট চলছিল। ঠিক হয়েছিল, সে কিছুটা সুস্থ হলে পরের কোনও একটা দলের সঙ্গে ওরা আসবে। তবু যে আসতে হল, তার কারণ রাশেদা।

রাশেদার সঙ্গে ফরিদের শাদির কথাবার্তা এবং দেনমোহর অনেক আগে থেকেই পাকা হয়ে আছে। শাদিটা যে হয়নি তার কারণ ফরিদের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। স্থায়ী রোজগারের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত বিয়ের কথা ভাবতে পারে না ফরিদ।

রাশেদা চায়নি তাদের ঢাকায় ফেলে আগেই ফরিদরা চলে যায়। কেঁদেকেটে এবং জেদ ধরে এমন এক কাণ্ড সে করে বসে যে শেষ পর্যন্ত তার আব্বা এবং আম্মাকেও বাক্স বিছানা গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হয়।

আগে থেকেই ঠিক করা আছে, কামতাপুর স্টেশনে রোজ অপেক্ষা করবে শওকত। সীমান্তের ওপার থেকে যারা আসবে তাদের জায়গামতো নিয়ে যাবে। আজও সে ফরিদদের নিয়ে চলেছে।

মুখ বুজে চুপচাপ সবাই হাঁটছিল। হঠাৎ রাশেদার আব্বা রমজান ডেকে ওঠে, 'শওকতভাই—'

মুখ না ফিরিয়েই সাড়া দেয় শওকত, 'হাঁ—'

'আমরা যেখানে যাচ্ছি সেখানকার হালচাল কেমন?'

'এখনও গোলমাল হয়নি। তবে—'

'কী?'

'আমরা যে এসেছি, সেটা মনে হয় ওদিকের লোকেরা জেনে গেছে।'

খানিকটা পেছনে, মাথায় বাক্স আর কাঁধের ব্যাগ সামলে, আনোয়ারাকে ধরে ধরে নিয়ে আসছিল ফরিদ। এখন শরীরের সব ভার তার ওপর ছেড়ে দিয়েছে আনোয়ারা।

শওকতের কথাগুলো কানে আসতে চমকে ওঠে ফরিদ। রমজান জবাব দেবার আগেই সে বলে, 'শুনেছিলাম জায়গাটা ফাঁকা মাঠ, ওখানে লোকজন থাকে না।'

শওকত বলে, 'বিলকুল ঠিক।'

'তা হলে?'

ফরিদের প্রশ্নটার মধ্যে যে ইঙ্গিত ছিল তা বুঝতে অসুবিধা হয় না শওকতের। সে বলে, 'আরে বেটা, মানুষের আঁখ আর কানের মতো খতারনাক চীজ দুনিয়ায় আর একটাও পাবে না। জঙ্গলেই যাও কি দরিয়াতে গিয়েই লুকোও, কারও না কারও নজরে পড়ে যাবেই। একজন দেখে ফেললে দশ আদমীর কানে উঠতে কতক্ষণ!' লম্বা লম্বা পায়ে রাস্তার দৈর্ঘ্য খানিকটা কমিয়ে দিয়ে আবার সে বলে, 'পরশু খালেদ চার 'মিল' দূরে বারহৌলির বাজারে আটা ডাল নিমক মরিচ কিনতে গিয়েছিল। সেখানে শুনে এসেছে, লোকেরা আমাদের ব্যাপারে বলাবলি করছিল। আমরা কোত্থেকে এসেছি, আচানক মাঠের দখল নিলাম কী করে—এই সব। বুঝতেই পারছ, জরুর কেউ না কেউ আমাদের দেখে গেছে।'

পুরো তিনটে দিন ভাল করে খাওয়া হয়নি, ঘুম হয়নি। ট্রেনে, বাসে, সাইকেল রিকশায়, বয়েল গাড়িতে এবং পায়ে হেঁটে অনবরত তারা চলেছেই, চলেছেই। অসীম ক্লান্তিতে হাত-পা এবং কোমরের জোড় যেন আলগা হয়ে গেছে। ধুঁকে ধুঁকে এবড়োখেবড়ো কাঁচা সড়কে টক্কর খেতে খেতে কোনওরকমে শরীরটা খাড়া রেখে তারা হাঁটছিল। শওকতের কথাগুলো তাদের শিরদাঁড়ার ভেতর অনেকখানি আতঙ্ক ঢুকিয়ে দেয়। সবার প্রতিনিধি হিসেবেই যেন রমজান বলে, 'এখানে থাকতে পারব তো শওকত ভাই?'

শওকত গলায় জোর দিয়ে বলে, 'কোসিস তো করনা পড়েগা। ডরো মাত রমজান

ভাই। একটা কিছু ব্যওস্থা জরুর হয়ে যাবে।'

বিশ ফুট পেছনে আসতে আসতে শওকতের দিকে সসম্ভ্রমে তাকায় ফরিদ। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে এই মানুষটাকে দেখে আসছে। সে শুনেছে, সাতচল্লিশে বিহারের দেহাত থেকে আরও হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে সে-ও ইস্ট পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল। অতি সাধারণ গরিব বিহারীরা গোড়ার দিকে যে ঢাকায় গুছিয়ে বসতে পেরেছিল সে জন্য শওকতের ভূমিকা কম নয়। সবার জন্য সুযোগ সুবিধা আদায় করতে একে ধরা, ওর কাছে আর্জি জানানো, তাকে সেলাম ঠোকা—কী না করেছে সে! আবার চল্লিশ বছর বাদে এই যে প্রায় রোজ ছোট ছোট দলে মানুষ বর্ডার পেরিয়ে তাদের পূর্বপুরুষের দেশে চলেছে, তাতেও তার প্রবল উৎসাহ। কখনও ভেঙে পড়ে না শওকত, হতাশায় তার শিরদাঁড়া দুমড়ে যায় না, কোনও অবস্থাতেই হার মানতে শেখেনি। জীবন সম্পর্কে চূড়ান্ত আশাবাদী এই মানুষটাকে শ্রদ্ধা করে ফরিদ।

এদিকে রমজান আর কিছু বলে না। গভীর উৎকণ্ঠা তার ভেতরকার শেষ জীবনীশক্তিটুকুকে যেন চুরমার করে দিতে থাকে।

তারা চলেছে তো চলেছেই।

হাঁটতে হাঁটতে একসময় অন্যমনস্ক হয়ে যায় ফরিদ। স্কুলে এবং কলেজে খানিকটা ইতিহাস পড়েছে সে। হিন্দু বা বৌদ্ধ আমলের কথা সে বলতে পারবে না। সেই সব সময়ে তাদের বংশের আদি পুরুষেরা কোথায় ছিল, কী-ই তখন তাদের পরিচয়, সে সম্পর্কে আদৌ কোনও ধারণা নেই ফরিদের। গত দুশ' বছরের কথাই সে শুধু বলতে পারে। কয়েক জেনারেশান ধরে তখন তারা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার প্রজা—ভারতীয় মুসলমান। দেশভাগের পর ঢাকায় গিয়ে তারা হয়ে যায় পাকিস্তানী। তারপর নিশ্চিতভাবে না হলেও বাংলাদেশে থাকার কারণে হয়ত বা বাংলাদেশী। আর এই মুহূর্তে ভোরের ঝাপসা আকাশের তলায় ইণ্ডিয়ার মাটির ওপর যখন পা ফেলে ফেলে এগিয়ে চলেছে তখন তাদের কী আইডেনটিটি, সে জানে না।

ইতিহাসের সেই আদিযুগের দেশহীন পরিচয়হীন অভিযানকারীদের মতো তারা চলেছে একটি স্বদেশের জন্য, একটি সুনিশ্চিত আইডেনটিটির সন্ধানে। আদৌ তা পাওয়া যাবে কিনা, কে বলবে!

সূর্য ওঠার ঠিক আগে আগে কাচ্চী অনেকটা তফাতে রেখে বিশাল এক পড়তি জমির মাঝখানে পৌঁছে যায় ফরিদরা।

এখানে বাঁশ টালি চট আর বাতিল পুরনো টিন দিয়ে তিরিশ চল্লিশটা ঘর তোলা হয়েছে। ঢাকা থেকে আগে যারা চলে এসেছিল, এই ঘরগুলো তাদের।

নির্জন নিঝুম মাঠের মাঝখানে রাতারাতি গজিয়ে ওঠা এই ছন্নছাড়া উপনিবেশে এখনও কারও ঘুম ভাঙেনি।

শওকত বলে, 'পোঁহচ গিয়া। তিন রোজ বহোত তখলিফ গেছে তোমাদের। এবার আরাম কর।'

ঘাড় এবং মাথা থেকে লটবহর নামিয়ে সবাই মাটিতে শরীর এলিয়ে বসে পড়ে।

তাড়াতাড়ি ময়লা চাদর পেতে আনোয়ারাকে শুইয়ে দেওয়া হয়। এতটা আসার ধকলে তার বুকে এখন একসঙ্গে দশটা হাপর ওঠানামা করছে।

ফরিদ একধারে বসে অসীম আগ্রহে চারিদিক লক্ষ করছিল। শওকত সঠিক খবরই দিয়েছে। এখান থেকে যেদিকে যতদূর চোখ যায়, কোথাও মানুষজন বা দেহাতের চিহ্নমাত্র নেই। আকাশ যেখানে পিঠ বাঁকিয়ে দিগন্তে নেমেছে একদিকের কাঁকুরে ভাঙা ততদূর ছড়ানো। আরেক দিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে মজা বিল। শ্যাওলা আর লম্বা লম্বা ডাঁটিওলা জলজ ঘাসে সেটা বোঝাই। বিলের ধার ঘেঁষে প্রচুর ঝোপঝাড় আর বিরাট বিরাট সিমার এবং কড়াইয়া গাছ। গাছগুলোর মাথায় অগুনতি বক ডানা মুড়ে চুপচাপ বসে আছে।

এদিকে গলা তুলে শওকত ডাকাডাকি শুরু করে দিয়েছে, 'আরে ওসমান ভাইয়া, রুস্তম, নবাবজান, রহিমা চাচী—আর কত ঘুমোবে! ওঠ ওঠ, উঠে পড়। ওরা এসে গেছে।'

প্রথমে দু-একজন, তারপর একে একে শ'খানেক মানুষ ঘরগুলো থেকে বেরিয়ে আসে। ফরিদদের দেখে বলে, 'আ গিয়া তুমলোগ?'

রমজান নির্জীব স্বরে বলে, 'হাঁ। লেকেন বিলকুল মর গিয়া।'

ওসমান বলে, 'হাঁ, পয়দল অনেকটা রাস্তা আসতে হয়। পা আর কোমরের হাড্ডি বেঁকে যায়। পথে কোনও গোলমাল হয়েছে?'

'নেহী।'

'ইণ্ডিয়ার লোকজন সন্দেহ করেনি?'

'নেহী।'

'না করারই কথা। ইতনা বড়ে দেশ। কড়োর কড়োর (কোটি কোটি) আদমী। এখানে কে কার খবর রাখে!'

এরপর ঠিক হয়, আগে এসে যারা ঘর তুলেছে, তাদের কাছে ভাগাভাগি করে ফরিদরা দু-চারদিন থাকবে। তারপর বারহৌলির বাজার থেকে টালি বা পুরনো টিন কিনে এনে নিজেদের ঘর তুলে নেবে।

ফরিদ দূরমনস্কর মতো সবার কথা শুনছিল। আসলে বর্ডার পেরিয়ে এপারে আসতে আসতে নিজের মধ্যে তিনদিন আগে এক ধরনের উত্তেজনা টের পেয়েছিল সে। এখন, এই বিশাল মাঠের মাঝখানে এসে আচমকা সেটা কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। সে শুনেছে, এখান থেকে মনপথল গাঁ খুব দূরে নয়। মনপথল থেকেই চল্লিশ বছর আগে তার দাদা বিবি-ছেলেমেয়ে নিয়ে ইস্ট পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল। পূর্বপুরুষের সেই গ্রামটা দেখার জন্য প্রচণ্ড অস্থিরতা এই মুহূর্তে একগুঁয়ে জিনের মতো তার কাঁধে যেন চেপে বসে।

হঠাৎ ফরিদ জিজ্ঞেস করে, 'শওকতচাচা, মনপথল গাঁও কোথায়?'

অন্যাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ঘাড় ফিরিয়ে ফরিদের দিকে তাকায় শওকত। বলে, 'এখান থেকে চার 'মিল' তফাতে বারহৌলি বাজার। সেখান থেকে আরও দু 'মিল' গেলে মনপথল। কেন জানতে চাইছ?'

'আমি আমাদের গাঁও দেখতে যাব।'

শওকত বলে, 'এখন না বেটা। আরও কিছুদিন দেখি, হালচাল ভাল করে বুঝি। গাঁও তো নজদিগ রইলই। সময় হলে যখন ইচ্ছা যেতে পারবে। আমারও তো ওই একই গাঁও, আমিও এখন পর্যন্ত যাইনি।'

এখানে যারা এসেছে তাদের সবাই মনপত্থল এবং তার চারপাশের গ্রামগুলো থেকে একদিন ঢাকায় চলে গিয়েছিল। তারাও শওকতের সঙ্গে গলা মিলিয়ে জানায়, এখন পর্যন্ত কেউ পুরনো পিতৃভূমি দেখতে যায়নি। শুধু নিজেদের পুরনো গাঁওতেই না, অন্য কোনদিকেও তারা পা বাড়ায়নি। ভয়ে ভয়ে, চাপা আতঙ্ক নিয়ে এই কাঁকুরে জমিতেই মুখ গুঁজে পড়ে আছে। তবে দু-একজন খুব সতর্ক ভঙ্গিতে বারহৌলি বাজারে কিছু কেনাকাটা করতে গিয়েছিল।

এদের মনোভাব বুঝতে পারছিল ফরিদ। কেউ কোনওরকম ঝুঁকি নিতে চায় না। চল্লিশ বছর আগে এটা তাদের দেশ ছিল ঠিকই, কিন্তু এখন তারা এ দেশের কেউ না। পিতৃভূমি বা জন্মভূমি দেখতে গিয়ে যদি বিপন্ন হতে হয়, তাই সেদিকে কেউ পা বাড়ায়নি।

ফরিদ আর কিছু বলে না।

শওকত এবার তাদের ব্যবস্থা করে দেয়। হাবিবা আর ফরিদ তাদের ঘর না তোলা পর্যন্ত থাকবে ওসমানদের সঙ্গে। রাশেদা আর আনোয়ারা থাকবে নবাবজানদের কাছে। রাশেদার দুই ভাই এবং আব্বা-আম্মার দায়িত্ব নেবে রুস্তম আর গহর শেখ।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর ঘরগুলোর সামনে ফরিদরা শওকতকে ঘিরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে। আজ আর ঢাকা থেকে কেউ আসবে না, তাই শওকতের কামতাপুরে যাওয়ার তাড়া নেই।

মাথার ওপর ঝকঝকে নীলাকাশ। সূর্য তার ঢালু গা বেয়ে পশ্চিমে নামতে শুরু করেছে। রোদে তাত থাকলেও গা পুড়িয়ে দেবার মতো নয়। প্রচুর উলটোপালটা হাওয়া বয়ে যাচ্ছে ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে। ফাল্গুনের রোদের সঙ্গে হাওয়া থাকায় মোটামুটি ভালই লাগছে সবার।

ইণ্ডিয়ায় তাদের ভবিষ্যৎ কী, এই নিয়ে কথা হচ্ছিল।

ফরিদ বলে, 'শওকতচাচা, কতদিন আমরা এখানে লুকিয়ে থাকতে পারব? তুমি আসতে আসতে বলেছিলে, আমাদের খবর অনেকে জেনে গেছে। তারাই আমাদের টেনে বার করবে। কে জানে ভাগিয়ে দেবে কিনা। তা ছাড়া আরও একটা কথা ভাবার আছে।'

শওকত জিজ্ঞেস করে, 'কী?'

'ঢাকা থেকে আমরা কে আর ক'টা পয়সা আনতে পেরেছি! কামাই না করলে না খেয়ে মরতে হবে। সে জন্যেও এখান থেকে বেরুনোটা জরুরি।'

ফরিদের কথাগুলো অনেককে নাড়া দিয়ে যায়। তারা সায় দিয়ে বলে, 'ঠিক ঠিক।'

শওকত গভীর আগ্রহে ফরিদের কথা শুনছিল এবং অন্যদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ

করছিল। সে আস্তে আস্তে বলে, 'বেটা তুমি যা বললে, সব আমার মাথায় আছে। লেকেন সবুর। আমি এখানকার একটা লোকের খোঁজ পেয়েছি। মনে হচ্ছে, তাকে দিয়ে আমাদের অনেক মুশকিল আসান হবে। দো-চার রোজের ভেতর তার সঙ্গে দেখা করব।'

অন্য সবার সঙ্গে গলা মিলিয়ে ফরিদ জিজ্ঞেস করে, 'লোকটা কে?'

শওকত জানায়, তার নাম এখন বলা যাবে না। সে পলিটিক্যাল পার্টির জবরদস্ত লিডার। তার নামে এ অঞ্চলে বাঘ আর বকরি একঘাটে জল খায়। সে-ই একমাত্র তাদের বাঁচাতে পারে। তবে তার সঙ্গে যোগাযোগ করা খুব সহজ ব্যাপার না।

ফরিদ এবং আরও অনেকে শ্বাসরুদ্ধের মতো জিজ্ঞেস করে, 'এর খবর তোমাকে কে দিল?'

শওকত বলে, 'বর্ডারের এপারে ওপারে কত ধান্দায় কত দালাল ঘুরে বেড়াচ্ছে, জানো? ধরে নাও তাদের কার কাছ থেকে খবরটা পেয়েছি।'

ফরিদের সংশয় কাটে না। সে বলে, 'যদি লিডারের সঙ্গে দেখা করতে না পার?'

'করতেই হবে। এটা আমাদের বাঁচা-মরার সওয়াল।'

একটু চুপচাপ।

তারপর ফরিদ বলে, 'আরেকটা কথা বলব শওকত চাচা?'

শওকত বলে, 'একটা কেন, দশটা বিশটা, যে ক'টা ইচ্ছা—বল।'

'এই মাঠে পড়ে না থেকে আমাদের গাঁওগুলোতে চলে যাওয়াই তো ভাল। যারা আমাদের জমিনের ওপর বসে আছে তাদের হাতে-পায়ে ধরলে একটু থাকার জায়গা দেবে না?'

ফরিদের সারল্যে হেসে ফেলে শওকত। ছেলেটা প্রচুর লেখাপড়া করলেও অনেক ব্যাপারে একেবারেই ছেলেমানুষ, যেন বহুকাল আগের 'বচপনেই' থেকে গেছে। তার হয়ত ধারণা, দুনিয়াটা পীর-দরবেশে থিক থিক করছে। এদের কাছে হাত পাতলেই যা ইচ্ছা পাওয়া যাবে। শওকতদের মতো মানুষ যারা না ইণ্ডিয়ান, না বাংলাদেশী, না পাকিস্তানী, যারা একটু আশ্রয়ের জন্য লুকিয়ে চুরিয়ে পুরনো স্বদেশে ঢুকে পড়েছে, এখন যদি ফেলে-যাওয়া জমির অংশ চাইতে যায় তার ফলাফল কী হতে পারে, চোখের সামনে ছবির মতো তা দেখতে পায় শওকত। সে ফরিদের কাঁধে একটা হাত রেখে আস্তে আস্তে বলে, 'ফরিদ বেটা, কেউ এক 'ধুর' জমিনও দেবে না। যা খোয়া গেছে তা কোনওদিনই ফেরত পাওয়া যাবে না। সমঝা?'

ফরিদরা আসার পর তিন দিন কেটে যায়। এর মধ্যে আর কিছু মানুষ বর্ডারের ওপার থেকে চলে এসেছে।

আজ চতুর্থ দিন। সকালে উঠে বাসি রুটি আর আখের গুড় দিয়ে নাস্তা করে লোক আনতে কামতাপুরে চলে গেছে শওকত।

বেলা আরেকটু চড়লে ফরিদ ঠিক করে ফেলে, মনপখলে আজ যাবেই। পূর্বপুরুষের জন্মভূমি তাকে যেন প্রবল আকর্ষণে সেদিকে টানতে থাকে।

এখন যে যার ঘরের সামনের তকতকে ফাঁকা জায়গাটায় ঢিলেঢালা বসে কথা বলছে। পুরুষদের রোজগার-ধান্দার ব্যাপার নেই। মেয়েদের অবশ্য কাঠকুটো জ্বেলে ভাজি চাপাটি বানাতে হয়। তবু তাদেরও তেমন তাড়া থাকে না। ভূগোলের হট্টগোল থেকে বহুদূরে এই মাঠের মাঝখানে ঘোর অনিশ্চয়তার মধ্যে দিনরাত শুধু মুখ গুঁজে পড়ে থাকা ছাড়া আপাতত কারও বিশেষ কিছু করার নেই।

ফরিদরা পায়ে পায়ে বিলের দিকে চলে যায়। ওসমানের কাছ থেকে আগেই সে জেনে নিয়েছিল কীভাবে বারহৌলি যেতে হবে। আর বারহৌলিতে একবার পৌঁছুতে পারলে লোকের কাছে জিজ্ঞেস করে ঠিক মনপত্থলে চলে যেতে পারবে।

বিলের কাছাকাছি ফরিদ যখন এসে পড়েছে, সেই সময় শুনতে পায়, 'এই শুনো—'

ঘুরে তাকাতেই ফরিদ দেখতে পায় রাশেদা। বেতের মতো পাতলা, ধারাল চেহারা তার। নাকমুখ কাটা কাটা। গায়ের রং পাকা গমের মতো। বড় বড় চোখ দু'টিতে আশ্চর্য যাদু মাখানো। বয়স উনিশ কুড়ি। ঢাকায় থাকতে মেয়েটা সেই কবে থেকে তাকে নজরে নজরে রেখেছে। তার চোখ এড়িয়ে কিছু করার বা কোথাও একটা পা ফেলার উপায় নেই।

রাশেদা কাছে এগিয়ে এসে বলে, 'কোথায় যাচ্ছ?'

ফরিদ ভেবেছিল মনপত্থলে যাওয়ার ব্যাপারটা কাউকে জানাবে না। বলে, 'কই, কোথাও না। এই এখানে একটু ঘোরাঘুরি করছিলাম।'

'ঝুট।'

'মতলব?'

'তুমি মনপত্থল যাচ্ছ।'

ফরিদ হকচকিয়ে যায়। বলে, 'নেহী নেহী। কে বললে?'

পলকহীন তাকিয়ে ছিল রাশেদা। সে বলে, 'আমার চোখে ধুলো দিতে পারবে না। চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।'

ধরা যখন পড়েই গেছে, তখন কী আর করা। ফরিদ বলে, 'সে অনেক দূর। যেতে ছ'মাইল। ফিরতে আবার ছ'মাইল। তোমার কষ্ট হবে।'

'হোক কষ্ট, আমি তো আর তোমার পায়ে হাঁটব না।'

'না না, ভাল করে ভেবে দেখ।'

'তোমার কোনও বাহানা শুনছি না। আমি যাবই। জানো তো রাশেদা কেমন জিদ্দি।'

অগত্যা হাল ছেড়ে দিতে হয় ফরিদকে।

বিলের পাশ দিয়ে ঝোপঝাড় চিরে একটা সরু কাঁচা রাস্তা চলে গেছে। সেটা ধরে আধ মাইলের মতো হাঁটলে পাকা সড়ক বা পাক্কি। এই পাক্কিটা সোজা গিয়ে ঠেকেছে বারহৌলিতে।

কাঁচা রাস্তা পেরিয়ে পাক্কিতে ওঠে দু'জনে। দু'পাশে ফসলকাটা ফাঁকা মাঠ এবং আকাশে অজস্র পাখি দেখতে দেখতে আর কথা বলতে বলতে যখন তারা বারহৌলি পৌঁছয়, দুপুর হতে তখনও বেশ দেরি।

জায়গাটা রীতিমত গমগমে। ছোটখাট টাউনই বলা যায় বারহৌলিকে। প্রচুর লোকজন। বিজলি বাতি এসে গেছে। সাইকেল রিকশা আর বয়েল গাড়িতে চারিদিক ছয়লাপ। ফাঁকে ফাঁকে অটো আর স্কুটারও চোখে পড়ে। রাস্তার বেশির ভাগই পাকা। দু'ধারে একতলা দোতলা অগুনতি বাড়ি। অবশ্য টিনের এবং টালির ঘরও অজস্র। এরই একধারে জমজমাট বাজার।

মনপথলে গিয়ে খাবার টাবার কিছু পাওয়া যাবে কিনা, কে জানে। ফরিদরা বাজারে এসে মিঠাইয়ের দোকান থেকে বালুসাই, লাড্ডু আর পুরি কিনে, দোকানদারের কাছ থেকে মনপথলে যাওয়ার রাস্তার হদিশ জেনে নিয়ে যখন বেরিয়ে আসে সেই সময় দূর থেকে বহু মানুষের চিৎকার ভেসে আসতে থাকে। ফরিদরা দাঁড়িয়ে যায়।

প্রথম দিকে কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। কিছুক্ষণ পর দেখা যায় রাস্তার মোড় ঘুরে স্লোগান দিতে দিতে বিরাট একটা মিছিল আসছে। এবার কথাগুলো পরিষ্কার শোনা যায়।

'আগলা চুনাওমে আজীবলাল সিংকো—'

'ভোট দেঁ, ভোট দেঁ।'

'সমাজসেবক আজীবলাল—'

'অমর রহে, অমর রহে।'

'দেশপ্রেমী আজীবলাল—'

'যুগ যুগ জীয়ে।'

'আজীবলালকা চিহ্ন—'

'হাঁথী ছাপ জিন্দাবাদ।'

'হাঁথী পর—'

'মোহর মারো, মোহর মারো।'

রাশেদার কানের কাছে মুখ নামিয়ে চাপা গলায় ফরিদ বলে,'এখানে চুনাও (নির্বাচন) আসছে।'

নির্বাচন, মিছিল, মিটিং ইত্যাদি ঢাকাতেও তারা দেখেছে। এসব তাদের কাছে অজানা কিছু নয়। রাশেদা আস্তে মাথা নাড়ে, নিচু গলায় বলে, 'হাঁ।'

একসময় স্লোগান দিতে দিতে মিছিলটা ফরিদদের সামনে দিয়ে চলে যায়। তারপর ওরা আর দাঁড়িয়ে থাকে না। বাঁ দিকের একটা সরু রাস্তায় ঢুকে এগিয়ে যায়।

বাজার এবং বারহৌলি টাউনের শেষ সীমা পেছনে ফেলে কিছুক্ষণের মধ্যে ফরিদরা একটা চওড়া পিচের সড়কে এসে ওঠে। মিঠাইওলা বলে দিয়েছিল, এই সড়কটা মনপথলের পাশ দিয়ে চলে গেছে।

এখানেও রাস্তার দু'ধারে ফাঁকা ফসলের খেত। দূরে দূরে ঘন গাছপালার ভেতর কিষাণদের গাঁ।

এ রাস্তায় প্রচুর গাড়িঘোড়া। দূরপাল্লার বাস, বয়েল কি ভৈসা গাড়ি, সাইকেল রিকশা, ট্রাক আর রোগা হাড্ডিসার ঘোড়ায়-টানা এক-আধটা টাঙ্গা। এক কিনার দিয়ে, গাড়িটাড়ির পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে দু'জনে সোজা হাঁটতে থাকে। মনপথলের দিকে যত এগোয়, আবেগে এবং উত্তেজনায় ফরিদের বুকের ভেতরটা তোলপাড় হয়ে যায়।

রাশেদা কী ভাবছে, বোঝা যায় না। ফরিদের পাশে পাশে সে যেন চঞ্চল পাখির মতো উড়ে চলে।

মাইল দুই হাঁটার পর ওরা মনপথলের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। রাস্তার লোকজনকে জিজ্ঞেস করলে তারা জানায়, এবার পাকা সড়ক থেকে নেমে ফরিদদের ডান দিকে যেতে হবে। মাঠের ভেতর দিয়ে খানিকটা গেলেই মনপথল গাঁও।

মাঠে মেনে অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে হাঁটতে থাকে ফরিদ। তার পাশে একইভাবে উড়ে উড়ে চলেছে রাশেদা। কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা মনপথল পৌঁছে যায়।

হালুইকর বলে দিয়েছিল, মনপথল গোয়ার বা গোয়ালাদের গাঁ। চারিদিকে অজস্র গরু-মোষ চরতে দেখে তা-ই মনে হয়।

এখন দুপুর। সূর্য খাড়া মাথার ওপর উঠে এসেছে। রোদের ঝাঁজ বেড়ে গেছে অনেকটা। তবে আগের মতোই জোরাল হাওয়া বয়ে যাচ্ছে।

মনপথলে পৌঁছে গেলেও সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে ঢোকে না ফরিদ। গাঁয়ের সীমানার কাছে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অগত্যা রাশেদাকেও থমকে যেতে হয়।

পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ফরিদের আবেগ এবং উত্তেজনা রাশেদার মধ্যেও যেন চারিয়ে যেতে থাকে।

অনেকক্ষণ পর রাশেদা বলে, 'কী হল, গাঁওয়ে ঢুকবে না?'

চমকে উঠে ফরিদ বলে, 'হাঁ চল।' যেতে যেতে গলার স্বর অনেকটা নামিয়ে দেয় সে, 'হোঁশিয়ার, আমরা যে ঢাকা থেকে এসেছি কাউকে বলবে না। মনে থাকবে?'

'থাকবে।'

গ্রামে ঢুকে খানিকটা গেলেই বিরাট পুকুর। ফরিদ বলে, 'এই তালাও-এর ধারে বসে আগে খেয়ে নিই। তারপর কোথায় আমাদের পুরনো ঘরবাড়ি জমিন ছিল, খোঁজ করব।'

পুরি, মিঠাই এবং পুকুরের জল খেয়ে তারা পিতৃভূমির সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে।

ফরিদের জন্ম পূর্ব পাকিস্তানে। আগে আর কখনও সে এখানে আসেনি। ঢাকায় থাকতে আব্বা বা দাদীর কাছে মনপথলের কথা অনেক বার শুনেছে কিন্তু তখন কোনওরকম টান অনুভব করেনি। বহুদূরে উত্তর বিহারের গ্রামাঞ্চলের নগণ্য অজানা এক ভূখণ্ডের জন্য তার প্রাণ উথলে ওঠেনি। পিতৃভূমি তার কাছে তখন নিতান্তই কথার কথা, ঝাপসা একটা আইডিয়া মাত্র। কিন্তু এখানকার মাটিতে পা দিয়ে ফরিদ টের পায়, না জন্মালেও বা আগে না দেখলেও তার অস্তিত্বের শিকড়টি মনপথলেই থেকে গেছে।

একটা ব্যাপার ভেবে সে অবাক হয়ে যাচ্ছিল, সাতচল্লিশে পার্টিশানের পর তার দাদা এবং রাশেদার দাদা এই গ্রামে থেকে সর্বস্ব খুইয়ে ঢাকায় চলে যায়। ঠিক চল্লিশ বছর বাদে তাদের দুই নাতি-নাতনী আশ্রয়ের খোঁজে, হয়ত বা আইডেনটিটির সন্ধানে এখানে চলে এসেছে।

একগুঁয়ে অভিযানকারীর মতো ফরিদ এবং রাশেদা মনপথলের ঘরে ঘরে হানা দিতে থাকে। কিন্তু এখানকার বাসিন্দা যাদের বয়স কম তারা কেউ বলতেই পারল না,

ফরিদের দাদা মুদাস্‌সর আলি এবং রাশেদার দাদা সামসুদ্দিন হোসেন নামে আদৌ কেউ মনপথলে ছিল কিনা। তবে তারা শুনেছে, অনেক কাল আগে এই গাঁওয়ে কিছু মুসলমান থাকত, আজাদীর পর তারা কোথায় চলে গেছে, কে জানে। এখন আর কোনও মুসলিম ফ্যামিলি এখানে নেই।

কিছুটা হতাশ হলেও অদম্য উৎসাহে খোঁজ চালিয়েই যায় ফরিদরা। শেষ পর্যন্ত মনপথলের সবচেয়ে প্রাচীন লোকটি তাদের জানায় মুদাস্‌সর আলি এবং সামসুদ্দিন হোসেন এই গাঁওতেই থাকত। সে তাদের চিনতও।

ফরিদের রক্তের ভেতর দিয়ে বিজলি চমকের মতো কিছু ঘটে যায়। সে বলে, 'মেহেরবানি করে বলুন তাদের ঘর কোথায় ছিল—' উত্তেজনায় আবেগে আগ্রহে তার গলা কাঁপতে থাকে।

বুড়ো লোকটা আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বলে, 'কিছু নেই বেটা।' তারপর আঙুল বাড়িয়ে দূরে যে জায়গাটা দেখিয়ে দেয় সেটা ফাঁকা শস্যক্ষেত্র ছাড়া আর কিছুই নয়, ঘরবাড়ির কোন চিহ্ন নেই কোথাও।

সেখানে গিয়ে শ্বাসরুদ্ধের মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে ফরিদ আর রাশেদা। তারপর উদ্‌ভ্রান্তের মতো ফিরে যায়।

বিকেলের ঢের আগেই তারা বারহৌলি বাজারে চলে আসে। এবারও দেখা যায় আরেকটা লম্বা মিছিল স্লোগানে স্লোগানে আকাশ চৌচির করে দিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে।

'দশভকত রামবনবাস চৌবে—'

'জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ।'

'এম্লে বনেগা কৌন?'

'রামবনবাস চৌবে।'

'মন্ত্রী বনেগা কৌন?'

'রামবনবাস চৌবে।'

'রামরাজ লায়েগা কৌন?'

'রামবনবাস চৌবে।'

'চৌবেজিকা চিহ্ন্ পেঁড় পর—'

'আগলে চুনাওমে মোহর মারো, মোহর মারো।'

'তুমহারা হামারা উম্মীদবার কৌন?'

'রামবনবাস চৌবে।'

'যবতক চান্দ্‌ সূরয হোগা—'

'তবতক চৌবেজিকা নারা হোগা।'

'চৌবেজি—'

'অমর রহে, অমর রহে।'

রামবনবাসের নির্বাচনী মিছিল আজীবলালের মিছিলের চেয়ে কিছুটা বড় এবং বেশি জমকালো। কিন্তু সেদিকে ফরিদের লক্ষ ছিল না। সে শুনেছে মনপথলে তাদের

বেশ বড় বাড়ি ছিল। পাকা মেঝে, ইটের দেওয়াল, চাল অবশ্য টিনের। কিন্তু কিছুক্ষণ আগে কী দেখে এল তারা? গভীর হতাশা চারিদিক থেকে যেন তাকে ঘিরে ধরতে থাকে।

সন্ধের আগে আগে, আকাশে দিনের আলো থাকতে থাকতেই ফাঁকা কাঁকুরে ডাঙার মাঝখানে তাদের সেই ছন্নছাড়া আস্তানায় পৌঁছে যায় ফরিদরা।

দিন সাতেক কেটে গেল।

এর মধ্যে ওপার থেকে আরও শ'খানেক মানুষ এসে পড়েছে। বাঁশ চট টালি ইত্যাদি জোড়াতাড়া দিয়ে আট দশটা নতুন ঘরও খাড়া করা হয়েছে। আরও ক'টা বানাবার তোড়জোড় চলছে।

সব মিলিয়ে এখন এখানে আড়াই শ'র মতো মানুষ। ঠিক হয়েছে, আপাতত বেশ কিছুদিন সীমান্তের ওধার থেকে লোক আসা বন্ধ থাকবে।

আজ সকালে নাস্তা সেরে শওকত ফরিদকে বলে, 'আমার সঙ্গে তোমাকে এক জায়গায় যেতে হবে বেটা।'

কোনও প্রশ্ন না করে ফরিদ বলে, 'যাব।'

কিছুক্ষণ পর তারা বেরিয়ে পড়ে। বিল এবং কাঁচা রাস্তা পেরিয়ে পাক্কিতে উঠে শওকত বলে, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি, জানো?'

এ দিকটা ফরিদের চেনা। এই রাস্তা দিয়েই ক'দিন আগে বারহৌলি হয়ে সে আর রাশেদা মনপত্থল গিয়েছিল। কিন্তু নিশ্চিতভাবে এখনও ফরিদ জানে না শওকত তাকে কোথায় নিয়ে চলেছে—বারহৌলিতে, না মনপত্থলে? জবাব না দিয়ে উৎসুক চোখে শওকতকে লক্ষ করতে থাকে সে।

শওকত নিজেই তার প্রশ্নের উত্তর দেয়, 'আমরা যাচ্ছি বারহৌলি টৌনে। সেই পলটিকাল লিডারের সঙ্গে দেখা করতে। বড়ে আদমী, আংরেজি উংরেজি বলতে পারে। সঙ্গে একজন 'লিখিপড়ি' লোক থাকা দরকার। তাই তোমাকে নিয়ে এলাম।' শওকত একনাগাড়ে বলে যায়, 'ভেবে দেখলাম, আর দেরি করা ঠিক না। কখন কী হাঙ্গামা বেধে যাবে, হয়ত এখান থেকে আবার ভাগিয়ে দেবে। তার আগে লিডারকে ধরতে হবে। সিধা ওঁর পায়ে পড়ে যাব।'

শওকত খুবই দূরদর্শী, অভিজ্ঞ এবং বুদ্ধিমান। ষাট বছরের জীবনে ভারত পাকিস্তান আর বাংলাদেশে অজস্র দাঙ্গা গণহত্যা দেশভাগ অস্থিরতা আর উন্মাদনার সাক্ষী সে। জীবনের বিপুল অভিজ্ঞতা তাকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে শিখিয়েছে।

শওকতের কথাগুলো ফরিদকে বুঝিয়ে দেয়, ইণ্ডিয়ায় থাকতে হলে পলিটিক্যাল প্রোটেকশানটা একান্ত জরুরি। আর সেই উদ্দেশ্যেই আজ সে তাকে নিয়ে চলেছে।

ফরিদ আচমকা বলে ওঠে, 'আমরা কার কাছে যাচ্ছি চাচা? আজীবলাল সিং, না রামবনবাস চৌবে?' বলেই টের পায় গোলমাল করে ফেলেছে। সে যে বারহৌলির দিকে গিয়েছিল, আর বারেহৌলিতে গেলে নিশ্চয়ই মনপত্থলে হানা দিয়েছে, এটা এবার ধরা পড়ে যাবে।

শওকত অবাক হয়ে ফরিদের দিকে তাকায়। বলে, 'ওঁদের নাম তুমি জানলে কী

করে? বারহৌলিতে এসেছিলে?'

ফরিদ মুখ নিচু করে মাথা হেলিয়ে দেয়।

চোখের তারা তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে শওকতের। সে বলে, 'মনপথলেও গিয়েছিলে, তাই না?'

ফরিদ আধফোটা গলায় বলে, 'হাঁ।'

শওকত অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে, 'ঠিক আছে, পরে মনপথলের কথা শোনা যাবে। এখন বল, আজীবলাল সিং আর রামবনবাস চৌবের কথা কার কাছে শুনেছ?'

ফরিদ সেদিনের দুটো মিছিলের কথা জানায়।

শওকত বলে, 'ও, আচ্ছা। আমরা এখন রামবনবাস চৌবের কাছেই যাচ্ছি।'

বারহৌলি টাউনের এক মাথায় বাজার, আরেক মাথায় 'চতুর্বেদী ধাম'। বিশাল কমপাউণ্ডের মাঝখানে পুরনো আমলের দুর্গের মতো প্রকাণ্ড তেতলা বাড়িটার মাথায় রামসীতা মন্দির। কামপাউণ্ড ঘিরে দশ ফুট উঁচু এবং তিনফুট চওড়া দেওয়াল। সামনের দিকে লোহার পাল্লা দেওয়া বিরাট গেট। সেখানে পাকানো গোঁফওলা বিপুল চেহারার ভোজপুরী দারোয়ান হাতে বন্দুক এবং গলায় টোটার মালা ঝুলিয়ে দিনরাত পাহারা দেয়।

শওকতরা 'চতুর্বেদী ধাম'-এ পৌঁছে দারোয়ানকে জানায় রামবনবাস চৌবের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

দারোয়ান ভুরু কুঁচকে দু'জনের পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে বাজখাঁই গলায় হুঙ্কার ছাড়ে, 'ভাগ শালে—'

শওকতেরা চলে যায় না, সমানে কাকুতিমিনতি করতে থাকে। দারোয়ান ভেতরে ঢুকতে দেবে না, তারাও নাছোড়বান্দা। দারোয়ানের মেজাজ ক্রমশ চড়তে থাকে, সেই সঙ্গে তার গলাও। চিৎকার করে সে বার বার হুঁশিয়ারি দেয়, না গেলে গুলি করে শওকতদের মাথা বিলকুল ছাতু করে দেবে।

এই সময় ভেতর থেকে গম্ভীর মোটা কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, 'দারবান, উ লোগোকো অন্দর আনে দো।'

গেটের পরে অনেকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে একটা হুড-খোলা প্রাচীন আমলের মোটর, দুটো জিপ আর ঘোড়ার-টানা ফিটন দাঁড়িয়ে আছে। দুটো নৌকর মোটর আর ফিটন ধোয়ামোছা করছে।

দূরে মূল বাড়িটার একতলায় শ্বেতপাথরে বাঁধানো ঢালা বারান্দায় ইজি চেয়ারে কাত হয়ে শুয়ে ডাক এডিশানের কাগজ পড়ছিলেন রামবনবাস। পাশে একটা নিচু টেবলে আরও অনেকগুলো খবরের কাগজ পর পর সাজানো। আর আছে দু-চারটে জরুরি ফাইল, কলম, দামি কাগজের রাইটিং প্যাড। নিচে একটা মোরাদাবাদী ফরসি, কলকের মাথা থেকে অল্প অল্প ধোঁয়া উড়ছে।

রামবনবাসের বয়স পঁয়ষট্টি ছেষট্টি। মজবুত স্বাস্থ্য। এই বয়সেও চুলটুল বেশি

পাকেনি, দাঁতগুলো অটুট। খাড়া নাক, ধারাল মুখ। শরীরে অতিরিক্ত মেদ নেই। চোখে অবশ্য চশমা রয়েছে।

বারান্দাটা মাটি থেকে ফুট তিনেক উঁচুতে। শওকতেরা ভয়ে ভয়ে, প্রায় দমবন্ধ করে রামবনবাসের কাছাকাছি নিচের জমিতে গিয়ে দাঁড়ায়। ঘাড় ঝুঁকিয়ে কপালে হাত ঠেকিয়ে বলে, 'সেলাম হুজৌর—'

রামবনবাস সোনার ফ্রেমের ওপর দিয়ে তীব্র চোখে তাদের দেখতে দেখতে বলেন, 'কী হয়েছে? শোর মচাচ্ছিলে কেন?'

'হুজৌর আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই। দারবান আসতে দিচ্ছিল না।'

'কারা তোমরা? তোমাদের তো আগে কখনও দেখিনি।'

শওকত জানায়, তারা এখানে নতুন এসেছে। তবে চল্লিশ বছর আগে এ অঞ্চলেরই বাসিন্দা ছিল।

কপালে ভাঁজ পড়ে রামবনবাসের। তিনি বলেন, 'মতলব?'

কীভাবে দেশভাগের পর তারা পূর্ব পাকিস্তানে চলে যায়, তারপর বাংলাদেশ হওয়ার পর ঢাকায় তাদের কী হাল হয়েছে এবং এখানে ফিরে না এসে তাদের উপায় ছিল না, ইত্যাদি বিস্তারিত জানিয়ে উদ্বিগ্ন মুখে তাকিয়ে থাকে শওকত।

রামবনবাসের মধ্যে একটা বৈদ্যুতিক ক্রিয়া ঘটে যায় যেন। খাড়া উঠে বসেন তিনি। বলেন, 'তোমরা লুকিয়ে চুরিয়ে ইণ্ডিয়ায় ঢুকেছ! ঘুসপৈঠিয়া—ইনফিলট্রেটরস। জানো এটা কত বড় বেআইনি কাজ?'

শওকত এবং ফরিদ হাতজোড় করে একেবারে নুয়ে পড়ে। শওকত রুদ্ধশ্বাসে বলে, 'হুজৌর মা-বাপ, আমাদের বাঁচান। ফিরে যাওয়ার উপায় নেই। এখানে যদি থাকতে না পারি, বালবাচ্চা নিয়ে শেষ হয়ে যাব। এখন আপনার মেহেরবানি।'

অনেকক্ষণ কী ভাবেন রামবনবাস। তারপর বলেন, 'তোমরা কত লোক এসেছ?'

'লগভগ আড়াই শ হুজৌর।'

'আর আসবে?'

'হাঁ।'

'কত আসতে পারে?'

'বহোত আদমী। তবে এদিকে আর সাত আটশ'র বেশি আসবে না।'

একটু চুপ করে থাকার পর রামবনবাস আবার জিজ্ঞেস করেন, 'আমার খবর তোমাদের কে দিলে?'

টাউটদের নাম করে না শওকত। সসম্ভ্রমে শুধু বলে, 'দুনিয়ায় আপনার নাম কে না জানে! এখানে পা দিয়েই আপনার কথা শুনেছি মালিক।'

চাটুবাক্যে মোটামুটি খুশিই হন রামবনবাস। তবে বাইরে থেকে তা বোঝায় উপায় নেই। বলেন, 'আচ্ছা, এখন যাও।'

শওকত ভীরু গলায় জিজ্ঞেস করে, 'আমাদের কী হবে মালিক?'

'আমাকে ক'দিন ভাবতে দাও।'

রামবনবাস চলে যেতে বলেছেন, তবু দাঁড়িয়ে থাকে শওকতেরা।

রামবনবাস বিরক্ত হয়েই এবার বলেন, 'কী হল, গেলে না?'

শওকত মাথা আর নুইয়ে দিয়ে বলে, 'হুজৌর, আমরা যে এসেছি, অনেকে জেনে গেছে। তারা যদি ঝঞ্ঝাট বাধায়?'

'চার রোজ বাদ তোমরা আমার সঙ্গে দেখা ক'রো।'

শওকতের আর কোন প্রশ্ন করতে সাহস হয় না। 'জি—' বলে এবং বারকয়েক সেলাম ঠুকে তারা বিদায় নেয়।

রামবনবাস চৌবে স্পষ্ট করে তাদের কোন ভরসা দেননি। অবশ্য চারদিন পর আসতে বলেছেন। তখন তিনি কী বলবেন, কী করবেন, বোঝা যাচ্ছে না। শওকতের গা ঘেঁষে চলতে চলতে উৎকণ্ঠায় দম আটকে আসতে থাকে ফরিদের। আংরেজি বলার জন্য শওকত তাকে নিয়ে এসেছিল কিন্তু তার দরকার হয়নি। এতক্ষণ রামবনবাসের হাভেলিতে সে ছিল নির্বাক দর্শক। এবার হঠাৎ সে জিজ্ঞেস করে, 'চৌবেজিকে আমাদের কথা বলে কি ভাল হল চাচা?'

চিন্তাগ্রস্তের মতো শওকতও হাঁটছিল। ফরিদের প্রশ্নের ধাঁচটা ধরতে না পেরে বলে, 'মতলব?'

'ওরা পলিটিক্যাল লোক। যদি বিপদে ফেলে দেয়?'

অর্থাৎ রাজনীতি-করা লোকেরা কতটা বিশ্বাসযোগ্য, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে ফরিদের। শওকত বলে, 'কাউকে না কাউকে সাহারার জন্যে তো বলতেই হবে। পলটিক্যাল লিডার ছাড়া আর কেউ আমাদের বাঁচাতে পারবে না। এখন দেখা যাক।'

ফরিদ আর কিছু বলে না।

চারদিন নয়, ঠিক দু'দিন পর সকালবেলায় দুটো ঘাড়ে-গর্দানে-ঠাসা, হট্টাকট্টা চেহারার লোক এসে লাঠি ঠুকে চেঁচায়, 'কৌন হো শওকত মিঞা আউর ফরিদ আলি?'

মাঠের মাঝখানে সৃষ্টিছাড়া এই বসতিতে মুহূর্তে আতঙ্ক ছড়িয়ে যায়। শওকত এবং ফরিদ ভয়ে ভয়ে বলে, 'আমরা। কেন?'

'চৌবেজি তোমাদের নিয়ে যেতে বলেছেন।'

চারদিনের বদলে দু'দিনের ভেতর কেন এই তলব, বুঝে উঠতে পারে না শওকত। ভীরু গলায় সে জানতে চায়, 'মালিক কেন যেতে বলেছেন, আপনারা জানেন?'

'নেহী।'

আর কোনও প্রশ্ন করে না শওকত। চারপাশের ত্রস্ত মানুষগুলোকে খানিকটা ভরসা দিয়ে ফরিদকে নিয়ে লোক দুটোর সঙ্গে বারহৌলি চলে যায়।

দু'দিন আগে 'চতুর্বেদী ধাম'-এর একতলায় শ্বেতপাথরে বাঁধানো বারান্দায় একাই ছিলেন রামবনবাস। আজ তাঁকে ঘিরে গদি-মোড়া আরামদায়ক চেয়ারে চার-পাঁচজন বসে আছেন। চেহারা এবং পোশাক-আশাক দেখে আন্দাজ করা যায় তাঁরা মান্যগণ্য বিশিষ্ট সব মানুষ। উঁচু গলায়, উত্তেজিত ভঙ্গিতে নিজেদের মধ্যে কিছু আলোচনা করছিলেন। শওকতদের দেখে তাঁরা থেমে যান।

রামবনবাস বলেন, 'এদের কথাই আপনাদের বলেছিলাম।'

তাঁর সঙ্গীরা স্থির চোখে শওকতদের লক্ষ করতে থাকেন। একজন বলেন, 'এরাই তা হলে ঘুসপৈঠিয়া (অনুপ্রবেশকারী)। এদের কথা আমার কানে আগেই এসেছে। বিলের পাশে পড়তি জমি দখল করে ঘর তুলে বসেছে এরা।'

আরও ক'জন সায় দিয়ে বলেন, 'আমরাও খবরটা পেয়েছি।'

শুনতে শুনতে ভয়ানক ঘাবড়ে যায় শওকত আর ফরিদ। গলগল করে ঘামতে থাকে।

রামবনবাস শওকতকে বলেন, 'আজ তোমাদের একটা জরুরি কাজে ডাকিয়ে এনেছি। সেদিন তোমরা বলেছিলে, লগভগ আড়াইশ আদমী ওপার থেকে এসেছ।'

কাঁপা গলায় উত্তর দেয় শওকত, 'জি।'

এবার রামবানবাস তাঁর সঙ্গীদের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনারা মনে করছেন, আগলা চুনাওতে আজীবলাল ভাল ভোট পাবে।'

সবাই সমস্বরে জানান, 'হাঁ।'

'কতগুলো সিওর ভোট হাতে থাকলে আমি জিততে পারি?'

'কমসে কম ছ'সাত শ।'

'ঠিক বলছেন?'

'হাঁ, জরুর।'

রামবনবাস আবার শওকতদের দিকে মুখ ফেরান। বলেন, 'সেদিন বলছিলে ওপার থেকে আরও ছ'সাত শ আদমী এখানে আসবে। এসে গেছে?'

'নেহী মালিক। শুনেছি কিছুদিন পর থেকে আসতে থাকবে।' শওকত শ্বাসরুদ্ধের মতো বলে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর রামবনবাস বলেন, 'এখানে আট মাস পর যে চুনাও হচ্ছে, তা জানো?'

শওকত ফরিদকে দেখিয়ে বলে, 'জানি না। তবে বারহৌলি বাজারে ও দুটো চুনাওর মিছিল দেখেছে। একটা আপনার, আরেকটা আজীবলাল সিংয়ের।'

'হাঁ।' রামবনবাস নড়েচড়ে বসেন। বলেন, 'এত আগে কেউ চুনাও নিয়ে মাথা ঘামায় না। লেকেন আজীবলাল ময়দানে নেমে গেছে। আমার পক্ষে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা সম্ভব না। ভূচ্চরটা জেতার জন্য দু হাতে টাকা ওড়াচ্ছে।' বলেই গলার ভেতর থেকে মোটা গমগমে আওয়াজ বার করেন, 'হোঁশিয়ার, ওদের পাল্লায় পড়বে না।'

ভীত মুখে শওকত বলে, 'নেহী মালিক, নেহী।'

'আর শোন, আগলা চুনাওতে আমাকে তোমরা ভোট দেবে। আমার চিহ্ন পেঁড়। পরে যারা ওপার থেকে আসবে তাদেরও আমাকে ভোট দিতে হবে।'

এই সময় নিজের মধ্যে খানিকটা সাহস জড়ো করে ফরিদ বলে, 'লেকেন মালিক আমরা ঘুসপৈঠিয়া, এদেশে ভোট দেব কী করে?'

তার মনোভাব বুঝতে পারছিলেন রামবনবাস। বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের

ভোটাধিকার নেই। তিনি বলেন, 'সব বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। লেকেন হোঁশিয়ার, আমাকে ভোট না দিলে তোমরা জিন্দা গোরে চলে যাবে।'

পাশ থেকে শশব্যস্তে শওকত বলে ওঠে, 'হাঁ হাঁ মালিক, আপনাকেই আমরা ভোট দেব, এই জবানের এদিক ওদিক হবে না। লেকেন আমাদের কী হবে? ফরিদ ক'দিন আগে মনপখল গিয়েছিল। সেখানে আমাদের বাপ-দাদার ঘর 'বরাবর' করে এখন চাষ হচ্ছে। আমরা কোথায় থাকব? কী করব?'

'ওখানে কিছু করা যাবে না। ভোটটা আগে দাও, ইণ্ডিয়ান বনো। তারপর ব্যওস্থা হয়ে যাবে।'

শওকত আর ফরিদ চুপ করে থাকে।

রামবনবাস আবার বলেন, 'আজ যে সব কথা হল, কাউকে বলবে না। মুহ্ বিলকুল বন্ধ্।'

'হাঁ মালিক।'

আরও কিছুদিন কেটে যায়। এর মধ্যে সীমান্তের ওপার থেকে নতুন কয়েক শ লোক এসে পড়ে।

এদিকে নির্বাচনের কারণে এ অঞ্চলের আবহাওয়া ক্রমশ তেতে উঠতে থাকে। তারই ভেতর এক ঝিম-ধরা দুপুরে দুটো লোক এসে ভোটার্স লিস্টে তাদের নাম তুলে নিয়ে যায়। আর কয়েকদিন বাদে রামবনবাসের সুপারিশে তাদের রেশন কার্ডও হয়ে গেল।

দিন মোটামুটি কেটে যাচ্ছিল। উৎকণ্ঠা দুশ্চিন্তা ভয় আতঙ্ক—সবই ছিল কিন্তু কেউ এসে এতকাল ঝঞ্ঝাট বাধায়নি। কিন্তু ভোটার লিস্টে নাম ওঠা এবং রেশন কার্ড হয়ে যাবার পর একদিন বিকেলে আজীবলালের শ'তিনেক লোক চিৎকার করতে করতে এসে হানা দেয়।

'ঘুসপৈঠিয়া হিন্দুস্থানসে—'

'দফা হো, দফা হো।'

'বিদেশী—'

'ভারত ছোড়ো, ভারত ছোড়ো।'

ঘন্টাখানেক হল্লা করে লোকগুলো চলে যায়।

তারপর ঊর্ধ্বশ্বাসে শওকত আর ফরিদ বারহৌলিতে 'চতুর্বেদী ধাম'-এ চলে আসে। হাঁপাতে হাঁপাতে ভয়ার্ত মুখে সব ঘটনা রামবনবাসকে জানায়।

রামবনবাস এতটুকু উত্তেজিত হ'ন না। নিস্পৃহ সুরে বলেন, 'শোর মচানে দো শালে লোগকো। ভোটার লিস্টে তোমাদের নাম উঠেছে. রেশন কার্ডও হয়ে গেছে। এখন তোমরা ইণ্ডিয়ান। কোনও ভূচ্চরের ছৌয়ার ক্ষমতা নেই তোমাদের চামড়ায় হাত ঠেকায়। চিন্তা মাত করনা। শুধু আমার ভোটের কথাটা মনে রেখো।'

'জি। জান গেলেও ভুলব না।'

ঘন্টাখানেক বাদে শওকতের সঙ্গে কাঁকুরে ভাঙার মাঝখানে তাদের সৃষ্টিছাড়া

বসতিতে ফিরে যেতে যেতে ফরিদের মাথায় সেই ভাবনাটাই বার বার ঘুরে ঘুরে আসতে থাকে। ব্রিটিশ আমলে তারা ছিল ভারতীয়, তারপর পাকিস্তানী, তারও পর বাংলাদেশী। চুনাও-এর কারণে চল্লিশ বছর বাদে তারা নতুন আইডেনটিটি পেয়ে যায়। এখন তারা আবার ভারতীয়।

দুরমনস্কর মতো হাঁটতে হাঁটতে মনে মনে চুনাওকে হাজার বার সেলাম জানায় ফরিদ।

বাঘ

কোথায় চান্দা জেলা, আর কোথায় এই রত্নগিরি!

রত্নগিরি বললে সঠিক বলা হয় না। বলা উচিত নোনপুরা। নোনপুরা কার্পাস চাষীদের দরিদ্র একখানা গ্রাম। ভূগোলের হৈচৈ থেকে অনেক, অনেক দূরে রত্নগিরি জেলার শেষ প্রান্তে মানুষের এই বসতিটা প্রায় আত্মগোপন করে আছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, এখানকার বাসিন্দারা অজ্ঞাতবাস করতেই ভালোবাসে।

অন্য সব বছরের মতো এবারও নোনপুরায় এল ঘুনুরাম। চান্দা জেলা থেকে বেরিয়ে প্রথমে লাইট মারহাট্টা রেলে কিছুটা পথ এসেছে সে। তারপর শুরু হয়েছে হাঁটা, উত্তরায়ণের সূর্য মাথায় নিয়ে অবিশ্রান্ত পথ-চলা। হাঁটতে হাঁটতে কোনাকুনি পশ্চিমঘাট পাড়ি দিয়ে অবশেষে এই নোনাপুরায় পৌঁছুনো গেছে।

মাসটা মাঘ। অর্থাৎ পঞ্চম ঋতু শীত এখন মধ্যপ্রহরে। নিয়ম অনুযায়ী সমারোহ করে হিম এবং কুয়াশা নামার কথা। উত্তুরে বাতাসের সওয়ার হয়ে একটা উদ্দাম খ্যাপামির দিগ্বিদিকে দাপাদাপি করে বেড়ানোও উচিত ছিল।

কিন্তু জগতের আর যেখানে যা খুশি চলুক, মহারাষ্ট্রের এই প্রান্তে কিন্তু বিপরীত রীতি। এখানে হিম নেই, কুয়াশাও না। উত্তুরে বাতাসটাকেও কেউ বুঝি খাপে পুরে খাপটার মুখ বন্ধ করে দিয়েছে। আকাশময় এখনও, এই মাঘে টুকরো টুকরো ইতস্তত মেঘ ছড়ানো। আষাঢ়-শ্রাবণের পর কত দিনই তো পার হয়ে গেছে, তবু রত্নগিরি জেলা বর্ষাকে বুঝি প্রাণ ধরে বিদায় দিতে পারেনি; আকাশ জুড়ে আষাঢ়-শ্রাবণের স্মৃতি সাজিয়ে রেখেছে।

পাঁচ বছর ধরে শীতের মাঝামাঝি এই সময়টায় চান্দা থেকে নোনপুরায় আসছে ঘুনুরাম। এখন সারা মহারাষ্ট্র জুড়ে শুরু হয় গণপতি-উৎসব। গণেশ-পুজোর আয়োজন করেনি, এমন একটি বাড়িও এখানে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

গণপতিপুজো মহারাষ্ট্রের জাতীয় উৎসব। উৎসবটা চলে দিন দশেক ধরে কিন্তু সেটা ঘিরে যে উৎসাহ, যে উদ্দীপনা তার মেয়াদ মাসখানেক। সেই মাতামাতির ঢেউ রত্নগিরির সুদূর অভ্যন্তরে কার্পাস চাষীদের স্তিমিত নগণ্য গ্রামখানাতেও এসে লাগে। উচ্ছ্বসিত দুর্বার এক স্রোতে নোনপুরা তখন ভেসে যায়।

গণপতি উৎসবের সময় প্রতি বছর ঘুনুরাম যে নোনপুরায় আসে সেটা অকারণে নয়। নোনপুরায় এসে বাঘ সাজে সে। বাঘ সেজে মানুষকে আনন্দ দিয়ে তার কিছু রোজগার হয়।

বাঘের সাজ গায়ে নিয়ে আর প্রকাণ্ড ল্যাজ লাগিয়ে কার্পাস চাষীদের দুয়ারে দুয়ারে এ-সময় ঘুনুরাম নেচে বেড়ায়। সে যেখানে যায় সেখানেই সাড়া পড়ে যায়। বাঘের সং দেখবার জন্য ঘরের বৌরা, বাচ্চারা, বয়স্করা, প্রাচীনেরা, কিশোরীরা, জোয়ানেরা, যুবতীরা—সবাই হুড়মুড় করে ছুটে আসে। মুহূর্তে তাকে ঘিরে সমস্বরে চারিদিক মুখর করে তোলে, 'ওয়াম আলো— ওয়ামা আলো—' অর্থাৎ বাঘ এসেছে, বাঘ এসেছে।

এই পার্বণের দিনে ঘুনুরাম এসে বাঘ সেজে নেচে নেচে আনন্দের স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, সেজন্য নোনপুরা গ্রামখানা সারা বছর অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে থাকে।

ঘুনুরামও তাদের নিরাশ করে না, বাঘ-নাচের সঙ্গে গানও জুড়ে দেয় :

'গণপতি বাপ্পা মোরেয়া,
পুড়ছ্যা বরষি লৌকর ত্র্যয়া।'

অর্থাৎ হে সিদ্ধিদাতা গণেশ, আগামী বছর আরও তাড়াতাড়ি এস, ইত্যাদি ইত্যাদি।

নাচগানের ফল খুব একটা খারাপ হয় না, বরং তা বেশ লাভজনকই। নোনপুরার মানুষ গরিব হতে পারে কিন্তু হৃদয় তাদের দরিদ্র নয়। যার যা সাধ্য, অক্লেশে হাসিমুখে তা-ই তারা ঘুনুরামের ঝুলিতে ঢেলে দেয়। এক মাস এখানে কাটিয়ে ঘুনুরাম যখন আবার চান্দা জেলায় ফিরে যায় তখন তার প্রাপ্তির তালিকা খুব একটা ছোট মাপের হয় না। খানচারেক নতুন ধুতি, নগদ দশ-বারোটা টাকা, মণ দেড়েকের মতো চাল, অজস্র চুট্টা (বিড়ির মতো নেশার জিনিস), কিছু কার্পাস তুলো এবং আরও টুকিটাকি অনেক কিছুই তার ঝোলাটিকে ভরে তোলে।

জগতে ঘুনুরাম একা। চারখানা ধুতিতে সারা বছর বেশ ভালোভাবেই কেটে যায়। চুট্টাও তার কিনতে হয় না। মণ দেড়েকের মতো যা চাল মেলে তাতে তিনটে মাস সে নিশ্চিন্ত। বাকি ন'মাসের জীবন তার একেবারেই অনিশ্চিত। জীবিকার জন্য এই সময় চান্দা জেলায় ঘুনুরামকে নানা ভূমিকায় দেখা যায়। কখনও সে ভূমিহীন কৃষাণ, কখনও মালটানা কুলি, কখনও তাকে পি. ডব্লু. ডি'র রাস্তা বানাতে দেখা যায়। কখনও সম্পন্ন গৃহস্থের মোষ চরায় সে, কখনও আগুনের হল্কার মতো বৈশাখের গনগনে দিনগুলোতে পাহাড়ী ঝরনা থেকে মহাজনদের জন্য বাঁক ভরে জল নিয়ে আসে। আবার কখনও পুরোপুরি বেকার সে।

এত করেও কারও মন পায় না ঘুনুরাম। খিস্তি, গালাগালি এবং মারও প্রায়ই ন্যায্য পাওনা হিসেবে জোটে। এত করেও বাকি ন'মাসের জন্য ঘুনুরাম নিশ্চিন্ত হতে পারে না। কাজেই সারা বছরে অন্তত তিনটে মাসের নিরাপত্তার জন্য সে যে গণপতি উৎসবের সময় নোনপুরায় ছুটে আসবে, এর মধ্যে বিস্ময়ের কিছু নেই।

তিন মাসের খোরাকি আর সারা বছরের জামাকাপড়—এর জন্য তো বটেই, অন্য আকর্ষণেও ছুটে আসে ঘুনুরাম। সেই আকর্ষণটার কেন্দ্রে বসে আছে রতি। পাঁচ বছর

ধরে রতিদের বাড়িতেই উঠছে সে। গণপতি উৎসবের একটা মাস ওখানেই কাটিয়ে যায় ঘুনুরাম।

সারাটা বছর রত্নগিরির এই অজ্ঞাতবাস থেকে যেন অবিরত হাতছানি দিতে থাকে মেয়েটা, আর হৃৎপিণ্ডের কোনও অদৃশ্য শিকড়ে বুঝি টান পড়ে ঘুনুরামের। এগারোটা মাস কোনওরকমে কাটিয়ে বছরের শেষে বিচিত্র এক ঘোরের মধ্যে নোনপুরায় চলে আসে সে।

এছাড়া আরও একটা কারণ আছে। নিজের দীপ্তিহীন, অর্ধাহার অনাহার এবং অগৌরবের জীবনে এই একটা মাসই যা কিছু মর্যাদা পায় ঘুনুরাম। নোনপুরায় মানুষ বাঘের সং দেখেই শুধু আনন্দ পায় না, তাকে দুর্লভ এক গৌরবের সিংহাসনেও বসিয়েছে। বাঘের সাজ গায়ে না থাকলেও সবাই, বিশেষত যুবতী মেয়েরা তার দিকে আঙুল বাড়িয়ে ফিস ফিস গুঞ্জনে মেতে ওঠে। প্রাচীনেরা এক বছর উৎসব শেষ হতে না হতেই পরের বছর আসার জন্য অনুরোধ জানায়। যে যাকে জগতের কোথাও কেউ ডাকে না, খোঁজে না, চান্দা জেলার সেই ঘুনুরাম নোনপুরার মানুষদের কাছে পরম বিস্ময়ের মতো।

এবার নোনপুরায় এসে ঘুনুরাম যখন পৌঁছুল সূর্যটা তখন আকাশের মধ্যবিন্দুতে। মাথায় একটা জীর্ণ টিনের বাক্স। সেটার ভেতর তার যাবতীয় পার্থিব সম্পত্তি। যেমন ভুষো কালি, পাটকিলে আর হলুদ রং, লোমশ টুপি, বাঘের মতো দাঁত, নখ, গোঁফ, লেজ, কিছু খড়, প্রচুর ন্যাকড়া, বাখারি, আঠা, সরু তামার তার এবং অগুনতি লোহার ক্লিপ। এসব বাঘ সাজার সরঞ্জাম। তাছাড়া নিজের জামাকাপড় আছে, বিছানা আছে। একটা মাস থাকতে হবে। তাই চাল-ডাল-আটা-মরিচ-মশলা ইত্যাদি আনতে হয়েছে।

মাথার ওপর দুপুরের সূর্য, পেটের ভেতর আগুন জ্বলছে। তাছাড়া ক'টা দিন সমানে পশ্চিমঘাটের চড়াই-উতরাই ভেঙেছে। অতএব কোথাও দাঁড়াল না ঘুনুরাম। শ্রান্ত শরীর নিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে যে রাস্তাটা সোজা দক্ষিণে গেছে সেটা ধরে এগিয়ে চলল। আপাতত তিনটে জিনিস তার ভীষণ প্রয়োজন। প্রথমে স্নান, তারপর কিছু খাদ্য, অবশেষে বিকেল পর্যন্ত টানা একখানা ঘুম।

গ্রামটা আধা-পাহাড়ী, আধা-সমতল। চারিদিকে ছাড়ানো বাড়িগুলো জায়গাটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে যেন মাথা তুলেছে। পশ্চিমঘাটের চাঁই-চাঁই পাথর কেটে সেগুলো তৈরি। সেগুলোর মাথার ওপর অবশ্য ভাঙাচোরা টিন অথবা বুনো ঘাসের ছাউনি। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, অর্ধপশুগঠন আদিম মানুষের সারি সারি দুর্গবিশেষ।

নোনপুরার দক্ষিণ প্রান্তে সর্বশেষ যে টিলাটি, তার মাথায় শিবল নায়েকের বাড়ি। শিবলেরই মেয়ে রতি। সরাসরি সেখানে চলে এল ঘুনুরাম।

শিবলকে বাড়িতেই পাওয়া গেল। সামনের দিকে যে বারান্দা, তার একটা খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে চুট্টা ফুঁকছিল সে। বহুকালের প্রাচীন একখানা পাথর দিয়ে তার বিশাল দেহটির যেন সৃষ্টি। পৃথিবীতে অনেক কাল টিকে আছে শিবল। বছরের পর বছর নানা দুর্যোগ তার শরীরে অসংখ্য ক্ষয় ধরিয়েছে। মাথার চুল তার ধূসর, চোখের দৃষ্টি

আচ্ছন্ন। শরীরময় এত যে ধ্বংস, তবু মনে হয় এই লোকটির ভেতর কোথায় যেন একটা অটুট কাঠিন্য রয়েছে।

ঘুনুরামকে দেখামাত্র চুট্টা ফেলে শিবল ছুটে এল। রীতিমত সরবে এবং সাদরে অভ্যর্থনা জানাল সে, 'আরে এস এস, সং এস—' বলে ধরাধরি করে ঘুনুরামের মাথা থেকে সেই প্রকাণ্ড টিনের বাক্সটা বারান্দায় নামাল। তারপর দু'জনে মুখোমুখি বসল।

শিবল আবার বলল, 'কেমন আছ সং?'

বাঘের সং স্যাজে ঘুনুরাম। সেই কারণে এ গ্রামের সবাই তাকে 'সং' বলে ডাকে। এই 'সং' সম্ভাষণটা লঘু অথবা ব্যঙ্গার্থে নয়, রীতিমত গৌরবার্থেই।

ঘুনুরাম উত্তর দিল, 'ভালই আছি। তোমরা কেমন আছ?'

তোমরা বলতে শিবল আর রতি। শিবলের সংসারে ওই একটা মেয়ে ছাড়া আর কেউ নেই। না একটা ছেলে, না আর একটা মেয়ে। বউটাও দশ-বারো বছর আগে তিনদিনের জ্বরে মারা গেছে।

শিবল বলল, 'একরকম কেটে যাচ্ছে আমাদের। তা এবার কিন্তু আসতে বেশ দেরি করে ফেলেছ সং।'

পুজোর এখনও দিনকয়েক দেরি। তবে গ্রামের ভেতর দিয়ে আসতে আসতে নিজের চোখেই ঘুনুরাম দেখেছে, ইতিমধ্যে উৎসবের কিছু ঘোর লেগে গেছে। শিবল তার সত্যিকারের হিতাকাঙ্ক্ষী। শিবলের ইচ্ছা, উৎসবের মাতামাতি আরম্ভ হবার আগেই ঘুনুরাম নোনপুরায় আসুক এবং যত বেশি পরিমাণে পারে এখানকার বাসিন্দাদের কাছ থেকে পার্বণী আদায় করে নিক। মাতামাতি যত দিন চলবে ততদিনই মানুষের মন থাকবে দরাজ আর বেহিসেবি। এক পয়সার জায়গায় তিন পয়সা ঢেলে দিতে তখন তাদের হাত কাঁপবে না। কিন্তু উচ্ছ্বাসে ভাটা পড়লেই বিপদ। দরিদ্র কার্পাস চাষীরা তখন হাত গুটিয়ে নেবে। দুটো পয়সা গেঁজে থেকে বার করতে পাঁচ বার ভাববে, দশ বার করবে হিসেব। সামনের দিকে এক পা এগিয়ে পিছু হটবে দশ কদম। মোট কথা, লোহা গরম থাকতে থাকতে সেটা পিটিয়ে কাজ গুছিয়ে নাও। শিবলের হিসেব সোজা। তার মতে সুযোগের সদ্ব্যবহার একেবারে প্রথম থেকেই করা দরকার।

ঘুনুরাম বলল, 'হ্যাঁ, একটু দেরি হয়ে গেল।'

শিবলের সঙ্গে কথা বলছে বটে ঘুনুরাম, কিন্তু তা যেন খানিকটা দূরমনস্কের মতো। নিজের অজ্ঞাতসারে তার চোখ দু'টি চারিদিকে চনমন করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সামনের তকতকে উঠোনে, দূরে কুয়োর পাড়ে, পিপুল গাছের তলায়, একচালা রান্নাঘরটায় কিংবা বারান্দার সংলগ্ন পাশাপাশি দুটো শোবার ঘরে— কোথাও রতিকে আবিষ্কার করা গেল না। অন্য বছর ঘুনুরাম বাড়িতে ঢুকতে না ঢুকতেই মেয়েটা ছুটে আসে। অপরিসীম উচ্ছ্বাস, প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে আর অনর্গল অজস্র কথা বলে বলে ঘুনুরামের চারপাশে দুরন্ত ঢল নামিয়ে দেয় সে। আর সেই ঢলে একেবারে ভেসে যায় ঘুনুরাম।

অতর্কিতে ঘুনুরামের ভাবনার ওপর দিয়ে একটা সম্ভাবনা ছায়া ফেলল। এক বছর পর পর সে নোনপুরায় আসে। এর মধ্যে রতির বিয়ে হয়ে যায়নি তো? শিবলের চোখের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল সে, তার আগে শিবলই বলে উঠল,

'চান করবে তো?'

ঘুনুরাম বলল, 'করব বৈকি। চারদিন সমানে হেঁটে আসছি, রাতে ঘুম নেই। গা-হাত-পা জ্বালা করছে। চান না করতে পারলে মরে যাব।'

শিবল আর কিছু বলল না। ঘর থেকে তেল আর গামছা বার করে ঘুনুরামের সামনে রাখল।

কুয়োর জলে শরীরের জ্বালা এবং শ্রান্তি অনেকখানি জুড়িয়ে ঘুনুরাম আবার যখন ফিরে এল তখন দেখা গেল বারান্দায় সেই বাক্সটা নেই। শিবল সেটা ঘরে নিয়ে রেখেছে।

শিবলের বাড়িতে মোট দু'খানি ঘর। প্রতি বছর গণপতি উৎসবের সময়টা শিবল আর রতি এক ঘরে থাকে। দ্বিতীয় ঘরখানা ছেড়ে দেয় ঘুনুরামকে।

ভেজা কাপড় ছেড়ে বাক্স খুলে শুকনো ধুতি পরল ঘুনুরাম। আর সেই সময় শিবল বলল, 'চল, তোমাকে ভাত দিই। এতখানি পথ হেঁটে এসেছ। খেয়েদেয়ে ভাল করে জিরোও।'

কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে ঘুনুরাম বলল, 'কিন্তু—' একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করেই সে থামল।

'কী?'

'চাল-ডাল কিছুই দিলাম না—'

প্রতি বছর এখানে থাকেই শুধু ঘুনুরাম। খোবাকি তার নিজের। অবশ্য রতি তার রান্নার দায়িত্ব নেয়। শিবল বলে উঠল, 'ওবেলা থেকে চাল-ডাল দিও। এখন এস দিকি—'

যেতে গিয়েও ইতস্তত করল ঘুনুরাম। আর সেই সময় রতির কথা আবার মনে পড়ল। একটু আগে পারেনি, এবার কিন্তু সে বলেই ফেলল, 'আচ্ছা, তোমার মেয়েকে তো দেখছি না—'

'ওর কথা আর বলো না সং। আজ পাঁচ-ছ'টা দিন ধরে ও কি আর বাড়িতে থাকে! ঘরের কাজটুকু কোনওরকমে সেরে উত্তরের টিলায় ছোটে। সারাদিন তো সেখানেই পড়ে আছে। আর মেয়েটাকেই বা কি বলব, গোটা গ্রামটাই ওখানে গিয়ে জড়ো হয়েছে।'

একটা ব্যাপারে অন্তত আশ্বস্ত হওয়া গেল। রতি নোনপুরাতেই আছে এবং তার বিয়ে হয়নি। উৎসুক সুরে ঘুনুরাম জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার, উত্তরের টিলায় সবাই ছুটছে কেন?'

শিবল বলল, 'আরে তোমাকে বলতেই ভুলে গেছি। উত্তরের টিলায় একটা বাঘ এসেছে যে—'

কথাটা বুঝতে পারল না ঘুনুরাম। বিমূঢ়ের মতো শিবলের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলতে পারল, 'বাঘ!'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ বাঘ, জ্যান্ত চিতাবাঘ।' শিবল বলতে লাগল, 'শম্ভা বলে একটা ছোকরা সেই সাতারা জেলা থেকে পেল্লায় এক খাঁচায় পুরে ওটাকে নিয়ে এসেছে। দিন পাঁচ-

ছয় শম্ভা আমাদের এখানে এসেছে। তার ভেতরই সারা গ্রামটাকে মাত করে ফেলেছে।'

ঘুনুরাম কী বলবে, ভেবে পেল না। একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় তার সমস্ত হৃৎপিণ্ড ঝড়ের দোলায় দুলতে লাগল যেন।

শিবল কী ভেবে আবার বলল, 'সে যাক গে, তুমি এখন খেতে এস সং—'

বিচিত্র এক অস্থিরতার মধ্যে শিবলের পিছু পিছু রান্নাঘরে গিয়ে খেতে বসল ঘুনুরাম। খাওয়ার আয়োজন সামান্যই। ভাত, উচ্ছে আর বেগুন দিয়ে ভাজি, খানিকটা হলদে রঙের আমতি (টকের ডাল) এবং আগুনে স্যাঁকা পাঁপড়।

ঘুনুরাম লক্ষ করল, মাত্র একজনের মতো ভাত-তরকারি বেড়ে নিয়েছে শিবল। বলল, 'এ কি, আমি একাই খাব নাকি?'

'হ্যাঁ।' শিবল মাথা নাড়ল, 'মেয়েটা না খেয়েই ছুটেছে। ও ফিরে আসুক, তখন একসঙ্গে খাব। ওকে ফেলে এখন খাই কি করে বল?'

হঠাৎ একটা ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠল ঘুনুরাম। কুণ্ঠিত মুখে বলল, 'কিন্তু—'

'কী?'

'তোমাদের দু'জনের মতো তো রান্না হয়েছে। আমি খেলে—'

ঘুনুরামের মনোভাব যেন বুঝতে পারল শিবল। হেসে বলল, 'ভয় নেই। আমরা না খেয়ে থাকব না। আজকাল দু'বেলার রান্না সকালেই রেঁধে রাখছে রতি। তুমি খেলে আর কী হবে? ওবেলা আবার না হয় চাট্টি ফুটিয়ে নেবে।'

এরপর আর কিছু বলল না ঘুনুরাম। ভাতের থালাটা টেনে নিয়ে অন্যমনস্কের মতো মুখে গ্রাস তুলতে লাগল। একটু আগেও পেটের ভেতর গনগনে খিদে ছিল, এখন সেটা একেবারে অনুভূতিশূন্য হয়ে গেছে। শুধু উত্তরের টিলা, একটা চিতাবাঘ আর শম্ভা নামে সাতারা জেলার আজানা অচেনা আগন্তুক তার সমস্ত অস্তিত্ব ভারাক্রান্ত করে ফেলেছে।

খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। সেই সময় ছুটতে ছুটতে এবং হাঁপাতে হাঁপাতে উত্তরের টিলা থেকে রতি ফিরে এল। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎচমকের মতো কী একটা যেন তীব্র গতিতে ঘুনুরামের রক্তের মধ্য দিয়ে বয়ে গেল।

আগের বছর, আগের বছর কেন, গত পাঁচ বছর ধরে ঘুনুরাম যেমন দেখছে হুবহু সেই একই রকম আছে রতি। কালো রং মেয়েটার। কালো বললে সব বলা হয় না। তার গা থেকে তীক্ষ্ণ এক দ্যুতি যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে। মনে হয়, মেয়েটা সর্বাঙ্গে ঘামতেল মেখে আছে। আদিবাসিনী মেয়েদের মতো উদ্দাম এবং অজস্র স্বাস্থ্য তার। নাকমুখ বেশ টানা-টানা, তীক্ষ্ণ। হাতে রুপোর কাঙনা, নিটোল গলাটি বেষ্টন করে রুপোর বিছে হার। কালো দেহে রুপোর ছটা রূপের হাট বসিয়ে দিয়েছে যেন।

মুঠোর ভেতর বেড় পাওয়া যায় রতির কোমরখানি এমনই সরু। কোমরের নিচের দিকে বিশাল অববাহিকা, ওপর দিকে ভরাট, মাংসল বুক। হলুদ রঙের ওপর কালো কালো ফুলের ছাপওলা একটা শাড়ি তার দেহটিকে সাপটে ধরে রয়েছে।

মেয়েটা যেন কালো ময়ূরী। চোখের দৃষ্টিতে তার ঘোর-লাগা, তার মধ্য থেকে

কৌতুকের খানিকটা দীপ্তিও বিচ্ছুরিত হচ্ছে। ছুটতে ছুটতে রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল রতি। চোখমুখ এই মুহূর্তে উত্তেজনায় জ্বলছে। বুকটা দ্রুত তালে ওঠানামা করছে। শিবলের দিকে তাকিয়ে সে বলতে লাগল, 'বাঘটা কি সুন্দর বাবা, পেঙলা পেঙলা রং। তার ওপর কালো কালো গোল গোল ছাপ। চোখ দুটো কাচের মতন। ল্যাজটা—'

শিবল সস্নেহে হাসল, 'বুঝেছি, বুঝেছি। বাঘ তো নয়, একেবারে রাজপুত্তুর।'

'আরো শোনই না—' অসহিষ্ণু সুরে রতি বলতে লাগল, 'ল্যাজটা প্রকাণ্ড—'

বাধা দিয়ে শিবল বলল, 'শুনেছি বাপু, শুনেছি। এই পাঁচ ছ'দিন ধরে কতবার তো এক কথা বললি। বাঘটার এমন চোখ, অমন নাক, তেমন ল্যাজ। শুনতে শুনতে একেবারে ঝালাপালা হয়ে গেছি। ওই বাঘ বাঘ করে তো খিদেতেষ্টা বিসর্জন দিয়ে বসে আছ। যাও, চান করে এস—'

রতি ফিরে যাচ্ছিল। শিবল ডেকে থামাল, 'আরে শোন শোন, এই রতি—দ্যাখ কে এসেছে—'

রতি ফিরে দাঁড়াল। উত্তেজনার ঝোঁকে আগে সে লক্ষ করেনি। এবার দেখল রান্নাঘরের এক কোণে খেতে বসেছে ঘুনুরাম। চোখ বড় বড় করে রতি বলল, 'ওমা সং যে—কখন এসেছ?'

নির্জীব সুরে ঘুনুরাম বলল, 'এই খানিকটা আগে।'

'তুমি যে এখানে বসে বসে খাচ্চ আমি খেয়ালই করিনি।'

'খেয়াল না করারই কথা। বাঘের গল্প নিয়ে তুমি মেতে ছিলে—'

নতুন উদ্যমে রতি বলল, 'তুমিই বল, অমন চমৎকার বাঘ—'

কথাটা আর শেষ করতে পারল না রতি। তার আগেই শিবল তাড়া দিয়ে উঠল, 'আবার বাঘের গল্প জুড়লি! গেলি চান করতে, গেলি—'

রতি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'পরে তোমাকে বাঘের কথা বলব সং।' বলেই ছুটে পালাল।

সর্বাঙ্গে অসীম শ্রান্তি, বিছানায় শরীর সঁপে দিলে ঘুমের আরকে ডুবে যাবার কথা। কিন্তু কিছুতেই ঘুম এল না। বুকের ভেতর একটা কাঁটা যেন বিঁধে আছে। কাঁটাটা যে কোথায়, হৃৎপিণ্ডের ঠিক মাঝখানে অথবা ধমনীর পাশে কিংবা অন্য কোথাও, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। সেটা যে আছে, নিদারুণ এক অস্বস্তির মধ্যে তা টের পাওয়া যাচ্ছে। আচ্ছন্ন এবং অস্থির ঘুনুরাম ঘুম এবং না-ঘুমের মাঝামাঝি জায়গায় পড়ে রইল। শুয়ে শুয়ে একটা ব্যাপার সে লক্ষ করেছে, কোনওরকমে চান-খাওয়া সেরেই আবার উত্তরের টিলার ছুট লাগিয়েছে রতি। রতির এই পরিবর্তন ঘুনুরামের প্রাণের ভেতরটা দুমড়ে-মুচড়ে বাঁকিয়ে-চুকিয়ে কেমন যেন ডেলা পাকিয়ে দিতে লাগল।

অথচ অন্য সব বছর ঘুনুরাম এখানে এলে তার সঙ্গ ছাড়তে চায় না রতি। কী এক নেশার ঘোরে সর্বক্ষণ তার পিছু পিছু ঘুরতে থাকে। আশ্চর্য, আজ তার সম্বন্ধে যেন বিন্দুমাত্র কৌতূহলও নেই মেয়েটার।

আদৌ না ঘুমিয়ে ঘুনুরাম যখন বিছানা থেকে উঠে বাইরের বারান্দায় এসে বসল তখন আকাশের কোথাও সূর্যটাকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

ঘুনুরামের ইচ্ছা ছিল, আজই ঘুম থেকে উঠে বাঘ সেজে গ্রামে বেরুবে। কিন্তু এই মুহূর্তে বাঘ সাজার মতো সামান্য উৎসাহটুকুও নিজের প্রাণের কোনও প্রান্তেই বুঝি অবশিষ্ট নেই। নিজেকে উদ্যমহীন, নিরুৎসাহ এক জড়পিণ্ডের মতো মনে হচ্ছে। শিবল বাড়িতে নেই আর রতিও সেই উত্তরের টিলায়। বারান্দায় বসে প্রায় শূন্য চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল ঘুনুরাম।

বেশিক্ষণ অবশ্য বসে থাকতে হল না। সন্ধের খানিক আগে আগেই রতি ফিরে এল। ঘুনুরামকে বসে থাকতে দেখে বলল, 'আমি যখন বেরুই তখন তুমি ঘুমুচ্ছ। তা কখন উঠলে?'

'এই একটু আগে।' ঘুনুরাম বলল।

'অন্য বছর যেদিন আসো সেদিনই তো বাঘ সেজে বেরিয়ে পড়। কই এবার তো বেরুলে না?'

'কাল থেকে বেরুব ভাবছি।'

'কেন, শরীর খারাপ নাকি?'

'না, তেমন কিছু নয়।'

রতি আর কিছু জিজ্ঞেস করল না। এদিকে সন্ধের অন্ধকার নেমে আসতে শুরু করেছে। লম্বা পায়ে ঘরের ভেতর চলে গেল সে। তারপর কেরোসিনের লণ্ঠন জ্বালিয়ে আবার ঘুনুরামের কাছে এল। দু-একটা সাধারণ কথার পর আবার উত্তরের টিলার বাঘের প্রসঙ্গে চলে গেল সে। জ্বলজ্বলে চোখে শুরু করল, 'বাঘটা যেমন সুন্দর, তার খেলোয়াড়টাও তেমনি।'

ঘুনুরাম চকিত হয়ে উঠল, 'খেলোয়াড়টা আবার কে?'

'ওই বাঘ যার—সে। নাম শম্ভা। গায়ের রং টকটকে, লম্বা-চওড়া চেহারা, পাকানো গোঁফ, বারবি চুল। বাঘের খাঁচায় ঢুকে সে যখন খেলা দেখায় বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। সত্যিকারের একটা পুরুষমানুষ। ব্যাটাছেলে এমন হলেই মানায়।' বলতে বলতে রতির গলায় স্বর আবেগে কাঁপতে লাগল। চোখের তারা দুটো কেমন যেন আবিষ্ট।

শম্ভা নামে অপরিচিত বাঘের খেলোয়াড়টির রূপ, গুণ এবং পৌরুষের স্তুতি শুনতে শুনতে আর রতির চোখমুখের চেহারা দেখতে দেখতে চোখ জ্বালা করতে লাগল ঘুনুরামের। জ্বরের রোগীর মতো কপালের দু'পাশে দুটো রগ সমানে লাফাচ্ছে। হঠাৎ উঠে দাঁড়াল সে।

রতি অবাক। বাঘ এবং শম্ভা সম্পর্কে উচ্ছ্বাস থামিয়ে বলল, 'কী হল সং, উঠে পড়লে যে?'

'মাথাটা ভীষণ ঘুরছে। যাই আরেকটু শুয়ে থাকি গে।' রতিকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে নিজের ঘরটিতে চলে গেল ঘুনুরাম।

শরীর আর মন যত নিরুদ্যমই হয়ে পডুক, পরের দিন সকালে ঘুনুরামকে বেরুতে হল।

তিন তিনটে মাসের নিরাপত্তা, তার ওপর সমস্ত বছরের জামাকাপড়ের প্রশ্নও আছে।

একেবারে বাঘ সেজেই বেরুল ঘুনুরাম। প্রথমেই সে গেল দক্ষিণ পাড়ায়।

অন্য সব বছর সে আসামাত্র সাড়া পড়ে যেত। ঘর-সংসার ফেলে সবাই বেরিয়ে আসত বাইরে। তার পিছু পিছু একটা জমজমাট ভিড় আর মৌচাকের মতো ভনভনানি সর্বক্ষণ লেগে থাকত।

এবার কিন্তু ঘুনুরামকে নিয়ে কেউ মাতল না। তাকে ঘিরে অন্য বার উদ্দীপনার যে ঢল নামে, এ বছর তার ছিটেফোঁটাও নেই।

তবু দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে গলার স্বর সপ্তমে তুলে সেই গানটা গাইতে লাগল ঘুনুরাম, 'গণপতি বাপ্পা মোরেয়া, পুড়ছা বরষি লৌকর ত্রায়া।' এত জোরে গাওয়ার উদ্দেশ্য, নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করা।

ঘুনুরামকে দেখে দু-চারজন যে বেরিয়ে না এল, তা নয়। কিন্তু তাদের চোখেমুখে অভ্যর্থনা নেই, অন্তরঙ্গতার তেমন কোন উত্তাপই অনুভব করতে পারল না ঘুনুরাম।

অন্য বছর এ গ্রামের বাসিন্দারা নিজে থেকেই ছুটে আসে। তার সঙ্গে দুটো কথা বলতে পারলে ধন্য হয়, কৃতার্থ বোধ করে। এবার কেউ এল না দেখে উপযাচকের মতো ঘুনুরামকেই এগিয়ে যেতে হল। গান থামিয়ে মুখে বিগলিত হাসি ফুটিয়ে বলল, 'এবারও এলাম তোমাদের গাঁয়ে—'

লোকগুলো বলল, 'আসবে বৈকি—' বলল বটে কিন্তু তার মধ্যে আন্তরিকতার সুর বাজল না।

দু-চার বাড়ি ঘুরে ভাওজিদের উঠোনে এসে দাঁড়াতেই ভাওজির জোয়ান ছেলেটা বলে উঠল, 'এবার আর নকল বাঘের নাচ আমরা দেখব না। আসল বাঘ এসেছে, তার খেলা দেখব।'

পাঁচ বছর ধরে নোনপুরায় আসছে ঘুনুরাম। এ গ্রামের সবাইকেই সে চেনে। নামও জানে। ভাওজীর ছেলের দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'আসল বাঘ, নকল বাঘ—কী বলছ যশোবন্ত!'

যশোবন্ত বলল, 'তুমি হলে নকল বাঘ। ন্যাকড়া-খড়-কালি-ঝুলি দিয়ে বাঘ সাজো। আসল বাঘ আছে উত্তরের টিলায়—'

অর্থাৎ সেই শম্ভা আর তার চিতাবাঘ। ঘুনুরামের ধমনীতে রক্তস্রোত যেন থেমে যেতে লাগল।

যাই হোক, সূর্যকে পশ্চিম আকাশের দেউড়ি পার করিয়ে সারা দিন পর অবসন্ন পায়ে টলতে টলতে ঘুনুরাম যখন ফিরে এল, তখন তার ঝুলিতে মোটে এক টাকা বিশ পয়সা আর সের দেড়েকের মতো চাল।

পরের দিন ঘুনুরাম গেল পুব পাড়ায়, তার পরের দিন উত্তর পাড়ায়, অবশেষে পশ্চিম পাড়ায়। যেখানেই সে যায় সেখানে একই অবস্থা। এ বছর কেউ তাকে কাছে টানার জন্য একখানা হাতও বাড়িয়ে রাখেনি। উত্তাপহীন নিস্পৃহ অভ্যর্থনা ছাড়া কোথাও কিছু জোটে না। প্রত্যাশার ঝুলিটি প্রতিদিন প্রায় শূন্যই থেকে যায় ঘুনুরামের।

এ গ্রামের বাসিন্দাদের অনেকেই প্রকাশ্যে জানিয়ে দিয়েছে, বাঘের সং দেখতে

তারা আর উৎসাহী নয়। সত্যিকারের অরণ্যচারী জীবন্ত বাঘ যখন এসেই পড়েছে তখন তাকে দেখেই তারা পরিতৃপ্ত হবে। অনেকে আবার কিছুই বলে নি। তবে উত্তরের টিলার চিতাবাঘটার দিকেই যে তাদের প্রবল অনুরাগ সেটুকু অনায়াসেই টের পাওয়া গেছে।

ক'দিন ঘুরেই ঘুনুরাম বুঝতে পারল, এ বছর আর সুবিধে হবে না। একটা গাঢ় গহন শঙ্কার ছায়া তার সমস্ত সত্তার ওপর অনড় হয়ে বসেছে যেন। তিনটে মাস নিরাপত্তার জন্য নোনপুরায় আসে সে। কিন্তু কার্পাস চাষীদের মুঠি এবার তার প্রতি এত কৃপণ যে সপ্তাখানেকের মতো খোরাকিও উঠবে কিনা সন্দেহ। এবার মত্ততার সব স্রোত, সব ঢল উত্তরের টিলার দিকে।

যে মানুষ ন'টা মাস অর্ধাহারে প্রায় পশুর জীবন কাটায় তার পক্ষে বাকি তিন মাস আয়েসী না হলেও চলে। দিন একরকম না একরকম করে কেটে যাবেই। কিন্তু নোনপুরায় এসে সে যে মর্যাদা পায় সেটা কোথায় মিলবে? ঘুনুরামের মনে হল, তার ন্যায়সঙ্গত আর চিরন্তন গৌরবে শম্ভা এবং তার বাঘটা অত্যন্ত অন্যায়ভাবে হাত বাড়িয়েছে।

উত্তরের টিলার ওই বাঘটা শুধু তিন মাসের নিরাপত্তা আর মর্যাদাই ছিনিয়ে নেয়নি, অন্য দিক থেকেও ঘুনুররামকে একেবারে পঙ্গু করে ফেলেছে।

সকাল হলেই নাকেমুখে চাট্টি গুঁজে বাঘ সেজে বেরিয়ে পড়ে ঘুনুরাম। সমস্ত দিন নেচে-গেয়ে নোনপুরা গ্রামের মনোহরণের চেষ্টা করে সন্ধের মুখে শিবল নায়েকের বাড়ি ফিরে আসে। ফিরে কোনওদিন রতির দেখা মেলে, তবে বেশির ভাগ দিনই সে থাকে উত্তরের টিলায়। অবশ্য সন্ধের অন্ধকার নামার পর আর বাইরে থাকে না রতি, বাড়ি ফিরে আসে।

বাঘের সাজ খুলে কালিঝুলি ধুয়ে আসতে আসতে রাতের বয়স অনেকটাই বেড়ে যায়। সেই সময় রতি খেতে ডাকে। খেতে খেতে নানা কথা হয়। তবে সব নদী সমুদ্রে মেশার মতো সব কথার শেষে বাঘের প্রসঙ্গ আনবেই মেয়েটা। প্রায় রোজই সে জিজ্ঞেস করে, 'চিতাবাঘটা তুমি দেখে এসেছ সং?'

খেতে খেতে ভাতের ডেলা গলায় আটকে যায়। বিস্বাদ, রুদ্ধ স্বরে ঘুনুরাম জবাব দেয়, 'না।'

'কী আশ্চর্য, গ্রামের কোনও লোকের বাঘটা দেখতে বাকি নেই। রোজ দু-চার বার করে সবাই গিয়ে দেখে আসছে, আর তুমিই শুধু যাচ্ছ না!' রতির মুখচোখ দেখে মনে হয়, উত্তরের টিলার বাঘটা দেখতে না যাওয়া রীতিমত অপরাধ।

ঘুনুরাম এবার আর কিছু বলে না। নিঃশব্দে, নতচোখে ভাতের থালায় আঁকিবুকি কেটে যায়।

রতি তাড়া লাগায়, 'কালই কিন্তু যাবে সং, নিশ্চয়ই যাবে। অমন চমৎকার বাঘ জীবনে আর কখনও দেখনি, আর দেখতেও পাবে না। তা ছাড়া ওই খেলোয়াড় শম্ভা—কি মজাদার লোক যে সে, তোমায় কী বলব সং!'

অদ্ভুত ব্যাপার। অন্য বছর তাকে দেখাবার জন্য নোনপুরা গ্রামের সবাইকে টেনে টেনে বাড়িতে নিয়ে আসত রতি। সে কী খেতে ভালোবাসে, কখন ঘুমোয়, কীভাবে বাঘ সাজে ইত্যাদি নানা রূপকথা শুনিয়ে তাক লাগিয়ে দিত। সে জানে এই রতি, কালো ময়ূরীর মতো শিবল নায়েকের এই মেয়েটা, একটু ইসারা পেলে একদিন তার পিছু পিছু চান্দা জেলা পর্যন্ত চলে যেতে পারত। কিন্তু প্রতিদিনের অসংখ্য অপমান, অর্ধাহার আর অনিশ্চয়তার জীবনে রতিকে ডেকে নিয়ে যেতে ভরসা হয়নি ঘুনুরামের। তা ছাড়া নোনপুরায় এই একটা মাস বাদ দিলে প্রাণধারণের জন্য সর্বক্ষণ তার যে সংগ্রাম, যে অসম্মান—তা ঘুনুরামকে স্বভাবভীরু করে রেখেছে। রতিকে ডাক দেবার মতো দুঃসাহস নিজের মধ্যে কোনওদিনই সে খুঁজে পায়নি।

ঘুনুরাম নিজে যেমনই হোক, যতই তার ভীরুতা থাক, রতি কিন্তু এতকাল তাকে নিয়েই মেতে ছিল। তার গৌরবে সর্বক্ষণ উচ্ছল আর উচ্ছ্বসিত হয়ে থাকত সে। আশ্চর্য, সেই রতিই আজ উত্তরের টিলার চিতাবাঘ আর শম্ভাকে নিয়ে মেতে উঠেছে।

রতি আবার বলে, 'আমি জানি, তুমি নিজে থেকে যাবে না। আমিই তোমাকে বাঘ দেখাতে কাল নিয়ে যাব।'

ঘুনুরাম উত্তর দেয় না। শুধু অসহ্য, অক্ষম আক্রোশে তার বুকের ভেতরটা তরঙ্গিত হতে থাকে। নাঃ, শম্ভা আর তার বাঘ সে দেখেনি, দেখার বিন্দুমাত্র সাধও নেই।

দেখতে দেখতে গণেশ পুজো এসে গেল। নোনপুরা গ্রামের উত্তেজনা, উদ্দীপনা এবং মাতামাতি এখন শীর্ষবিন্দুতে। উদ্যমহীন, ভগ্নমন ঘুনুরাম শেষবারের মতো আসরে নামল। মানুষ এখন উদ্দাম, হিসেবহীন, বেপরোয়া। এ-সময়টা যদি তাদের খুশি করে কিছু আদায় করা যায়। অতএব যতখানি সম্ভব নিখুঁত করে বাঘ সাজল ঘুনুরাম, শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে নাচল, কুঁদল এবং মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে গাইল। কিন্তু এবার নোনপুরার মানুষেরা যেন প্রতিজ্ঞাই করে বসেছে তার দিকে ফিরেও তাকাবে না, কঠিন উপেক্ষা দিয়ে শুধু দূরেই সরিয়ে রাখবে।

ঘুনুরামের কেমন যেন সংশয় হল, এতকাল নকল বাঘ সেজে আসল বাঘের মর্যাদা পেয়ে এসেছে সে। নোনপুরার মানুষ আসল-নকলের পার্থক্য বুঝতে না পেরেই বোধহয় সে সম্মান দিয়েছে। এখন সত্যিকারের বাঘ এসে পড়ায় তফাতটা ধরা পড়ে গেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে গৌরবের সিংহাসন থেকে তারা তাকে একেবারে পথের ধুলোয় ছুঁড়ে দিয়েছে।

আরও ক'টা দিন কেটে গেল। ব্যর্থ, পরাভূত, হতাশ ঘুনুরাম আজকাল আর বাঘ সেজে গ্রামে বেরোয় না। কী-ই বা হবে বেরিয়ে! শুধু শিবল নায়েকের বারান্দায়, দু-হাঁটুর ফাঁকে মুখ রেখে শূন্য দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে আর ভাবে, উত্তরের টিলার যে বাঘটা তার সমস্ত মর্যাদা ছিনিয়ে নিয়েছে সেটা কেমন? একদিন সে পণ করেছিল, বাঘটা দেখতে কোনওদিনই যাবে না। নোনপুরা গ্রামের আর সব জায়গাতেই গেছে সে, শুধু ওই উত্তরের টিলাটাই এতদিন বাদ থেকেছে। কিন্তু ধীরে ধীরে প্রবল বিতৃষ্ণা দিয়ে গড়া শপথের ভিতটা কখন যে শিথিল হয়ে গেছে, খেয়াল

নেই। ঘুনুরাম স্থির করল, বাঘটা দেখতে যাবে।

বিচিত্র এক বিদ্বেষ আর উত্তেজনার মধ্যে সেদিন সারা দুপুর বসে বসে বাঘ সাজল ঘুনুরাম। তারপর সূর্যটা যখন পশ্চিম আকাশের দিকে অনেকখানি নেমে গেছে সেই সময় পায়ে পায়ে উত্তরের টিলায় চলে এল।

আজ গণপতি-উৎসবের পঞ্চম দিন। ঘুনুরাম এসে দেখল, উত্তরের টিলায় একেবারে মেলা বসে গেছে। এখানে ভিড় জমাতে নোনপুরা গ্রামের কেউ বুঝি আর বাকি নেই। আর ভিড়টার একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই কালো ময়ূরী—রতি।

সত্যিই দর্শনীয় ব্যাপার। ভিড় যেখানে শেষ হয়েছে তার পরেই লাল শালুর একটা সামিয়ানা খাটানো। সেটার ঠিক নিচে বিশাল লোহার খাঁচা। তার ভেতর একটা চিতাবাঘ শুয়ে আছে।

আর খাঁচার গায়ে হাত রেখে একটি টান টান চেহারার যুবক দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে-ই বোধ হল খেলোয়াড়—সাতারা জেলার শম্ভা। রতি যা বলেছিল, মিথ্যে নয়। সত্যিই শম্ভা সুপুরুষ। শরীরময় থরে থরে সাজানো পেশী। তার হাত-পা, চওড়া কবজি, বিস্তৃত বুক—সবই বলশালিতার প্রতীক। বাবরি চুলে বাঁকা সিঁথি, নাকের নিচে সূক্ষ্ম শৌখিন গোঁফ। চোখের দৃষ্টিতে খানিকটা অবজ্ঞা মেশানো।

পরনে গোলাপি গেঞ্জি আর খাটো হাফ প্যান্ট, হাতে লিকলিকে ছড়ি। ভিড়টার ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে চোখ দু'টি একবার ঘুরিয়ে নিয়ে শম্ভা আরম্ভ করল, 'এ বাঘ বড় তেজী, খোদ সাতপুরা পাহাড় থেকে পনেরো দিন আগে ধরা হয়েছে। কিন্তু আমি একে বশ মানিয়েছি। এ আমার কথায় ওঠে, আমার কথায় বসে, হাতজোড় করে নমস্কার করে। ইচ্ছে হলে গানও গায়।'

বাঘের গুণ সম্বন্ধে লম্বা একখানা ফিরিস্তি দিয়ে শম্ভা যা করল, তাতে সবার শ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে আসতে লাগল। চকিতে খাঁচার একটা পাল্লা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল সে। তারপর বাঘটার কাছে গিয়ে ছড়ির এক খোঁচা মেরে বলল, 'ওঠ ব্যাটা, ওঠ। দুনিয়াকে একটা সেলাম ঠুকে নাচ দেখা।'

বাঘ কিন্তু উঠল না। চোখ দুটো বারকয়েক পিট পিট করে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। শম্ভা অনেক খোঁচাখুঁচি এবং টানাটানি করল। এমন কি তার মুখ খুলে একখানা হাত পুরে দিল কিন্তু বাঘটার কোনও বিকার নেই, ঘুমের আরকে সে ডুবেই রইল।

এদিকে সামনের ভিড়টা স্তব্ধ, একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ। আর রতির তো কথাই নেই। দু-চোখে অপার অসীম বিস্ময় নিয়ে একেবারে সম্মোহিত হয়ে গেছে মেয়েটা।

সবার পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল ঘুনুরাম। আচ্ছন্নের মতো কখন সে ভিড় ঠেলে সামনে চলে এসেছে, খেয়াল নেই।

ওদিকে খাঁচার ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছে শম্ভা। এসেই সে বলল, 'নাঃ, তোমাদের কাছ থেকে দু-চার পয়সা নজরানা না পেলে ও ব্যাটা কিছুতেই উঠবে না। সেলামও ঠুকবে না, নাচও দেখাবে না।'

বলার শুধু অপেক্ষা। সঙ্গে সঙ্গে চারপাশ থেকে সিকি-আধুলি, এমন কি এক টাকার

নোটেরও বৃষ্টি আরম্ভ হল। তা ছাড়া মুখ-বাঁধা ছোট ছোট চালের থলেও পড়তে লাগল।

স্তম্ভিত ঘুনুবাম দেখতে লাগল, এর আগে একমাস ঘুরে ঘুরে এ গ্রাম থেকে সে যা আদায় করতে পেরেছে, একদিনেই তার দশগুণ বেশি পেয়েছে ওই শম্ভা আর তার বাঘ।

হঠাৎ ঘুনুরামের মনে হল, জগতে যাদের কাছে যত বঞ্চনা যত অপমান যত অমর্যাদা সে পেয়েছে, খাঁচার মধ্যে শায়িত ওই বাঘটা তাদের সবার প্রতিনিধি। বাঘটা তার সমস্ত গৌরব ছিনিয়ে নিয়েছে, নোনপুরা গ্রামকে তার কাছ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দিয়েছে। এমন কি কালো ময়ূরীর মতো ওই মেয়েটাকে পর্যন্ত সম্মোহিত করে ফেলেছে। অসম্মানের শেষ প্রান্তে পৌঁছে এই প্রথম বার নিজের শৌর্যে জ্বলে উঠতে চাইল ঘুনুরাম। হঠাৎ শম্ভার উদ্দেশে চিৎকার করে উঠল সে, 'একটা মরা বাঘ নিয়ে এসে বাহাদুরি দেখানো হচ্ছে!'

পয়সা কুড়োতে কুড়োতে চকিত হল শম্ভা। তারপর বিদ্যুৎবেগে উঠে দাঁড়িয়ে ঘুনুরামের দিকে তাকাল। বাঘের সংটাকে দেখতে দেখতে তার ভুরু দুটো ধীরে ধীরে কুঁচকে যেতে লাগল। চোখের দৃষ্টি তার স্বভাবের সেই বাঁকা বিদ্রূপে তীক্ষ্ণ হতে লাগল। চিবিয়ে চিবিয়ে অবজ্ঞার সুরে সে বলল, 'আমার বাঘটা মরা!'

'নিশ্চয়।'

'আর তুই বুঝি জ্যান্ত বাঘ!'

শম্ভার বলার ভঙ্গিতে চারপাশের ভিড়টা হো হো করে উদ্দাম হাসিতে ভেঙে পড়ল।

আর সেই হাসির আওয়াজ ডুবিয়ে দিয়ে গর্জে উঠল ঘুনুরাম, 'নিশ্চয়ই, আমি জ্যান্ত বাঘ।'

এক মুহূর্ত কী ভাবল শম্ভা। তারপর আগের মতোই চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'কে জ্যান্ত আর কে মরা, একবার পরখ করবি? লড়বি আমার বাঘটার সঙ্গে?'

ঘুনুরাম লক্ষ করল, চারপাশের মানুষগুলো এবার আর হাসল না। দুরন্ত দ্রুতগতিতে তার সত্তার মধ্যে দিয়ে কী একটা প্রতিক্রিয়া ঘটে গেল যেন। মনে হল, ওই বাঘটার সঙ্গে যুদ্ধে নামলে সে তার হারানো গৌরব আবার ফিরে পাবে। ঘুনুরাম বলল, 'হ্যাঁ, লড়ব।'

'আয় তবে।' বলে বাঘের খাঁচার পাল্লা খুলতে শুরু করল শম্ভা, 'শেষে কিছু হলে আমায় দোষ দিবি না?'

'না, দেব না।' অন্যমনস্কের মতো কথা ক'টা বলে আরেক বার ভিড়টার দিকে তাকাল ঘুনুরাম, রতিকে দেখল। অনুভব করল, সবার হৃৎপিণ্ড থমকে গেছে, নিশ্বাস পড়ছে না কারও। স্তব্ধ নিষ্পলকে সকলে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

সবাইকে দেখে নিয়ে বিচিত্র ঘোরের মধ্যে খাঁচায় গিয়ে ঢুকল ঘুনুরাম। সঙ্গে সঙ্গে শম্ভা পাল্লা বন্ধ করল।

খানিক আগে শম্ভা যখন খাঁচায় ঢুকেছিল তখন বাঘটা বারকয়েক চোখ পিটপিট করেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। কিন্তু ঘুনুরাম ঢুকতেই চোখ মেলে অদ্ভুত-দর্শন একটা জানোয়ারকে দেখে কী যেন বুঝতে চেষ্টা করল। তারপর গা-ঝাড়া দিয়ে ল্যাজ দুলিয়ে উঠে দাঁড়াল। এবং ঘুনুরাম কিছু বুঝবার বা করবার আগেই তার ঘাড়ের কাছে প্রচণ্ড এক থাবা এসে পড়ল। পরমুহূর্তেই আরেকটা। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল, চেতনাটা যেন ক্রমশ গভীর অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে।

চারপাশের লোকগুলো বোধহয় ভয়ার্ত চিৎকার জুড়ে দিয়েছে। কিন্তু তা বুঝতে পারছে না ঘুনুরাম। মনে হচ্ছে দূরাগত ক্ষীণ একটা গুঞ্জন কানে এসে লাগছে। সেটাও বেশিক্ষণ শোনা গেল না। আহত রক্তাক্ত মূর্ছিত ঘুনুরাম মুহূর্তে লুটিয়ে পড়ল।

জীবনে চিরদিন বাঘের সংই সেজেছে ঘুনুরাম। এই একবারই বাঘ হয়ে উঠতে চেয়েছিল সে।

বিরুদ্ধ পক্ষ

মাঝারি মাপের ফ্ল্যাটটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাবার পর পোপটলাল পারেখ বললেন, 'কি, পছন্দ তো?'

মাস চারেক আগে একটা বিরাট মাল্টি-ন্যাশনাল ফার্মে চাকরি পেয়ে বম্বে এসেছি। এখানে আসার পর বাড়ি-টাড়ি ভাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না। বম্বে শহরে আকাশের তারা খসিয়ে আনাটা বাড়ি পাওয়ার চাইতে ঢের সহজ ব্যাপার।

চারটে মাস আমি একটা গেস্ট-হাউসে আছি। এখানে এই বম্বে শহরে সাতটায় সানরাইজ। সকালে ঘুম থেকে উঠে স্নান করে ব্রেকফাস্ট সারতে সারতেই সাড়ে আটটা বেজে যায়। সাড়ে ন'টায় অফিসে অ্যাটেনডান্স। উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে দৌড়তে সাবার্বন ট্রেনের দম-আটকানো ভিড়ে নিজেকে গুঁজে দিয়ে চলে যাই প্রপার বম্বেতে।

সাড়ে ন'টা থেকে একটানা সাড়ে বারোটা পর্যন্ত অফিসে আর মাথা তুলতে পারি না। ঘাড় গুঁজে ফাইলের মধ্যে ডুবে থাকতে হয়। তারপর এক ঘন্টা লাঞ্চ ব্রেক। উদিপি সিন্ধি কি ইরানি হোটেলে দুপুরের খাওয়াটা সেরে দেড়টায় আবার ব্যাক বে রিক্লামেশনের বাইশ-তলা বিশাল স্কাইস্ক্রেপারে গিয়ে ঢুকি। ওখানেই আমার অফিস। দেড়টায় ঢুকবার পর বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত বাকি পৃথিবীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক থাকে না, অগুনতি ফাইল বিরাট হাঁ করে আমাকে তার ভেতর গিলে নেয়।

পাঁচটার পর অফিস ছুটি হলে বাড়ির খোঁজে বেরিয়ে পড়ি। বাবা মা আর দুটো ছোট ভাই কলকাতায় রয়েছে। দু বছর হল বাবা রিটায়ার করেছেন। ছোট ভাই দুটো বি. কম পাশ করে বসে আছে। এই অবস্থায় বম্বেতে গেস্ট-হাউসে থেকে নিজের খরচ চালিয়ে আবার কলকাতার সংসার টানা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। একটা বাড়ি-টাড়ি পেলে সবাইকে নিয়ে আসা যায়। তাতে খরচটা আমার মাপের মধ্যে নিয়ে আসতে পারব। তাছাড়া সিন্ধি কি উদিপি হোটেলে খেয়ে পেটের বারোটা বেজে যাচ্ছে। মা এলে

পাকস্থলীটাকে অন্তত রক্ষা করা যাবে।

কিন্তু বম্বে শহরে বাড়ি কোথায়? প্রপার বম্বের তো প্রশ্নই ওঠে না। চার মাস ধরে গোটা আউটস্কার্ট চষে বেড়িয়েছি, কিন্তু এক কামরার একটা ঘরও খুঁজে বার করতে পারিনি।

ঘর কি পাওয়া যায় না? নিশ্চয়ই যায়। কিন্তু কিভাবে যায়, বারো শ মাইল দূরের কলকাতা থেকে আসা আমার মতো একটা নতুন ছেলের পক্ষে তা জেনে ওঠা সম্ভব হয়নি।

শেষ পর্যন্ত বাড়ির ব্যাপারে কিছুই করতে না পেরে পোপটলাল পারেখকে ধরেছি।

আমি যে ডিপার্টমেন্টে কাজ করি পোপটলাল সেখানকার সুপারিনটেনডেন্ট। মধ্যবয়সী এই গুজরাটি ভদ্রলোক মানুষ হিসেবে অত্যন্ত হৃদয়বান। আমি যেদিন এই অফিসে রিপোর্ট করলাম সেদিন থেকেই তাঁর স্নেহের উষ্ণতা অনুভব করে আসছি।

পোপটলাল বম্বে শহরের অন্ধিসন্ধি সব জানেন। তিনিই খোঁজাখুঁজি করে লোক লাগিয়ে শেষ পর্যন্ত প্রপার বম্বে থেকে বারো-চোদ্দ কিলোমিটার দূরে সান্তাক্রুজ ইস্টে একটা পাঁচতলা বাড়ির একেবারে মাথায় একটা ফাঁকা ফ্ল্যাট বার করেছেন। আর সেটাই তিনি আমাকে এই মুহূর্তে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখানো শেষ করলেন।

ফ্ল্যাটটায় দু'খানা বড় বেডরুম, একটা হল, তাছাড়া আলাদা কিচেন, বাথরুম ইত্যাদি ইত্যাদি তো রয়েছেই। সব চাইতে সুবিধাজনক যেটা তা হল সাবার্বন ট্রেনের স্টেশনটা বাড়ির গায়েই, দু' মিনিট হাঁটলেই ঘোড় বন্দর রোডে গিয়ে প্রপার বম্বের এক্সপ্রেস বাস পাওয়া যায়। আমার পক্ষে এর চাইতে ভাল বাড়ি পাওয়া প্রায় অসম্ভব।

বাড়িটা পোপটলাল পারেখের এক দূর-সম্পর্কের আত্মীয়ের, তাঁর নাম ভরতরাম ঢোলাকিয়া। তিনিও এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন।

আমি পোপটলালকে বললাম, 'হ্যাঁ, পছন্দ হয়েছে। কত ভাড়া দিতে হবে?'

'পাঁচ শ! তবে—'

'কী?'

'দশ হাজার টাকা পাগড়ি (সেলামি) দিতে হবে।'

ভরতরাম হাত কচলাতে কচলাতে বললেন, 'মানে বুঝতেই পারছেন, বাড়িভাড়া দিয়ে আমাকে খেতে হয়। নইলে আমার আত্মীয়ের সঙ্গে এসেছেন, বুঝি পাগড়িটা নেওয়া উচিত না—'

পাগড়ি ছাড়া বম্বেতে এক ইঞ্চি জায়গা পাওয়া যায় না। যে ফ্ল্যাটটা এইমাত্র দেখলাম কম করে তার পাগড়ি হওয়া উচিত বিশ হাজার টাকা। পোপটলাল পারেখের খাতিরে দশ হাজারে পাওয়া যাচ্ছে। এর চাইতে সস্তায় খুঁজতে গেলে বম্বে শহরে এ জন্মে আর বাড়ি মিলবে না। বললাম, 'ঠিক আছে, দশ হাজারই দেব।'

কথাবার্তা পাকা করে আমরা তিনজন ফ্ল্যাটটা থেকে বেরিয়ে এলাম। বেরিয়েই পোপটলাল আর ভরতরাম সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। আমাকে কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। কেননা এই পাঁচতলা বাড়িটার প্রত্যেক ফ্লোরে দুটো করে মুখোমুখি ফ্ল্যাট, আর এই মুহূর্তে আমার চোখে পড়ল উলটো দিকের ফ্ল্যাটটা থেকে

মাধুরী বেরিয়ে আসছে।

তিন বছর পর মাধুরীকে কলকাতা থেকে বারো শ মাইল দূরে আরব সাগরের পাড়ের এই শহরে দেখব, কে ভাবতে পেরেছিল! অবাক বিস্ময়ে পলকহীন তাকিয়ে রইলাম।

মাধুরীও আমাকে দেখে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তার চোখেও অপার বিস্ময়। কয়েক পলক তাকিয়ে থাকার পর সে-ই প্রথম বলল, 'সঞ্জীবদা না?'

মাধুরীর বয়স তেইশ-চব্বিশ। গায়ের রঙ খুব ফর্সাও না, আবার কালোও না। দুয়ের মাঝামাঝি। মসৃণ ত্বক, লম্বাটে মুখ। ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা বাদামি সিল্কের মতো চুল, ভাসা ভাসা মাঝারি চোখ, মেলে দেওয়া পাখির ডানার মতো টান টান ভুরু, পাতলা ফুরফুরে নাক। পরনে প্রিন্ট-করা নাইলেক্স শাড়ি আর স্লিভলেস ব্লাউজ, পায়ে উঁচু হিলের স্লিপার।

তিন বছর আগে কলকাতায় থাকতে মাধুরী ছিল বেশ মোটাসোটা, তুলতুলে নরম চর্বি দিয়ে তখন তার শরীরটা ছিল তৈরি। বাজে চর্বি ঝরে গিয়ে এই তিন বছরে তার চেহারায় ঝকঝকে ইস্পাতের মতো একটা ধারাল ভাব এসেছে।

তার চোখেমুখে এবং শরীরের গড়নে কোথায় যেন অদৃশ্য একটা আকর্ষণ ছিল। সেটা এই তিন বছরে অনেক বেড়েছে। মাধুরীর চোখে দৃষ্টি স্থির রেখে বললাম, 'হ্যাঁ। তুমি এখানে!'

মাধুরী বলল, 'আমরা তো এখানেই থাকি।'

'ওই ফ্ল্যাটটায়?'

'হ্যাঁ।'

পোপটলালরা সিঁড়ি ভেঙে চারতলার ল্যান্ডিং-এর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। ওখান থেকেই পোপটলাল গলা তুলে বললেন, 'কী হল চ্যাটার্জি, যাবে না?'

একটু চমকে উঠলাম। মাধুরীকে দেখার পর পোপটলালদের কথা খেয়াল ছিল না। ঘাড় ফিরিয়ে বললাম, 'আপনারা নামতে থাকুন। আমি আসছি।'

চোখের কোণ দিয়ে মাধুরীকে দেখিয়ে পোপটলাল বললেন, 'চেনাশোনা বুঝি?'

'হ্যাঁ।' আস্তে ঘাড় কাত করলাম।

পোপটলাল আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না, ভরতরামকে সঙ্গে করে নেমে গেলেন।

মাধুরী এবার বলল, 'তুমি এখানে কি করে সঞ্জীবদা?'

কী উদ্দেশ্যে এই ফ্ল্যাট বাড়িতে এসেছি মাধুরীকে জানিয়ে দিলাম।

মাধুরী অবাক হয়ে বলল, 'তুমি তা হলে ওই ফ্ল্যাটটা ভাড়া নিচ্ছ!'

'হ্যাঁ।'

আমাদের কথাবার্তার মধ্যেই মাধুরীর মা আর ছোট বোন সুব্রতা ওদের ফ্ল্যাটের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। মাধুরীর মা বললেন, 'কার সঙ্গে কথা বলছিস রে মাধু?' বলতে বলতেই আমার ওপর তাঁর চোখ এসে পড়ল, 'কে, সঞ্জীব নাকি?'

এক মুহূর্ত দ্বিধা করলাম, তারপর দু'পা এগিয়ে মাধুরীর মাকে প্রণাম করলাম। তিনি আমার চিবুকে আঙুল ঠেকিয়ে বললেন, 'বেঁচে থাকো বাবা। এস, ভেতরে এস—'

বললাম, 'আজ আর যাব না মাসিমা, এক্ষুনি আমাকে ব্যাক-বে রিক্লামেশনে দৌড়তে হবে।'

মাধুরীর মা বললেন, 'তোমাকে বোম্বাইতে দেখব ভাবতে পারিনি।'

'আমি এখানে একটা চাকরি নিয়ে এসেছি।'

'ও মা, তাই নাকি? কদ্দিন আগে এসেছ?'

'মাস চারেক।'

'ওই দেখ, আমরা কিচ্ছু জানি না। জানবই বা কোত্থেকে? কলকাতা থেকে আসার পর তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগও নেই, দেখাসাক্ষাৎও নেই।'

মাধুরী এই সময় বলে উঠল, 'জানো মা, সঞ্জীবদা ওই ফ্ল্যাটটা ভাড়া নিচ্ছে।'

মাধুরী মা বললেন, 'তাই বুঝি? বাঃ, খুব ভাল। আবার এক জায়গায় থাকা যাবে।'

মাধুরীর বোন সুব্রতার বয়স সতেরো-আঠারো। সে হঠাৎ রগড়ের গলায় বলে উঠল, 'আবার মজাসে ঝগড়া শুরু করা যাবে।'

মাধুরীর মা আর আমি, দু'জনেই ভীষণ অস্বস্তি বোধ করলাম।

মাধুরীর মা ধমকের গলায় সুব্রতাকে বললেন, 'বাঁদর মেয়ে, চুপ কর।'

মাধুরী কিন্তু এতটুকু বিব্রত হয় নি। সে ঠোঁট কামড়ে হাসতে লাগল।

মাধুরীর মা আমার দিকে ফিরে এবার বললেন, 'ওই দেখ, আসল কথাটাই জিজ্ঞেস করা হয় নি। তোমার মা-বাবা কেমন আছেন?'

বললাম, 'ভাল।'

'ফ্ল্যাট ভাড়া নিচ্ছ, ওঁদের নিয়ে আসবে তো?'

'হ্যাঁ, মাসিমা।'

'তাড়াতাড়ি নিয়ে এস।'

এরপর বাড়ির অন্য সবাই কে কেমন আছে, কে কী করছে, সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করলেন মাসিমা। সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বললাম, 'আজ যাই।'

'এস।'

মাধুরীও আমার সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে নিচে নেমে এল। নামার সময়ই ও ওদের বাড়ির তিন বছরের সব কথা তিন মিনিটে জানিয়ে দিয়েছে। মাধুরীর বাবা হরিনারায়ণবাবু এখনও কাস্টমসে চাকরি করছেন, তবে এটাই তাঁর রিটায়ারমেন্টের বছর। মাধুরী কলকাতা থেকে বি. এ পাস করে এসেছিল। এখানে সে এল. আই. সি'তে একটা চাকরি পেয়েছে। সুব্রতা একটা নাম-করা ইনস্টিটিউটে অফিস সেক্রেটারিশিপ করছে। ওদের কোনও ভাই-টাই নেই।

কথায় কথায় দু'জনে সান্তাক্রুজ স্টেশনে চলে এসেছিলাম। মাধুরী আন্ধেরিতে যাবে। ওখানকার জোনাল অফিসে সে কাজ করে। আর আমি যাব তার উলটোদিকে চার্চ গেট স্টেশনে।

টিকিট কেটে ওভারব্রিজ পেরিয়ে আমি এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে যখন নেমে যাচ্ছি তখন মাধুরী বলল, 'তোমরা তাড়াতাড়ি চলে এস সঞ্জীবদা—'

বললাম, 'আচ্ছা।'

'সুব্রতা যা বলল তাই করব কিন্তু।'

'ঝগড়া তো?'

'হ্যাঁ। তোমাদের সঙ্গে ঝগড়া করে করে এমন অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল যে ওটা ছাড়া এই তিন বছরে ভীষণ অসুবিধা হয়েছে।'

আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'তিন বছর ইন্টারভ্যালের পর নতুন এনার্জি নিয়ে আবার শুরু করতে চাইছ?'

'হ্যাঁ।' বলে হাসতে হাসতে ওভারব্রিজ ধরে চার নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিকে চলে গেল মাধুরী। ওখান থেকেই আম্বেরির ট্রেন ধরবে সে।

এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে নেমে চার্চগেটের ট্রেনে উঠে প্রপার বম্বের দিকে যেতে যেতে তিন বছর আগের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল আমার।

কলকাতায় শ্যামবাজারের কাছে একটা জিলিপির প্যাঁচের মতো গলির শেষ মাথায় মাধুরীরা আর আমরা একই বাড়িতে থাকতাম। বাড়িটা যে কোন আদ্যিকালের কে জানে। খুব সম্ভব জব চার্ণক নিজের হাতে ওটার ভিত পুঁতেছিলেন। সূর্য উত্তরায়ণে না গেলে ও বাড়িতে এক ফোঁটা রোদ ঢুকত না। দু-তিনটে মাস বাদ দিলে বাড়িটা ছিল চির প্রদোষের রাজ্য। অবশ্য ছাদে গেলে খানিকটা রোদ পাওয়া যেত। গরম কালটা তবু এক রকম। শীত পড়লে মেঝে থেকে সর্বক্ষণ বরফের মতো হিম উঠতে থাকত। তাছাড়া বাড়ির ইলেকট্রিকের লাইনগুলো পুরনো ঝরঝরে হয়ে গিয়েছিল, যখন তখন আলো নিভে যেত, ফ্যান বন্ধ হ'ত। জলের কলেরও সেই অবস্থা।

জল কল রোদ ইলেকট্রিসিটি, এসব নিয়ে মাধুরীদের সঙ্গে প্রায় রোজই আমাদের খিটিমিটি লেগে থাকত। একেক দিন ঝগড়াটা সকালে শুরু হয়ে ক্লাসিক গানের আলাপ তান এবং বিস্তারের মতো সারাদিনই চলতে থাকত। ওদের পক্ষের মূল গাইয়ে ছিল মাধুরী নিজে, তার সঙ্গে সঙ্গত করতেন ওর মা, সুব্রতা আর ওর বাবা। আমাদের পক্ষের আসল আর্টিস্ট আমি। আমার সঙ্গে আমাদের ফ্যামিলির অন্য সবাই ধুয়ো ধরত।

বেশির ভাগ দিনই যুদ্ধটা হ'ত জল কল নিয়ে। তখন আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। স্নান করতে নিচের তলায় নেমে দেখি, চৌবাচ্চায় এক ফোঁটা জল নেই। চিৎকার করে বলতাম, 'এটা কিরকম হল মাধুরী, তোমাদের কি এতটুকু কনসিডারেশন থাকতে নেই?'

মাধুরী তখন কলেজে বি. এ পড়ছে। আমার গলা পেয়েই সে তাদের ঘর থেকে বেরিয়ে আসত। বলত, 'কী বলতে চাও তুমি?'

'বলতে চাই, সবটুকু জল তোমরা শেষ করে দিলে। আমি এখন কী করে চান করি?'

'তোমার কি ধারণা আমরা সাহারা মরুভূমি থেকে এসেছি? সব সময় চৌবাচ্চার জল আর কল নিয়ে পড়ে আছি?'

'সাহারা থেকে এসেছ, না চেরাপুঞ্জি থেকে তা আমাদের জানবার দরকার নেই।

আমরা স্নানের সময় দু বালতি জল পেলেই খুশি হব।'

'তোমরা জল পাবে কি পাবে না, তার কৈফিয়ৎ কি আমাদের দিতে হবে?'

'নিশ্চয়ই দিতে হবে। তোমরা নিচে থাক। চৌবাচ্চার জল কোথায় যায়, তোমরা ছাড়া ওপর থেকে আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়।'

'অত সন্দেহ হলে চৌবাচ্চার কাছে সারা দিন বসে পাহারা দিলেই পার।'

আমাদের চিৎকার চেঁচামেচির মধ্যেই মাধুরীর মা বাবা আর সুব্রতা বেরিয়ে আসত। ওপরের বারান্দায় আমার মা বাবা আর ভাইরা রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে যেত। দু পক্ষের আর্মি মবিলাইজেশনের পর কোরাসে যে চিৎকার শুরু হ'ত তাতে শ্যামবাজারের সেই গলির মাথা থেকে যাবতীয় কাক চিল চড়ুই আর শালিক পালিয়ে যেত।

শুধু কলের বা চৌবাচ্চার জল নিয়ে না, ছাদের ভাগাভাগি, ইলেকট্রিসিটির বিল ইত্যাদি ইত্যাদি ছোট বড় সব ব্যাপারে রোজই ওপরে নিচে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠত।

ঝগড়া ছাড়া ওদের সঙ্গে আমাদের কথাবার্তা হ'ত না। দেখা হলেই দুপক্ষ অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে চলে যেত।

এইভাবে মাধুরীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে পুরো দশটা বছর কেটে গেছে। তারপর একদিন ওর বাবা বদলি হয়ে বম্বে চলে এলেন। নিচের তলাটা ফাঁকা হয়ে গেল। বাড়িওলা তারপর আর ওটা ভাড়া দেয় নি। তার গেঞ্জির কল ছিল, নিচের তলায় সে গো-ডাউন করেছে। মাধুরীরা চলে যাবার পর বাড়িটা একেবারে চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল। ঝগড়া নেই, চিৎকার নেই। কাকেরা চড়ুইয়েরা আবার ফিরে আসতে শুরু করেছিল। টানা দশ বছর যুদ্ধের পর শান্তি নামলেও কেমন যেন সব কিছু ফাঁকা লাগতে শুরু করেছিল।

সকালবেলা ঝগড়া করতে করতে আমরা উঠতাম, রাত্তিরে ঝগড়া করতে করতে ঘুমোতে যেতাম। মাধুরীরা চলে যাবার পর দশ বছরের সেই অভ্যাসটায় দারুণ একটা ধাক্কা লেগেছিল।

মা বলতেন, 'মাধুরীরা ছিল, সময়টা বেশ কেটে যেত। এখন আর ভাল লাগে না।'

বাবা এবং ভাইরাও সেই একই কথা বলত। আসলে দিনরাত একটানা দশ বছর যুদ্ধ করলেও তলায় তলায় কোথায় যেন একটা টানও ছিল। মাধুরীরা চলে যাবার পর সেটা টের পাওয়া গেছে।

যাই হোক, সময় তো আর কোথাও হাঁটু গেড়ে বসে থাকে না। সেটা চলতেই থাকে, চলতেই থাকে।

দেখতে দেখতে ক'টা বছর কেটে গেছে। তার মধ্যে বাবা রিটায়ার করেছেন, ভাইরা গ্র্যাজুয়েট হয়ে বসে আছে। আমি এম. কম পাস করে আচমকা একটা চাকরি পেয়ে বম্বে চলে এসেছি। আর কি আশ্চর্য, এতকাল পর আবার মাধুরীদের সঙ্গে দেখা হল। কলকাতার মতো এবার আর ওপরে নিচে নয়, একেবারে মুখোমুখি থাকতে হবে।

পরের দিনই পোপটলালের আত্মীয়টিকে পাগড়ি এবং ভাড়ার টাকা দিয়ে ফ্ল্যাটটা নিয়ে নিলাম। তারপর একটা মাসও কাটল না। মা বাবা ভাইদের কলকাতা থেকে নিয়ে এলাম। ওরা মাধুরীদের দেখে অবাক। কি অদ্ভুত কাণ্ড, ওরা মাধুরীদের এত কাছে পেয়েও যুদ্ধ ঘোষণা করল না। শুধু বলল, 'যাক বাবা, এক ঘর চেনা-জানা মানুষ পেয়ে বাঁচালাম।'

তারপর দেখা যেতে লাগল, আমার মা-বাবা মাধুরীর মা-বাবার সঙ্গে খার-এ রামকৃষ্ণ মিশনে গীতা পাঠ শুনতে যাচ্ছেন। আর আমরা অর্থাৎ মাধুরী সুব্রতা আমি আর আমার দুই ভাই তপু এবং তনু কোনও ছুটির দিনে চলে যেতাম পুনে, কখনও এলিফ্যান্টা কেভে, কখনও জুহু বীচে, কখনও বা দু-তিন দিনের জন্য গোয়ায় কি অজান্তা-ইলোরায়।

তা ছাড়া যদিও মাধুরী এবং আমার অফিস বম্বে শহরের দক্ষিণে এবং উত্তরে, একেবারে পরস্পরের উলটোদিকে, তবু ইচ্ছে থাকলে কী না হয়! ছুটির পর আগে থেকে একটা জায়গা ঠিক করে আমরা দেখা করি।

মাধুরী বলে, 'দেখ, এভাবে ঠিক জমছে না।'

ওর কথা বুঝতে না পেরে আমি জিজ্ঞেস করি, 'কিভাবে?'

'এই ঝগড়াঝাঁটি না করে জাস্ট লাইক গুড নেবারস আমরা যে আছি, এতে কোনও চার্ম নেই। কলকাতায় দশ বছর লড়াই করে করে হ্যাবিট এরকম হয়ে গেছে যে—'

'ঠিক বলেছ। লোকসভায় অপোজিশন না থাকলে সেসান জমে না।'

'ওয়ারটা ডিক্লেয়ার করব কী নিয়ে? কল জল ইলেকট্রিক মিটার, সবই তো আলাদা।'

'তাই তো—'

ভেবে বললাম, 'এক কাজ করা যাক। ঝগড়ার কোনও সাবজেক্ট বার করা যায় কিনা সেটা খুঁজতে থাক। আমিও বার করতে পারি কিনা দেখি।'

মাধুরী বলল, 'ঠিক আছে।'

দেখতে দেখতে কয়েকটা মাস কেটে গেল। এর মধ্যে যুদ্ধ বাধাবার মতো কোনও বিষয়বস্তু বা আছিলা খুঁজে বার করতে পারি নি আমরা। তবে আমার মাথায় অন্য একটা পরিকল্পনা এসেছে।

একদিন ছুটির পর ব্যান্ড স্ট্যান্ডে সমুদ্রের পাড় ধরে হাঁটতে হাঁটতে বললাম, 'দেখ মাধুরী, তুমি যদি হেল্প্ কর, ঝগড়ার একটা ব্যবস্থা হতে পারে।'

মাধুরী দু চোখে কৌতূহল নিয়ে তাকাল, 'কী সাহায্য চাও?'

বললাম, 'যদি সাহস দাও, বলব।'

'দিলাম সাহস।'

'তুমি এক ফ্ল্যাটে থাক, আমি আরেক ফ্ল্যাটে। কল জল ইলেকট্রিসিটি কিছুই কমন নয়। যদি পার্মানেন্টলি আমাদের ফ্ল্যাটে চলে আস তা হলে, মানে কাছাকাছি থাকলে ঝগড়া কি আর একটা বাধানো যাবে না?'

থমকে দাঁড়িয়ে গেল মাধুরী। একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল সে। তার ফর্সা মুখে ধীরে ধীরে রক্তের উচ্ছ্বাস খেলে যেতে লাগল। ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে আমার কাঁধের কাছে পিঁপড়ের কামড়ের মতো কুট করের একটা চিমটি কাটল সে। তারপর আবছা ফিসফিসে গলায় বলল, 'এই মতলব?' তার চোখে জোনাকির মতো হাসি ঝিকমিক করতে লাগল।

আমি দু'হাত জোড় করে বললাম, 'এছাড়া আর কোনো উপায় নেই। তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে না পারলে আমি বাঁচব না। বল রাজি কিনা?'

একটু চুপ করে থেকে মাধুরী বলল, 'রাজি।' বলেই কুট করে দ্বিতীয় চিমটিটি কাটল।

রাজপুত

নাজিমপুরা 'টৌন' বা টাউনের দক্ষিণ দিকের শেষ মাথায় মেয়েপাড়া। এ অঞ্চলের লোকজন প্রবল ঘৃণায় নাক সিঁটকে বলে 'রেন্ডিটুলি'। দুনিয়ার সবচেয়ে ওঁচা পঁচিশটি মেয়েমানুষের এই হতচ্ছাড়া কলোনির চেহারাটা এইরকম। একটা চৌকো চবুতরের তিন দিক ঘিরে ভাঙাচোরা পুরনো টালির চালের মোট ছাব্বিশটি ঘর। মাথা পিছু একটা করে পঁচিশ জনের পঁচিশটা, বাকি ঘরটা মেয়েপাড়ার মালকিন চম্পার। ফুলের নামে যার নাম তার ধাতটা ফুলের মতো মোলায়েম হবে, এটা যদি কেউ ভেবে থাকে তবে তা নেহাতই দুরাশা। অতি জাঁহাবাজ মেয়েমানুষ চম্পা। তার দাপটে পঁচিশটি মেয়ের কারও পান থেকে চুন খসার জো নেই।

চবুতরের যে দিকটায় ঘরটর নেই সেখানে নোনাধরা নিচু পাঁচিলের গায়ে ঘুণে-কাটা সদর দরজা। সেটার পাশে ক'টা খাটা পায়খানা, চানের জন্য ঘেরা জায়গা, আর একটা মস্ত কুয়ো। মেয়েপাড়ার লাগোয়া যে হেলে-পড়া টিনের চালাটা কোনওরকমে দাঁড়িয়ে আছে সেটারও মালকিন চম্পা। ওখানে থাকে হীরালাল আর তার ঘোড়া মোতিয়া। এ জন্য ফি মাসে হীরালালকে নগদ চল্লিশটা করে টাকা ভাড়া গুনতে হয়। মেয়েপাড়ার পঁচিশটি বাসিন্দার মতো হীরালালও চম্পার খাসতালুকের একজন।

সময়টা ফাল্গুনের মাঝামাঝি।

এখনও ভাল করে সকাল হয়নি। দিগন্তের তলা থেকে সূর্য সবে মাথা তুলতে শুরু করেছে। ষষ্ঠ ঋতুর নরম সোনালি আলোয় ভরে যাচ্ছে চারিদিক। আশপাশের গাছপালার মাথায় রাজ্যের পাখিরা খাদ্যের সন্ধানে ঝাঁক বেঁধে বেরুবার জন্য তৈরি হচ্ছে। তাদের একটানা কিচিরমিচির আর পাখা ঝাপটানোর আওয়াজ সকালের ঝিরঝিরে বাতাসে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

এই সময় ঘুমটা ভেঙে যায় হীরালালের। অন্যদিন জেগে ওঠার পরও বেশ খানিকক্ষণ চুপচাপ বিছানায় পড়ে থাকে সে। জীবনে এটুকুই তার একমাত্র বিলাসিতা। কিন্তু আজ আর শুয়ে থাকার উপায় নেই। দশটার ভেতর এখান থেকে মাইল তিনেক

দূরে পাহাড়ের যে রেঞ্জটা রয়েছে সেখানে ঘোড়া অর্থাৎ মোতিয়াকে নিয়ে তার পৌঁছুতেই হবে। বোম্বাই থেকে একটা সিনেমা কোম্পানি এসেছে। তার লোকজনেরা হীরালাল এবং মোতিয়ার জন্য পাহাড়ের তলায় অপেক্ষা করবে। ওরা কাল বার বার বলে দিয়েছে, হীরালালরা গেলে তবেই ওদের তসবির খিঁচা (শুটিং) শুরু হবে, নইলে সব বরবাদ।

অগত্যা ধড়মড় করে উঠে পড়ে হীরালাল। তেলচিটে বিছানাটা গুটিয়ে, দলা পাকিয়ে ঘরের এক কোণে ছুঁড়ে দিয়ে হাই তুলতে তুলতে বাইরে বেরিয়ে আসে।

ঘরের গায়ে সরু বারান্দা, টিনের চাল সেটার মাথা পর্যন্ত টানা। বারান্দার তলায় খানিকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে কাঠের খুঁটিতে বাঁধা রয়েছে মোতিয়া। হীরালালকে দেখে প্রাণীটা চঞ্চল হয়ে ওঠে, সমানে মাটিতে পা ঠুকতে থাকে। তার গলার ভেতর থেকে কাঁপা কাঁপা মিহি আওয়াজ বেরিয়ে আসে—চিঁহিহি, চিঁহিহি। মালিককে দেখে সে যে বেজায় খুশি এটা তারই প্রকাশ।

হীরালালের চটকা এখনও পুরোপুরি কাটেনি। ক্রমাগত হাই উঠছিল তার। মুখের কাছে ডান হাতটা এনে তুড়ি দিতে দিতে জড়ানো গলায় বলে, 'থোড়া সবুর, আসছি—' সকালে খনিকক্ষণ আদর না করলে মোতিয়ার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। সেটা হীরালালের ভালই জানা আছে।

এ বাড়িতে জলের ব্যবস্থা নেই। মেয়েপাড়ার কুয়োটাই হীরালালের ভরসা। তার এবং মোতিয়ার নাহানা, রান্না, খাওয়া, কাপড় কাচা— সবই ওটার জলে সারতে হয়। কাল রাতে তিনটে প্লাস্টিকের বড় বালতি ভর্তি করে দাওয়ার কোণে রেখে দিয়েছিল। এখন সোজা সেদিকেই চলে যায়। দ্রুত চোখেমুখে জল দিয়ে নেমে আসে মোতিয়ার কাছে। তার পিঠে, গলায়, কানে, কপালে কখনও হাত বুলোতে বুলোতে, কখনও সুড়সুড়ি দিতে দিতে অনবরত বকে যায়, 'আরে উল্লু, আরে পাঠ্‌ঠে, আরে গাধ্‌ধে—সুবে উঠে তোমাকে তোয়াজ করা ছাড়া আমার দুসরা কামকাজ কিছু নেই? শালে নবাবকা ছৌয়া—' এটাই তার আদর করার নিজস্ব পদ্ধতি।

একটি মানুষ আর একটি প্রাণী, দু'জনেই পরস্পরের ভাষা বোঝে। আরামে, সুখে দুই চোখ বুজে আসে মোতিয়ার, ল্যাজ ঘন ঘন নাড়তে থাকে। তার গলায় চিঁহিহি আওয়াজটা আরও গাঢ়, আরও দীর্ঘ হয়।

হীরালাল থামে না, 'আজ অ্যায়সা খেল দেখাতে হবে যেন সিনেমাবালাদের শিরপে চক্কর লেগে যায়। সমঝা?'

মোতিয়া বলে, 'চিঁহিহি—' অর্থাৎ বিলকুল সমঝেছে।

'দুনিয়ার সব আদমি সিনেমায় তোর তসবির দেখবে। সেটা মনে রাখবি।'

'চিঁহিহি—'

এইভাবে তাদের বিচিত্র কথোপকথন চলে কিছুক্ষণ। বোঝা যায়, আজকের শুটিংয়ের ব্যাপারে তারা ভীষণ উত্তেজিত।

এবার ওদের দিকে একটু ভাল করে তাকানো যাক। হীরালাল আর মোতিয়ার নামের মধ্যে হীরামোতির যতই ঝলকানি থাক, আসলে তারা গরিবের চাইতেও গরিব।

হীরালালের বয়স ত্রিশ বত্রিশ। নাকমুখ বেশ ধারাল কিন্তু সে খুবই রোগা, সারা গায়ে অপুষ্টির ছাপ। দু'বেলা বারো মাস ভরপেট খেতে পেলে সে যে একটা টগবগে সুপুরুষ হয়ে উঠত, সেটা তাকে দেখামাত্র আন্দাজ করা যায়।

নিজে খেতে পাক আর না-ই পাক, মোতিয়ার দানাপানি কিন্তু ঠিকই যুগিয়ে যায় হীরালাল। প্রাণীটাকে খুবই যত্ন করে সে। ফলে মোতিয়ার চেহারায় রুগ্‌ণতার চিহ্ন নেই। সাদা আর বাদামিতে মেশানো তার স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মসৃণ গা থেকে তেল যেন চুঁইয়ে পড়ে।

দুনিয়ায় পার্থিব সম্পত্তি বলতে খানকতক কুর্তা, পা-চাপা খেলো কাপড়ের চুস্ত এবং এই ঘোড়াটা ছাড়া আর কিছুই নেই হীরালালের। জীবনে তার একটাই স্বপ্ন, একখানা জমকালো ফিটন গাড়ির মালিক হওয়া। সে জন্য খেয়ে, না খেয়ে টাকা জমিয়ে যাচ্ছিল। বছরখানেক আগে নাজিমপুরার এক বুড়ো কোচোয়ান ফকিরার কাছ থেকে ঝোঁকের মাথায় তিন শ টাকায় মোতিয়াকে কিনে নেয় সে। তখন প্রাণীটার হাল খুবই খারাপ। দিনরাত ধুঁকত, পাঁজরার হাড় চামড়া ফুঁড়ে বেরিয়ে পড়েছিল। মনে হচ্ছিল ওর আয়ু ফুরিয়ে এসেছে, পাঁচটা দিনও টিকে থাকবে কিনা তেমন ভরসা আদৌ ছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হীরালালের যত্নে আর তোয়াজে শুধু বেঁচেই গেল না মোতিয়া, তার সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়ে উঠল।

ঘোড়াই শুধু কিনতে পেরেছে হীরালাল কিন্তু ফিটনের গাড়িটা কেনার মতো পয়সা এখনও জমিয়ে উঠতে পারেনি। সেদিক থেকে তার স্বপ্ন আধাআধি সফল। মোতিয়া তাজা হয়ে ওঠার পর ইদানীং মাসকয়েক বিয়ে বা তৌহর অর্থাৎ পরবের মরসুমে তাকে ভাড়া খাটাচ্ছে হীরালাল। ওটার পিঠে চড়ে নাজিমপুরা এবং আশেপাশের ছোটখাট সব শহরের মারোয়াড়ি আর রাজপুত দুলহারা বিয়ে করতে শ্বশুরবাড়ি যায়। তৌহরের সময় ফুলের ছত্রি দিয়ে সাজানো হয় মোতিয়াকে। সেই ছত্রির তলায় রামসীতা বা অন্য দেবদেবীর মূরত বসিয়ে জুলুস বার করা হয়। তা ছাড়া এখান থেকে মাইল তিনেক দূরে যে পাহাড়ের রেঞ্জ এবং নদী রয়েছে সেখানে কলকাতা আর বোম্বাই থেকে আজকাল প্রায়ই সিনেমাওলারা শুটিং করতে আসছে। তাদের অনেকেরই ঘোড়ার দরকার হয়, তখন হীরালাল আর মোতিয়ার ডাক পড়ে। যেমন আজও পড়েছে। মোতিয়া অকৃতজ্ঞ জানোয়ার নয়, সে নিজের জন্য তো বটেই, সেই সঙ্গে হীরালালের পেটের দানাও যোগাড় করে চলেছে। কিন্তু বিয়ে, তৌহর বা সিনেমা বছরে আর ক'দিন? বাকি সময়টা বড়ই কষ্টেসৃষ্টে কাটে হীরালালদের। মোতিয়াকে ভাড়া খাটানোর আগে পর্যন্ত নানারকম উঞ্ছবৃত্তি করে পেট চালাত হীরালাল। কখনও ঠিকাদারদের কাছে কাজ জুটিয়ে পাথর ভাঙত, রাস্তা বানাত, কখনও বা ধানচালের আড়তে গিয়ে মাল বইত। মোতিয়াকে কেউ ভাড়া না করলে এখনও তাকে সে সবই করতে হয়।

তার পদবিসুদ্ধ পুরো নাম হীরালাল সিং। সে রাজপুত ক্ষত্রিয়। কিন্তু তার রক্তে পূর্বপুরুষের ক্ষাত্রতেজ এতটুকু অবশিষ্ট নেই। সে ভীরু, দুর্বল। তার ওপর এক জঘন্য বেশ্যার চালা ভাড়া নিয়ে থাকে। রাজপুত জাতির সে ঘোর কলঙ্ক। নাজিমপুরা শহরে

যে রাজপুতেরা আছে, লজ্জায় ভয়ে এবং কুণ্ঠায় তাদের কাছে তার নিজের পরিচয় দেয় না হীরালাল। ওরা জানতে পারলে তার মুখে তিনবার থুক দেবে। জগৎ সংসারে কেউ নেই তার, একা একা শহরের এই কোণে ঘাড় গুঁজে পড়ে আছে সে।

বেশি আদরের আশায় মোতিয়া মুখটা হীরালালের দিকে বাড়িয়ে দিচ্ছিল।

এদিকে আকাশের ঢালু পাড় বেয়ে সূর্য বেশ খানিকটা ওপরে উঠে এসেছে। রোদের তেজ এর মধ্যেই বাড়তে শুরু করেছে। হীরালাল আকাশের দিকে একবার চোখ তুলে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বলে, 'আর তোয়াজ করতে পারব না। বেলা চড়ে গেছে। এবার বেরিয়ে পড়তে হবে। তার আগে অনেক কাজ বাকি। দু'জনে খেয়ে নেব। তোকে সাজাব। তারপর—'

হীরালালের কথা শেষ হওয়ার আগেই চম্পার বাজখাঁই গলা ভেসে আসে, 'আউর কেত্তে দের করনা—আঁ? জলদি নিকালনা। এরপর বেরুলে মন্দিরের সামনে আমাদের ঘেঁষতে দেবে?'

চম্পার গলাটাই ওরকম, সবসময় সাত পর্দা চড়েই আছে। ঝগড়ার সময় তার ঝাঁঝ আরও কয়েক গুণ বেড়ে যায়। তখন এ অঞ্চলের একটি কাক-চিলেরও টিকি চোখে পড়ে না, সব ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে উধাও হয়ে যায়।

হীরালাল যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে মেয়েপাড়ার প্রায় সমস্তটাই চোখে পড়ে। দেখা গেল, ওখানকার চবুতরে সবগুলো মেয়েমানুষ জড়ো হয়েছে। তাদের বয়স কুড়ি থেকে চল্লিশের মধ্যে। শীতগ্রীষ্ম বারো মাস একটানা রাতজাগা আর আওরতটুলিতে অন্তহীন নরকবাসের যাবতীয় ছাপ পড়েছে ওদের চোখে মুখে। মেয়েগুলোর ভাঙাচোরা শরীরে শুধুই ক্ষয়ের চিহ্ন।

এই সকালবেলাতেই ওরা নাহানা চুকিয়ে ফেলেছে। সকলের পরনেই পরিষ্কার কাচা শাড়ি, পিঠময় ভেজা চুল ছড়ানো। সব মিলিয়ে একটা শুধ্ শুধ্ (পবিত্র) আবহাওয়া।

অন্য দিন এ দৃশ্য কখনও দেখা যায় না। নাহানা দুরের কথা, বেলা অনেকটা না চড়লে ওখানে কারও ঘুমই ভাঙে না। কিন্তু হীরালাল জানে, আজকের দিনটা একেবারেই আলাদা।

মেয়েমানুষের জটলাটার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল চেহারার চম্পা। তার হাত-পা থামের মতো। গায়ের কুচকুচে কালো চামড়ায় এমন জেল্লা, মনে হয় পালিশ করা। মেয়েমানুষটার সারা গা জুড়ে চাঁদির জবড়জং গয়না। চম্পার পাশে রয়েছে বিলাখী—ঢ্যাঙা, হাড়-বার-করা মুখ, চোখের তলায় ভুষো কালি। তার বয়স সাঁইত্রিশ আটত্রিশ হবে। বিলাখীর পর কুন্তা। কুন্তা বিলাখীর মেয়ে।

কুন্তার বয়স আঠারো উনিশ। নরকের এই খাসতালুকে জন্মের পর এতগুলো বছর কাটালেও তার চেহারা ভারি নিষ্পাপ। বড় বড় চোখ দু'টিতে সারল্য মাখানো। কুন্তার ডিম্বাকৃতি মুখ, কোমর ছাপানো চুল, নিটোল চিবুক, সাজানো মোতির মতো দাঁতের সারি, পাকা গেঁহুর মতো গায়ের রং। তার দিকে তাকালে পলক পড়ে না।

কুন্তার পরনে নুতন রঙিন শাড়ি, হাতে ঝকঝকে স্টেনলেস স্টিলের রেকাবিতে

আস্ত ক'টি ফল, তেল, মেটে সিঁদুর, আতপ চাল, পেতলের প্রদীপ।

পাশাপাশি থাকার কারণে মেয়েপাড়ার নাড়িনক্ষত্রের খবর রাখে হীরালাল। সে জানে, এতটা বয়স পর্যন্ত কুন্তাকে দু'হাতে যখের ধনের মতো আগলে রেখেছে বিলাখী। কিন্তু গিধের পাল যেখানে দিনরাত নখ আর দাঁত শানিয়ে মেয়েদের ছিঁড়ে খাওয়ার জন্য হানা দেয় সেখানে তার পক্ষে খুব বেশিদিন কুন্তাকে রক্ষা করা আদৌ সম্ভব হ'ত না, যদি না কয়েক বছর আগে এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় ঠিকাদার ধনেশ্বর চৌবের চোখ তার ওপর এসে পড়ত। শুধু ঠিকাদারই নয়, লোকটা স্বনামে বেনামে চার শ একর জমির মালিক। অঢেল পয়সা তার, প্রচুর বন্দুকবাজ আর পহেলবান পোষে সে। তার দাপটে গোটা নাজিমপুরা সর্বক্ষণ তটস্থ।

চৌবে অর্থাৎ চতুর্বেদী ব্রাহ্মণ হলেও ধনেশ্বরের নজর বড় নিচু। বেশ্যাই হোক আর অচ্ছুতই হোক, সুন্দরী মেয়ে দেখলেই সে তাকে রাখনি বা রক্ষিতা করে রাখে। কুন্তাকে দেখার পর এক বন্দুকবাজ পাঠিয়ে বিলাখীকে জানিয়ে দিয়েছিল, মেয়েটা যুবতী হয়ে উঠলে সে তাকে নিয়ে যাবে। হুঁশিয়ার, অন্য কোনও হারামজাদকা ছৌয়া যেন কুন্তার কাছে না ঘেঁষে। মুহূর্তে খবরটা চারিদিকে চাউর হয়ে যায়। ধনেশ্বর চৌবে যাকে নিজস্ব সম্পত্তি হিসেবে মার্কা মেরে দিয়েছে তার দিকে হাত বাড়াবার মতো বুকের পাটা কারও নেই। যে লুচ্চার দল এখানে আসে তারা কুন্তার দিকে ফিরেও তাকায় না।

কুন্তা কবে পুরোপুরি যুবতী হয়ে ওঠে, সে জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে গেছে ধনেশ্বর। পরশু সে খবর দিয়েছে আজ বিকেলে ঘোড়ার গাড়ি পাঠিয়ে কুন্তাকে নিয়ে যাবে। তার জন্য নতুন একটা বাড়ি তৈরি করিয়ে দামি দামি আসবাবে সাজিয়ে রেখেছে।

এই বেশ্যাপাড়ার মেয়েদের নিজস্ব কিছু রীতিনীতি আছে। পেশাদার জীবন শুরু করার আগে সবাই মিলে রামসীতা মন্দিরে পুজো দিয়ে আসে। কুন্তার জন্য আজ তারই তোড়জোড় চলছে।

কিন্তু হীরালাল জানে, মেয়েপাড়ার জীবনযাপন পদ্ধতি একেবারেই পছন্দ নয় কুন্তার। বাপের বয়সী ধনেশ্বর চৌবের রাখনি হয়ে থাকতে তার ঘোর আপত্তি। এই কদর্য, গ্লানিকর পরিবেশ থেকে সে মুক্তি চায় কিন্তু কিভাবে তা জানে না।

মায়ের কাছে প্রচুর কান্নাকাটি করেছে কুন্তা, কতদিন না খেয়ে থেকেছে। বিলাখী বুঝিয়েছে, এটাই তাদের নিয়তি। তবু তো অন্য মেয়েদের মতো শিয়াল-শকুনেরা ঝাঁক বেঁধে তাকে ছিঁড়ে খাবে না। একটি পয়সাওলা ক্ষমতাবান লোকের কাছেই সারা জীবন অঢেল আরামে এবং সুখে প্রায় বিয়াহী আওরতের (বিয়ে-করা স্ত্রী) মতো থাকতে পারবে। তেমন সৌভাগ্য এ পাড়ার ক'টি মেয়েমানুষের হয়? বোঝানোতে কতটা ফল হয়েছে কে জানে, তবে কান্নাটা থেমেছে কুন্তার।

একটা ব্যাপার মনে পড়ছে হীরালালের। এতদিন যতক্ষণ সে বাড়িতে থাকত দেওয়ালের ওপর থেকে কুন্তা পলকহীন তাকে দেখত। জল আনতে মেয়েপাড়ায় গেলে কিছু একটা বলতে চাইত কিন্তু বিলাখীর পাহারাদারি এমনই কড়া যে তার নজর

এড়িয়ে কোনওদিনই বলতে পারেনি।

কুন্তাকে দেখতে দেখতে মন যখন ভারী হয়ে ওঠে, সেই সময় চম্পার গলা আবার শোনা যায়। কণ্ঠস্বর আরও কয়েক পর্দা চড়িয়ে সে তাড়া লাগায়, 'আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবি? সূরয কোথায় উঠে এসেছে, হুঁশ আছে তোদের?'

এদিকে আদর থেমে যাওয়ায় মোতিয়াও চেঁচিয়ে ওঠে, 'চিঁহিহি—চিঁহিহি—'

পরের দুঃখে কাতর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার মতো পর্যাপ্ত সময় হীরালালের নেই। তাকেও খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তে হবে। মোতিয়ার মাথায় আলতো দুটো চাপড় মেরে বলে, 'থোড়ে ঠহর যা। বহোত দূর যানে হোগা। তোর দানাপানি নিয়ে আসি, কি বলিস? পেটে কিছু না পড়লে অতটা রাস্তা যাবি কী করে?'

সামঝদারের মতো ঘাড় কাত করে মোতিয়া বলে, 'চিঁহিহি—চিঁহিহি—'

ঘরে ঢুকে কৌটোবাটা ঝোলাঝুলি হাতড়ে তার বা মোতিয়ার জন্য একদানা খাদ্যও খুঁজে পায় না হীরালাল। মজুত খাবারদাবার কখন শেষ হয়ে গেছে, তার খেয়াল ছিল না। এক পলক ভাবে সে। না, এতটা পথ পেটে ভুখ নিয়ে হাঁটা যাবে না। দ্রুত ক'টা টাকা পকেটে পুরে বেরিয়ে আসে। মোতিয়ার উদ্দেশে বলে, 'কুছ চানাউনা খরিদ করে আনি। পন্দ্র বিশ মিনিটের মধ্যে ফিরে আসব।'

মেয়েপাড়ার পাশ দিয়ে খোয়া-ওঠা একটা বড় রাস্তা শিরদাঁড়ার মতো খাড়া উত্তরে চলে গেছে। তার দু'ধারে করাত কল, সুরকি কল, আটা চাক্কি, ধানকল, লেদ মেশিনের কারখানা, কাঠগোলা, ধানচালের বিরাট বিরাট আড়ত। এ সব পেরিয়ে গেলে গমগমে বাজার, বাজারের পর শ্বেতপাথরের তৈরি বিশাল রামসীতা মন্দির। মন্দিরের পর থেকে নাজিমপুরার পয়সাওলা লোকেদের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সব বাড়ি। এই পাড়াটা উত্তর দিকে যেখানে শেষ হয়েছে তারপর মাইল দেড়েক পাথুরে জমির পর চমৎকার একটা নদী, নদীর পর উঁচু পাহাড়ের লম্বা রেঞ্জ। ওখানেই সিনেমাওলারা শুটিং করতে আসে।

উত্তর বিহারের এই শহরে এর মধ্যেই ঝাঁকে ঝাঁকে ধর্মের ষাঁড় টহল দিতে শুরু করেছে। প্রচুর লোকজন, বয়েল গাড়ি আর সাইকেল রিকশাও বেরিয়ে পড়েছে। কিন্তু কোনওদিকে লক্ষ্য নেই হীরালালের। লম্বা লম্বা পা ফেলে সে সোজা চলে আসে বাজারে। মোতিয়ার জন্য আস্ত চানা আর নিজের জন্য চানার ছাতু কিনে যখন ফিরে যাচ্ছে সেই সময় রাস্তায় মেয়েপাড়ার বাসিন্দাদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। কুন্তাকে মাঝখানে রেখে পঁচিশটি মেয়েমানুষ মিছিল করে রামসীতা মন্দিরের দিকে এগিয়ে চলেছে। সবার আগে আগে রয়েছে চম্পা।

কাছাকাছি আসতে বিষণ্ণ চোখে হীরালালের দিকে একবার তাকায় কুন্তা। তাকাতে তাকাতেই সঙ্গিনীদের সঙ্গে পা ফেলতে থাকে।

এক মুহূর্তে থমকে দাঁড়ায় হীরালাল। বুকের ভেতর কোথায় যেন চিনচিনে কষ্ট অনুভব করে। পরক্ষণে আগের মতোই জোরে জোরে হাঁটতে শুরু করে। সিনেমাওলারা তার এবং তার ঘোড়ার সারাদিনের মজুরি নগদ চার শ' টাকা দেবে। এখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কারও জন্য মন খারাপ করার মতো সৌখিনতা তার মতো মানুষের মানায় না।

চালায় ফিরে এসে মোতিয়াকে খাইয়ে হীরালাল নিজেও গোগ্রাসে খাওয়া চুকিয়ে নেয়। খানিক আগে কুন্তার জন্য কিছুটা মুষড়ে পড়লেও চার শ' টাকার ভাবনাটা তাকে রীতিমত চনমনে করে তোলে।

চনমনে হওয়ার অন্য কারণও রয়েছে। আজ সিনেমার যে শুটিং হবে তাতে ফিল্মের হিরো মোতিয়ার পিঠে চড়ে ভিলেনদের টিট করতে যাবে। কিন্তু বোম্বাইয়ের যে হিরোটি এসেছে সে ঘোড়ায় চড়তে পারে না। তার মতো সাজপোশাক করে বন্দুক হাতে হীরালালকেই ঘোড়া দাবড়ে দুর্বৃত্তদের শায়েস্তা করতে হবে। এমনভাবে নাকি তসবির তোলা হবে, সিনেমার পর্দায় তাকে চেনাই যাবে না, বিলকুল হিরোর মতো মনে হবে। মোতিয়াকে তাই সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে যেতে বলেছে সিনেমাওলারা। অবশ্য সাজসজ্জা পছন্দ না হলে ওরাই তার ব্যবস্থা করবে।

দু'টাকা পাঁচ টাকা করে জমিয়ে মোতিয়ার জন্য রেকাব, জিন, গলায় ঝোলাবার পেতলের ঘুন্টি ইত্যাদি কিনেছিল হীরালাল। ঘর থেকে সেগুলো বার করে এনে তাকে সাজাতে সাজাতে বলে, 'আজ বহোত বড়িয়া দিন। আমি হিরো বনব, তু ভি। সমঝা?' তার পলকা দুর্বল শরীরে প্রবল উত্তেজনা চারিয়ে যাচ্ছিল।

ঘোড়া সাজানো হলে আবার চালার ভেতর ঢোকে হীরালাল। পুরনো টিনের বাক্স খুলে বহুকাল আগের কেনা নকশা-করা রেশমি কুর্তা আর সিল্কের চুস্ত বার করে। সেগুলো অবশ্য অনেক জায়গায় পিঁজে পিঁজে গেছে। কিন্তু কী আর করা যাবে, এর চেয়ে দামি পোশাক তার আর নেই। সুসজ্জিত মোতিয়ার পিঠে কি আর ছেঁড়া পাজামা পরে চড়া যায়?

এবার ঘরের দরজায় শেকল তুলে মোতিয়াকে নিয়ে বাইরের রাস্তায় চলে আসে হীরালাল। যদিও রোগা এবং দুর্বল, ঘোড়ায় চড়াটা সে অনেক আগেই শিখেছিল। রেকাবে পা রেখে এক লাফে মতিয়ার পিঠে উঠে পড়ে। রাস্তা বরাবর উত্তর দিকে ঘোড়া ছোটাতে ছোটাতে একবার আকাশের দিকে তাকায়। সূর্য আরও খানিকটা ওপরে উঠে এসেছে, রোদের ঝাঁঝও বেড়েছে, তবে দুশ্চিন্তার কারণ নেই। ঠিক সময়েই পাহাড়ের তলায় পৌঁছনো যাবে।

চলতে চলতে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে যায় হীরালাল। চোখের সামনে কুন্তার ভয়ার্ত মুখ আবার ফুটে ওঠে। কিন্তু সে ভীরু, গরিবের চাইতেও গরিব, কমজোর। কী-ই বা সে করতে পারে?

রাস্তায় চেনাজানা যার সঙ্গেই দেখা হচ্ছে, মজার গলায় বলে, 'কা রে, হীরোয়া, এত্তে জগমগ চুস্ত-কুর্তা চড়িয়ে ফিলমকা হিরো বননে চললি নাকি?'

কেউ বলে, 'বোম্বাইসে যো হিরো-ইন আয়ী, উসিকো মাত্ ছোড়না। ঘোড়ায় তুলে ভাগিয়ে আনবি, তবে বুঝব তুই রাজপুতকা ছৌয়া।'

এই নগণ্য ছোট্ট শহরের প্রায় সবাই হীরালালের খবরাখবর রাখে। সে এখন কোথায়, কী উদ্দেশ্যে চলেছে সে সব তথ্য তাদের জানা। হীরালাল ওদের ঠাট্টা টাট্টার জবাবে অস্পষ্ট ভাবে হুঁ হাঁ করে যায়।

আরও কিছুটা এগোতে রামসীতা মন্দিরের দিক থেকে প্রচণ্ড হই চই শোনা যায়।

চমকে সামনে তাকাতে হীরালালের চোখে পড়ে মেয়েপাড়ার বাসিন্দারা গলার শির ছিঁড়ে চেঁচাতে চেঁচাতে উত্তর দিকে ছুটছে। সবাইকে ভীষণ উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। ওদের মধ্যে কুন্তা, চম্পা, বিলাখী এবং আরও ক'টি মেয়েমানুষকে দেখা গেল না।

ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে ওদের কাছাকাছি চলে আসে হীরালাল। এতগুলো মেয়েমানুষের এ জাতীয় চেঁচামেচির সঠিক কারণটা বুঝতে না পেরে দিশেহারা হয়ে পড়ে সে। যারা শুদ্ধ মনে রামসীতা মন্দিরে মিছিল করে পুজো দিতে এসেছিল, হঠাৎ কী এমন অঘটন ঘটল যাতে তারা এমন উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছোটাছুটি করছে?

উদ্বিগ্ন মুখে হীরালাল জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছে মৌসিরা, তোমরা এমন ছুটছ কেন?' মেয়েপাড়ার সবাইকে সে মাসি ডাকে।

মেয়েমানুষগুলো সমস্বরে উত্তর দেয়, 'কুন্তা ভাগ গয়ী—' উত্তর দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেয় তারা, 'উঁহা—উধর—'

কিছুক্ষণ আগে ছাতুটাতু কিনতে এসে কুন্তাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল কিন্তু এমন একটা দুঃসাহসিক কাণ্ড যে এই মেয়েটা ঘটাতে পারে তখন তার এতটুকু আঁচ পাওয়া যায়নি। মেয়েমানুষগুলোর উত্তেজনা এবং দুশ্চিন্তা হঠাৎ তার মধ্যেও যেন চারিয়ে যায়। হীরালাল কাঁপা গলায় জানতে চায়, 'কী করে ভাগল?'

জান্‌কী নামের একটি মেয়েমানুষ বলে, 'মন্দিরের ভেতর তো আমাদের ঢুকতে দেয় না। পুজোর জিনিসগুলো যে থালায় ছিল, বাইরে সড়কের ওপর সেটা নামিয়ে রেখে কুন্তা আচানক দৌড়ুতে শুরু করে। আমরা থ হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর সবাই ওর পিছা ধাওয়া করলাম। চম্পা মৌসি, বিলাখী, আরও দো-চার আওরত সামনে এগিয়ে গেছে।'

আরেকটি মেয়েমানুষ, যার নাম ছিবলি, বলে, 'তোর ঘোড়াকে তুরন্ত হাঁকিয়ে দে। দ্যাখ, ছোকরিকে ধরতে পারিস কিনা—'

ঘোড়া ছোটাতে গিয়েও জরুরি কথাটা মনে পড়ে যায় হীরালালের। বলে, 'কুন্তা ভাগল কেন?'

ছিবলি নাকমুখ কুঁচকে কুৎসিত একটা ভঙ্গি করে। তোড়ে কিছুক্ষণ খিস্তিখেউড় চালাবার পর বলে, 'রেন্ডির বেটি সীতা বনবে, সাবিত্তিরি বনবে! এত্তে বড়ে আদমী ধনেশ্বরজি, বরাম্ভণ (ব্রাহ্মণ)—কোথায় তার প্যারা রাখনি হয়ে আরামে থাকবে, তা ওর মনে ধরল না, তাই ভেগেছে। যা হীরা, যা। দ্যাখ ওকে ধরতে পারিস কিনা। ওই ভূচ্চরের ছৌরীটাকে না পেলে ধনেশ্বরজি ভাববে আমরাই ফন্দি করে ওকে সরিয়ে দিয়েছি। তখন আমাদের টৌলির কাউকে আর জানে বাঁচতে হবে না।'

কুন্তা পালিয়েছে জেনে একটু যেন আরামই বোধ করছিল হীরালাল। কিন্তু যেই মনে হল ধনেশ্বর চৌবে এই খবরটা পাওয়ামাত্র তার পোষা পহেলবান আর বন্দুকবাজদের মেয়েটার পেছনে লেলিয়ে দেবে, তখনই চিনচিনে ব্যথার মতো একটা কষ্ট বুকের ভেতর ফিরে আসে। কিন্তু আর দাঁড়ালে চলবে না। কুন্তার জন্য নয়, সিনেমাওলাদের জন্য এখনই ঘোড়া হাঁকানো দরকার।

মোতিয়ার পেটের দু'ধারে গোড়ালির আলতো একটু গুঁতো দিতেই সেটা নতুন

উদ্যমে দৌড় শুরু করে দেয়।

বাজার আর রামসীতা মন্দির পেছনে ফেলে নাজিমপুরার পয়সাওলা মানুষদের এলাকাটা আধাআধি পেরুবার পর চোখে পড়ে মাথার চুল ছিঁড়ে চিৎকার করে কী বলতে বলতে ছুটে চলেছে বিলাখী, তার পেছনে চম্পা এবং আরও তিন চারটে মেয়েমানুষ।

বিলাখীর কথাগুলো স্পষ্ট শুনতে না পেলেও সে যে নিজের মেয়ের উদ্দেশে একনাগাড়ে গালাগাল দিয়ে যাচ্ছে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না হীরালালের। তাকে দেখতে পেয়ে গলার স্বর চড়িয়ে কী যেন বলল বিলাখী। কিন্তু মোতিয়া এমন উল্কা গতিতে ছুটছে যে তার নামটা ছাড়া আর কিছুই কান পর্যন্ত পৌঁছুল না। তবে কুন্তাকে খুঁজে দেবার জন্য বিলাখী যে কাকুতি মিনতি করছে সেটা আন্দাজ করা গেল।

এক সময় নাজিমপুরার চৌহদ্দি পার হয়ে একটা পাথুরে রাস্তায় চলে আসে হীরালাল। রাস্তাটা উঁচু হতে হতে দূরের পাহাড়ি রেঞ্জটার দিকে চলে গেছে। তার একধারে দেওদার, কড়াইয়া আর শিশুগাছের লাইন। আরেক ধারে পাহাড়ি নদী। নদীটা দূরের রেঞ্জ থেকে নেমে এসে নানা আকারের নানা রঙের পাথর আর নুড়ির ওপর দিয়ে প্রবল স্রোতে বয়ে চলেছে। নদীটার পায়ে যেন কয়েক জোড়া অদৃশ্য ঘুঙুর বাঁধা। আবহমান কাল ধরে একটানা ঝুম ঝুম আওয়াজ করে চলেছে। তার ওপারে সবুজ কার্পেটের মতো বহুদূর জুড়ে ঘাস, মাঝে মাঝে ক্যাকটাস আর উঁচু উঁচু সব গাছ যা এই পৃথিবীর চোখজুড়ানো অলঙ্কারের মতো দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড়ের মাথা থেকে এতটা দূর পর্যন্ত জায়গায় নানা স্পট বেছে নিয়ে সিনেমাওলারা শুটিং করে থাকে।

পাথুরে রাস্তা দিয়ে খানিকটা এগোবার পর পাহাড়ের তলায় অনেকগুলো তাঁবু চোখে পড়ে। এখান থেকে সেগুলোকে ছোট ছোট ফুটকির মতো দেখায়। ওখানেই সিনেমাওলারা ক্যাম্প করেছে। যতদিন শুটিং চলবে, হিরো-হিরোইন-ভিলেন সুদ্ধু সমস্ত ইউনিট তাঁবুতেই থাকবে।

আরও কিছুটা যাবার পর আচমকা একটা ভীরু গলা ভেসে আসে, 'ঘোড়া রুখো, ঘোড়া রুখো—'

হীরালাল ভীষণ চমকে ওঠে। জায়গাটা একেবারে নিঝুম। কোথাও কেউ নেই। অনেক উঁচুতে আকাশের নীল ছুঁয়ে ছুঁয়ে ক'টা চিল বাতাসে ডানা ভাসিয়ে রেখেছে। নদীর ঝুম ঝুম শব্দ ছাড়া আর কোনও আওয়াজ নেই। ওটা বাদ দিলে সব কিছুই যেন অতল নৈঃশব্দের আরকে ডুবে আছে। এখানে কে ডাকতে পারে তাকে?

চারিপাশে তাকাতে তাকাতে চোখের তারা দুটো স্থির হয়ে যায় হীরালালের। রাস্তার ডান ধারে যে কড়াইয়া গাছগুলো জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে তার আড়াল থেকে যে বেরিয়ে আসে তাকে এখানে দেখবে এটা ছিল একেবারেই অভাবনীয়। বিমূঢ়ের মতো হীরালাল বলে, 'কুন্তা তুমি!'

কুন্তা ঝাপসা গলায় বলে, 'হাঁ। আমি—আমি—'

ঘোড়া থামিয়ে দিল হীরালাল। সে লক্ষ করে মেয়েটার দুই ঠোঁট ভীষণ কাঁপছে। তার চোখেমুখে প্রচণ্ড ভয় আর দুশ্চিন্তার ছাপ।

হীরালাল কী বলবে যখন ভেবে পাচ্ছে না, কুন্তা ফের বলে ওঠে, 'আমি পালিয়ে এসেছি।'

'জানি। তোমার মা আর চম্পা মৌসিরা তোমাকে খোঁজাখুঁজি করছে।'

'করুক। তুমি এই সড়ক ধরে সিনেমাবালাদের কাছে যাবে, তাই কড়াইয়া গাছগুলোর ভেতর লুকিয়ে ছিলাম। আমাকে বাঁচাও—'

হীরালালের শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎচমকের মতো কিছু একটা খেলে যায়। দিশেহারার মতো সে বলে, 'আমি তোমাকে বাঁচাব!'

'হাঁ হাঁ—' ভাঙা ভাঙা, রুদ্ধ স্বরে কুন্তা বলে, 'রক্ষা (রক্ষা) না করলে আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে। তুমি তো সব কুছ জানো—'

'লেকেন তোমার মা আউর ওহী চৌবেজি—' বলতে বলতে থেমে যায় হীরালাল।

এবার জোরে জোরে মাথা নাড়তে নাড়তে ব্যাকুলভাবে কুন্তা বলে, 'ওদের কথা শুনতে চাই না। তুমি আমাকে কির্পা (কৃপা) কর, কির্পা কর—' দু'হাতে প্রাণপণে হীরালালের ঘোড়ার রেকাব আঁকড়ে ধরে সে। এটাই যেন তার জীবনের শেষ ভরসা, কোনওভাবেই তা হাতছাড়া হতে দেওয়া যায় না। সেই সঙ্গে শুরু হয় অঝোরে কান্না। কুন্তার দু'চোখ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় অবিরল জল ঝরতে থাকে।

ত্রিশ বত্রিশ বছরের জীবনে এমন বিপন্ন আর কখনও হয়নি হীরালাল। কী করবে, কী বলবে, কিছুই ঠিক করে উঠতে পারে না।

কুন্তা আবার কিছু বলতে যাচ্ছিল, শহরের দিক থেকে অনেকের চিৎকার ভেসে আসে। চমকে সেদিকে মুখ ফেরায় সে। বিলাখী, চম্পা এবং আরও ক'টি মেয়েমানুষ শিকারি কুকুরের মতো গন্ধ শুঁকে শুঁকে এখানে চলে এসেছে। উদ্‌ভ্রান্তের মতো কুন্তা বলে, 'ওহী লোগন আ গয়ী। বাঁচাও—বাঁচাও—কির্পা কর—'

চম্পারা গলায় রক্ত তুলে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে আসছে। তাদের লক্ষ করতে করতে হীরালাল টের পায়, তার মধ্যে কোথায় যেন প্রচণ্ড ভাঙচুর চলছে। মনে হতে থাকে, কুন্তার জন্য এই মুহূর্তে কিছু একটা করা খুবই জরুরি। হঠাৎ নিজের অজান্তে দ্বিধাগ্রস্ত, দুর্বল এই যুবকটির ভেতর থেকে একটি পরাক্রান্ত মানুষ বেরিয়ে আসে। হাত বাড়িয়ে কুন্তাকে এক টানে ওপরে তুলে নিজের পেছনে বসায়। তারপর মোতিয়ার কাঁধে চাপড় মারতেই তীরের ফলার মতো সেটা সামনের দিকে ছুটতে থাকে।

খানিকটা যাবার পর সড়ক দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। বাঁ দিকেরটা পাহাড়ের তলায় যেখানে সিনেমাওলারা ক্যাম্প করে আছে সেখানে গিয়ে থেমেছে। ডান দিকেরটা গেছে যাট মাইল দূরের ডিস্ট্রিক্ট টাউনে। আপাতত কুন্তাকে নিয়ে ডান দিকেই যাবে হীরালাল। তারপর কী করা দরকার সেটা পরে ভাবা যাবে।

চিরকালের ভীরু কমজোর হীরালাল জীবনে এই প্রথম রাজপুত হয়ে ওঠে।

মলির জন্য

কাল শোবার আগে অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছিল ললিতা। বহুকালের বিশ্বস্ত ঘড়িটা ঠিক সময়েই ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। বেড সুইচ টিপে আলো জ্বালতে চোখে পড়ে এখন কাঁটায় কাঁটায় চারটে।

শীতের এই শেষ রাতে কাচের জানালার বাইরে কলকাতা মেট্রোপলিস গাঢ় অন্ধকার আর কুয়াশায় অদৃশ্য হয়ে আছে। তারই মধ্যে রাস্তার টিউব লাইটগুলোকে ঝাপসা, রহস্যময় সংকেতের মতো মনে হয়।

সূর্যোদয় হতে এখনও এক, দেড় ঘন্টা বাকি। সাড়ে ছ'টায় ললিতাকে এয়ারপোর্টে নিয়ে যাবার জন্য গাড়ি আসবে। তার আগেই তৈরি হয়ে নিতে হবে।

ললিতা একজন এয়ার হোস্টেস। আজ তার অফ-ডে। তবু যে তাকে ডিউটিতে যেতে হচ্ছে, কারণ তার ওপর তার এয়ার লাইনসের অগাধ আস্থা। সকাল আটটা দশে একটা স্পেশাল ফ্লাইটে কয়েকজন ভি. আই. পি লক্ষ্ণৌ যাবেন। তাঁদের যত্ন এবং পরিচর্যার জন্য ললিতার মতো একজন অভিজ্ঞ, তৎপর বিমানসেবিকা থাকাটা ভীষণ জরুরি।

সাউথ ক্যালকাটায় ললিতার এই দু'কামরার মাঝারি ফ্ল্যাটটা খুবই ছিমছাম। দুটো বেড রুম ছাড়া রয়েছে ড্রইং-কাম-ডাইনিং হল, কিচেন, দুটো টয়লেট, ব্যালকনি ইত্যাদি। তার নিজস্ব শোবার ঘরখানা চমৎকার সাজানো। মাঝখানে দুটো সিঙ্গল বেড জোড়া দিয়ে বিছানা। একধারে ওয়ার্ডরোব এবং ফ্যাশনেবল ড্রেসিং টেবল, কুশন। আরেক ধারে ছোট টেবল-চেয়ারে মলির পড়ার ব্যবস্থা। একটা দুর্দান্ত' চেহারার ক্যাবিনেটে বাছাই করা কিছু বাংলা আর ইংরেজি বই। এক দেওয়ালে ওভাল শেপের ফরেন ইলেকট্রনিক ওয়াল ক্লক, আরেক দেওয়ালে তাদের এয়ার লাইনসের দুর্দান্ত একখানা ক্যালেন্ডার। অন্য একটি দেওয়ালে তার আর মলির এনলার্জ-করা বিশাল বাঁধানো ফোটো। তাতে তারা দু'জনেই হাসছে—ঝলমলে, প্রাণবন্ত হাসি।

গা থেকে লেপ সরিয়ে ললিতা নামতে যাবে, হঠাৎ তার চোখে পড়ে পাশে মলি নেই। কোথায় যেতে পারে সে? টয়লেটে কি? কিন্তু রাত্তিরে উঠলে মলি তাকে ডাকবেই। আজ তো তাকে ডাকে নি।

প্রায় যান্ত্রিক নিয়মে ললিতার চোখ টয়লেটের দিকে চলে যায়। দরজা বন্ধ রয়েছে, তাই বোঝা যাচ্ছে না ওটার ভেতরে কেউ আছে কিনা। ললিতা ডাকে, 'মলি—মলি—'

কোন সাড়া নেই।

তবু দরজাটা খুলে সুইচ টিপে আলো জ্বালে ললিতা। টয়লেট ফাঁকা। তা হলে কোথায় যেতে পারে মলি? এধারে ওধারে তাকাতে হঠাৎ তার চোখে পড়ে বেড-রুমের দরজাটা খোলা। পরিষ্কার মনে আছে, কাল শোবার আগে পাল্লা টেনে ওটা 'লক' করে দিয়েছিল। তবে কি মলি দরজা খুলে পাশের ঘরে আরতির কাছে গেছে?

আরতি তাদের কাছে বছর তিনেক আছে। কাজের লোক বলতে যা বোঝায় সে ঠিক তা নয়। বছর চল্লিশের মতো বয়স। রীতিমত ভদ্রঘরের মেয়ে, ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছে। বিধবা হবার পর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাকে তাড়িয়ে দেয়। বাপের বাড়িতেও প্রচণ্ড অসম্মানের মধ্যে দিন কাটছিল তার। ললিতার এক এয়ার হোস্টেস বন্ধু সুজয়া একদিন আরতিকে তার কাছে নিয়ে এসেছিল, সেই থেকে এখানেই আছে। আসলে ওকে পেয়ে বেঁচে গেছে ললিতা। সে যখন ডিউটিতে বেরোয় তখন মলিকে কে দেখবে এই নিয়ে ছিল তার মারাত্মক দুশ্চিন্তা। মাঝে মধ্যে দু-চার দিনের জন্য দিল্লি বম্বেতে গিয়েও সেই সময় তাকে থাকতে হ'ত। সমস্যা দেখা দিত তখনই। এখনও তাকে কলকাতার বাইরে গিয়ে থাকতে যে হয় না তা নয়, কিন্তু আরতি আছে বলে সে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত।

আরতির দায়িত্ববোধ প্রবল। তা ছাড়া মলিকে সে খুবই ভালবাসে। আরতি যখন এসেছিল তখন মলির বয়স তিন, গেল জুলাইতে সে আটে পড়েছে। মায়ের যত্নে এবং আদরে আরতি তাকে মানুষ করে তুলছে।

ক'টা রাত আর ললিতার কাছে শোয় মলি! বেশির ভাগ দিনই সে পাশের ঘরে আরতির সঙ্গে ঘুমোয়। আরতি ছাড়া এক মুহূর্ত চলে না মেয়েটার।

ললিতা তার বেড রুম থেকে বাইরের ড্রইং-কাম-ডাইনিং হল-এ চলে এল। ডান পাশে আরতির ঘর। তার দরজায় টোকা দিয়ে ডাকতে থাকে, 'আরতিদি—আরতিদি—'

আরতির ঘুম ভীষণ পাতলা। ধড়মড় করে উঠে এসে দরজা খুলে দাঁড়ায় সে, সঙ্কোচের গলায় বলে, 'বড্ড ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ভাগ্যিস তুমি ডাকলে। এক্ষুনি চায়ের জল চড়িয়ে দিচ্ছি।'

ভোরের ফ্লাইটে ডিউটি থাকলে আগের দিনই আরতিকে জানিয়ে দেয় ললিতা। সে ওঠার আগেই আরতি উঠে কিছু খাবার তৈরি করে চা বসিয়ে দেয়। খালি মুখে কোনওদিনই সে ললিতাকে বাড়ি থেকে বেরুতে দেয় না।

আরতি শশব্যস্তে ওধারে বেসিনের দিকে যাচ্ছিল। চোখে মুখে জল দিয়ে সে কিচেনে ঢুকবে।

ললিতা হাত তুলে তাকে থামিয়ে দেয়। বলে, 'মলি কি রাত্তিরে তোমার কাছে উঠে এসেছে?'

আরতি অবাক হয়ে বলে, 'কই, না! সে তো কাল তোমার সঙ্গে শুল।'

'ঘুম ভাঙার পর মলিকে দেখতে পাচ্ছি না। ভাবলাম তোমার কাছে যদি এসে থাকে—'

'কিন্তু ও কোথায় যেতে পারে?'

'কিছুই বুঝতে পারছি না।'

এরপর দু'জনে সাড়ে আট শ ফিটের এই মাঝারি ফ্ল্যাটটা তোলপাড় করে ফেলে। কিন্তু দুটো বেড রুম, দুটো টয়লেট, কিচেন, ব্যালকনি, ড্রইং-কাম-ডাইনিং হল—কোথাও মলিকে পাওয়া যায় না। খোঁজাখুঁজি করতে করতে একসময় আরতির চোখে পড়ে ড্রইং-কাম-ডাইনিং হল-এর যে জায়গাটায় বসার জন্য সোফা টোফা

সাজানো রয়েছে তার গা ঘেঁষে বাইরে বেরুবার দরজাটা ফাঁক হয়ে আছে। সে প্রায় চেঁচিয়েই ওঠে, 'দিদি, ওই দেখ—'বলে দরজাটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেয়।

ললিতা চমকে উঠে। একরকম দৌড়ে দরজার কাছে এসে পুরোটা খুলে ফেলে। তাদের এই ফ্ল্যাট দোতলায়। বাইরে বেরুলেই নিচে নামার সিঁড়ি।

আলো জ্বেলে দ্রুত কিছু একটা ভেবে নিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো একতলায় চলে আসে ললিতা। তার পেছনে পেছনে আরতিও আসে। ললিতা যা ভেবেছিল তা-ই, রাস্তা থেকে বাড়িতে ঢোকার বিশাল মজবুত দরজাটা হাট করে খোলা। সমস্ত ব্যাপারটা মুহূর্তে পরিষ্কার হয়ে যায়।

রাস্তায় যেদিকে যতদূর চোখ যায়, কেউ কোথাও নেই। গাঢ় হিম আর অন্ধকারে সব কিছু আচ্ছন্ন হয়ে আছে। শীতের এই শেষ রাতে চারিদিক যখন স্তব্ধ, মহানগর যখন ঘুমের আরকে ডুবে রয়েছে, সেই সময় একা কোথায় যেতে পারে মলি! সে তো তাকে না জানিয়ে কিছু করে না। তা ছাড়া মলি ভীরু স্বভাবের মেয়ে। হঠাৎ এমন দুঃসাহস তার হল কী করে? শ্বাসরুদ্ধের মতো কিছুক্ষণ রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে ললিতা। তারপর অবসন্নের মতো সিঁড়ি ভেঙে ফের দোতলায় উঠতে থাকে। নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করে আরতি।

ফ্ল্যাটে ফিরে এসে প্রথমটা ললিতা বুঝে উঠতে পারে না, এখন তার কী করা উচিত। এই অসহ্য শীতের ভোরেও ভয়ে আর দুশ্চিন্তায় তার সারা শরীর ঘামে ভিজে উঠেছে। শিরদাঁড়ার ভেতর দিকে আগুনের হলকার মতো কী যেন দ্রুত ওঠানামা করছে। দু'হাতে মুখ ঢেকে একটা সোফায় বসে পড়ে ললিতা। মলিকে সে এর মধ্যে বকাবকি করেছে কি? গায়ে হাত তুলেছে? মনে করতে পারল না। আসলে মেয়েটা এত ভাল আর এত বাধ্য যে তার ওপর রাগ করার সুযোগই পাওয়া যায় না। তা হলে কী এমন ঘটল যাতে কাউকে কিছু না জানিয়ে সে এভাবে এই নির্জন কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের রাতে বেরিয়ে পড়ল?

আরতি কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে বলে, 'কিছু একটা কর দিদি। এভাবে বসে পড়লে চলবে না। মলিকে খুঁজে বার করতেই হবে।' তার গলা ভীষণ কাঁপছিল।

আরতির কথাগুলো ললিতার মস্তিষ্কে ঝাঁকুনি দিয়ে যায়। মুখ থেকে হাত নামিয়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায় সে। ভেঙে পড়লে এখন চলবে না। আপাতত যেটা আগে দরকার তা হল ডিউটি অফিসার মেনন সাহেবকে একটা ফোন করা।

ড্রইং রুমের একধারে ছোট টেবলে টেলিফোনটা রয়েছে। সেটা তুলে ডায়াল করতে একবারেই মেনন সাহেবকে পাওয়া যায়। মলির ব্যাপারটা জানিয়ে ললিতা বলে, 'স্যর, এই অবস্থায় কী করব বুঝতে পারছি না।'

মেনন সাহেব মানুষটি হৃদয়বান। নিছক কাঠখোট্টা অফিসার নন। ললিতার মনোভাব বুঝতে তাঁর অসুবিধা হয় না। সহানুভূতির সুরে বলেন, 'ডোন্ট ওরি ললিতা। লক্ষ্ণৌ ফ্লাইটে তোমাকে যেতে হবে না। তোমার জায়গায় অন্য কাউকে ডিউটি দিয়ে দিচ্ছি। এক্ষুনি থানায় কনট্যাক্ট করে সব জানাও। যদি কোনও সাহায্যের দরকার হয়, আমাকে ফোন করবে। ডোন্ট হেজিটেট। আরেকটা কথা—'

'কী স্যর?'

'মিস্টার চ্যাটার্জিকে মেয়ের খবরটা দিয়েছ?'

মিস্টার চ্যাটার্জি অর্থাৎ অরিন্দম, তার প্রাক্তন স্বামী। ললিতা হকচকিয়ে যায়। অরিন্দমের কথাটা তার মাথায় আসে নি এই মুহূর্তে। মেনন সাহেবের কথার কী উত্তর দেবে, সে ভেবে পায় না।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে মেনন সাহেবের কণ্ঠস্বর আবার শোনা যায়, 'তুমি কি লাইন কেটে দিলে?'

চাপা গলায় ললিতা বলে, 'না স্যর—'

'এই সময় পুরনো তিক্ততা মনে রাখতে নেই। আফটার অল চ্যাটার্জি মলির বাবা। ওঁকে ব্যাপারটা জানানো দরকার। আচ্ছা, এখন রাখছি, পরে কথা হবে।'

আস্তে আস্তে ফোন নামিয়ে রাখে ললিতা। মেনন সাহেব ঠিকই বলেছেন, অরিন্দমকে খবরটা দেওয়া খুবই জরুরি। মলি যেমন তার মেয়ে, তেমনি অরিন্দমেরও।

থানায় ফোন তো করতেই হবে কিন্তু পুলিশ আজকাল কোনও ব্যাপারেই তেমন গুরুত্ব দেয় না। একমাত্র মন্ত্রী, এম. এল. এ বা এম. পি-রা তাড়া দিলে আলাদা কথা। নেহাতই দায়সারাভাবে তারা তাদের ডিউটি করে যায়। ওদের ওপর ভরসা করে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। কিন্তু এই কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের শেষ রাতে তার মতো একটি মেয়ের পক্ষে কলকাতার জনশূন্য, নিঝুম রাস্তায় রাস্তায় কোথায় মলিকে খুঁজে বেড়াবে সে? এই শহর ইদানীং মেয়েদের পক্ষে তেমন নিরাপদও নয়।

আরতি ডাকে, 'দিদি—' পরস্পরকে তারা এই বলেই ডাকে।

ললিতা চমকে ওঠে, 'কিছু বললে?'

'হ্যাঁ। তোমার অফিসের সাহেব কী বললেন?' মেনন সাহেবকে চেনে আরতি, অনেক বার এই ফ্ল্যাটে এসেছেন তিনি। ললিতা যে তাঁর সঙ্গেই একটু আগে কথা বলছিল সেটা সে বুঝতে পেরেছে।

ললিতা বলে, 'থানায় ফোন করতে বললেন।' ইচ্ছা করেই অরিন্দমের কথাটা আর জানায় না সে।

'তা হলে চুপ করে বসে আছ কেন?' আরতির গলায় ব্যাকুলতা ফুটে বেরোয়।

ললিতা উত্তর দেয় না। ফের ফোনটা তুলে নিয়ে দূরমনস্কর মতো খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। চার বছরের ভেতর একবারও অরিন্দমকে ফোন করেছে কিনা, সে মনে করতে পারে না। অরিন্দমও তাকে ফোন করে নি। তবে প্রতি সপ্তাহে তিন বার অরিন্দম মলিকে দেখতে আসে, কিন্তু ফ্ল্যাটের ভেতর ঢোকে না। একতলায় কলিং বেল আছে। সেটা বাজালে আরতি মলিকে নিচে নিয়ে যায়। মেয়ের সঙ্গে কথা বলে, কিংবা নতুন জামাটামা বা কমিকস-এর বই, রঙের বাক্স তাকে দিয়ে চলে যায়। অরিন্দম সোম বুধ এবং শুক্রবার আসে। ওই দিন তিনটে পারতপক্ষে বাড়িতে থাকে না ললিতা। তবু ক্কচিৎ কখনও থেকে গেলে অরিন্দমের সঙ্গে হয়তো দেখা হয়ে যায় কিন্তু কেউ কথা বলে না। মলির ব্যাপারে জরুরি কিছু জানাবার থাকলে আরতিকে

দিয়ে ফোন করায়।

একসময় ধীরে ধীরে ডায়াল ঘোরায় ললিতা। ওধারে টেলিফোন বেজে ওঠে, বাজতেই থাকে।

ললিতা জানে অরিন্দমদের ফোনটা থাকে দোতলায় চওড়া প্যাসেজের এক ধারে, একটা উঁচু টুলের ওপর।

বেশ কিছুক্ষণ পর লাইনের ওধার থেকে একটা ঘুমন্ত গলা ভেসে আসে, 'হ্যালো, কাকে চাইছেন?'

এতদিন বাদেও কণ্ঠস্বরটা চিনতে অসুবিধা হয় না। অরিন্দমের ছোট ভাই দেবেশ। নিচু গলায় ললিতা বলে, 'আমি ললিতা। তোমার দাদাকে একটু ডেকে দেবে?'

দেবেশ বলে, 'ও হ্যাঁ, ডাকছি—'

গলা শুনে বোঝা যায়, ঘুম ছুটে গেছে দেবেশের। বহুকাল বাদে শীতের ভোরে দাদার প্রাক্তন স্ত্রীর ফোন আসবে, এটা ছিল তার পক্ষে অভাবনীয়।

মিনিট খানেকও কাটে না, ওধার থেকে অরিন্দমের উদ্বিগ্ন স্বর ভেসে আসে, 'কী হয়েছে ললি?'

কত দিন বাদে ওই ডাকটা শুনল ললিতা। একদা, কোনও এক পূর্বজন্মে আদর করে ললি বলে ডাকত অরিন্দম। আড়ষ্ট, কাঁপা সুরে সে বলে, 'মলিকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

অরিন্দম যে ভয়ে আঁতকে উঠেছে সেটা তার গলা শুনে বোঝা যায়, 'সে কী, কখন থেকে?'

গোটা ব্যাপারটা জানায় ললিতা। এমন কি মেনন সাহেবের সঙ্গে ফোনে তার যা যা কথা হয়েছে তা-ও বাদ দেয় না। সব বলার পর অবরুদ্ধ গলায় জিজ্ঞেস করে, 'আমার মলিকে কি ফিরে পাব না?'

ললিতার বলার মধ্যে এমন একটা চাপা ভয় আর কাতরতা ছিল যা অরিন্দমকে প্রবল নাড়া দিতে থাকে। আর্দ্র, কোমল স্বরে সে বলে, 'অত ভেঙে পড়ো না। নিশ্চয়ই মলিকে পাওয়া যাবে। একা একা এখন বেরিও না। আমি আসছি—'

ওধারে লাইন কেটে দেবার শব্দ হয়। ফোনটা ক্রেডেলে নামিয়ে রেখে ফের দু'হাতে মুখ ঢাকে ললিতা।

আরতি এখনও কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। সে বলে, 'দাদার সঙ্গে কথা বললে?' অরিন্দমকে সে দাদা বলে ডাকে।

আস্তে মাথা নাড়ে ললিতা।

খানিকটা আন্দাজের ওপর এবার আরতি জিজ্ঞেস করে, 'দাদা কি আসছেন?'

ললিতা মুখ থেকে হাত সরায় না। আগের মতোই মাথা নেড়ে জানায়—আসছে।

আরতি আর দাঁড়ায় না, নিঃশব্দে সামনে থেকে চলে যায়।

আশ্চর্য, যে মলির জন্য অসহ্য কষ্টে বুকের ভেতরটা দুমড়ে মুচড়ে ভেঙেচুরে যাচ্ছিল, হঠাৎ তাকে সম্পূর্ণ মুছে দিয়ে দশ বছর আগের একটা দিন অদৃশ্য কোনও টিভি স্ক্রিনে ফুটে উঠতে থাকে।

সেবার কলকাতা থেকে বম্বের ফ্লাইটে ললিতা প্রথম অরিন্দমকে দেখে। বিশাল এয়ার বাসের দুশ'র বেশি প্যাসেঞ্জারের ভেতর কেউ আলাদাভাবে চোখে পড়ার কথা নয়। পড়েছিল এই কারণে, পৃথিবী নামের এই গ্রহটি থেকে পঁচিশ তিরিশ হাজার ফিট উচ্চতায় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে অরিন্দম। তখন অবশ্য তার নাম জানত না ললিতা। সে সময় কত আর বয়স অরিন্দমের? খুব বেশি হলে সাতাশ আটাশ। আর ললিতার চব্বিশ। শান্ত, সুপুরুষ চেহারার তরুণ যাত্রীটিকে শুশ্রূষা করতে হয়েছিল তাকেই।

মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার অভ্যাস ছিল না অরিন্দমের। একটি দারুণ সুন্দর তরুণীর পরিচর্যায় সে যতটা আড়ষ্ট হয়েছিল, ঠিক ততটাই খুশি। সুস্থ হয়ে সসঙ্কোচে অরিন্দম ধন্যবাদ দিয়েছিল। বলেছিল, 'আপনি না থাকলে আমার কী যে হ'ত, ভাবতে পারি না। আই অ্যাম ভেরি মাচ গ্রেটফুল টু য়ু।'

যাত্রীটি যে সামান্য নার্ভাস ধরনের, অন্তত তখন তাই ছিল, বুঝতে অসুবিধা হয় নি ললিতার। মধুর হেসে বলেছে, কৃতজ্ঞতা বা ধন্যবাদের প্রয়োজন নেই। সে না থাকলেও অন্য বিমানসেবিকা এভাবেই অরিন্দমের সেবা করত। কেননা, এয়ারক্রাফটের ভেতর কোনও যাত্রী থাকলে তার ভাল মন্দের সমস্ত দায়িত্ব এয়ারলাইনস কর্মীদের। এটা তাদের ডিউটি।

এরপর সামান্য দু-চারটি কথা হয়েছে। তার মধ্যে অরিন্দমের নাম তো জানা গেছেই, ললিতা আরও জানতে পেরেছে অরিন্দম ইতিহাসের অধ্যাপক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট। সেদিনের ফ্লাইটে সে প্রথম বম্বেতে যাচ্ছে। ওখানে বম্বে ইউনিভার্সিটিতে সেবার অল ইন্ডিয়া হিস্টোরিক্যাল কংগ্রেসের কনফারেন্স হচ্ছে। সেই কনফারেন্সে তাকে একটা পেপার পড়তে হবে।

ললিতাও তার নামটাম বলেছিল। সে বাঙালি জেনে আরও খুশি হয়েছে অরিন্দম।

সান্তাক্রুজ এয়ারপোর্টে প্লেন থেকে নামার সময় অরিন্দম বলেছিল, 'আচ্ছা চলি।'

ললিতা বলেছে, 'আশা করি এইরকম কোনও ফ্লাইটে আবার দেখা হবে।'

'আশা করি।'

সত্যিই ফের দেখা হয়ে গিয়েছিল। একবার নয়, বহু বার। কখনও আগরতলার ফ্লাইটে, কখনও লক্ষ্ণৌর ফ্লাইটে, কখনও দিল্লি, মাদ্রাজ, বাঙ্গালোরগামী প্লেনে। তরুণ ঐতিহাসিক হিসেবে তখন অরিন্দমের খ্যাতি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। নানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তার ডাক আসত। প্রতি মাসেই হয় সেমিনার, নইলে কনফারেন্স কিংবা মিটিং।

ললিতা হেসে হেসে বলত, 'আপনি দেখছি আমাদের এয়ারলাইনসের প্রায় ডেইলি প্যাসেঞ্জার হয়ে উঠলেন।'

অরিন্দমও হাসত। মজার গলায় বলত, 'ভাগ্যিস সেমিনারওলারা প্লেনের টিকেট দেয়। তাই—' কথা শেষ না করেই চুপ করে যেত। তারপর ঠোঁট টিপে, চোখের কোণ দিয়ে ললিতাকে লক্ষ করতে থাকত।

ললিতা জিজ্ঞেস করত, 'তাই কী?'

'আপনার সঙ্গে দেখা হয়। যদি সাহস দেন, একটা কথা বলি—'

'কী?'

'প্লেনে উঠেই খোঁজ করি, আপনি আছেন কিনা। না থাকলে মন ভীষণ খারাপ হয়ে যায়।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকত ললিতা। মুখ নামিয়ে একসময় চাপা গলায় বলত, 'আমারও। ফ্লাইটে ডিউটি পেলেই মনে মনে ভাবি, আপনাকে দেখতে পাব কিনা।'

এরপর কবে যে তারা খুব কাছাকাছি চলে এসেছিল, নিজেরাই বুঝতে পারে নি। ততদিনে পরস্পরের ঠিকানা আর ফোন নম্বর ওদের জানা হয়ে গেছে।

ভূপৃষ্ঠ থেকে বিশ পঁয়ত্রিশ ফিট উঁচুতেই শুধু নয়, ডিউটি না থাকলে ললিতা অরিন্দমদের বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়িতে ফোন করত। সে তখন থাকত হিন্দুস্থান পার্কে, তার দাদার কাছে। অরিন্দমও সেখানে তাকে ফোনে ধরে ফেলত।

শুধু কি দূরভাষ যন্ত্রেই কথা বলা, প্রায়ই তাদের দেখা হতে লাগল। মাঝে মাঝে কোনও ভাল রেস্তোরাঁয় লাঞ্চ খেতে যেত তারা, কখনও বা ভোরে গাড়ি নিয়ে কাছাকাছি কোথাও বেড়িয়ে সন্ধেবেলায় ফিরে আসত।

অরিন্দম মানুষটা খুবই খোলামেলা, সাদাসিধে, তার মধ্যে লুকোচুরির ব্যাপার নেই। বেশ কয়েকবার সে ললিতাকে ওদের বাড়ি নিয়ে গেছে।

অরিন্দমদের জয়েন্ট ফ্যামিলি। ওর বাবা নেই। তবে কাকা, কাকিমা, বিধবা মা, খুড়তুতো এবং নিজের ভাইবোনদের নিয়ে তাদের বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়িটা সারাদিন সরগরম।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে একান্নবর্তী পরিবারগুলো বিশাল বিশাল প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর মতো লুপ্ত হয়ে গেছে। কিউরিও শপে যেমন দুষ্প্রাপ্য জিনিস সাজিয়ে রাখা হয়, সেইভাবেই যেন কলকাতা শহর জায়েন্ট ফ্যামিলির একটি নমুনা একক প্রদর্শনী হিসেবে অরিন্দমদের বাড়িতে এখনও রেখে দিয়েছে।

অরিন্দমদের বাড়ির আবহাওয়া খুবই উদার। মা কাকা কাকিমা থেকে শুরু করে ছোট ভাই-বোনেরা পর্যন্ত সবাই প্রথম দিনটি থেকে তার সঙ্গে অত্যন্ত আপনজনের মতো ব্যবহার করেছে। ওখানে গেলে এক ধরনের মধুর উষ্ণতা অনুভব করত সে।

আরও একটা ব্যাপার ললিতার চোখে পড়েছিল। উদারতা থাকলেও অরিন্দমদের লাইফ স্টাইলটা পুরনো ধাঁচের। বাড়িতে ডাইনিং টেবলে খাওয়ার চল ছিল না, সবাই আসন পেতে মেঝেতে বসে খেত। যত রকম পাল পার্বণ আছে, সব ওরা মেনে চলত। গরিব আত্মীয়দের নিয়মিত সাহায্য করত অরিন্দমরা। মাসের গোড়ার দিকে কম করে কুড়ি বাইশটা মানি অর্ডারে নানা ঠিকানায় টাকা পাঠাত। পুরনো ভ্যালুজ, পুরনো পারিবারিক সম্পর্কের প্রতি ওদের শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। আগেকার যৌথ পরিবারগুলোতে যেমন একজনই হেড অফ দ্য ফ্যামিলি, এখানেও তা-ই। অরিন্দমের বাবার মৃত্যুর পর কাকাই ছিলেন সর্বেসর্বা, তাঁর কথাই শেষ কথা। তাঁর মুখের ওপর কথা বলার সাহস কারও ছিল না।

গোটা পরিবারটাই ছিল টিটোটেলার। কাউকে কোনওদিন ড্রিংক তো দূরের কথা,

সিগারেট টিগারেটও খেতে দেখে নি ললিতা।

ওদের বাড়িতে ঢুকলে প্রথমেই যা চোখে পড়বে তা হল বই। একতলা থেকে তেতলা পর্যন্ত প্রতিটি ঘরেই একটা কি দুটো বইয়ের আলমারি আছেই।

অরিন্দমদের বাড়িতে পড়াশোনাটা ছিল সব চেয়ে জরুরি ব্যাপার। ওর বাবা ছিলেন একটা বড় কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। ভাইবোনদের বেশির ভাগই কলেজের অধ্যাপক। এক ভাই সেন্ট্রাল গভর্নমেণ্টের একটা ইনস্টিটিউটে সায়েন্টিফিক অফিসার, সেখানে তরুণ গবেষকদের সে রিসার্চ গাইড। সবার ছোট দুই ভাইবোন তখন এম. এ পড়ছে। স্কুল থেকে ইউনিভার্সিটি লেভেল পর্যন্ত সবার রেজাল্টের দিকে তাকালে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। অরিন্দমের কাকা অবশ্য এডুকেশন লাইনে নেই। তিনি হাইকোর্টের নাম করা অ্যাডভোকেট, দুর্দান্ত পসার তাঁর।

ললিতাদের বাড়ির আবহাওয়া এবং চেহারা একেবারে উলটো। জয়েন্ট ফ্যামিলির কথা তারা ভাবতেই পারে না। কাকা-জেঠাদের সঙ্গে এক বাড়িতে তারা থাকত না। শুধু তাই নয়, আত্মীয়স্বজনরা কে কোথায় থাকে, সে খবরও তারা বিশেষ রাখত না।

বাবা-মা অনেক আগেই মারা গিয়েছিলেন। ললিতা, তার দাদা সঞ্জয়, বৌদি সাউথ ইন্ডিয়ান মেয়ে বিজয়া এবং তাদের একমাত্র ছেলে সানি—এই নিয়ে ছিল ওদের ছোট ফ্যামিলি।

বাড়িতে লেখাপড়ার চল বিশেষ নেই। ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ার কারণে ইংরেজিটা জলের মতো বলতে পারত দুই ভাইবোন। কোনওরকমে ঘষে ঘষে গ্র্যাজুয়েট হবার পর দাদা ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের বিজনেসে কিভাবে যেন নেমে পড়েছিল। আর ঝকঝকে, স্মার্ট, তোড়ে ইংরেজি বলা ললিতা এয়ার হোস্টেসের চাকরিটা জুটিয়ে ফেলেছিল।

সঞ্জয়ের হিন্দুস্থান পার্কের ফ্ল্যাটটার সঙ্গে ভাল বই-টইয়ের কোনও সম্পর্ক ছিল না। যা আসত তা হল হালকা 'পর্নো' ধরনের কেচ্ছার কাগজ, রঙিন ফিল্মি আর ফ্যাশনের ম্যাগাজিন। সেলারে সাজানো থাকত হুইস্কি রাম জিনের বোতল। ডিপ ফ্রিজে নানা ধরনের মাংস। চিকেন, মাটন, হ্যাম, পর্ক। আর ছিল দামি ফরেন টিভি, ভি সি আর এবং অগুনতি পপ মিউজিকের রেকর্ড।

সপ্তাহে অন্তত তিনটে দিন রাত্তিরে তাদের বাড়িতে পার্টি দেওয়া হ'ত। চড়া পপ মিউজিকের মধ্যে বয়ে যেত হুইস্কির স্রোত, প্রায় সমস্ত রাত ধরে চলত হুল্লোড়। সঞ্জয় বা ললিতার যে বন্ধুরা এই সব পার্টিতে আসত তারা গোটা কয়েক জিনিস ছাড়া আর কিছু বুঝত না। ড্রিংকস, দামি দামি ফ্যাশনেবল পোশাক, ফোরেন পারফিউম, ফোরেন কার, অজস্র টাকা, দু-চার মাস পর পর আমেরিকা, কানাডা, সুইজারল্যান্ড কি ওয়েস্ট জার্মানি ঘুরে আসা, ইত্যাদি। তাদের কাছে এ সবের বাইরে জীবনের কোনও মানে নেই।

দুই বাড়ির লাইফ-স্টাইলের মধ্যে এত পার্থক্য, তবু প্রেম এমন এক ম্যাজিক যা সমস্ত অসঙ্গতি ভুলিয়ে দেয়। অন্তত কিছু দিনের জন্য। যা অনিবার্য তাই ঘটে, একদিন দু'জনের বিয়ে হয়ে যায়, হিন্দুস্থান পার্ক থেকে বালিগঞ্জ প্লেসে চলে আসে ললিতা।

বিয়ের পর একটা বছর স্বপ্নের মতো পাখা মেলে উড়ে যায়। তখন ঘোরের মধ্যে রয়েছে ললিতা। তারপর ধীরে ধীরে আচ্ছন্নতা যত কাটে ততই অসুবিধাগুলি ফুটে বেরুতে থাকে। প্রথমেই তার মনে হয় এ বাড়িতে বড় বেশি ভিড়। এখানে তার নিজস্ব বা আলাদা বলতে কিছু নেই। একটা প্রকাণ্ড সংসারের সে অংশমাত্র—অতি তুচ্ছ এবং গুরুত্বহীন।

এ বাড়িতে উদারতা আছে, গরিব আত্মীয়স্বজনদের জন্য মহানুভবতা আছে কিন্তু সেই সঙ্গে যা আছে তা হল এক ধরনের রক্ষণশীলতা। এরা বড় বেশি পিউরিটান, ভীষণ কনজারভেটিভ। এখানে জ্যাজ নেই, পপ মিউজিক এর ত্রিসীমানায় ঢোকে না। পার্টি, ড্রিংকস, রাতভর নাচানাচি, হুল্লোড়—এ সবের নামে এ বাড়ির লোকেরা ভিরমি খায়।

বালিগঞ্জ প্লেসে যে আনন্দ ছিল না তা নয়। তবে সেটা ওদের মতো। হিন্দুস্থান পার্কের আনন্দের সঙ্গে এর কোনও মিল নেই। ও বাড়িটায় বড় বেশি পড়াশোনার গন্ধ। দাদা তো মজা করে প্রায়ই বলত, 'শেষ পর্যন্ত বেছে বেছে একটা ক্লাসরুমে গিয়ে ঢুকলি।'

আরও একটা বছর কেটে যায়। এর মধ্যে মলি এসে গেছে। ওদিকে ললিতার মধ্যে এক ধরনের চাপা ক্ষোভ এবং তিক্ততা তৈরি হচ্ছিল। এ বাড়িতে এসে সে যে পুরোপুরি সুখী হয় নি, সেটা যেন স্পষ্ট করে বুঝতে পারছিল।

বিয়ের পরও চাকরি ছাড়ে নি ললিতা, অবশ্য ছাড়ার কথা কেউ তাকে বলে নি। তবে শ্বশুরবাড়ির হালচাল মাথায় রেখে পারতপক্ষে কলিগদের কাউকে বাড়িতে ডাকত না। কেউ আসতে চাইলে বলত, দিনের বেলা সাদা চোখে, মুখে গন্ধ না নিয়ে, স্বাভাবিক অবস্থায় আসতে। রাতের দিকে কোনওভাবেই না। কিন্তু বিয়ের তৃতীয় বছরে অরুণ সোন্ধি গোলমাল পাকিয়ে দিল। অরুণ দারুণ আমুদে আর হই চই-করা মানুষ, তবে ড্রিংকটা একটু বেশিই করে থাকে। এমনিতে খারাপ না, কিন্তু পেটে হুইস্কিটা পড়লে তার মাথার ভেতর গোলমাল হয়ে যায়। তখন সে যে কী করে বসবে তার ঠিক থাকে না।

অরুণ আগে ছিল দিল্লি অফিসে। তখন থেকেই ললিতা তাকে চিনত। সেই অরুণ একদিন কলকাতায় বদলি হয়ে এল। আর এসেই প্রতি রাতে আরক্ত চোখে, টলটলায়মান পায়ে এবং মুখে হুইস্কির প্রচুর গন্ধ নিয়ে একেক জন বন্ধুর বাড়ি হানা দিতে লাগল।

একদিন বেশ রাত করেই অরুণ বালিগঞ্জ প্লেসে এসে হাজির। ললিতা খুবই বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। বুঝিয়ে সুঝিয়ে কোনওরকমে সে তাকে গাড়িতে তুলে দেয়।

অরুণ চলে যাবার পর অরিন্দম থমথমে মুখে বলেছিল, 'মাতাল, স্কাউড্রেল। তোমাকে পরিষ্কার বলে দিচ্ছি, এখানে এ সব চলবে না। আমাদের বাড়ির স্যাংটিটি নষ্ট হয়, এ আমি কিছুতেই সহ্য করব না।'

অরুণ ওভাবে আসায় খুবই বিব্রত হয়েছিল ললিতা। কিন্তু অরিন্দম অমন রূঢ়ভাবে বলায় হঠাৎ মাথার ভেতর কিছু একটা ঘটে গিয়েছিল তার। মুখ শক্ত হয়ে

উঠেছে। চড়া গলায় বলেছে, 'ওয়ার্ল্ডে তোমাদের বাড়িটাই সবার মডেল হওয়া উচিত, এটা ভাবছ কেন? ড্রিংক করাটা তোমাদের কাছে মহাপাপ হতে পারে, সবার কাছে নয়। ব্যাপারটা এত খারাপ হলে পৃথিবী থেকে লিকার ব্যাপারটাই উঠে যেত।'

অরিন্দম এমনিতে খুবই ভদ্র, শান্ত এবং সংযত ধরনের মানুষ। কিন্তু সেদিন সে-ও প্রায় খেপে গিয়েছিল, 'যে কেউ যেখানে খুশি ড্রিংক করতে পারে কিন্তু আমাদের বাড়িতে ড্রাংকার্ডদের অ্যালাউ করব না।'

হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের মতো চেঁচিয়ে উঠেছে ললিতা, 'আমার বন্ধুরা তা হলে এ বাড়িতে আসবে না?'

'তোমার বন্ধুদের যা নমুনা তাতে তারা এখানে না এলে বাধিত হব।'

অরুণের সেই ঘটনাটা দিয়ে যে বিস্ফোরণের শুরু, তারপর থেকে দু'জনের সম্পর্ক ক্রমশ আর খারাপ হতে থাকে। রোজই খিটিমিটি, অশান্তি। বাড়ির অন্য সবাই এ ব্যাপারটা পছন্দ করছিল না, তারা খুবই অখুশি। বালিগঞ্জ প্লেসের এতদিনের পারিবারিক প্যাটার্ন ললিতার জন্য চোখের সামনে ভেঙেচুরে যাচ্ছে, এটা কেউ মেনে নিতে পারছিল না।

ললিতারও অসহ্য লাগছিল। সে বলেছে, 'আমি এখানে আর থাকব না।'

অরিন্দম স্তম্ভিত। বলেছে, 'তার মানে?'

'এ বাড়িতে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।'

'তার মানে তুমি চাইছ আমি অন্য বাড়ি ভাড়া নিই?'

ললিতা উত্তর দেয় নি।

অরিন্দম এবার বলেছে, 'তুমি ভুল করেছ। য়ু আর ফ্রি টু গো এনিহোয়ের য়ু লাইক। আমি নিজেদের বাড়ি ছেড়ে যাব না। এখানে থাকতে হলে তোমার চাকরি-বাকরি আর ওই টাইপের বন্ধুবান্ধব ছাড়তে হবে। আমাদের ফ্যামিলির অন্য সবার মতো হতে হবে।'

ক্ষিপ্ত, উত্তেজিত ললিতা সেদিনই মলিকে নিয়ে হিন্দুস্থান পার্কে তার দাদার ফ্ল্যাটে চলে গিয়েছিল। অরিন্দম তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে নি। তার মা কাকা কাকিমা গোলমালটা মিটিয়ে দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু অরিন্দম এবং ললিতার, দু'জনেরই মাথায় অন্ধ জেদ তখন চেপে বসেছে। এমন একটা জায়গায় তারা পৌঁছে গিয়েছিল যেখান থেকে আর ফেরা যায় না। এরপর কোর্ট, মামলা, ডিভোর্স। আদালত রায় দিয়েছিল, মলি আপাতত ললিতার কাছে থাকবে। অরিন্দম যখন ইচ্ছা, মেয়েকে দেখে আসতে পারবে।

হিন্দুস্থান রোডে বেশিদিন থাকে নি ললিতা। দেশপ্রিয় পার্কের কাছে কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটির এই ফ্ল্যাট কিনে বছরখানেকের ভেতর উঠে আসে।

উত্তেজনা, রাগ, খ্যাপামি ইত্যাদি থিতিয়ে যাবার পর মাঝে মাঝে ললিতার মনে হয়েছে, জেদের বশে ডিভোর্সটা করে বসা ঠিক হয় নি, অন্তত মলির ভবিষ্যতের কথা তার মাথায় রাখা উচিত ছিল। অরিন্দম এই বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পর্কে কী ভেবেছে, সে জানে না।

ললিতার বয়স এখন চৌত্রিশ। যথেষ্ট সুন্দরী সে, চমৎকার স্বাস্থ্যের জন্য তাকে তরুণীই বলা যায়। এই বয়সের একটি যুবতীর পক্ষে কলকাতা শহরে ছোট একটি মেয়েকে নিয়ে জীবন কাটানো খুব সহজ নয়। অরুণ সোন্ধি তার মতোই ডিভোর্সি, সে আগে আগে প্রায়ই বিয়ের কথা বলত, ললিতা রাজি হয় নি। শুধু অরুণই না, কলিগদের মধ্যে আরও কেউ কেউ ইঙ্গিত দিয়েছে। কিন্তু কেন কে জানে, ললিতা তাদের এড়িয়ে গেছে। ইদানীং কয়েক মাস এ ব্যাপারে কেউ আর অনুরোধ, কাকুতি-মিনতি বা জোরজার করে না। এই চাপটা থেকে সে আপাতত মুক্ত।

ললিতা জানে, অরিন্দমও বিয়ে করে নি। নিয়মিত সে মেয়েকে দেখে যায়। তবে তার সঙ্গে কথাবার্তা নেই। প্রায় চার বছর বাদে ললিতাকে নেহাত নিরুপায় হয়েই আজ ফোন করতে হল।

কতক্ষণ মুখ ঢেকে আচ্ছন্নের মতো বসে ছিল, খেয়াল নেই ললিতার। একসময় কলিং বেল বেজে ওঠে। সে বুঝতে পারছিল অরিন্দম এসেছে। মুখ থেকে হাত সরিয়ে তবু আরতিকে বলে, 'দেখ তো কে এল—'

আরতি কিচেনে কী করছিল, দৌড়ে ড্রইং-কাম-ডাইনিং রুমের ওধারে ব্যালকনিতে চলে যায়। নিচে মেইন দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে অরিন্দম। সে গাড়ি নিয়ে এসেছে। গাড়িটা রাস্তার ধার ঘেঁষে পার্ক করা।

অরিন্দম আসবে বলে মেইন দরজার মাথায় যে আলো রয়েছে, সেটা জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে।

আরতি শশব্যস্তে বলে, 'একটু দাঁড়ান দাদা, নিচে গিয়ে দরজা খুলে দিচ্ছি।'

অরিন্দম বলে, 'আমি আর ভেতরে যাব না। তোমার দিদিকে তাড়াতাড়ি আসতে বল।'

ওদের কথা শুনতে পেয়েছিল ললিতা। দ্রুত বেসিনের সামনে গিয়ে চোখেমুখে একটু জল দিয়ে, সামনে যে চটি পায় তাতে পা ঢুকিয়ে নেমে যায়। কাল রাতে যে শাড়িটাড়ি পরে শুয়েছিল তা বদলাবার কথা মনে থাকে না।

নিচে আসতেই নিঃশব্দে গাড়ির পেছন দিকের দরজা খুলে দিয়ে সামনে ড্রাইভারের সিটে উঠে বসে অরিন্দম। ললিতা উঠতেই সে স্টার্ট দেয়। এক মিনিটের ভেতর গাড়িটা রাসবিহারী অ্যাভেনিউতে চলে আসে।

এখনও ঘন কুয়াশায় ঢেকে আছে কলকাতা মেট্রোপলিস। তবে অন্ধকার আগের মতো গাঢ় নেই, ফিকে হয়ে আসছে। এ বছর শীতটা জাঁকিয়ে পড়েছে, কনকনে উত্তুরে হাওয়া সাঁই সাঁই বয়ে যাচ্ছে ঝড়ের গতিতে।

দোতলা থেকে নিচে নামার সময় চাদর কি কার্ডিগান নেবার কথা মাথায় ছিল না ললিতার। এখন ঠাণ্ডায় সমস্ত শরীর যেন জমে যাচ্ছে। শাড়ির আঁচলটা ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে কুঁকড়ে বসে থাকে সে।

রাস্তা একেবারে সুনসান। লোকজন চোখে পড়ে না। তবে খুব সম্ভব ফার্স্ট ট্রামটা বেরিয়েছে। ঘন্টি বাজাতে বাজাতে, কুয়াশা ফুঁড়ে কোনও অপার্থিব গ্রহের অলৌকিক

যানের মতো সেটা সামনে দিয়ে চলে যায়। ক্বচিৎ কখনও দু-একটা লরি কি ট্যাক্সি চকিতে দেখা দিয়েই পলকে দূরে, আরও দূরে, গাঢ় কুয়াশায় অদৃশ্য হয়।

শীতভোরের নির্জন রাসবিহারী অ্যাভেনিউ, কুয়াশাতরল অন্ধকার, দু'ধারের ঝাপসা বাড়িঘর, কোনও কিছুই দেখছে না ললিতা, পলকহীন তাকিয়ে আছে অরিন্দমের দিকে।

একটা ব্যাপার সে লক্ষ করেছে, অরিন্দম তাকে ফ্রন্ট সিটে নিজের পাশে বসতে বলে নি। অবশ্য বলার কারণও নেই। ডিভোর্স হয়ে যাবার পর তার সঙ্গে সম্পর্কই বা কী? তবু নিজের অজান্তে বুকের ভেতর চিনচিনে একটু কষ্টই যেন টের পায় ললিতা।

অরিন্দম তাকে নিয়ে কোন দিকে চলেছে বোঝা যাচ্ছে না। একসময় দ্বিধান্বিতভাবে ললিতা বলে, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

একটু যেন চকিত হয়ে ওঠে অরিন্দম। অন্যমনস্কর মতো উইন্ডস্ক্রিনের বাইরে তাকিয়ে ছিল সে। স্পিড সামান্য কমিয়ে মুখ ফেরাতে গিয়ে হঠাৎ ডান দিকের আয়নায় ললিতাকে দেখতে পায়। হিমে একেবারে জড়সড় হয়ে আছে সে।

অরিন্দম বলে, 'আপাতত থানায় যাচ্ছি।' তার গায়ে সোয়েটারের ওপর একটা গরম শাল জড়ানো। এক হাত স্টিয়ারিংয়ে রেখে, আরেক হাতে শালটা খুলে প্রাক্তন স্ত্রীর দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলে, 'এটা গায়ে দিয়ে নাও।'

সারা শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে যায় ললিতার। অরিন্দমের কাছ থেকে এতটা সে আশা করে নি, এটা ছিল তার সুদূর কল্পনারও বাইরে। শালটা হাতে নিয়ে চুপ করে বসে থাকে সে।

কিছুক্ষণ পর অরিন্দম ফের বলে, 'কী হল, গায়ে দিলে না?'

অরিন্দম যে গাড়ি চালাতে চালাতে পাশের মিররের দিকে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে, ললিতা টের পায় নি। নিঃশব্দে, ধীরে ধীরে শালটা গায়ে জড়িয়ে নেয় সে। কাশ্মীরী শালের কোমল উষ্ণতা তার শীতল, জমে-আসা শরীরে উত্তাপ ছড়িয়ে দিতে থাকে।

থানায় পৌঁছে দেখা যায়, বিশাল বাড়িটা একেবারে নিঝুম। কোলাপসিবল গেটের ওধারে খাটিয়ার ওপর দু'জন কনস্টেবল কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছিল। তাদের জাগিয়ে, গেট খুলিয়ে ললিতাকে সঙ্গে নিয়ে ভেতরে ঢোকে অরিন্দম। একটি ঝকঝকে তরুণ অফিসার রাতের ডিউটিতে ছিল। মানুষ হিসেবে সে খুবই সহানুভূতিপ্রবণ। মলির নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারটা শুনে চটপট ডায়েরি লিখে নেয়। তারপর বলে, 'রোদ উঠলেই আমার ডিউটি শেষ। কোয়ার্টার্সে ফিরে যাবার কথা। তবে এখন যাচ্ছি না। এই কেসটা আমি নিজেই হ্যান্ডল করব। দেখি মেয়েটিকে খুঁজে বার করা যায় কিনা।' একটু ভেবে বলে, 'আমার কয়েকটা পয়েন্ট জানার আছে।'

অরিন্দম এবং ললিতা পাশাপাশি বসে উন্মুখ তাকিয়ে থাকে।

অফিসারটি ললিতাকে জিজ্ঞেস করে, 'অ্যালার্মের আওয়াজে ঘুম ভাঙার পর দেখলেন, আপনার মেয়ে মানে মলি আপনার পাশে নেই। তখন আপনারা দু'জনে সারা ফ্ল্যাট খুঁজে দেখলেন। কিন্তু—'

ললিতা এমন কথা বলে নি যে সে আর অরিন্দম মলিকে খুঁজেছে। অরিন্দমের

ব্যাপারটা অফিসার ধরে নিয়েছে এবং সেটাই স্বাভাবিক। আধফোটা গলায় ললিতা বলে, 'ও ছিল না। আমি আর আমাদের কাজের মেয়ে আরতিদি, দু'জনে মিলে খুঁজেছি।'

অফিসারটি একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করে, 'তা হলে ইনি! ইনি কোথায় ছিলেন?'

রীতিমত নার্ভাস হয়ে পড়ে ললিতা। অফিসার যেভাবে জেরা শুরু করেছে, তার ফলে অরিন্দমের সঙ্গে তার এখনকার সম্পর্কটা বেরিয়ে পড়ার সম্ভাবনা। সেটা খুবই অস্বস্তিকর। ললিতা কী উত্তর দেবে যখন ঠিক করে উঠতে পারছে না সেই সময় অরিন্দম তাকে বাঁচিয়ে দেয়। বলে, 'বালিগঞ্জ প্লেসে আমাদের একটা বাড়ি আছে। আমি কাল রাতে সেখানে ছিলাম।' ললিতাকে দেখিয়ে বলে, 'ভোরে ওর ফোন পেয়ে চলে এসেছি।'

অরিন্দমের স্টেটমেন্টের ভেতর এক ফোঁটা মিথ্যে নেই। অফিসার বলে, 'ও, আচ্ছা। ইনি আপনার স্ত্রী নিশ্চয়ই?'

একটু ইতস্তত করে অরিন্দম আস্তে মাথা নাড়ে। অর্থাৎ তা-ই।

ললিতা বুঝতে পারে, অরিন্দম ইচ্ছা করেই তাদের ডিভোর্সের কথাটা বলে নি। তাতে জটিলতাই বাড়বে।

অফিসার অবশ্য এ বিষয়ে আর কোন প্রশ্ন করে না। সে বলে, 'মলি যে হঠাৎ কাউকে কিছু না জানিয়ে ওভাবে বেরিয়ে গেল, এর কারণ কী হতে পারে?'

ললিতা এবং অরিন্দম একসঙ্গে বলে ওঠে, 'বুঝতে পারছি না।'

'ওকে কি বকাবকি বা মারধর করা হয়েছিল?'

ললিতা বলে, 'না। মলি এত বাধ্য আর ভাল যে ওসবের দরকার হয় না।'

'অন্য কোনও কারণে কি ওর মনটন খারাপ হয়েছিল?'

'কী ধরনের কারণের কথা বলছেন?'

'এগ্‌জাক্টলি বলতে পারব না।' চোখ কুঁচকে একটু ভেবে অফিসার বলে, 'ধরুন, স্কুলে পড়া পারে নি বলে শাস্তি পেয়েছে কিংবা উইকলি টেস্টে রেজাল্ট খারাপ করেছে—'

ললিতা বলে, 'ইমপসিবল। আমি কালও ওর স্কুলের খাতাগুলো দেখেছি। সব সাবজেক্টেই ভেরি গুড পেয়েছে।'

'ঠিক আছে। ওর কোনও ফোটো এনেছেন?'

মলির একটা ছবি আনা উচিত ছিল। নইলে তাকে চেনা যাবে কী করে? কিন্তু এখানে আসার সময় দুশ্চিন্তায়, স্নায়বিক চাপে ললিতারা এতই বিপর্যস্ত ছিল যে ফোটোর কথাটা মাথায় আসে নি। ললিতা বলে, 'না, মানে—'

তরুণ অফিসারটি বলে, 'কিন্তু ওটা চাই-ই।'

'ঠিক আছে। পরে আমি দিয়ে যাব।'

'পরে না, এখনই দরকার। আমি আপনাদের সঙ্গে যাচ্ছি। ফোটোটা নিয়ে মলিকে খুঁজতে বেরুব।'

অফিসারটির কর্তব্যবোধে অভিভূত হয়ে যায় ললিতা এবং অরিন্দম। এতটা তারা আশা করে নি। ললিতা বলে, 'ধন্যবাদ। মলিকে পাওয়া যাবে তো?' বলতে বলতে তার গলা কাঁপতে থাকে।

অফিসারটি জোর দিয়ে বলে, 'নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।' তারপর ফোন করে লালবাজার পুলিশ হেড কোয়ার্টার্সে মলির খবরটা জানিয়ে দিয়ে বলে, কলকাতার সব থানাকে যেন আলার্ট করে দেওয়া হয়। শহর থেকে বাইরে বেরুবার যত রাস্তা আছে, ট্রাফিক ডিপার্টমেন্ট যেন সব জায়গায় নজর রাখে। ললিতাদের কাছে মলির চেহারা, বয়স ইত্যাদি সম্পর্কে যা শুনেছিল তা-ও জানায় অফিসারটি। বলা যায় না, কোনওভাবে ছেলেমেয়ে পাচারকারীদের হাতে মলি পড়েছে কিনা। তারা যদি ওকে কলকাতার বাইরে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে তাই এই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা।

লাইনের ওধার থেকে খুব সম্ভব আরও কিছু জানতে চাওয়া হয়। তার উত্তরে অফিসারটি বলে, 'ওর ফোটো শীগ্‌গিরই পাঠিয়ে দিচ্ছি।' তারপর ফোন নামিয়ে রেখে দু'জন কনস্টেবলকে ডেকে তৈরি হয়ে নিতে বলে।

মিনিট পাঁচেক বাদে দেখা যায় থানা থেকে বেরিয়ে অরিন্দমের গাড়িটা সামনে চলেছে, ব্যাক সিটে কিছুক্ষণ আগের মতোই চুপচাপ বসে আছে ললিতা। আর তাদের পেছন পেছন আসছে একটা জিপ। সেটা চালাচ্ছে সেই অফিসারটি। তার সঙ্গে রয়েছে দুই কনস্টেবল।

ললিতার ফ্ল্যাটের কাছে এসে গাড়ি দাঁড় করায় অরিন্দম। ললিতা নেমে অফিসারকে বলে, 'ওপরে আসুন—'

অফিসারটি বলে, 'এখন একটা সেকেন্ডও নষ্ট করা যাবে না। আপনি যত তাড়াতাড়ি পারেন মেয়ের একটা ফোটো নিয়ে আসুন।' ললিতা চলে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে আবার বলে, 'একটা আর্জেন্ট ব্যাপার একদম ভুলে গেছি। আপনাদের ফোন নাম্বারটা লিখে নিয়ে আসবেন। তেমন দরকার হলে যোগাযোগ করতে সুবিধা হবে।'

একটু ইতস্তত করে অরিন্দম ললিতাকে বলে, 'বালিগঞ্জ প্লেসের ফোন নাম্বারটাও লিখে দিও। কলকাতার ফোন তো, ভেরি ডিফিকাল্ট অ্যান্ড আনপ্রেডিক্টেবল। একটা না পাওয়া গেলে আরেকটায় ট্রাই করা যেতে পারে।'

অফিসারের সামনে যে কৈফিয়তই দিক অরিন্দম, দুটো ফোন নম্বর দেবার কারণ ললিতাই শুধু জানে। কয়েক পলক স্থির চোখে অরিন্দমকে লক্ষ করে সে, তারপর বাড়ির দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

আধ ঘন্টা আগে ললিতা যখন অরিন্দমের সঙ্গে থানায় যায় তখন থেকেই আরতি দোতলার ব্যালকনিতে বসে ছিল। গাড়ি দেখে দ্রুত নিচে নেমে দরজা খুলে একধারে দাঁড়িয়ে যায়। ললিতা দোতলা থেকে মলির দু-তিনটে ফোটো এনে অফিসারকে দেয়।

অফিসারটি বলে, 'আমরা তো খুঁজছিই। আপনারাও খোঁজ করুন। দেখুন আত্মীয়-স্বজন বা ওর কোন বন্ধুবান্ধবের বাড়ি গেছে কিনা—'বলে জিপে স্টার্ট দিয়ে চলে যায়।

অরিন্দম তার গাড়ি থেকে নামে নি। সে বলে, 'অফিসারের সাজেসানটা ভাল।

উঠে এস।'

নিঃশব্দে যন্ত্রচালিতের মতো আবার ব্যাক সিটে উঠে বসে ললিতা।

অরিন্দম জিজ্ঞেস করে, 'মলির ক্লাসের বন্ধুদের সবাইকে চেনো?'

ললিতা বলে, 'মেয়ের স্বভাব তো জানো। মলি কি কার সঙ্গে সহজে মেশে?'

'দু-চারজনের সঙ্গে তো মেশে। ও সেদিন বলছিল কাদের যেন নেমন্তন্ন করবে—' বলে মুখ ফিরিয়ে ললিতার দিকে তাকায় অরিন্দম।

খানিক চিন্তা করে ললিতা বলে, 'হ্যাঁ। তিন-চারজনকে প্রায়ই ফোন করে—জয়িতা, বনি, রিয়া আর সূর্য। ওরা মাঝে মাঝে আসেও।'

'ওদের বাড়ি চেনো?'

ললিতা জানায়, চেনে। এই বন্ধুদের জন্মদিনে মলিকে সে ওদের বাড়ি পৌঁছে দিয়েছে। শুধু জন্মদিনের পার্টিতেই নয়, অন্য সময়ও কয়েকবার নিয়ে গেছে।

অরিন্দম গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'সবচেয়ে কাছে কারা থাকে?'

'জয়িতারা। চক্ররেড়ে রোড সাউথে—'

অরিন্দম গাড়ির মুখ সেদিকে ঘুরিয়ে দেয়। মলি ভোর রাতে উঠে বন্ধুদের বাড়ি যাবে, ললিতা এটা ভাবতে পারছিল না। তবে কিনা বাচ্চাদের মনস্তত্ত্ব বুঝে ওঠা মুশকিল। ঝোঁকের বশে কখন যে তারা কী করে বসবে, আগে থেকে আন্দাজ করা যায় না। ললিতার মনে ক্ষীণ একটু দুরাশা দেখা দেয়, যদি মলি জয়িতা কি রিয়া-টিয়াদের বাড়ি গিয়েই থাকে!

এদিকে অন্ধকার আর কুয়াশা অনেকটা কেটে গেছে। আলো ফুটে উঠতে শুরু করেছে। রাস্তা-টাস্তা এখন আর ফাঁকা নেই। দুধের গাড়ি, ট্যাক্সি, প্রাইভেট কার, বাস-টাস শীতের বাতাস চিরে সাঁ সাঁ করে ছুটছে। আর চোখে পড়ে খবরের কাগজওলাদের। সাইকেলের পেছনে মর্নিং এডিশানের টাটকা কাগজের পাহাড় নিয়ে তারা ঝড়ের গতিতে পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে।

ব্যাক সিটে একা একা বসে দুশ্চিন্তায়, ভয়ে নিজের অজান্তেই কাঁপতে থাকে ললিতা। যদি মলি জয়িতাদের বাড়ি না গিয়ে থাকে? হঠাৎ বুকের ভেতর থেকে হু হু করে কান্না উঠে আসে।

উইন্ডস্ক্রিনের বাইরে চোখ রেখে গাড়ি চালাচ্ছিল অরিন্দম। ফোঁপানির শব্দে চমকে পেছন ফিরে দেখে, ললিতার দু চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে সে, তারপর গাড়িটা ফুটপাথের ধার ঘেঁষে দাঁড় করিয়ে পেছন দিকের দরজা খুলে নরম গলায় বলে, 'সামনে এস—'

নিঃশব্দে ফ্রন্ট সিটে এসে বসে ললিতা। তবে কাঁদতেই থাকে। অরিন্দম বলে, 'কেঁদো না ললি, কেঁদো না।' বলতে বলতে ললিতার কাঁধে একটা হাত রাখে, 'এত অস্থির হলে মলিকে খুঁজবে কী করে? ললি প্লিজ—' অরিন্দমের কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে আসে।

ললিতার কান্না কিন্তু থামে না। কতকাল বাদে অরিন্দম তাকে ছুঁল! পরিচিত এই স্পর্শ তার সমস্ত অস্তিত্বের ভেতর যেন বিদ্যুৎপ্রবাহ বইয়ে দেয়। দু'হাতে অরিন্দমের

হাতটা আঁকড়ে ধরে সে। যে কান্নাটা এতক্ষণ ছিল চাপা, অনুচ্চ, এবার সেটা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

ললিতার কান্না অদ্ভুত এক কষ্টকে অরিন্দমের মধ্যেও চারিয়ে দিচ্ছিল। সে কাঁপা গলায় বলে, 'প্লিজ ললি—প্লিজ—'

ললিতা ভাঙা ভাঙা, ঝাপসা স্বরে বলে, 'আমার মন বলছে, মলি বন্ধুদের কাছে যায় নি। গেলে নিশ্চয়ই ওদের বাড়ি থেকে ফোন করে জানিয়ে দিত।'

কথাটা খুবই যুক্তিসঙ্গত। একটা ছোট মেয়ে এভাবে শীতের রাতে একা চলে আসবে আর তার অভিভাবককে খবর দেওয়া হবে না, তা কখনও হতে পারে না। মলির বন্ধুদের মা-বাবাদের কাছ থেকে এটুকু দায়িত্ববোধ নিশ্চয়ই আশা করা যায়।

ললিতা যা বলেছে তারপর হতাশা ছাড়া আর কিছু থাকে না। কিন্তু মলির ব্যাপারে সামান্য সম্ভাবনাও ছাড়তে রাজি নয় অরিন্দম। সে বলে, 'হয়তো ওরা ভেবেছে, সকালে মলিকে পৌঁছে দেবে।'

ললিতা বুঝতে পারে, চূড়ান্ত এক দুরাশাকে বুকের ভেতর প্রাণপণে জাগিয়ে রেখেছে অরিন্দম; কিছুতেই সেটাকে নিভে যেতে দিচ্ছে না। ললিতা আর কিছু বলে না।

চক্রবেড়ে রোড সাউথ-এ এসে জয়িতাদের ঘুম ভাঙিয়ে জানা যায় মলি এখানে আসে নি। আর যেটা ঘটে তা এইরকম।

জয়িতার মা-বাবা জানত ললিতা ডিভোর্সি। অরিন্দমকে তারা চিনত না, তবে তার পরিচয় জেনে অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে থাকে।

গুরুসদয় রোডে থাকে রিয়ারা, ক্রিক রোতে সূর্যরা, নিউ আলিপুরে বনিরা। জয়িতাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে তিন জায়গাতেই যায় ললিতা এবং অরিন্দম। কিন্তু যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল তা-ই। মলি কোনও বন্ধুর বাড়ি যায় নি।

একটা ব্যাপার লক্ষ করেছে ললিতা আর অরিন্দম। মলি সম্বন্ধে তার বন্ধুদের মা-বাবারা যতটা উদ্বিগ্ন তার চেয়ে অনেক বেশি কৌতূহলী তাদের সম্পর্ক নিয়ে। জয়িতার মা-বাবার মতো এই সব মা-বাবারা অত্যন্ত উৎসুক চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে থেকেছে।

চারটে বাড়ি ঘুরতে বেশ বেলা হয়ে যায়। সবার শেষে ওরা গিয়েছিল নিউ আলিপুরে। সেখান থেকে ফিরতে ফিরতে সঞ্জয়ের কথা মনে পড়ে যায় অরিন্দমের। বলে, 'আচ্ছা, মলি ওর মামাবাড়ি যায়?'

ললিতা পাশ থেকে ঝাপসা গলায় বলে, 'যায় মাঝে মাঝে। কেন?'

'ওখানে একবার খোঁজ নিয়ে দেখা যাক।'

ললিতা উত্তর দেয় না, অবসন্নের মতো বসে থাকে। তার সব আশা যেন শেষ হয়ে গেছে।

হিন্দুস্থান পার্কে এসে নতুন খবর কিছুই পাওয়া যায় না। মলি সেখানেও যায় নি।

সঞ্জয় এবং তার স্ত্রী বিজয়া মানুষ খারাপ নয়। মলির কথা শুনে ওরা যতটা উৎকণ্ঠিত, ঠিক ততটাই খুশি বোনের সঙ্গে প্রাক্তন ভগ্নিপতিকে দেখে। তারা দু'জনকে

চা খেয়ে যাবার জন্য বার বার বলতে থাকে।

অরিন্দম বলে, 'এখন না। পরে একদিন এসে খাব। আমাদের মানসিক অবস্থাটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।'

সঞ্জয় বলে, 'কথা দিলে কিন্তু।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

'ললিকে সঙ্গে করে নিয়ে এস।'

অরিন্দম কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে, 'ও যদি আমার সঙ্গে আসতে চায়, আসবে। এখন যাই। দেখি মলিকে কিভাবে খুঁজে বার করা যায়।'

সঞ্জয় সচকিত হয়ে বলে, 'লালবাজারে আমার দুই বন্ধু টপ পজিশনে আছে। আমিও ওদের কাছে যাচ্ছি। মলিকে খুঁজে পেতেই হবে।'

হিন্দুস্থান পার্ক থেকে ললিতার বাড়ির সামনে এসে গাড়ি থামিয়ে অরিন্দম বলে, 'ঘোরাঘুরি করে খুব টায়ার্ড হয়ে পড়েছ। একটু রেস্ট নাও। বাড়ির সবাই মলির জন্যে চিন্তা করছে। যাই, ওদের খবরটা দিতে হবে।'

এক পলক অরিন্দমের মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নেয় ললিতা। নিচু গলায় বলে, 'ওপরে আসবে না? আমার ভীষণ ভয় করছে।' তার ঠোঁট এবং গলার কাছটা থির থির করে কাঁপছে।

ললিতাকে দেখতে দেখতে কী যেন ঘটে যায় অরিন্দমের মধ্যে। গভীর গলায় তার একটা হাত ধরে বলে, 'আচ্ছা, চল—'

ওপরে এসে প্রথমে বালিগঞ্জ প্লেসে ফোন করে অরিন্দম জানিয়ে দেয়, মলিকে এখনও পাওয়া যায় নি। তারপর থানায় ফোন করে। কিন্তু সেই অফিসারটি ফিরে আসে নি।

সেই ভোর রাত থেকে তারা ঘুরছে। কার মুখটুখ পর্যন্ত ধোওয়া হয় নি। অরিন্দম যখন ফোন করছিল সেই সময় নতুন একটা ব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে তার সামনে এনে রেখেছে ললিতা। সেই সঙ্গে একটা নতুন দামি তোয়ালেও। ওদিকে আরতি ক্ষিপ্র হাতে ব্রেকফাস্ট তৈরি করছে।

মুখটুখ ধোওয়ার পর চা ছাড়া আর কিছুই খায় না অরিন্দম।

ললিতা বলে, 'একটু কিছু খাও।'

অরিন্দম বলে, 'ভাল লাগছে না।'

ললিতারও কিছু খেতে ইচ্ছা করছিল না। সে-ও চায়ের কাপই শুধু তুলে নেয়।

চা খাওয়া হয়ে গেলে অরিন্দম অস্থিরভাবে খানিকক্ষণ পায়চারি করে। তারপর বলে, 'আমি বরং একবার থানায় যাই।'

ললিতা বলে, 'আমিও তোমার সঙ্গে যাব।'

'তোমার বাড়িতে থাকা দরকার। সঞ্জয়দা লালবাজারে যাবে বলল। যদি কোনও খবর থাকে, নিশ্চয়ই এখানে ফোন করবে। তোমাকে না পেলে অসুবিধা হবে।'

'ঠিক আছে।'

সেই যে অরিন্দম থানায় গেল, তারপর ঘন্টা দুই কেটে গেছে। এর ভেতর তার ফোন তো আসেই নি, সঞ্জয়ও কোনওরকম যোগাযোগ করে নি।

সময় যেন আর কাটতে চায় না। মলির দুশ্চিন্তাটা চাক চাক বরফের মতো স্নায়ুর ওপর চেপে বসেছে। শ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে থাকে ললিতার। এই ফ্ল্যাট, নিচের রাস্তায় লোকজনের ভিড়, ব্যস্ততা, গাড়ি-টাড়ির অবিশ্রান্ত ছোটাছুটি, হই চই—সব অসহ্য লাগছে। মাথার ভেতরকার সব শিরা যেন ছিঁড়ে যাবে।

একসময় মরিয়া হয়েই সে ঠিক করে ফেলে, থানায় যাবে। পোশাক বদলে বেরুতে যাবে, সেই সময় কলিং বেলের আওয়াজে দরজা খুলে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে পড়ে ললিতা। তার ঠিক সামনেই মলি আর অরিন্দম।

কয়েক সেকেন্ড পর হৃৎপিণ্ডের ভেতরকার তুমুল এক আবেগ ললিতাকে ঠেলে নিয়ে যায় যেন। দু' হাতে মলিকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে ভেতরে আনতে আনতে সে সমানে কাঁদতে থাকে, 'কোথায় গিয়েছিলি মলি? কেন গিয়েছিলি? আমি তো তোকে কখনও বকি না, মারি না। তবু কেন গেলি সোনা?'

মলি চুপ করে থাকে।

অরিন্দম তাদের সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে এসেছিল। ললিতা ব্যাকুলভাবে তাকে জিজ্ঞেস করে, 'কোথায় পেলে ওকে?'

অরিন্দম জানায়, সে তাকে খুঁজে বার করতে পারে নি। সব কৃতিত্ব সেই তরুণ অফিসারটির। একটা পার্কে বসে কাঁদছিল মলি। তাকে ঘিরে ভিড় জমে গিয়েছিল। খুঁজতে খুঁজতে সেখানে চলে যায় অফিসারটি। ছবি মিলিয়ে মলিকে চিনতে পারে। তারপর থানায় নিয়ে আসে।

ললিতা বলে, 'অফিসারকে আমাদের এখানে আসতে বল নি?'

'বলেছি। সন্ধের পর আসবে।'

'আমাদের গ্র্যাটিচুড জানিয়েছ?'

'সে কি আর তোমার বলার অপেক্ষা রাখে? ভদ্রলোক যা করেছে, সমস্ত জীবন মনে রাখব।'

'মলি কেন না বলে চলে গিয়েছিল, কিছু বলেছে?'

'বলেছে।'

'কী?'

'ওর কাছ থেকেই জেনে নাও না।'

মলিকে জিজ্ঞেস করলে সে ললিতার বুকে মুখ লুকিয়ে বলে, 'বাবার জন্যে মন খারাপ লাগছিল। তাই—' একটু থেমে বলে, 'কিন্তু অন্ধকারে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলাম।'

ললিতা স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকে। তারপর বলে, 'বাবার কাছে যেতে চাও, আমাকে বল নি কেন?'

'তুমি যদি যেতে না দিতে?'

'বাবার কাছে যাবে, আর আমি যেতে দেব না!' বলে আবার কাঁদতে শুরু করে

ললিতা।

অনেকক্ষণ পর আরতির জিম্মায় চলে গেছে মলি। মুখ ধুইয়ে, ফ্রক-ট্রক পালটে, চুল আঁচড়ে এখন পাশের ঘরে তাকে খাওয়াতে বসেছে সে।

আর বড় বেডরুমটায় পাশাপাশি বসে আছে ললিতা আর অরিন্দম।

অরিন্দম একসময় বলে, 'এবার আমি যাই।'

কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলে গিয়েছিল ললিতার। মুখ তুলে সে বলে, 'যাবে?'

'মেয়েকে তো ফিরে পেয়েছই। এখন আর আমার—' কথাটা শেষ না করেই থেমে যায় অরিন্দম।

ললিতা কাঁপা গলায় বলে, 'কিন্তু—'

'কী?'

'আবার যদি ওভাবে মলি তোমার জন্যে না বলে-কয়ে বেরিয়ে পড়ে? একবার ফিরে পেয়েছি বলে আবার পাব তার কি ঠিক আছে? তখন কী হবে? মলিকে আমি হারাতে পারব না।'

বিমূঢ়ের মতো অরিন্দম বলে, 'কিন্তু—'

তার কথা যেন শুনতে পাচ্ছিল না ললিতা। বলে, 'আমাদের দু'জনের কাছে না থাকলে ও আবার না জানিয়ে বেরিয়ে পড়বে।'

'তুমি কী বলতে চাইছ?'

'স্পষ্ট করে না বললে কিছুই বুঝতে পার না তুমি!' বলতে বলতে দু'হাতে মুখ ঢাকে ললিতা, 'আমরা কি নতুন করে আবার শুরু করতে পারি না? মলির জন্যে—মলির জন্যে—'

কয়েক পলক ললিতার দিকে তাকিয়ে থাকে অরিন্দম। তারপর ধীরে ধীরে অসীম মমতায় তাকে নিজের বুকের ভেতর জড়িয়ে নেয়। টের পায় তার জমা-টামা চোখের জলে ভিজে যাচ্ছে।

বিদেশী

ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠা আলতাফ হোসেনের বহুকালের অভ্যাস। আজও পাঁচটাতেই উঠে হোটেলের ব্যালকনিতে এসে বসেছেন।

সময়টা নভেম্বরের মাঝামাঝি। এর মধ্যেই কুয়াশা পড়তে শুরু করেছে কলকাতায়। সূর্য এখনও ওঠেনি। কনকনে উত্তুরে হাওয়া সারা গায়ে হিম মেখে প্রবল দাপটে বয়ে যাচ্ছে শহরের ওপর দিয়ে। মনে হচ্ছে, শীতটা এবার অনেক আগে আগেই নেমে যাবে।

আলতাফ হোসেনের পরনে পাজামা এবং গরম পাঞ্জাবির ওপর মোটা পশমি চাদর। সেটা আরেকটু ঘন করে জড়িয়ে নিলেন তিনি। ভোরের এই ঠাণ্ডাটা বেশ আরামদায়ক লাগছে।

তিনি যেখানে বসে আছেন সেখান থেকে যেদিকে যতদূর চোখ যায় সব ঝাপসা। কুয়াশার ভেতর চারপাশের উঁচু উঁচু হাই-রাইজগুলোকে অস্পষ্ট পেন্সিল স্কেচের মতো মনে হয়। ষাট ফুট নিচে চওড়া অ্যাসফাল্টের রাস্তাটা এখন একেবারেই ফাঁকা। ক্বচিৎ দু-চারটে দুধের গাড়ি বা খবরের কাগজের ভ্যান ভোরের নৈঃশব্দকে চুরমার করে গাঁক গাঁক করে বেরিয়ে যাচ্ছে।

দিন দশেক আগে ঢাকা থেকে দিল্লি হয়ে আজমীর শরিফ গিয়েছিলেন আলতাফ। সেখান থেকে ফেরার পথে তিনদিন হল কলকাতায় এসেছেন।

আলতাফের বয়স এখন ছিয়াত্তর। পঁয়তাল্লিশ বছর আগে, দেশ তখনও ভাগ হয়নি, এই শহরে শেষ এসেছিলেন। তারপর এই এলেন। এবার আসার একটা উদ্দেশ্য আছে।

ছিয়াত্তরেও স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালই আলতাফের। এখনও একা একা চলাফেরা করতে পারেন। কিন্তু আয়ুর কথা কেউ বলতে পারে না। ভারতে যখন আসাই হয়েছে তখন ছেলেবেলার বন্ধুদের সঙ্গে একবার দেখা করতে চান। পরে হয়তো আর সে সুযোগ পাওয়া যাবে না।

তবে দেখা যে করতে পারবেন সে ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত নন আলতাফ। কেননা দেশভাগের পর পূর্ব বাংলায় তাঁদের সেই নগণ্য মফস্বল শহর থেকে পুরনো বন্ধুদের কে কোথায় ভেসে গেছে, ক'জন বেঁচে আছে, তাদের ঠিকানাই বা কী, কিছুই জানা নেই তাঁর। এই এক কোটি মানুষের বিশাল মেট্রোপলিসে ঠিকানাহীন চার পাঁচটি বন্ধুকে খুঁজে বার করা অসম্ভব।

পঁয়তাল্লিশ বছর আগে যে কলকাতায় তিনি শেষবার এসেছিলেন তার সঙ্গে আজকের এই শহরের বিশেষ কোনও মিল নেই। অগুনতি হাইরাইজ, জনবিস্ফোরণের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ, রাস্তায় রাস্তায় অন্তহীন গাড়ির স্রোত তো আছেই, সেই সঙ্গে কলকাতা যে কতদিকে কতভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, এখানে না এলে জানা যেত না। তাঁর স্মৃতির শহর যে এতটা বদলে যাবে কে ভাবতে পেরেছিল। দেশভাগের আগের কলকাতার সামান্য একটু আদলই এখন অবশিষ্ট আছে। নইলে সবই প্রায় অচেনা, অভাবনীয় এবং চমকে দেওয়ার মতো। এখানে পাঁচ বছর রাস্তায় ঘুরে বেড়ালেও বন্ধুদের খোঁজ পাওয়া যাবে না। তাই অনেক ভেবেচিন্তে একটা উপায় ঠিক করেছেন। তিনদিন আগে কলকাতায় পৌঁছেই হোটেলে সুটকেশ ব্যাগট্যাগ রেখে, ঠিকানা যোগাড় করে চলে গিয়েছিলেন একটা ইংরেজি আর দুটো বাংলা খবরের কাগজের অফিসে। কাগজগুলোর 'চিঠিপত্র' বিভাগে ছাপার জন্য একটি করে চিঠি দিয়ে এসেছেন। সেগুলোর বয়ান এইরকম।

'ঢাকা জেলার ছোট শহর বাজিতপুরে আমাদের চার পুরুষের বাস। আমার জন্ম সেখানে। জীবনের প্রথম তিরিশ বছর ওই শহরে কাটিয়েছি। সাতচল্লিশ সালে পাকিস্তান হওয়ার পর থেকে রাজধানী ঢাকায় চলে এসেছি। পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে আমি ঢাকার স্থায়ী বাসিন্দা।

'বাজিতপুরে থাকাকালীন আমার কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বাল্যবন্ধু ছিল। তারা হল

পরিতোষ গোস্বামী, মণিমোহন ঘোষ, অম্বিকা চাকলাদার, ভূপতিনাথ বসাক আর নৃপতি সরকার। এরাও পুরুষানুক্রমে ওই শহরে বাস করে এসেছে। দেশভাগের পর এই বন্ধুরা ভারতে চলে আসে। এদের মধ্যে মণিমোহন ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামী। ব্রিটিশ আমলে ডিফেন্স অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্টে অন্তরীণ হওয়া ছাড়াও বেয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলনে জেল খেটেছে। মণিমোহনের এই পরিচয়টা বিশেষভাবে দেওয়ার কারণ, ভারতে তাকে হয়তো অনেকেই চিনবেন।

'আমার এই বন্ধুরা কে কোথায় আছে, জানি না। জীবনের অন্তিম পর্বে তাদের দেখার জন্য ব্যাকুলতা বোধ করছি।

'বর্তমানে আমি সার্কুলার রোডে 'ড্রিমল্যান্ড ইন্টার-কন্টিনেন্টাল হোটেল'-এ আছি। আর পাঁচদিন এখানে থাকব। বন্ধুরা এই চিঠি পড়ামাত্র যেন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে। দুর্ভাগ্যবশত এরা কেউ জীবিত না থাকলে এদের পুত্রকন্যারা যদি পিতৃবন্ধুকে দেখতে আমার হোটেলে আসে বড়ই আনন্দ লাভ করব।

আলতাফ হোসেন'

'চিঠিপত্র' বিভাগের সম্পাদকদের তিনি অনুরেরাধ করে এসেছিলেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিঠি যেন ছাপা হয়। কাল পর্যন্ত ওগুলো বেরোয়নি। হয়তো স্থানাভাবের কারণে। এজন্য ভেতরে ভেতরে আলতাফ বেশ উৎকণ্ঠিত হয়ে আছেন।

কতক্ষণ ব্যালকনিতে বসে ছিলেন খেয়াল নেই। হঠাৎ আলতাফের চোখে পড়ে কুয়াশা কেটে গিয়ে কখন যেন রোদ উঠে গেছে। সামনের সার্কুলার রোড, দূরের ক্যামাক স্ট্রিট বা চৌরঙ্গিতে এখন প্রচুর মানুষজন। বাস, মিনিবাস আর প্রাইভেট কারের ঢল নেমেছে-চারপাশে। রাত পোহাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হই চই এবং ব্যস্ততায় সরগরম হয়ে উঠতে শুরু করেছে এই শহর।

ধীরে ধীরে উঠে তিনি টয়লেটে চলে যান। কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে আসতেই রুম বয় এসে টয়লেট এবং কামরা সাফ করে, বেড-শিট পালটে বিছানা ঠিক করে দিয়ে যায়। তারপর একটা বেয়ারা ট্রেতে চায়ের সরঞ্জাম, ব্রেকফাস্ট এবং তিনখানা খবরের কাগজ সাজিয়ে ঘরে ঢোকে। যে কাগজগুলোতে আলতাফ চিঠি দিয়ে এসেছিলেন রোজ সকালে বেয়ারাকে তার একটা করে কপি কিনে আনতে বলেছেন।

টেবিল ট্রে নামিয়ে রেখে চলে যায় বেয়ারা। আলতাফ তৎক্ষণাৎ কাগজগুলোর ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েন। আজ তিনটে কাগজেই তাঁর চিঠি ছাপা হয়েছে। বিভাগীয় সম্পাদকদের মনে মনে ধন্যবাদ জানিয়ে টি-পট থেকে কাপে লিকার এবং দুধ ঢেলে সুগার কিউব মিশিয়ে চামচ দিয়ে নাড়তে নাড়তে ভাবতে থাকেন, এই চিঠি সকালেই বন্ধুদের চোখে পড়ার কথা। যদি তারা বেঁচে থাকে দু-তিন ঘন্টা পর নিশ্চয়ই ফোন আসবে। পরক্ষণে একটা খটকা লাগে তাঁর। তিনি ধরেই নিয়েছেন বন্ধুরা কলকাতায় বা তার আশেপাশে রয়েছে, কিন্তু যদি না থাকে? অনিশ্চিতভাবে চায়ে চুমুক দিতে দিতে তাঁর মনে হয়, সবাই কি আর কলকাতার বাইরে আছে? যদি বাইরেও থাকে, কাগজগুলো দূরত্ব অনুযায়ী কারও কাছে দুপুরে, বিকেলে কি সন্ধের ভেতর পৌঁছে যাবে। আজ না পারলেও, আশা করা যায়, কাল পরশু কিংবা তার

পরদিন ওরা যোগাযোগ করবে।

নাতি-নাতনী এবং পুত্রবধূরা কলকাতা থেকে বালুচরি শাড়ি, ইন্ডিয়ান কসমেটিকস এবং ভাল শার্ট প্যান্টের পিস কিনে নিয়ে যেতে বলেছেন। কিন্তু বন্ধুদের কার কখন ফোন আসবে ঠিক নেই। আলতাফ স্থির করে ফেলেন আজ কাল এবং পরশু হোটেল থেকে বেরুবেন না। এর ভেতর বন্ধুদের সাড়া পাওয়া না গেলে কিছু করার নেই।

ব্রেকফাস্ট শেষ করে খবরের কাগজগুলো নিয়ে শুয়ে পড়েন আলতাফ। খাটের পাশে একটা নিচু টেবলে ছোট টেলিফোন রয়েছে। চোখের সামনে খবরের কাগজ থাকলেও তাঁর সমস্ত মনোযোগ সেদিকে।

এগারটা বেজে যখন পঁচিশ, আলতাফ ঠিক করলেন স্নানটা সেরে নেওয়া যাক। বিছানা থেকে তিনি নামতে যাবেন, সেইসময় হঠাৎ ফোন বেজে ওঠে। অসীম আগ্রহে সেটা তুলে নিয়ে 'হ্যালো' বলতেই ওধার থেকে ভারী গলা ভেসে আসে, 'আমি মণিমোহন ঘোষ। আলতাফ হোসেনের সঙ্গে কথা বলছি কি?'

দেখা যাচ্ছে কৌশলটা ষোল আনা কাজে লেগেছে। বন্ধুদের ভেতর আলতাফের সব চেয়ে প্রিয় ছিলেন মণিমোহন। স্বাধীনতা সংগ্রামের অক্লান্ত যোদ্ধা এই মানুষটির প্রতি ছিল তাঁর গভীর শ্রদ্ধা।

মণিমোহনের কণ্ঠস্বর শুনতে শুনতে বুকের ভেতরটা গাঢ় আবেগে তোলপাড় হয়ে যাচ্ছিল আলতাফের। বললেন, 'হ্যা, আমি আলতাফ। কতকাল পর তোমার গলা শুনলাম—' তাঁর বলার ভঙ্গিতে পূর্ববঙ্গের টান।

'সকালে খবরের কাগজে তোমার চিঠিটা পড়ে কী ভাল যে লাগল, বলে বোঝাতে পারব না। বাজিতপুরের কথা একরকম ভুলেই গিয়েছিলাম। সে কী আজকের ব্যাপার! তোমার চিঠিটা যেন আমাকে আগের জন্মে ফিরিয়ে নিয়ে গেল।'

'তোমাদের ঠিকানা তো জানি না। খবরের কাগজে চিঠি না দিয়ে উপায় ছিল না।'

'পদ্ধতিটা বুদ্ধি করে ভালই বার করেছিলে।'

দু'জনে প্রাণ খুলে জোরে জোরে হাসতে থাকেন।

একসময় আলতাফ বলেন, 'তোমার খবর পরে নিচ্ছি। আগে বল অন্য বন্ধুরা কে কেমন আছে, কোথায় থাকে।'

মণিমোহন জানান, পার্টিশানের পর নৃপতিরা, অম্বিকারা, ভূপতিরা এবং তাঁরা সোজা কলকাতায় চলে এসেছিলেন। পরিতোষরা চলে যান আসামে। তাঁদের কোনও খবর জানা নেই মণিমোহনের। নৃপতি আর ভূপতি মারা গেছেন। নৃপতির স্ত্রীও বেঁচে নেই। তাঁদের দুই মেয়ে বিয়ের পর বিদেশে চলে গেছে। ভূপতি কলকাতায় আসার পর বেশিদিন বাঁচেননি। তাঁর বিধবা স্ত্রীকে তাঁর এক শালা জামশেদপুরে নিজের কাছে নিয়ে যায়। বছর চারেক আগে পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন, এখনকার কথা বলতে পারবেন না মণিমোহন।

অম্বিকা জীবিত আছেন। শুধু তাই নয়, এখনও অত্যন্ত কর্মক্ষম। দেশভাগের পর কলকাতায় এসে ব্যবসা করে কারখানা বসিয়ে প্রচুর পয়সা করেছেন। নিউ আলিপুরে

প্রাসাদের মতো বিশাল বাড়ি। ছেলেরা সবাই শিক্ষিত এবং কৃতী। বাবার বিরাট ব্যবসা, সাত-আটটা কারখানা তারাই দেখে। তবে সবার মাথার ওপর রয়েছেন অম্বিকা। তিনিই মূল শক্তি। তাঁর নির্দেশে এতগুলো প্রতিষ্ঠান মসৃণ নিয়মে চলছে। প্রবল ব্যক্তিত্বের অধিকারী অম্বিকা চাকলাদারকে অমান্য করার সাহস ছেলেদের কারও নেই।

আলতাফ বললেন, 'অম্বিকার কথা শুনে ভাল লাগল। রিফিউজি হিসেবে এদেশে এসে এতখানি রাইজ করা সহজ ব্যাপার নয়। আশা করি, আমার চিঠিটা তার নজরে পড়লে ফোন করবে। তবু ওর ঠিকানা আর ফোন নম্বরটা যদি দাও—'

ফোন নাম্বার আর ঠিকানা দিলেন মণিমোহন। তারপর বললেন, 'এবার তোমার কথা বল আলতাফ।'

'সে তো বলবই। তার আগে তোমারটা শুনি—'

'শুনে আর কী হবে। আজ রাতে আমাদের এখানে দুটো ডালভাত খাও। তখন নিজের চোখেই সব দেখতে পাবে।'

দারুণ খুশির গলায় আলতাফ বলেন, 'নিশ্চয়ই খাব। বাজিতপুরে তোমার মা, মানে মাসিমার হাতের রান্না কত খেয়েছি। সে সব মুখে লেগে আছে। তোমার ঠিকানা বল, কিভাবে যাব তার ডিরেকশানটা দাও—'

টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপোর কাছে একটা সরু রাস্তায় থাকেন মণিমোহনরা। সেখানকার ঠিকানা দিয়ে ট্যাক্সি করে সন্ধের দিকে চলে আসতে বলেন তিনি।

আলতাফ বলেন, 'ঠিক আছে, চলে যাব।'

মণিমোহন বললেন, 'তোমাদের কথা কিন্তু জানা হল না আলতাফ। ক'টি ছেলেমেয়ে, তারা কী করছে টরছে—'

আলতাফ বলেন, 'তুমি আমাকে সাসপেন্সে ঝুলিয়ে রাখলে। আমি সেটা করছি না। শোন তবে—' পঁয়তাল্লিশ বছরের পারিবারিক ইতিহাস সংক্ষেপে জানিয়ে দেন তিনি। পাকিস্তান হওয়ার পর বাজিতপুর থেকে স্ত্রী এবং বড় ছেলেকে নিয়ে ঢাকায় চলে আসেন, শুরু করেন কাপড়ের ব্যবসা আর ছাপাখানা। সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্য ফিরে যায়। টাকা আসতে থাকে স্রোতের মতো। সেই টাকার বেশির ভাগটাই নতুন নতুন ব্যবসাতে ঢেলেছেন। তার ফলও পেয়েছেন। টঙ্গির কাছে এখন দুটো গারমেণ্ট ফ্যাক্টরি তাঁর। ফরেন কোলাবরেশনে সেখানে জিনসের ট্রাউজার্স আর শার্ট তৈরি হয়, তার আশি ভাগ এক্সপোর্ট করেন অস্ট্রেলিয়ায় আর মিডল ইস্টে। ছ'খানা ট্রেডল মেশিন দিয়ে ছাপাখানা আরম্ভ হয়েছিল। সেই জায়গায় এখন বারোখানা পাঁচ কালারের অফসেট মেশিন, ডিটিপি বাইশ খানা।

বাজিতপুরে থাকার সময় একটি মাত্র ছেলে হয়েছিল। ঢাকায় আসার পর আরও দুই ছেলে ও দুই মেয়ের জন্ম। সবাই উচ্চশিক্ষিত। বড় আর মেজো ছেলে গারমেন্ট ফ্যাক্টরি দেখে, আলতাফ এবং ছোট ছেলে দেখে ছাপাখানা। দুই মেয়ের একজন আর্কিটেক্ট, অন্যজন ডাক্তার। তাদের ভাল বিয়ে হয়েছে। ধানমণ্ডিতে দু'খানা বাড়ি করেছেন, গাড়ি আছে চার-পাঁচটা। জীবনে যা যা কাম্য সবই পেয়েছেন। তাঁর কোন

আক্ষেপ নেই।

সব শুনে খুব আন্তরিক গলায় মণিমোহন বলেন, 'বা, এ তো বিরাট সাকসেস স্টোরি। শুনে খুব আনন্দ হল।' একটু থেমে বলেন, 'সন্ধেয় আসছ কিন্তু। আমারই গিয়ে তোমাকে হোটেল থেকে নিয়ে আসা উচিত ছিল কিন্তু বিকেলে—'

তাঁকে থামিয়ে আলতাফ বলেন, 'এ নিয়ে ভেবো না। টালিগঞ্জ মোটামুটি আমার চেনা। ঠিক সময়ে চলে যাব।'

মণিমোহনের সঙ্গে কথা বলার পর আলতাফ স্নান খাওয়া সেরে শুয়ে পড়েন। দুপুরের দিকে ঘন্টাখানেক ঘুমনো তাঁর বরাবরের অভ্যেস। স্বল্পক্ষণের এই দিবানিদ্রায় শরীরটা বেশ ঝরঝরে থাকে। ভাবলেন, অম্বিকার ঠিকানা আর ফোন নাম্বার তো পাওয়াই গেছে। অম্বিকা যদি যোগাযোগ নাও করেন তিনি বিকেলের দিকে ফোন করবেন।

কিন্তু ঘুমনো আর হল না। দুই চোখ যখন জুড়ে আসছে সেই সময় ফোন বেজে ওঠে। সেটা তুলে কানে লাগাতে অচেনা কণ্ঠস্বর শোনা যায়, 'আলতাফ হোসেনের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

কলকাতায় আসার পর ঢাকায় স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের জানিয়ে দিয়েছেন এখানে কোথায় উঠেছেন। তারা রোজ সন্ধের পর ফোন করে। তিনি আন্দাজ করলেন এটা হয়তো অম্বিকার গলা। মণিমোহনের সঙ্গে ঘন্টা দেড়েক আগে কথা হয়ে গেছে। এ শহরে অম্বিকা ছাড়া আর কে তাঁকে ফোন করতে পারে? আলতাফ বলেন, 'আমিই আলতাফ। তুমি নিশ্চয়ই অম্বিকা?'

ওধার থেকে এবার শোনা যায়, 'বুঝলে কী করে?' অম্বিকার গলায় বিস্ময় মাখানো।

'পঁচাত্তর ছিয়াত্তর বছর বয়স হল। এটুকু অনুমানশক্তি এতদিনে কি আমার হয়নি?'

'তা বটে।'

এবার দুই বন্ধু পঁয়তাল্লিশ বছর আগে বাজিতপুরের সেই স্বপ্নময় দিনগুলিতে ফিরে যান। পুরনো স্মৃতির ভেতর কিছুক্ষণ মগ্ন হয়ে থাকার পর এখন কে কী করছেন, ছেলেমেয়ে ক'টি, ইত্যাদি খবর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নেন। দেশভাগের পর সব দিক থেকে পরস্পরের চমকপ্রদ ধারাবাহিক সাফল্যের ইতিহাস শুনে দু'জনেই মুগ্ধ এবং খুশি। অবশ্য অম্বিকার কথা মণিমোহনের কাছে আগেই জেনেছেন আলতাফ।

একসময় আলতাফ বলেন, 'সন্ধেবেলা গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি। চলে আসবে কিন্তু। রাত্তিরে একসঙ্গে ডিনার খাব। আমার ছেলেরা, ছেলের বৌরা, আমার স্ত্রী, তুমি, আমি—সবাই মিলে জমিয়ে আড্ডা দেওয়া যাবে।'

আলতাফ বলেন, 'আজ তো যেতে পারব না ভাই।'

'কেন?'

'মণিমোহন খেতে বলেছে। তার ওখানে যেতে হবে।'

'মণিমোহনের সঙ্গে দেখা হয়েছে নাকি?'

'না। খবরের কাগজে আমার চিঠি দেখে কিছুক্ষণ আগে ফোন করেছিল।'

'ও, আচ্ছা—'

একটু চুপচাপ।

তারপর আলতাফ হোসেন জিজ্ঞেস করেন, 'মণি এখন কী করছে?'

অম্বিকা পালটা প্রশ্ন করেন, 'কেন তোমার সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে, কিছু বলেনি?'

'না। ওর বাড়িতে গেলে নাকি সব জানতে পারব।'

অম্বিকা উত্তর দিলেন না।

আলতাফ হোসেন এবার বলেন, 'দেশের জন্যে ওর যা স্যাক্রিফাইস তাতে ওর মন্ত্রী-টন্ত্রী হওয়া উচিত। তোমাদের এখানে পার্লামেন্টের মেম্বারদের যেন সংক্ষেপে কী বলা হয়?'

অম্বিকা বলেন, 'এম পি।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, এম পি। সেই রকমই শুনেছিলাম, মনে পড়ছিল না। মণি মিনিস্টার না হোক, এম পি হওয়ায় তো বাধা ছিল না।'

'ও কী হতে পারত, আর কী হয়েছে সে সম্বন্ধে আমি কিছুই বলব না। তবে মণির মতো বিষয়বুদ্ধিহীন, আন-প্র্যাকটিক্যাল লোক জীবনে আর দু'টি দেখলাম না। ওর স্বভাবে অ্যাডজাস্টমেন্ট বলে কোনও শব্দ নেই।'

আলতাফ আর কোনও প্রশ্ন করেন না।

ঘন্টা চারেক পর টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপোর কাছে নবীন হালদার রোডে মণিমোহনদের পুরনো শ্যাওলা ধরা নোনা-লাগা একতলা বাড়িটার সামনে এসে ট্যাক্সি থেকে আলতাফ যখন নামলেন, কলকাতার ওপর নভেম্বরের সন্ধে নেমে গেছে।

মণিমোহন তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ট্যাক্সির আওয়াজ শুনে বাইরে বেরিয়ে আসেন।

পঁয়তাল্লিশ বছর আগের যুবক মণিমোহন আর যুবক আলতাফ হোসেনের চেহারা এতদিনে আগাগোড়া বদলে গেছে। এখানে এই সময়ে আসার কথা জানা না থাকলে কেউ কাউকে চিনতেই পারতেন না।

পরস্পরের দিকে কিছুক্ষণ দু'জনে তাকিয়ে থাকেন। আলতাফের স্বাস্থ্য এই বয়সেও যথেষ্ট ভাল কিন্তু মণিমোহনের শরীর একেবারেই ভেঙে গেছে। রোগা, কৃশ, ভগ্নস্বাস্থ্য মণিমোহনকে লক্ষ করতে করতে মন খুব খারাপ যায় আলতাফের।

একসময় মণিমোহন বলেন, 'আলতাফ?'

আলতাফ হোসেন আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন, 'হ্যাঁ।'

'এস।' আলতাফের একখানা হাত ধরে বাড়ির ভেতর নিয়ে যেতে যেতে মণিমোহন বলেন, 'কতদিন পর তোমাকে দেখলাম। ভাবতেই পারিনি তুমি আমাদের মনে করে রাখবে!'

আলতাফ বলেন, 'কী যে বল! জীবনের তিরিশটা বছর একসঙ্গে কাটিয়েছি। এখন

না হয় আমরা দুই দেশের নাগরিক। তাই বলে বন্ধুত্বটা ভুলে যাব? কিন্তু—'

'কী?'

'এ কী চেহারা হয়েছে তোমার!'

মণিমোহন সামান্য হাসেন, উত্তর দেন না।

রাস্তার ওপর সদর দরজা। ভেতরে ঢুকলে প্রথমে ইট বিছানো খানিকটা ফাঁকা উঠোন। তার বাঁ-ধারে কলতলা, স্নানের জায়গা, রান্নাঘর। সামনের দিকে পর পর তিনখানা বেড-রুম, একটা টালির চালের টানা বারান্দা সেগুলোর সামনে দিয়ে চলে গেছে।

বাড়িতে ঢুকে মণিমোহন গলার স্বর একটু উঁচুতে তুলে ডাকতে থাকেন, 'সোনা—এই সোনা, তোর আলতাফ কাকু এসে গেছে।'

সবগুলো বেডরুমে এবং রান্নাঘরে আলো জ্বলছিল। একটি সাতাশ আটাশ বছরের ভারি সুশ্রী মেয়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে। আলতাফকে প্রণাম করে মণিমোহনকে বলে, 'বাবা, তুমি কাকুকে তোমার ঘরে নিয়ে যাও। যান কাকু, আমি আসছি।'

আলতাফ বাড়িতে ঢুকেই লক্ষ করেছেন বাইরের মতোই ভেতরটাও জরাজীর্ণ। দেওয়াল থেকে পলেস্তারা খসে গেছে। বেশ ক'টা জানালার পাল্লা ভাঙা। দরজাগুলোও পুরোপুরি আস্ত নেই, অদৃশ্য ঘুণপোকারা তাদের আয়ু শেষ করে এনেছে। আরেকটা ব্যাপার তাঁর মনে হয়, বাড়িটা বড় বেশি নিঝুম। মণিমোহন এবং সোনা ছাড়া আর কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। মণিমোহনের সন্তান কি এই একটিই? তাই যদি হয় স্ত্রী মমতা কোথায়? তিনি কি বেঁচে নেই? এতদিন বাদে আলতাফ দেখা করতে এসেছেন, বেঁচে থাকলে হই চই করে নিশ্চয়ই ছুটে আসতেন। কিন্তু—

ভাবনাটা সম্পূর্ণ হল না, তার আগেই মণিমোহন তাঁকে দক্ষিণ দিকের শেষ ঘরখানায় নিয়ে আসেন।

একধারে একটা তক্তাপোষে যে বিছানাটা রয়েছে তার ওপর ধবধবে চাদর টান টান করে পাতা। আরেক ধারে দুটো পুরনো কাচের আলমারিতে প্রচুর বই। ঘরের মাঝখানে গদিওলা চারটে বেতের চেয়ার আর একটা কাঠের সেন্টার টেবল। চেয়ারের গদিগুলোর ওয়াড় আর সেন্টার টেবলের ওপরকার ফর্সা টেবল ক্লথ দেখে মনে হল আজই সেগুলো পালটানো হয়েছে। বিছানার চাদরটাও তাই। আলতাফ আসবেন বলেই হয়তো যতটা সম্ভব ফিটফাট রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মণিমোহন বললেন, 'বসো ভাই—'

দু'জনে মুখোমুখি বসে পড়েন।

আলতাফ বেশ দ্বিধান্বিতভাবে বলেন, 'তুমি আর সোনা ছাড়া বাড়িতে কি আর কেউ নেই?'

মণিমোহন বলেন, 'বড় ছেলে আছে, তবে না থাকার মধ্যেই।'

'কেন?'

'অত তাড়া কিসের? আছ তো কিছুক্ষণ। সব জেনে যাবে।'

'মমতাকে তো দেখছি না।'

এবার বিষণ্ণ হাসেন মণিমোহন। বলেন, 'না, তুমি আগের মতোই আছ দেখছি। ধৈর্য বড় কম।' একটু থেমে বলেন, 'মমতার ক্যানসার। চারমাস হাসপাতালে পড়ে আছে। আসছে মাসে অপারেশন হবে। আদৌ বাড়ি ফিরে আসবে কিনা কে জানে।'

আলতাফ চমকে ওঠেন, 'বল কী!'

মণিমোহন বলেন, 'এতেই ঘাবড়ে গেলে? আমার পারিবারিক ইতিহাস সবটা শুনলে কী করবে জানি না। না শোনাই ভাল আলতাফ। দু-চারদিনের জন্যে কলকাতায় এসেছ। মন ভারাক্রান্ত করে কী লাভ? তার চেয়ে অন্য গল্প করা যাক।'

রুদ্ধ স্বরে আলতাফ বলেন, 'না, তুমি বল। আমি শুনব।'

এইসময় সোনা চা বিস্কুট এবং ডালমুট নিয়ে আসে। বলে, 'কাকা, বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে, এখন একটু চা খান। আধ ঘণ্টার ভেতর আমার রান্না হয়ে যাবে। রাতের খাওয়া ক'টায় খান?'

আলতাফ বুঝতে পারছিলেন মমতা অসুস্থ হওয়ার পর এই বাড়ির যাবতীয় দায়িত্ব এখন সোনার। তুলনামূলকভাবে নিজের মেয়েদের কথা মনে পড়ে যায়। লেখাপড়া ছাড়া সংসারের একটা কাজও তাদের করতে হয়নি। তারপর তো বিয়েই হয়ে গেল। দুই মেয়েরই শ্বশুরদের অঢেল টাকা। তাছাড়া তাদের নিজেদের প্রফেসনেও প্রচুর আয়। কাজেই সংসারের একটি কুটোও তাদের নাড়তে হয় না। মণিমোহনের এই মধুর স্বভাবের মেয়েটিরও তো জীবন তেমন মসৃণ এবং সুখকর হতে পারত।

আলতাফ বিষণ্ণ একটু হাসেন। বলেন, 'আমার জন্যে তোমার খুব কষ্ট হল তো?'

সোনার মুখে স্নিগ্ধ হাসি ফোটে। বলে, 'রান্নার কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ, মানে—'

'বা রে, আমাদের জন্যে রাঁধতে হয় না? কি, বললেন না কখন খাবেন?'

'তুমি যখন দেবে তখনই খাব।'

'আচ্ছা—'

সোনা চলে যায়।

মণিমোহন এবার এভাবে শুরু করেন। দেশভাগের পর বাজিতপুরের বাড়ি এবং চাষের জমি বিক্রি করে যে টাকা পেয়েছিলেন তা দিয়ে টালিগঞ্জের এই বাড়িটা কিনেছেন। দেশের জন্য জেল খাটার কারণে অনেক সুযোগ সুবিধা পাওয়া যেত। যেমন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মাসোহারা, পরবর্তীকালে তাম্রপত্র, ইত্যাদি। কিন্তু দেশসেবার নগদ মূল্য তিনি নিতে চাননি। একটু চেষ্টা চরিত্র করলে সে আমলে ইলেকশানে দাঁড়িয়ে এম এল এ হওয়া যেত। কিন্তু স্বাধীনতার পরের রাজনীতির চেহারা দেখে তিনি চমকে গিয়েছিলেন। ব্রিটিশ আমলে যে সব মানুষ দেশের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন, জেলখানার অন্ধকারে কাটিয়ে দিয়েছেন বছরের পর বছর, অকাতরে সহ্য করেছেন কলোনিয়ান মাস্টারদের যাবতীয় বর্বর নির্যাতন, তাদের সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে এল ধূর্ত ধুরন্ধরদের একটা দল। দেশের জন্য একটা দিনও এরা

জেল খাটেনি, ত্যাগ করেনি এক কানাকড়িও। এদের একমাত্র লক্ষ্য স্বাধীন ভারতের ক্ষমতাদখল আর অর্থ। মণিমোহন বুঝতে পারছিলেন, এই পোস্ট-ইন্ডিপেনডেন্স পেট্রিয়টদের সঙ্গে তাঁর পক্ষে মানিয়ে চলা অসম্ভব। তিনি ধীরে ধীরে রাজনীতি থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন। কিন্তু যেটা সবচেয়ে বিস্ময়কর এবং বেদনাদায়ক তা হল তাঁর মতো অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামীই এই সব চতুর ক্ষমতালিপ্সু নতুন দেশসেবকদের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করে কাজ গুছিয়ে নিয়েছেন।

পুরোনো যাঁরা তখনও ক্ষমতায় ছিলেন তাঁদের একজন অবশ্য মণিমোহনকে একটা চাকরি যোগাড় করে দিয়েছিলেন কিন্তু সেখানেও তিন চার বছরের বেশি তিনি টিকতে পারেননি, কেননা তাঁর সেই অফিসটায় ছিল রমরমা ঘুষের বাজার। প্রতিবাদ জানিয়ে চাকরিটা ছেড়ে দেন। এরপর আরও দু'চার জায়গায় কাজ করেছেন। সর্বত্র এক হাল। সাহসী, আপসহীন এই মানুষটি কোথাও নিজেকে মানাতে পারেননি।

পরাধীন ভারতের জেলখানায় বসে মণিমোহনের মতো মানুষেরা একদা স্বপ্ন দেখতেন স্বাধীনতার পর এ দেশের নাগরিকেরা হবে সৎ, নির্লোভ, পরিচ্ছন্ন। ভারতবর্ষের এমন একটা উজ্জ্বল ভাবমূর্তি গড়ে উঠবে যা সারা পৃথিবীকে অবাক করে দেবে। কিন্তু সব দেখেশুনে হতাশ, বিপর্যস্ত মণিমোহন নিজেকে একেবারে গুটিয়ে নিলেন। তবে কিছু তো একটা করতে হবে। শেষ পর্যন্ত ছেলেমেয়ে পড়াতে শুরু করলেন। দু'বেলা দু ব্যাচ ছাত্রছাত্রী বাড়িতে এসে পড়ে যায়। এটাই কয়েক বছর ধরে তাঁর জীবিকা।

মমতা অবশ্য সরকারি চাকরি পেয়েছিলেন এমন একটা ডিপার্টমেন্টে যেখানে ঘুষের সুযোগ নেই। নইলে মণিমোহনের যোগ্য স্ত্রী হিসেবে কাজটা ছেড়ে দিতে হ'ত। বছর পাঁচেক আগে রিটায়ার করেছেন তিনি। তাঁর পেনসনের টাকাটা এই সংসারের একটা বড় ভরসা।

মণিমোহনদের তিন ছেলেমেয়ে। দুই ছেলের পর একমাত্র মেয়ে সোনা। বড় ছেলে প্রণব লেখাপড়ায় ছিল অসাধারণ, স্কুল ফাইনাল আর হায়ার সেকেন্ডেরিতে স্ট্যান্ড করেছিল। কিন্তু বি. এসসি পড়তে পড়তে সত্তর দশকের উত্তাল রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। পুলিশের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াইতে দুই পায়ে গুলি লেগেছিল। কয়েক মাস হাসপাতালে কাটাবার পর পা দুটো খুইয়ে কিছুদিনের জন্য জেল খাটে, তারপর বাড়িতে এসেছে। তার নড়াচড়ার উপায় নেই।

ছোট ছেলে রাজীব ছাত্র হিসেবে মোটামুটি ভালই, তবে খুবই স্বার্থপর, কেরিয়ারিস্ট। অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্সে এম. এসসি করার পর একটা স্কলারশিপ যোগাড় করে কানাডায় চলে যায়। সেখানে ডক্টরেট করে ইউনিভার্সিটিতে পড়ায়। সহকর্মী ব্রাজিলের একটি মেয়েকে বিয়ে করে ওখানকার ন্যাশনালিটি নিয়েছে। দেশে আর ফেরার সম্ভাবনা নেই। বাড়ির সঙ্গে কোনওরকম সম্পর্ক রাখে না।

সোনা সবার ছোট। সে বছর চারেক আগে মর্ডান হিস্ট্রিতে এম. এ করেছে। রেজাল্ট মোটামুটি খারাপ নয়, হাই সেকেন্ড ক্লাস। মাঝে মাঝে অন্যের লিভ ভ্যাকান্সিতে নানা কলেজে পড়াচ্ছে কিন্তু পার্মানেন্ট চাকরি এখনও হয়নি। কবে হবে,

আদৌ হবে কিনা কে জানে। মমতার ক্যানসার হওয়ার পর সংসারটা এখন ওর কাঁধে।

শুনতে শুনতে কষ্টও হচ্ছিল, আবার একই সঙ্গে এই স্বার্থহীন, আদ্যোপান্ত সৎ, আদর্শবাদী বন্ধুটির প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছিল আলতাফের।

মণিমোহন বলেন, 'সব চেয়ে বড় সমস্যা কী জানো ভাই, মেয়েটার আটাশ বছর বয়েস হল কিন্তু বিয়ে দিতে পারছি না।'

আলতাফ বেশ অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করেন, 'সোমা এত শিক্ষিত, এত সুন্দর—বিয়েটা আটকাচ্ছে কিসে?'

'টাকার জন্যে।' বিমর্ষ সুরে বলেন মণিমোহন, 'ভাল ঘরে বিয়ে দিতে হলে যা খরচ করতে হবে সে সামর্থ আমার নেই।'

বিস্ময় বাড়ছিলই আলতাফের। তিনি বলেন, 'কী বলছ মণি! দেশের জন্যে তুমি এত স্যাক্রিফাইস করেছ, তোমার মেয়েকে তো মাথায় করে নিয়ে যাওয়া উচিত।'

মণিমোহন উত্তর দেন না, ম্লান একটু হাসেন শুধু।

আলতাফ ভাবছিলেন, মণিমোহনের যথেষ্ট বয়স হয়েছে, মমতা ক্যানসারে শয্যাশায়ী, রাজনীতি করতে গিয়ে দুই পা খোয়া গেছে প্রণবের, ছোট ছেলের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই—সবই ঠিক, তাই বলে আটাশ বছরের মেয়ে বাপের সংসার আগলে পড়ে থাকবে, তা তো হতে পারে না। লাবণ্য থাকতে থাকতে সোনার বিয়েটা হওয়া দরকার। তিনি একজন সফল অর্থবান মানুষ, সহৃদয়ও। একটা কেন, দশটা মেয়ের বিয়ে তিনি দিতে পারেন। প্রায় বলতে যাচ্ছিলেন, 'তুমি সোনার বিয়ে ঠিক কর। টাকার চিন্তা আমার—' কিন্তু বলতে গিয়েও থমকে যান। যে মানুষ তাম্রপত্র নেননি, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পেনসন ফিরিয়ে দিয়েছেন, দুর্নীতির জন্য একের পর এক চাকরি ছেড়েছেন, তিনি কি অন্যের সাহায্য বা অনুগ্রহ নেবেন?

শেষ পর্যন্ত কথাটা বলা হয় না আলতাফের। খাওয়া-দাওয়ার পর 'আবার আসব' এবং 'তোমাদের সঙ্গে হাসপাতালে মমতাকে দেখতে যাব' ইত্যাদি বলে অনেক রাতে হোটেলে ফিরে গেলেন। মণিমোহনদের জন্যে মনটা বিষণ্ন হয়ে রইল। একজন নিঃস্বার্থ স্বাধীনতা সংগ্রামীর এই পরিণতি তিনি আশা করেননি।

পরদিন সন্ধেবেলায় অম্বিকা দামি ফরেন লিমুজিন পাঠিয়ে আলতাফকে নিউ আলিপুরে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন।

দেশভাগের পর ঢাকার নিও-রিচদের মতোই অম্বিকাদের বাড়ি। চোখধাঁধানো স্থাপত্য, সামনে সবুজ কার্পেটের মতো ঘাসের লন, ফুলের বাগান, দেশি এবং বিদেশি মিলিয়ে ছ'সাতটা গাড়ি।

অম্বিকা দোতলার বিরাট ব্যালকনিতে বসে অপেক্ষা করছিলেন। আলতাফ লিমুজিন থেকে নামতেই নিচে নেমে এলেন। বাল্যবন্ধুকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ওপরের বিশাল ড্রইং রুমে নিয়ে যেতে যেতে ডাকাডাকি করে সবাইকে সেখানে আসতে বললেন।

কিছুক্ষণ পর দেখা গেল আলতাফকে ঘিরে জমজমাট আড্ডা বসে গেছে। অম্বিকা

তো আছেনই, তাঁর স্ত্রী নিরুপমা, দুই পুত্রবধূ সুজাতা আর বিপাশা, তিন ছেলে সন্দীপ, দীপক আর রাজেশ তাঁকে ঘিরে বসেছে।

ছেলে আর ছেলের বৌদের প্রথমে বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন অম্বিকা। ছেলে এবং পুত্রবধূরা সবাই খুব কৃতী। তবে ছোট ছেলে রাজেশের এখনও বিয়ে হয়নি। দুই পুত্রবধূই দারুণ সুন্দরী, স্মার্ট, হাসিখুশি এবং উচ্চশিক্ষিত। তাদের ব্যবহারও চমৎকার।

নানা কথার ফাঁকে ফাঁকে উর্দি-পরা দুই বেয়ারা চা কফি কাজুবাদাম কাবাব আর ফিশ ফিঙ্গার দিয়ে যেতে লাগল। পুরনো দিনের স্মৃতিচারণ তো চলছিলই, সেই সঙ্গে এখনকার কলকাতা আর ঢাকার নানা গল্পও হচ্ছিল। সুজাতা আর বিপাশা মাঝে মাঝেই বলছিল, 'কাকা, আপনাদের বাড়ির সবাইকে নিয়ে একবার আসবেন।'

আলতাফ বলছিলেন, 'নিশ্চয়ই। তোমরাও একবার ঢাকায় এস।'

'যাব।'

কথাবার্তা চলছিল ঠিকই কিন্তু বার বার আলতাফের চোখ চলে যাচ্ছিল রাজেশের দিকে। অম্বিকার এই ছোট ছেলেটি সত্যিই সুপুরুষ। ছ'ফিটের মতো হাইট, লম্বাটে মুখ, ধারাল নাক, উজ্জ্বল চোখ, ঘন ভুরু, দৃঢ় চিবুক—সব মিলিয়ে দারুণ বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। রাজেশকে দেখতে দেখতে মাঝে মাঝেই অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলেন আলতাফ।

ড্রইং রুমের আড্ডা ভাঙল রাত দশটায়। তারপর দোতলারই আরেক প্রান্তে প্রকাণ্ড ডাইনিং হলে ডিনার শুরু হল। বাড়ির সবাই আলতাফের সঙ্গে খেতে বসে গেল। অম্বিকার স্ত্রী নিরুপমার ইঙ্গিতে দুই বেয়ারা নিখুঁত যন্ত্রের দক্ষতায় খাবার সার্ভ করতে লাগল।

ড্রইং রুমের আড্ডার মতো হাসিতে গল্পে এবং টুকরো টুকরো মজার কথায় ডিনার জমে উঠল। এখানেও কী এক স্বয়ংক্রিয় নিয়মে আলতাফের চোখ মাঝে মাঝেই রাজেশের মুখে আটকে যাচ্ছিল।

একসময় ডিনার শেষ হল। তারপর আর বসলেন না আলতাফ। অনেক রাত হয়ে গেছে। এখনই হোটেলে ফিরে শুয়ে পড়া দরকার। তিনি খুবই নিয়মানুবর্তী এবং শৃঙ্খলাপরায়ণ। কোনও কারণেই বেশি রাত পর্যন্ত জেগে থাকেন না। তাতে শরীর খারাপ হয়।

আলতাফ অম্বিকাকে বললেন, 'এবার আমি যাব। কিন্তু—'

অম্বিকা উৎসুক চোখে বন্ধুর দিকে তাকান, 'কী?'

'তোমার সঙ্গে একটা জরুরি কথা আছে।'

'বেশ তো, বল।'

'এখন না। কাল তুমি একবার আমার হোটেলে আসতে পারবে?'

'কখন?'

'আমার তো এখানে কোনও কাজকর্ম নেই। সব সময় ফ্রি। তোমার কখন সময় হবে?'

একটু ভেবে অম্বিকা বলেন, 'ধর সকালের দিকে, ন'টা নাগাদ। ফ্যাক্টারিতে যাবার আগে তোমার হোটেল হয়ে আসব।'

আলতাফ বলেন, 'চলে এস।'

পরদিন ঠিক ন'টাতেই অম্বিকা এলেন।

এলোমেলো কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর আলতাফ বলেন, 'এবার কাজের কথাটা শুরু করা যাক।'

অম্বিকা হেসে হেসে বলেন, 'আমি প্রস্তুত।'

'পরশু আমি মণির বাড়ি গিয়েছিলাম।'

'সে তো জানি।'

একটু চুপ করে থেকে আলতাফ বলেন, 'ওদের সম্বন্ধে সব খবর নিশ্চয়ই তোমার জানা আছে।'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন অম্বিকা।

আলতাফ বলেন, 'বন্ধু হিসেবে ওর ব্যাপারে তোমার কিছু করা উচিত।'

অম্বিকা বলেন, 'এই কথাটা আমি বহুবার ভেবেছি। কিন্তু তুমিও তো ওর ছেলেবেলার বন্ধু। ওকে ভাল করেই চেনো। কারও সাহায্য ও নেবে না।'

'আমি আর্থিক সাহায্যের কথা বলছি না।'

'তা হলে?'

উত্তর না দিয়ে সোজা অম্বিকার চোখের দিকে তাকান আলতাফ। তারপর বলেন, 'আমার একটা কথা রাখবে?'

ভেতরে ভেতরে একটু থমকে যান অম্বিকা। ধীরে ধীরে বলেন, 'আগে শুনি, তারপর তো রাখার কথা।'

'মণির মেয়েটি চমৎকার। মডার্ন হিস্ট্রিতে এম. এ। দেখতে ভাল। তোমার ছোট ছেলের সঙ্গে ভাল মানাবে। আমার ইচ্ছে ওদের বিয়ে হোক।'

অম্বিকার মুখ গম্ভীর হয়ে যায়। আবেগহীন ভারী গলায় বলেন, 'তা হয় না আলতাফ।'

এই জবাবটা যেন প্রত্যাশিত ছিল না। আলতাফ চকিত হয়ে বলেন, 'কেন?'

'মণির আর আমার ফ্যামিলি স্টেটাস এক নয়। এ বিয়ে সুখের হবে না।'

'কী বলছ তুমি! মণি দেশের জন্যে কত স্যাক্রিফাইস করেছে। লোকে তাকে সম্মান করে। টাকা না থাকলেও মর্যাদা তো আছে।'

'মণি ঝোঁকের মাথায় কবে কী করেছিল সে সব কেউ মনে করে রাখেনি। স্বাধীনতা সংগ্রামের সেন্টিমেন্ট নিয়ে মানুষ আজকাল মাথা ঘামায় না।'

আস্তে আস্তে হাত ছাড়িয়ে নিতে নিতে অম্বিকা বলেন, 'আমাকে জোর করো না ভাই। তুমি বিদেশী। দু-চারদিনের জন্যে ইন্ডিয়ায় এসেছ। গল্প কর, আড্ডা মারো। এসবের মধ্যে থেকো না।'

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকেন আলতাফ। তারপর রুদ্ধ গলায় বলেন, 'আমি বিদেশী! আরে তাই তো, ঝোঁকের মাথায় সীমা পার হয়ে গিয়েছিলাম। ঠিক বুঝতে পারিনি কতদূর এগুনো উচিত।'

অম্বিকা উত্তর দেন না। হঠাৎ ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, 'ফ্যাক্টরিতে যেতে হবে। আচ্ছা চলি—'

আর একবার

এই সতেরো তলা হাই-রাইজ বিল্ডিংটার টপ ফ্লোরে সুশোভনের ফ্ল্যাট। এখানে যে কোনও জানালায় দাঁড়ালে বিশাল আকাশ চোখে পড়ে। কলকাতার মাথার ওপর যে এত বড় একটা আকাশ ছড়িয়ে আছে, এখানে না এলে টের পাওয়া যায় না।

বেশ কিছুক্ষণ আগেই সকাল হয়েছে। শীতের মায়াবী রোদে মেঘশূন্য আকাশটাকে অলৌকিক মনে হচ্ছে।

ক'টা শঙ্খচিল অনেক উঁচুতে, আকাশের নীলের কাছাকাছি, ডানা মেলে অলস ভঙ্গিতে হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে। সব মিলিয়ে কোনও জাপানি চিত্রকরের আঁকা একটি ছবি যেন।

বেডরুমে সিঙ্গল-বেড খাটে হেলান দিয়ে দূরমনস্কর মতো আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে সুশোভন। হাতের কাছে একটা টি-পয় টেবলে সাজানো রয়েছে আজকের মর্নিং এডিশনের সবগুলো খবরের কাগজ, অ্যাশ-ট্রে, সিগারেটের প্যাকেট, লাইটার আর এক কাপ চা।

কুক-কাম-বেয়ারা সতীশ ঘন্টাখানেক আগে খবরের কাগজ-টাগজ দিয়ে গেছে কিন্তু একটা কাগজেরও ভাঁজ খুলে এখন পর্যন্ত দেখেনি সুশোভন। মেটালের অ্যাশ-ট্রে'টা ঝকঝকে পরিষ্কার, পোড়া সিগারেটের টুকরো বা ছাই কিছুই তাতে নেই। এমন কি, সতীশ যেভাবে চা দিয়ে গিয়েছিল ঠিক সেই ভাবেই পড়ে আছে। কাপে একটা চুমুকও দেয়নি সুশোভন। চা জুড়িয়ে জল হয়ে গেছে। ক'দিন ধরে এভাবেই তার সকালটা কাটছে।

অনেকটা সময় আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকার পর আস্তে আস্তে চোখ নামায় সুশোভন। একটানা একভাবে বসে থাকার কারণে কোমরে খিঁচ ধরার মতো একটু ব্যথা ব্যথা লাগছে। অর্থাৎ ব্লাড-সার্কুলেশনটা ঠিকভাবে হচ্ছে না। রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করতে হাত-পা টান টান করে বাঁ দিকে সামান্য কাত হল সুশোভন। আর তখনই ওধারের বেডরুমে মণিকাকে দেখতে পেল। তার আর মণিকার শোবার ঘরের মাঝখানে যে দরজাটা রয়েছে সেটা আধাআধি খোলা। সুশোভন দেখল, মণিকা তারই মতো সিঙ্গল-বেড খাটে হেলান দিয়ে আকাশ দেখছে। তার পাশের টি-পয় টেবলেও চা জুড়িয়ে ওপরে সর পড়ে গেছে।

মাসখানেক ধরে রোজ সকালে সুশোভন এবং মণিকার ঘরে এই একই দৃশ্য চোখে পড়ে।

সপ্তাহের অন্য সব দিন অবশ্য এভাবে সুশোভনকে বেশিক্ষণ বসে থাকতে হয় না। কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে ন'টায় অফিসের গাড়ি এসে যায়। তার আগেই শেভ করে, স্নান এবং ব্রেকফাস্ট চুকিয়ে রেডি হয়ে থাকতে হয়। লাঞ্চের সময় সে ফ্ল্যাটে ফেরে না। ওটা অফিসেই সেরে নেয়।

আজ রবিবার। সপ্তাহের কাজের দিনগুলো প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যে কেটে যায়। কিন্তু ছুটির দিন নিয়েই যত সমস্যা। সময় আর কাটতে চায় না তখন। রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে অপরিচিত যাত্রীদের মতো পাশাপাশি ঘরে তারা চুপচাপ বসে থাকে।

অবশ্য এরকম অস্বাভাবিক গুমোট আবহাওয়া খুব বেশিদিন থাকবে না। এ সপ্তাহেই যে কোনও সময় এলাহাবাদ থেকে মণিকার দাদা অমলের আসার কথা আছে। সে তার বোনকে নিয়ে যেতে আসছে। মণিকা সেই যে চলে যাবে, তার আর ফেরার সম্ভাবনা নেই। সেটাই হবে সুশোভনের জীবন থেকে তার চিরবিদায়। তারপর আনুষ্ঠানিক ভাবে কোর্টে গিয়ে ডিভোর্সের জন্য দরখাস্ত করবে। ঝগড়াঝাঁটি, হই চই বা পরস্পরের দিকে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি নয়, শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয়ে যাবে দু'জনের চার বছরের ক্ষণস্থায়ী দাম্পত্য জীবন।

অথচ সুশোভন এবং মণিকা, দু'জনেই ভদ্র, শিক্ষিত। তাদের ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউণ্ডও চমৎকার। তবুও তাদের মধ্যে বনিবনা বা অ্যাডজাস্টমেন্ট ঘটেনি। অমিলের কারণ বা বীজটি রয়েছে তাদের চরিত্রের মধ্যে।

মণিকা খুবই শান্ত, স্বল্পভাষী এবং ইনট্রোভার্ট ধরনের মেয়ে। সে কথা বললে দশ ফুট দূরের লোক শুনতে পায় না। জোরে টিভি বা রেডিও চালায় না সে। চলাফেরার সময় এত আস্তে পা ফেলে যে শব্দই হয় না। চা খায় আলতো চুমুকে—নিঃশব্দে।

বিয়ের পর এই চারটে বছর বাদ দিলে আজন্ম এলাহাবাদেই কেটেছে মণিকার। কলকাতার বাইরে বাইরে নানা প্রভিন্সের নানা জাতের মানুষের কসমোপলিটান পরিবেশে বড় হয়ে উঠলেও সে রীতিমত রক্ষণশীল ধরনের মেয়ে। তাদের বাড়ির আবহাওয়াতেও এই রক্ষণশীলতার ব্যাপারটা রয়েচে। তার মা-বাবা বা ভাই-বোনের কেউ পুরনো ধাঁচের পারিবারিক কাঠামো ভেঙে বৈপ্লবিক কিছু ঘটাবার কথা ভাবতে পারে না। তার বাপের বাড়িতে মদ ঢোকে না। ড্রিংক করাটা সেখানে ট্যাবু। উনিশ শতকের সুখী যৌথ পরিবার যেভাবে চলত সেই চালেই তাদের বাড়ি চলছে। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানো ছাড়া সেখানে বিশেষ কোনও পরিবর্তনের ছাপ পড়েনি।

সুশোভনদের ফ্যামিলি একেবারে উলটো। হই চই, পার্টি, ড্রিংক, ওয়েস্টার্ন পপ মিউজিক, কেরিয়ারের জন্য যতদূর দরকার নামা—এসব নিয়ে তারা মেতে আছে। জয়েন্ট ফ্যামিলিতে তাদের আস্থা নেই। ছেলেরা চাকরি-বাকরিতে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে সুশোভনের বাবা তাদের আলাদা করে দিয়েছেন। 'নিজের নিজের সংসার বুঝে নাও এবং সুখে থাকো। অন্যের দায় বা সাহায্য, কিছুই নেবার প্রয়োজন নেই। এতে সম্পর্ক

ভাল থাকবে।' মোটামুটি এটাই হল তাঁর জীবনদর্শন এবং ছেলেদের প্রতি অমূল্য উপদেশ।

এই ফ্যামিলির ছেলে হবার ফলে উত্তরাধিকার সূত্রে পারিবারিক ট্র্যাডিশানের সব কিছুই পেয়েছে সুশোভন। সে একটা নাম-করা অ্যাড কোম্পানির টপ একজিকিউটিভ। বড় বড় ফার্মের হয়ে তারা বিজ্ঞাপনের পরিকল্পনা তো করেই, তাছাড়া প্রচুর অ্যাড-ফিল্মও তুলতে হয়।

আজকাল অগুনতি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কোম্পানি গজিয়ে উঠেছে। কমপিটিশন প্রচণ্ড। বড় বড় ক্লায়েন্টদের হাতে রাখতে হলে প্রায়ই পার্টি দিতে হয়। শুধু হোটেল বা 'বার'-এ নয়, বাড়িতে ডেকেও মাঝে মাঝে ড্রিংকের আসর বসাতে হয়। এমন কি বড় কোম্পানি ধরে রাখতে হলে অনেক সময় জায়গামতো টাকাপয়সাও দিতে হয়। কারও কারও যুবতী সুন্দরী মেয়ে সম্পর্কে দুর্বলতা রয়েছে। কাজেই দরকারমতো তারও ব্যবস্থা করতে হয়। যে ছেলেমেয়েদের নিয়ে অ্যাড-ফিল্ম তোলা হয়, তারা তো প্রায়ই সুশোভনদের ফ্ল্যাটে এসে হানা দেয়। যতক্ষণ তারা থাকে চড়া সুরের ওয়েস্টার্ন মিউজিকের সঙ্গে হুল্লোড় চলে।

জীবন সম্পর্কে ধ্যানধারণা, রুচি, কালচার, কোনও কিছুতেই সুশোভন আর মণিকার মধ্যে এতটুকু মিল নেই। তবু তাদের বিয়েটা হয়ে গিয়েছিল। প্রেমের বিয়ে নয়। দুপক্ষেরই এক আত্মীয় যোগাযোগটা ঘটিয়ে দিয়েছিল।

বিয়ের পর কলকাতায় এসে দু-চারদিন কাটাতে না কাটাতেই চমকে উঠেছিল মণিকা। সুশোভনের বন্ধুবান্ধব বা বড় বড় কোম্পানির একজিকিউটিভ এবং তাদের স্ত্রীরা প্রায়ই আসত। সতীশ হুইস্কি-টুইস্কি বার করে দিত। যে মহিলারা আসত তারাও পাঁড় মাতাল। পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তারা রাম কি হুইস্কি খেত।

এমন দৃশ্য আগে আর কখনও দেখেনি মণিকা। সে শিউরে উঠত। অন্য একটা ঘরে ঢুকে দম বন্ধ করে সিঁটিয়ে বসে থাকত। সুশোভন এসে ডাকাডাকি করত, 'কী হল? ওঁরা তোমার জন্যে ওয়েট করছেন—এস।' মণিকা জানাতো, মদের আসরে সে যাবে না। কাকুতি-মিনতি করেও ফল কিছুই হ'ত না। সুশোভন বলত, 'ওঁরা কী ভাবছেন বল তো?' মণিকা বলত, 'যা খুশি ভাবুক। বাড়িতে 'বার' না বসালেই কি হয় না?' সুশোভন কৈফিয়তের ভঙ্গিতে বলত, 'কী করব বল। দিস ইজ আ পার্ট অফ মাই জব। আমার কেরিয়ার, আমার ফিউচারের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। প্লিজ এস, ফর মাই সেক।'

প্রথম প্রথম কিছুতেই মদের আসরে যেত না মণিকা। পরে অনিচ্ছাসত্ত্বেও খানিকটা অ্যাডজাস্ট করে নিয়েছিল। সুশোভনের বন্ধুবান্ধব এবং তাদের স্ত্রীরা এলে সে ওদের সামনে যেত ঠিকই, তবে হুইস্কির ছোঁয়া বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলত। অবশ্য সঙ্গ দেবার জন্য হাতে একটা সফট্ ড্রিঙ্কের গেলাস রাখত।

সুশোভনের বন্ধুরা বলত, 'একটু হুইস্কি টেস্ট করুন ম্যাডাম। পুরাকালের ঋষি-টিষিরাও সোমরস পান করতেন। জিনিসটা খুব অস্পৃশ্য নয়।'

মণিকা উত্তর দিত না।

বন্ধুরা আবার বলত, 'আফটার ডেথ যখন ওপারে যাবেন তখন ব্রহ্মা বিষ্ণুরা এক্সপ্লেনেশন চাইবে—মা জননী, ওয়ার্ল্ডে যে তোমাকে পাঠালাম, হুইস্কিটা টেস্ট করে এসেছ তো? তখন কী উত্তর দেবেন? মানব জীবনটা এভাবে নষ্ট হতে দেবেন না ম্যাডাম।'

মণিকা আবারও চুপ।

বন্ধুদের স্ত্রীরা বলত, 'তোমার মতো পিউরিটান মেয়ে লাইফে দেখিনি। ড্রিংক করলে ক্যারেক্টার নষ্ট হয় না।'

এসব কথারও উত্তর দেওয়া দরকার মনে করত না মণিকা। মনের দিক থেকে সায় না থাকলেও দাম্পত্য জীবনের খাতিরে দাঁতে দাঁত চেপে এসব মেনে নিতে হ'ত তাকে। তবে কম বয়সের ছেলেমেয়েদের লেভেলে নেমে তাদের সঙ্গে সমান তালে সুশোভন যখন হুল্লোড় করত তখন অসহ্য লাগত।

ভেতরে ভেতরে বারুদ একটু একটু করে জমছিলই। কিন্তু বিস্ফোরণটা ঘটল দেড়-দু'ই বছর আগে। মণিকা যেদিন জানতে পারলে, কাজটাজ বাগাবার জন্য সুশোভন কাউকে ঘুষ দেয়, কাউকে কাউকে সঙ্গ দেবার জন্য সুন্দরী যুবতী যোগাড় করে—তখন তার মাথায় আগুন ধরে গিয়েছিল। যা কখনও সে করে না, যা তার স্বভাবের বাইরে, ঠিক তাই করে বসেছিল। উত্তেজিত মুখে চিৎকার করে বলেছিল, 'তুমি ঘুষ দাও?'

স্থির চোখে অনেকক্ষণ স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থেকেছে সুশোভন। বলেছে, 'ঘুষ না, গিফট।'

'একই বস্তু। আর ওই মেয়েদের ব্যাপারটা?'

'নাথিং নাথিং—' টোকা দিয়ে গা থেকে পোকা ঝাড়ার মতো ভঙ্গি করে বলেছিল সুশোভন।

দাঁতে দাঁত চেপে মণিকা বলেছিল, 'নাথিং বলে উড়িয়ে দিলে চলবে না।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে, দুই হাত উলটে সুশোভন হালকা গলায় বলেছিল, 'এ নিয়ে তোমায় মাথা ঘামাতে হবে না। খুব সিম্পল ব্যাপার। কেউ কেউ মেয়েদের কোম্পানি পছন্দ করে। এই একটু গল্প-টল্প করতে চায়। জাস্ট আ টেণ্ডার ফেমিনিন টাচ।'

সোজাসুজি সুশোভনের চোখের দিকে তাকিয়ে মণিকা চাপা অথচ কঠিন গলায় বলেছে, 'এসব তোমাকে ছাড়তে হবে।'

হাসির একটা পলকা ভঙ্গি করে সুশোভন বলেছে, 'কী যে বল, তার কোনও মানে হয় না।'

'নিশ্চয়ই হয়। আমি চাই না, আমার স্বামী কেরিয়ারের জন্য এত নিচে নামুক।'

'নিচে নামানামির কী আছে! দিস ইজ আ পার্ট অফ আওয়ার লাইফ।'

'এ ধরনের লাইফের দরকার নেই আমার। তোমার সম্পর্কে আমার শ্রদ্ধা নষ্ট হতে দিও না।'

মণিকার কণ্ঠস্বরে এমন এক দৃঢ়তা ছিল যাতে সুশোভন চমকে উঠেছে। বলেছে, 'একটা তুচ্ছ বাজে ব্যাপার দেখছি তোমার মাথায় ফিক্সেশানের মতো আটকে গেছে। আজকাল র‍্যাট রেসে টিকে থাকতে হলে, জীবনে ওপরে উঠতে হলে, মানুষকে অনেক কিছু করতে হয়।'

'খুব বেশি রাইজ আর অনেক টাকার দরকার কী? ভদ্রভাবে চলে গেলেই হল।'

সুশোভন বোঝাতে চেষ্টা করেছে, তার বন্ধুবান্ধবরা টাকা পয়সার জন্য, প্রোমোশনের জন্য কত কী করে বেড়াচ্ছে। তাদের স্ত্রীরা এই নিয়ে মণিকার মতো খিটিরমিটির তো করেই না, বরং রীতিমত উৎসাহই দেয়।

মণিকা বলেছে, 'তোমার দুর্ভাগ্য, আমি তোমার বন্ধুর স্ত্রীদের মতো উপযুক্ত সহধর্মিণী হতে পারিনি।'

মাথার ভেতরটা এবার গরম হয়ে উঠেছে সুশোভনের। বলেছে, 'দেখ, মস্তিষ্কে নাইনটিনথ্ সেঞ্চুরির কিছু ভ্যালুজ ঢুকিয়ে বসে আছ। ওসব আজকাল একেবারে অচল, টোটালি মিনিংলেস। তোমার বাপু কোনও সাধু-ফাধু টাইপের লোককে বিয়ে করা উচিত ছিল। আমি তোমার লাইফে মিসফিট।'

হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের মতো মণিকা তৎক্ষণাৎ বলেছে, 'বোধহয়। এই বিয়েটা তোমার আমার, কারও পক্ষেই হয়তো ভাল হয়নি।'

এরপর আর কিছু বলার ছিল না সুশোভনের। স্তব্ধ বিস্ময়ে বিমূঢ়ের মতো সে তাকিয়ে ছিল।

ক্রমশ যত দিন গেছে, দু'জনের মধ্যে দূরত্ব বেড়ে যাচ্ছিল। পারস্পরিক শ্রদ্ধা বিশ্বাস বা মমতা বলতে কিছুই প্রায় আর অবশিষ্ট ছিল না। রাত্তিরে এক ঘরে তারা থাকে না। তাদের বিছানা আলাদা হয়ে গেছে। কথাবার্তাও একরকম বন্ধ। সুশোভন ফ্ল্যাটে থাকলে পাশাপাশি দুই ঘরে তারা চুপচাপ বসে থাকে। ইদানীং বেশ কিছুদিন বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে ডাকে না সে। ওদের কারও কিছু দরকার হলে সতীশকে দিয়ে বলায়। সমস্ত ফ্ল্যাট জুড়ে এখন দম বন্ধ-করা আবহাওয়া।

এভাবে মন এবং স্নায়ুর ওপর মারাত্মক চাপ নিয়ে জীবন কাটানো অসম্ভব। এর মধ্যে একদিন মণিকা সোজা তার ঘরে এসে বলেছে, 'তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।'

প্রায় দেড়মাস পর সুশোভনের ঘরে এসেছিল মণিকা। রীতিমত অবাকই হয়ে গিয়েছিল সুশোভন। বলেছিল, 'কী কথা?'

'আমরা যেখানে এসে পৌঁছেছি তাতে নিশ্চয়ই তোমার খুব অসুবিধে হচ্ছে।'

'আমার কথা থাক। অসুবিধাটা বোধহয় তোমারই বেশি। তা কী করতে চাও তুমি?'

'এলাহাবাদ যেতে যাই। দাদাকে চিঠি লিখেছি। কয়েকদিনের ভেতরেই আমাকে নিতে আসবে।'

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে ছিল সুশোভন। তারপর বলেছিল, 'একেবারে নিয়ে যাবার জন্যে চিঠি লিখে ফেললে!' একটু থেমে বলেছিল, 'ঠিক আছে।'

তারপর থেকে শুধু অমলের জন্য অপেক্ষা করে থাকা। আজ কাল পরশু, যে

কোনওদিন সে এসে পড়তে পারে। সুশোভনের বুঝতে অসুবিধা হয় নি, অমলের সঙ্গে সেই যে মণিকা চলে যাবে, আর কোনওদিনই ফিরবে না।

কতক্ষণ আধখোলা দরজার ফাঁক দিয়ে মণিকার দিকে তাকিয়ে ছিল, খেয়াল নেই। আচমকা কলিং বেল বেজে উঠল।

আজকাল তাদের ফ্ল্যাটে বিশেষ কেউ আসে না। বন্ধুবান্ধব, অফিসের কলিগ, অ্যাড-ফিল্মের মডেলেরা—কেউ না। মণিকার সঙ্গে তার সম্পর্কটা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে, মোটামুটি সবাই তারা জেনে গেছে। তাই পারতপক্ষে এধার মাড়ায় না। একটা অস্বস্তিকর আবহাওয়ার ভেতর গিয়ে কী লাভ?

সুশোভন প্রথমটা ভেবেছিল, জমাদার বাথরুম সাফ করতে এসেছে। কিংবা যে ছেলেটা মিল্ক বুথ থেকে দুধ এনে দেয় সে-ও হতে পারে। যে-ই আসুক, বিশেষ কৌতূহল নেই সুশোভনের। ওরা এলে সতীশ দুধ নিয়ে ফ্রিজে রেখে দেবে বা বাথরুম পরিষ্কার করাবে। কাজকর্মে লোকটা দারুণ চৌখস।

একটু পরেই দরজা খোলার আওয়াজ কানে এল। পরক্ষণেই ফ্ল্যাট কাঁপানো চিৎকার, 'সুশোভন কোথায় রে?'

গলার আওয়াজেই টের পাওয়া গেল পরিমল। আস্তে, গলার স্বর নিচু পর্দায় নামিয়ে কথা বলতে পারে না সে। কলেজে সুশোভনের সঙ্গে পড়ত। পরে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে ডিগ্রি নিয়ে চাকরি যোগাড় করে ক'বছর আগে মিডল ইস্টে চলে গিয়েছিল। ওখানে তাদের কোম্পানি কী একটা প্ল্যান্ট বসাচ্ছে। সেখানে পরিমল টপ একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার।

ব্যস্তভাবে খাট থেকে নেমে বাইরে আসতেই সুশোভনের চোখে পড়ে, লিভিং-কাম-ড্রইং রুমে পরিমল আর তার স্ত্রী সুজাতা দাঁড়িয়ে আছে। পরিমলের হাতে একটা মাঝারি সাইজের দামি সুটকেস। তাকে দেখেই সুটকেসটা নামিয়ে রেখে প্রায় দৌড়ে এসে দু'হাত জড়িয়ে ধরল, 'কেমন আছিস রে শালা?'

সেই কলেজ লাইফ থেকেই পরিমলটা দারুণ হুল্লোড়বাজ আর আমুদে। তার মধ্যে কোনওরকম প্যাঁচ বা নোংরামি নেই। ওর স্বভাব অনেকটা দমকা বাতাসের মতো—ও এলেই মনে হয় ঘরের সব বন্ধ দরজা-জানলা খুলে গেল।

পরিমলকে দেখে মনটা খুশি হয়ে গেল সুশোভনের। বলল, 'এই চলে যাচ্ছে। তোরা কেমন আছিস বল।'

'আমরা কখনও খারাপ থাকি না। অলওয়েজ ইন আ জলি গুড মুড। আমাদের মতো স্বামী-স্ত্রী হোল ওয়ার্ল্ডে খুব বেশি খুঁজে পাবি না।' বলে ঘাড় ফিরিয়ে চোখের কোণ দিয়ে স্ত্রীকে দেখতে দেখতে পরিমল বলল, 'না কি বল?'

সুজাতা হাসল, অর্থাৎ স্বামীর কথায় তার পরিপূর্ণ সায় রয়েছে।

বোঝাই যায়, পরিমল এবং সুজাতা দাম্পত্য জীবনে খুবই সুখী। পারফেক্ট আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং বলতে যা বোঝায় তা তাদের রয়েছে। হঠাৎ নিজের আর মণিকার কথা মনে পড়তে অদ্ভুত বিষাদে বুকের ভেতরটা ভরে যেতে লাগল সুশোভনের।

বন্ধুকে ছেড়ে দিয়ে একটা সোফায় বসতে বসতে পরিমল বলল, 'অনেকদিন পর তোর সঙ্গে দেখা হল। কী ভাল যে লাগছে!'

সুশোভন দাঁড়িয়েই ছিল। একটু ভেবে বলল, 'হ্যাঁ, প্রায় বছর পাঁচেক পর তোকে দেখলাম। এখন যেন তুই মিডল-ইস্টে কোথায় পোস্টেড?'

'কুয়েতে। আমাদের কোম্পানি ওখানে একটা বিরাট এয়ারপোর্ট তৈরি করছে।'

সুশোভন জানত, যাদবপুর থেকে ডিগ্রি নিয়ে বেরুবার পর পরিমল বছর দুই-তিন কলকাতার একটা ফার্মে কাজ করেছে। তারপর চলে যায় বম্বের অন্য একটা কোম্পানিতে। সেই কোম্পানি মিডল-ইস্ট আর আফ্রিকার নানা দেশে বিরাট বিরাট প্রোজেক্ট করেছে। ক'বছর ধরে পরিমল এই সব প্রোজেক্টের কাজে কখনও আবুধাবি, কখনও বাগদাদ, কখনও ত্রিপোলিতে চরকির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাইরে দিনরাত তার এত ব্যস্ততা যে দেশে ফেরার সময়ই পায় না। আগে তবু দেড় দু'বছর পর পর আসতে পারত। ক'বছর আগে একবার সুজাতাকে বিয়ে করতে এসেছিল। এবার তো এল পাঁচ বছর বাদে।

পরিমল বলল, 'এবার একমাসের ছুটি নিয়ে এসেছি। লাস্ট উইকে বম্বে পৌঁছেছি। হেড অফিসে দুটো জরুরি কনফারেন্স ছিল। সে-সব সেরে পরশু মর্নিং ফ্লাইটে এসেছি কলকাতায়। তোকে সারপ্রাইজ দেব বলে ফোন-টোন না করেই চলে এলাম। কতকাল একসঙ্গে থাকি না। এবার তোর এখানে তিন-চার দিন থেকে যাব।' সুটকেসটা দেখিয়ে বলল, 'এই দ্যাখ, একেবারে জামাকাপড় নিয়ে রেডি হয়ে এসেছি।'

সুশোভন চমকে উঠল। পরিমল তার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু। সেই স্কুল-কলেজে পড়ার সময় থেকে যতদিন পরিমল কলকাতায় ছিল, রোজ দু'জনের একবার করে দেখা না হলে চলত না। কতদিন পরিমল তাদের বাড়ি এসে থেকে গেছে, সে-ও গিয়ে থাকত পরিমলদের বাড়ি। কোনওদিন যে তাদের ছাড়াছাড়ি হবে, এ যেন ভাবাই যেত না।

পরিমল তার কাছে ক'দিন থাকবে। সোনার সুতো দিয়ে বোনা যৌবনের সেই দিনগুলো নতুন করে ফিরে আসবে, এর চেয়ে আনন্দের ব্যাপার আর কী হতে পারে। কিন্তু কয়েক দিন না, কয়েকটা মিনিট থাকলেই তার আর মণিকার এখনকার সম্পর্কটা ওদের চোখে ধরা পড়ে যাবে। ভেতরে ভেতরে দারুণ গুটিয়ে গেল সুশোভন। ফ্যাকাসে একটু হেসে কোনওরকমে বলল, 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।'

সুজাতা ওধারের একটা সোফায় এর মধ্যে বসে পড়েছিল। সে এবার বলে উঠল, 'আপনার মিসেস কোথায়? তাঁর তো সাড়াশব্দ পাচ্ছি না। বাড়িতে নেই?'

সুজাতার দিকে তাকাল সুশোভন। গোলগাল আদুরে চেহারা। চোখে মুখে হাসির আভা মাখানো। সে যে সুখী, তৃপ্ত, সেটা যেন তার সর্বাঙ্গে হালকা লাবণ্যের মতো মাখানো রয়েছে।

সুজাতাকে আগে খুব বেশি দেখেনি সুশোভন। পরিমলের বিয়েটা প্রেম-ফ্রেম করে বিয়ে নয়। পুরনো স্টাইলে বাড়ি থেকে মেয়ে দেখে বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মেয়ে দেখার সময় একবার সুজাতাকে দেখেছে সুশোভন। তারপর বিয়ে এবং বৌভাতের দিন। পরে খুব সম্ভব বারদুয়েক। সুজাতার সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ বেশি পাওয়া

যায়নি। যাই হোক, হৃৎপিণ্ড পলকের জন্য থমকে যায় সুশোভনের। কাঁপা দুর্বল গলায় সে বলে, 'বাড়িতেই আছে।'

ওধারের সোফা থেকে প্রায় চেঁচিয়েই ওঠে পরিমল, 'তুই আশ্চর্য ছেলে তো। বৌকে কোথায় গায়েব করে রেখেছিস? ডাক, এক্ষুনি ডেকে আন।'

অগত্যা প্রায় মাসখানেক-মাসদেড়েক বাদে মণিকার বেডরুমের দরজায় এসে দাঁড়াল সুশোভন। দুরমনস্কের মতো এখনও আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে মণিকা। পরিমলরা যে এসেছে, সে কি টের পায়নি?

কয়েক মুহূর্ত দ্বিধান্বিতের মতো তাকিয়ে থাকে সুশোভন। তারপর আস্তে করে ডাকল, 'মণিকা—'

চমকে মুখ ফেরায় মণিকা। রীতিমত অবাকই হয়ে যায়। কতদিন পর সুশোভন তাকে ডাকল, মনে করতে পারল না। জিজ্ঞাসু চোখে সে তাকিয়ে থাকে।

সুশোভন এবার বলল, 'পরিমলকে তো তুমি চেন।'

মণিকা মাথা নাড়ল—চেনে। যদিও তার বিয়ের পর দু-একবার মাত্র পরিমলকে দেখেছে। অবশ্য সে যে সুশোভনের প্রাণের বন্ধু, এ খবর তার অজানা নয়।

সুশোভন বলল, 'পরিমল ওর স্ত্রীকে নিয়ে এসেছে। ড্রইং রুমে বসে আছে। ওরা ক'দিন আমাদের এখানে থাকবে।'

মণিকার চোখে মুখে চাঞ্চল্য ফুটে উঠল কিন্তু এবারও কিছু বলল না সে।

সুশোভন গলার ভেতর একটু শব্দ করল। তারপর ইতস্তত করে বলল, 'আমার একটা অনুরোধ রাখবে?'

মণিকা আবছা গলায় বলল, 'কী?'

'আমাদের মধ্যে যা-ই হয়ে থাক না, পরিমলরা যেন বুঝতে না পারে। ওরা যে ক'দিন থাকে একটু অ্যাডজাস্ট করে নিও। আই মীন—' বলতে বলতে থেমে যায় সুশোভন। তার দু'চোখে অনুনয়ের ভঙ্গি ফুটে ওঠে। অর্থাৎ বাইরের লোকজনের সামনে পরস্পরের তিক্ত সম্পর্কটা যাতে বিস্ফোরণের মতো ফেটে না পড়ে সেই জন্যই সুশোভনের এই কাকুতি-মিনতি।

মণিকা এক পলক ভেবে নিল। আর ক'দিন বাদেই দাদা এলে সে তো এলাহাবাদ চলে যাচ্ছেই। তার আগে দু-চারটে দিন সুখী দম্পতির রোলে অভিনয় করলই না হয়। যে সম্পর্ক চিরকালের মতো শেষ হয়ে যাচ্ছে, যার আর জোড়া লাগার বিন্দুমাত্র সম্ভবনা নেই, খুশি মুখে পরিতৃপ্ত ভঙ্গিতে কয়েকটা দিনের জন্য তার জের টেনে চলতে হবে। এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের ডিভোর্স হয়নি, আইনের চোখে এখনও তারা স্বামী-স্ত্রী। এ সবই ঠিক, তবু মনে মনে তারা বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য প্রস্তুত হয়েই আছে। এই সময় আদর্শ স্বামী-স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করাটা একটা নতুন ধরনের অভিজ্ঞতা বৈকি।

মণিকা বলল, 'ঠিক আছে। তোমার সম্মান যাতে নষ্ট না হয়, যাতে কোনও রকম অস্বস্তিতে না পড় সেটা আমি দেখব।'

মারাত্মক একটা টেনশান কেটে যায় সুশোভনের। দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে একটু

হাসে সে। বলে, 'পরিমলরা ড্রইং রুমে বসে আছে। তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিল।' বলে গভীর আগ্রহে মণিকার দিকে তাকাল।

সুশোভনের ইচ্ছেটা বুঝতে অসুবিধে হয় না মণিকার। খাট থেকে নামতে নামতে সে বলে, 'চল, আমি যাচ্ছি।' একটু পরে সুশোভনের সঙ্গে ড্রইং রুমে এসে স্নিগ্ধ হেসে মণিকা পরিমলকে বলে, 'কতদিন পর আপনার সঙ্গে দেখা। কী ভাল যে লাগছে! আমাদের এখানে কিন্তু ক'দিন থেকে যেতে হবে।' পরিমলরা যে এখানে থাকতেই এসেছে সে খবর সুশোভনের কাছে কিছুক্ষণ আগেই পেয়েছে মণিকা। তবু কথাটা যে বলল, সেটা নিতান্তই আন্তরিকতা বোঝাবার জন্য।

পরিমল বলল, 'থ্যাংক ইউ ম্যাডাম, থ্যাংক ইউ। আমরা তো সেইরকম প্ল্যান করেই এসেছি। ক'টা দিন হই-হই করে কাটিয়ে দেওয়া যাবে।'

মণিকা হেসে হেসে বলল, 'আপনারা দুই বন্ধু গল্প করুন। আমি এঁর সঙ্গে একটু কথা-টথা বলি। আপনাদের বিয়ের সময় সেই একবার মোটে দেখেছিলাম। তারপর যে দু'বার কলকাতায় এসেছিলেন তখন আমি এলাহাবাদে, বাপের বাড়িতে।' বলতে বলতে সুজাতার পাশে গিয়ে বসল মণিকা। বলল, 'প্রথমেই বলে রাখছি, আমি কিন্তু আপনি-টাপনি করে বলতে পারব না।'

সুজাতা হাসল।

'তুমি করে বললে রাগ করবে না তো?' মণিকা ফের বলে।

'আরে না না, তুমি করেই তো বলবে।' মণিকা যে এত দ্রুত আপন করে নেবে সুজাতা ভাবতে পারেনি। তাকে খুবই খুশি দেখাল।

বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে চোখের কোণ দিয়ে মণিকাকে লক্ষ করতে লাগল সুশোভন। হেসে হেসে সুজাতার সঙ্গে গল্প করছে মণিকা। খুবই ইনট্রোভার্ট ধরনের মেয়ে সে। কোনওদিন তাকে এত উচ্ছ্বসিত হতে দেখেনি সুশোভন। যেভাবে অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে সুজাতার সঙ্গে সে কথা বলছে তাতে মনে হয় সুজাতা যেন তার কতকালের চেনা। মণিকার সঙ্গে তার সম্পর্কটা যে একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, এই মুহূর্তে তাকে দেখলে কে তা বুঝবে!

কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে সতীশকে দিয়ে প্রচুর কেক, প্যাস্ট্রি, সন্দেশ আর চা আনিয়ে নিজের হাতে সাজিয়ে সবার সামনে ধরে দিল মণিকা। তারপর বাজার থেকে কী কী আনতে হবে, তার একটা লিস্ট করে তাকে পাঠিয়ে দিল। প্রায় দেড়মাস বাদে এভাবে তাকে বাজারে পাঠাল মণিকা। এই ক'সপ্তাহ সতীশ নিজের থেকেই যা ইচ্ছে কিনে এনেছে বা রেঁধেছে। কিভাবে কি হচ্ছে, সে সম্পর্ক একটা কথাও বলেনি মণিকা। এমন কি রান্নাঘরে উঁকি পর্যন্ত দেয়নি। গভীর উদাসীনতায় সংসার থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে চুপচাপ নিজের ঘরে বসে থেকেছে। সতীশও সুশোভনের মতোই অবাক হয়ে গেছে। বিমূঢ়ের মতো মণিকাকে দেখতে দেখতে সে চলে গেল।

এদিকে আচমকা কিছু মনে পড়ে যেতে পরিমল স্ত্রীর দিকে ফিরে বলল, 'ওদের জন্যে কী সব এনেছ, সেগুলো বার করে দাও।'

'আরে তাই তো—' ব্যস্তভাবে নিজেদের সুটকেসটা খুলে সুশোভনের জন্য দামি

প্যান্টের পিস, টাই-পিন, টেপ-রেকর্ডার এবং মণিকার জন্য ফরেন কসমেটিকস, হাউস কোট ইত্যাদি ইত্যাদি কত রকমের জিনিস যে বার করে দিল সুজাতা!

সুশোভন বলল, 'এত সব কী এনেছিস! তোদের কি মাথা-টাথা খারাপ!'

সুজাতা এবং পরিমল একসঙ্গে জানালো, এমন কিছুই তারা আনেনি। খুবই সামান্য জিনিস।

হাত পেতে হাউস কোট-টোট নিতে নিতে ভেতরে ভেতরে কুঁকড়ে যাচ্ছিল মণিকা। এসব তাকে নিতে হচ্ছে সুশোভনের স্ত্রী হিসেবে, যার সঙ্গে কিছুদিনের মধ্যেই তার সম্পর্ক চিরদিনের মতো ছিন্ন হয়ে যাবে। এই উপহারগুলিতে তার এতটুকু অধিকার নেই। এক ধরনের ক্লেশ এবং অস্বস্তি মণিকাকে খুবই কষ্ট দিতে থাকে। মনে মনে সে স্থির করে ফেলে, এলাহাবাদ যাবার সময় এর একটি জিনিসও নিয়ে যাবে না, সব এখানে রেখে যাবে।

মণিকা নিজের মনোভাবটা মুখে চোখে ফুটে উঠতে দেয় না। শুধু বলে, 'এর কোনও মানে হয়!'

ওদের কথাবার্তার মধ্যেই একসময় বাজার করে ফিরে আসে সতীশ। কী কী রান্না হবে, ভাল করে তা বুঝিয়ে দেয় মণিকা। শুধু তা-ই নয়, মাঝে মাঝে গল্পের ফাঁকে ফাঁকে উঠে গিয়ে রান্না দেখিয়ে আসে, কখনও বা চা করে আনে।

অতিথিদের যে এত যত্ন করতে পারে, যে এমন নিপুণ সুগৃহিণী, ক'দিন পরেই তার সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক থাকবে না, ভাবতেই বুকের ভেতর অদৃশ্য কোনও শিরা ছিঁড়ে যায় সুশোভনের।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার সময় অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটে যায়। টেবলের এক দিকে পাশাপাশি বসেছে পরিমল এবং সুজাতা। তাদের মুখোমুখি মণিকা আর সুশোভন। মণিকা অবশ্য একসঙ্গে বসতে চায়নি। সবাইকে খাইয়ে, পরে খাবে বলে ভেবে রেখেছিল। কিন্তু সুজাতা রাজি হয়নি, একরকম জোরজার করে তাকেও সঙ্গে বসিয়ে দিয়েছে।

মণিকার ইঙ্গিতে এবং নির্দেশে সতীশ সবার প্লেটে প্লেটে খাবার দিয়ে যাচ্ছিল। একটা বড় মাছের মাথা সে যখন পরিমলের প্লেটে দিল তক্ষুনি পরিমল সেটা সুজাতার পাতে তুলে দিল। লজ্জায় এবং সুখে মুখটা আরক্ত দেখাচ্ছে সুজাতার।

ওদিকে সতীশ আর একটা মাছের মুড়ো সুশোভনের পাতে দিয়েছে। দ্রুত সুশোভন এবং মণিকা পরস্পরের দিকে একবার তাকায়। আগে হলে মুড়োটা কিছুতেই নিত না সুশোভন। মাছের মুড়ো মণিকার খুব পছন্দ। কিন্তু এখন তাদের যা সম্পর্ক তাতে হুট করে মুড়োটা তুলে দেওয়া যায় না। ভেতরে ভেতরে ভয়ানক অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে লাগল সুশোভন।

এদিকে আচমকা চেঁচিয়ে উঠল পরিমল, 'কি রে শালা, তুই তো টেরিফিক সেলফিশ দেখছি।'

সুশোভন চমকে ওঠে, 'কেন, কী করলাম?'

'নিজে এত বড় মাছের মুড়োটা সাবড়ে দেবার তাল করছিস। আর তোর বউ মুখ চুন করে বসে আছে। বৌকে কী করে ভালোবাসতে হয় আমার একজাম্পল দেখেও শিখলি না! মুড়োটা মণিকার পাতে তুলে দে এক্ষুনি।'

সুশোভন অস্পষ্ট গলায় কিছু একটা বলতে চেষ্টা করল, বোঝা গেল না। মণিকাই তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'মাছের মুড়ো-টুড়ো আমার ভাল লাগে না। ভীষণ কাঁটা।'

এরপর যান্ত্রিক নিয়মে খেতে লাগল মণিকা আর সুশোভন। পরিমল অবশ্য প্রচুর কথা বলছিল। আর করছিল বিদেশবাসের সময়কার মজার মজার সব গল্প। একটু-আধটু হাসছিল সুশোভন। মাঝে-মধ্যে হুঁ হাঁ করে যাচ্ছিল।

খাওয়া-দাওয়ার পর সুশোভন বলল, 'সতীশকে বিছানা করে দিতে বলি। তোরা একটু রেস্ট নে।'

পরিমল জোরে জোরে মাথা ঝাঁকায়, 'দিবানিদ্রা দেবার জন্যে কুয়েত থেকে তোর এখানে এসেছি নাকি? ক'দিন এখন শুধু আড্ডা, বাংলা সিনেমা, তাস, বাংলা থিয়েটার, এটসেট্রা, এটসেট্রা।'

দু' মিনিটের ভেতর ক'দিনের একটা প্রোগ্রামও ছকে ফেলে পরিমল। আজ এই দুপুরবেলায় তাসের আসর বসবে। বিকেলে চা-টা খেয়ে একটা বাংলা নাটক কি সিনেমা। রাত্রে ফিরে এসে আবার আড্ডা, তারপর ডিনার, অবশেষে ঘুম। কাল সকাল থেকে আড্ডা-নাটক ইত্যাদি ব্যাপারগুলোর সঙ্গে ছেলেবেলার বন্ধুদের বাড়িতেও হানা দেবে। ক'টা দিন কলকাতাকে জমিয়ে মাতিয়ে পরিমলরা আবার কুয়েতে ফিরে যাবে। ঠিক হয়, কাল থেকে দিন চারেক সুশোভন ছুটি নেবে।

কাজেই ড্রইং রুমে আবার সবাই চলে আসে। হালকা মেজাজে নতুন করে গল্পটল্পর ফাঁকে একসময় সুশোভনকে ডেকে দক্ষিণ দিকের ব্যালকনিতে নিয়ে যায় মণিকা। বেশ অবাকই হয়েছিল সুশোভন। জিজ্ঞেস করে, 'কিছু বলবে?'

'হ্যাঁ।' আস্তে মাথা হেলিয়ে দেয় মণিকা, 'তোমার বন্ধুরা আমাদের জন্যে এত জিনিস এনেছে। ওদেরও আমাদের দিক থেকে কিছু প্রেজেন্টেশন দেওয়া দরকার। নইলে খারাপ দেখাবে।'

এই ব্যাপারটা আগে মাথায় আসেনি, অথচ আসা উচিত ছিল। সংসারের সব দিকে মণিকার চোখ-কান খোলা। বরাবরই সুশোভন লক্ষ করেছে, তার কর্তব্যবোধের তুলনা হয় না। মণিকা সম্বন্ধে রীতিমত কৃতজ্ঞতাই বোধ করল সে। খুব আন্তরিকভাবে বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, দেওয়া তো নিশ্চয়ই দরকার। ওদের জন্যে তোমার পছন্দমতো কিছু কিনে এনো।'

'তুমিই নিয়ে এস না।'

'দোকানের ভিড়ভাট্টায় আমার যেতে ইচ্ছে করে না। সাফোকেটিং মনে হয়। তুমিই একসময় চলে যেও।'

ওরা যেরকম প্রোগ্রাম-ট্রোগ্রাম করেছে তাতে পরে যাবার সময় পাওয়া যাবে না। গেলে এখনই যেতে হয়।'

'বেশ তো, গাড়িটা নিয়ে চলে যাও।'

মণিকা নিজে ড্রাইভ করতে জানে। সুশোভন বলা সত্ত্বেও মণিকা কিন্তু গেল না, দাঁড়িয়েই রইল।

সুশোভন জিজ্ঞেস করল, 'আর কিছু বলবে?'

মুখ নামিয়ে দ্বিধান্বিতের মতো মণিকা বলে, 'মানে—' বলেই থেমে যায়।

হঠাৎ সুশোভনের মনে পড়ে, ডিভোর্স সম্পর্কে মোটামুটি একটা সিদ্ধান্ত নেবার পর থেকেই আলমারির চাবি নিজের কাছে আর রাখে না মণিকা, সতীশকে দিয়ে সুশোভনের কাছে আগেই পাঠিয়ে দিয়েছে।

দ্রুত নিজের বেডরুমে গিয়ে বালিশের তলা থেকে চাবির গোছাটা এনে মণিকাকে দিতে দিতে সুশোভন বলে, 'আলমারি থেকে টাকা নিয়ে যাও--'

কুণ্ঠিত মুখে মণিকা বলে, 'কিন্তু—'

বিষণ্ণ হাসে সুশোভন, 'স্বামী-স্ত্রীর নকল রোলে যখন অভিনয় করতে রাজিই হয়েছ তখন সামান্য খুঁতটা আর রাখছ কেন? ফিউচারে আমাদের যা-ই ঘটুক না, আমি কি তোমাকে কোনওদিন অবিশ্বাস করতে পারব?' তার কণ্ঠস্বর অদ্ভুত এক কষ্টে বুজে আসে।

মণিকা উত্তর দেয় না। চাবি নিয়ে সোজা সুশোভনের ঘরে গিয়ে আলমারি খোলে। কতকাল বাদে সে এই ঘরে ঢুকল!

একটু পর টাকা নিয়ে একাই ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে গেল মণিকা। যাবার আগে পরিমলদের বলল, একটা দরকারি কাজে সে বেরুচ্ছে। ঘন্টাখানেকের ভেতর ফিরে আসবে। ইচ্ছে হলে পরিমলরা একটু ঘুমিয়ে নিতে পারে।

পরিমল জানালো, দুপুরে ঘুমোবার অভ্যাস তার বা সুজাতার কারও নেই। মণিকা যতক্ষণ না ফিরছে তারা সুশোভনের সঙ্গে গল্প করে কাটিয়ে দেবে। সে ফিরে এলে চারজনে জমিয়ে তাসের আসর বসাবে।

এক ঘন্টা না, প্রায় ঘন্টাদুয়েক বাদে সুজাতার জন্য দামি মাইশোর সিল্কের শাড়ি, নাম-করা গায়কদের লং-প্লেয়িং রেকর্ড, কিছু ইণ্ডিয়ান পারফিউম আর পরিমলের জন্য দামি প্যান্ট এবং শার্টের পীস ইত্যাদি নিয়ে ফিরে এল মণিকা।

পরিমল প্রায় চেঁচামেচিই জুড়ে দিল, 'এই জন্যে বেরুনো হয়েছিল! কোনও মানে হয়?'

সুজাতা মজা করে বলল, 'ওই যে আমরা কি একটু দিয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে তার রিটার্ন দেওয়া হল।'

মণিকা বলল, 'রিটার্ন আবার কী! সামান্য উপহার। এগুলো দেখলে আমাদের কথা মনে পড়বে।'

পরিমল বলল, 'এগুলো না দিলেও মনে পড়বে।'

'জানি। তবু—'

এরপর এ নিয়ে আর কথা হয় না। পরিমল বলে, 'এবার তা হলে তাস নিয়ে বসা

যাক।'

মণিকা বলে, 'আমার আপত্তি নেই। পুরুষ ভার্সাস মহিলা খেলা হোক। সুজাতা আর আমি একদিকে, আপনার ফ্রেণ্ড আর আপনি আরেক দিকে।'

'ও, নো নো—' জোরে জোরে প্রবলবেগে মাথা নাড়ল পরিমল, 'ওটা হবে না। ওই ইভস ভার্সাস আদমস-এর কারবারে আমি নেই। সুজাতা আমার লাইফ-পার্টনার। সুখে-দুঃখে ভালয়-মন্দয়, চেস্ট বেঙ্গলিতে কী যেন বলে—শ্মশানে রাজদ্বারে সব সময় ও আমার পর্টনারই থাকবে। এই তাস খেলাতেও ওকে আর কারও পার্টনার হতে দেব না।' বলে রগড়ের ভঙ্গিতে চোখ টিপল।

পরিমল এবং সুজাতার মধ্যে সম্পর্কটা কতটা গভীর, নতুন করে আরেক বার টের পাওয়া গেল। সুশোভন একধারে এতক্ষণ চুপচাপ সিগারেট হাতে বসে ছিল। কোনও এক যান্ত্রিক নিয়মেই যেন তার চোখ চলে যায় মণিকার দিকে। মণিকাও তার দিকে পলকহীন তাকিয়ে আছে। চোখাচোখি হতেই দ্রুত মুখ ফিরিয়ে নেয় মণিকা। সুশোভন টের পায়, বুকের অতল থেকে ঢেউয়ের মতো কিছু একটা উঠে আসছে।

একসময় খেলা শুরু হয়। পরিমলের ইচ্ছে মতোই সুজাতা তার পার্টনার হয়েছে। অগত্যা সুশোভনের পার্টনার হয়েছে মণিকা।

সুজাতা ভুল তাস ফেললেই হই চই করে একটা কাণ্ড বাধিয়ে দিচ্ছে পরিমল, 'তুমিই আমাকে ডোবাবে।'

মণিকা খুব ভাল তাস খেলতে জানে না। সে এনতার বাজে তাস ফেলে যাচ্ছে। আগেকার সম্পর্ক থাকলে পরিমলের মতোই সুশোভনও চেঁচামেচি করত। কিন্তু হার-জিতের ব্যাপারে এখন তার মনোভাব একেবারেই নিস্পৃহ। প্রতি দানেই তারা পরিমলদের কাছে হেরে যাচ্ছে। কিন্তু কী আর করা যাবে। জয় পরাজয়, দুই-ই তার কাছে এখন সমান। নিঃশব্দে অন্যমনস্কর মতো সে খেলে যেতে লাগল।

প্রতি দানে জিতে জিতে দারুণ মেজাজে আছে পরিমল। সে বলল, 'কি রে, তোর বউ তোকে ফিনিশ করে দিলে!'

চমকে মণিকার দিকে তাকায় সুশোভন। চমকানো ভাবটা তার একার নয়, মণিকারও। দ্রুত মণিকা তার দিকে একবার তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিল।

এক পলক কিছু ভাবল সুশোভন। তারপর বলল, 'আরে বাবা, খেলাটা খেলাই। এটা তো আর লাইফ অ্যাণ্ড ডেথের ব্যাপার নয়। তাসের খেলায় তোরা না হয় জিতলিই। এই তুচ্ছ জিনিস নিয়ে বউকে বকাবকি করতে যাওয়াটা মিনিংলেস।' বলে চিন্তাটিন্তা না করেই হাতের তাসগুলো থেকে একটা বেছে টেবিলের ওপর ফেলল।

একটানা ঘন্টা দুয়েক খেলা চলল। তারপর সন্ধের আগে আগে পরিমল বলল, 'অনেকক্ষণ তাস হল। এবার চল, একটু বাইরে ঘুরে আসা যাক।'

সুশোভন বলল, 'ফাইন। ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থেকে থেকে কোমর ধরে গেছে।'

দশ মিনিটের ভেতর চারজন টপ ফ্লোর থেকে নিচে নেমে সুশোভনের গাড়িতে করে বেরিয়ে পড়ল। ময়দানের চারপাশে চক্কর দিতে দিতে হঠাৎ পরিমল বলল, 'অনেক দিন বাংলা নাটক দেখিনি। কলকাতায় এখন ভাল ড্রামা কী চলছে?'

সুশোভন বলল, 'ঠিক বলতে পারব না। আমরাও অনেক দিন নাটক-টাটক দেখিনি। অ্যাকাডেমিতে গ্রুপ থিয়েটারগুলো রোজই নাটক করে। ওদের ড্রামায় একটা ফ্রেশ ব্যাপার থাকে। দেখবি নাকি?'

পরিমল বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠল। বলল, 'চল না, দেখাই যাক।'

আহামরিও না, আবার খুব খারাপও না, একটা নাটক দেখে ফ্ল্যাটে ফিরতে ফিরতে সাড়ে ন'টা বেজে গেল।

রাত্তিরে খাওয়ার পর আরও কিছুক্ষণ আড্ডা-টাড্ডা দিতে দিতে পরিমলের হাই উঠতে লাগল। সে বলল, 'ঘুম পাচ্ছে রে। এবার শুতে হবে। আমি আবার রাতটা বেশি জাগতে পারি না।'

শোওয়ার কথায় চমকে উঠল সুশোভন। কেননা তার এই ফ্ল্যাটে মোটে দুটো বেডরুম। পরিমলদের যদি একটা ঘর ছেড়ে দেওয়া হয়, অন্য ঘরটায় তাকে আর মণিকাকে থাকতে হবে। অনেক দিন মণিকা এবং সে এক ঘরে রাত কাটায় না।

একটু ভেবে সুশোভন বলল, 'এক্ষুনি শোবার ব্যবস্থা হচ্ছে। এক কাজ করা যাক—'

'কী?'

'তুই আর আমি এক ঘরে শোব। আমাদের বউরা অন্য ঘরে। সেই কলেজ লাইফে তুই আর আমি কতদিন এক বিছানায় রাত কাটিয়েছি। এতদিন পর যখন একটা চান্স—'

সুশোভনের কথা শেষ হতে না হতেই প্রবল বেগে দুই হাত এবং মাথা নাড়তে নাড়তে পরিমল বলল, 'নো নো, নেভার। কলেজ লাইফে যা হয়েছে, হয়েছে। এখন আমাদের ম্যারেড লাইফ। বউকে ছাড়া আমি ভাই ঘুমোতে পারব না।' পরক্ষণেই গলার স্বরটা ঝপ করে অনেকখানি নামিয়ে বলল, 'তুই কী রে, বউকে ফেলে আমার মতো একটা দুম্বো পুরুষের সঙ্গে শুতে চাইছিস! তোদের মধ্যে কোনওরকম গোলমাল টোলমাল হয়েছে নাকি?' বলে রগড়ের ভঙ্গিতে হাসতে লাগল।

নেহাত মজা করার জন্যই কথাটা বলেছে পরিমল, কিন্তু সুশোভন এবং মণিকার শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎচমকের মতো কিছু খেলে গেল। তাদের সম্পর্কটা কি বাইরের একজন মানুষের চোখে ধরা পড়ে গেছে? দ্রুত পরস্পরের দিকে একবার তাকিয়ে নিল তারা। তারপর সুশোভনই আবহাওয়াটাকে সহজ করে নেবার জন্য হেসে বলল, 'ঠিক আছে বাবা, তুই তোর বউয়ের কাছেই শুবি। ম্যারেড লাইফের হ্যাবিট তোকে নষ্ট করতে হবে না।'

সতীশকে দিয়ে একটা ঘরে পরিমল এবং সুজাতার বিছানা করে দেওয়া হল। এবং নিতান্ত নিরুপায় হয়েই অন্য ঘরটায় গিয়ে ঢুকল সুশোভন আর মণিকা। দরজায় তারা খিল দেয়নি। পাল্লা দুটো ভেজিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল দু'জনে। তারপর মণিকা আস্তে আস্তে ডান দিকে জানালার কাছে গিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল।

জানালার ফ্রেমের ভেতর দিয়ে যে আকাশ দেখা যায় সেখানে হাজার হাজার তারা

জরির ফুলের মতো আটকে আছে। রুপোর থালার মতো গোল চাঁদ উঠেছে। অপার্থিব জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে কলকাতা।

শহর এখনও ঘুমোয়নি। নিচে অবিরত গাড়ি চলার শব্দ। অবশ্য হাই-রাইজ বিল্ডিংয়ের এই টপ ফ্লোরে বাতাসের ছাঁকনির ভেতর দিয়ে সেই আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে উঠে আসছে।

সুশোভন খুবই অস্বস্তি বোধ করছিল। দ্বিধান্বিতের মতো খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর আস্তে করে বলল, 'পরিমলটা ভীষণ ঝামেলায় ফেলে দিল।'

মুখ ফিরিয়ে এদিকে তাকায় মণিকা। সুশোভন কী বলতে চায়, সে বুঝেছে। ধীরে ধীরে চোখ নামিয়ে নিল সে।

সুশোভন এবার বলল, 'আমি বরং এক কাজ করি।'

আবার চোখ তুলে তাকায় মণিকা। তবে কিছু বলে না।

সুশোভন বলল, 'আমি বাইরের ড্রইং রুমে গিয়ে শুই। তুমি এখানেই থাক।'

আধফোটা গলার মণিকা বলল, 'কিন্তু—'

'কী?'

'ড্রইং রুমে তো সতীশ শোয়। ওখানে—'

ইঙ্গিতটা বুঝতে অসুবিধে হয় না। কাজের লোকের গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বাড়ির কর্তা গিয়ে শোবে, দৃশ্যটা একেবারেই মনোরম নয়। তাছাড়া সতীশ ভাববেই বা কী!

সুশোভন বলল, 'তা হলে?'

ঘরের চারপাশ একবার দেখে নেয় মণিকা। তারপর বলে, 'তুমি শুয়ে পড়। আমি ওই জানালাটার ধারে সোফায় বসে থাকি। একটা তো রাত।'

'আজকের রাতটা না হয় না ঘুমিয়ে কাটাবে। কিন্তু পরিমলরা তো কয়েক দিন থাকছে। বাকি রাতগুলো?'

মণিকা কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই হঠাৎ পাশের ঘর থেকে টুকরো টুকরো হাসি, জড়ানো গাঢ় গলার আবছা আবছা কথা, চুমুর শব্দ, খুনসুটির আওয়াজ ভেসে আসতে থাকে।

চমকে মণিকা সুশোভনের দিকে একবার তাকাল। পরক্ষণেই মুখ নামিয়ে নেয়। আর সুশোভনের সমস্ত অস্তিত্বের ভেতর দিয়ে তীব্র স্রোতের মতো অনেকক্ষণ, একটানা কী যেন বয়ে যেতে থাকে। নিজের অজান্তেই কখন যে সে মণিকার কাছে চলে এসেছে, জানে না। কোনও এক অভ্রান্ত নিয়মে তার হাত মণিকার কাঁধে উঠে আসে। সঙ্গে সঙ্গে কী এক অলৌকিক বৈদ্যুতিক ক্রিয়া ঘটে যায়। হঠাৎ সুশোভন টের পায় মণিকার মুখ তার বুকের ওপর আটকে আছে এবং মণিকার শরীরটাও ক্রমশ তার শরীরের ভেতর মিশে যাচ্ছে।

অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে তারা। তারপর কাঁপা গভীর গলায় সুশোভন বলে, 'তোমার দাদা অমল এলে বলব, তুমি এলাহাবাদ যাবে না। আরেক বার আমরা চেষ্টা করে দেখি না। তুমি কী বল?'

মণিকা উত্তর দেয় না। অনবরত তার মুখটা সুশোভনের বুকে ঘষতে থাকে।

একটু পর সুশোভন বুঝতে পারে, তার বুক চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে। মণিকার কান্না তার মধ্যেও বুঝিবা ছড়িয়ে পড়ে। ভাঙা ভাঙা, ঝাপসা গলায় বলে, 'কেঁদো না, কেঁদো না।'

চোর

আবীর-গোলা বিকেলটা রক্তকমলের মতো ফুটে উঠেই আবার ঝরে পড়েছে। দিগন্তবিসারী আকাশের কোণে এক টুকরো নিরীহ মেঘ উঁকি দিয়েছিল। তারপর কখন একসময় দূরের গাছগাছালির অস্পষ্ট লাইনের মাথায় সন্ধে নেমে এসেছিল ধীরে পায়ে।

মেঘনার আকাশে এক টুকরো মেঘ। দেখতে দেখতে সেই মেঘের টুকরোটা সাপের চোখের মণির মতো হিংস্র ক্রূরতায় ছেয়ে ফেলে চারিদিক। উথলপাথল জল হঠাৎ যেন খেপে উঠতে থাকে। যতদূর চোখ যায়, উলটো পালটা ঝড়ো হাওয়ার মাতামাতি। মেঘনার ঢেউ ফুঁড়ে ফুঁড়ে বাতাস উঠে আসছে হু হু করে, উন্মাদের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ছে মেঘনাপাড়ের হিজল আর বউন্যার জঙ্গলে, কৃষাণ গ্রামের একচালা দোচালা ঘরগুলোর ঝুঁটি ধরে নাস্তানাবুদ করে দিচ্ছে।

একসময় ঝড়ের সঙ্গে তাল দিয়ে দিয়ে অঝোরে বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়।

কালি-ঢালা নিঃসীম অন্ধকারে একটা দোচালা ঘরের ভেতর বয়রা বাঁশের মাচায় ক্লান্ত শরীর ঢেলে শুয়ে ছিল আকলিমা। রজিবুল ঘরে নেই, সেই দুপুরে উত্তরপাড়ায় গেছে কিতাব্দী শেখের মেয়ের শাদির দেনমোহর পাকা করতে। এ বাবদে কিছু প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। এ অঞ্চলের মক্তবে কী সব করে সে। তা ছাড়া শাদি-টাদির ব্যাপারে সব বাড়িতেই তার ডাক পড়ে। তাকে বাদ দিয়ে এখানে বিয়ে শাদির কথা ভাবা যায় না। সে যা সাব্যস্ত করে দেবে, মেয়ে এবং ছেলে দুই পক্ষই তা মেনে নেয়। এই কারণে সে ভাল রকমের মজুরি নিয়ে থাকে।

মেঘনার বেপরোয়া বাতাসের দাপাদাপি আর প্রচণ্ড বৃষ্টির তোড়ে ঘরের আড়া মচ মচ করে ওঠে। মনে হয়, এই বুঝি ভেঙে পড়ল। মেঘের ডাক, আকাশটাকে চিরে আড়াআড়ি বিদ্যুতের চমক আর ঘন ঘন বাজের গজরানিতে আচমকা ঘুম ভেঙে যায় আকলিমার। দারুণ ভয় পেয়ে লাফ দিয়ে বিছানায় উঠে বসে সে। বাখারির জানালার ফাঁক দিয়ে দৃষ্টি ছড়িয়ে পড়ে বাইরের গাঢ় অন্ধকারে। পৃথিবী এখানে নিরাবরণ, আকাশ চিহ্নহীন দিগন্ত পর্যন্ত ছড়ানো। কিন্তু এই অনাবৃত আকাশের নিচে এমন বৃষ্টিঝরা রাতগুলো বড়ই দুঃসহ আর ভয়াবহ মনে হয় আকলিমার। সে জানে আজও বাইরে থেকে দরজায় তালা লাগিয়ে গেছে রজিবুল। এটা অনিবার্য নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। কোথাও বেরুলেই আকলিমাকে ঘরে রেখে তালা লাগিয়ে যায় সে।

আকলিমা জানে, এতদিন ঘর করার পরও তাকে আদৌ বিশ্বাস করে না রজিবুল চৌধুরি।

এক সময় পশ্চিমের আকাশ পুরোপুরি ফেঁড়ে দিয়ে নতুন করে বিদ্যুৎ চমকায়। ওধারের মাঠে তালগাছের মাথা ঝলসে দিয়ে বাজ পড়ে। অন্ধকারে ঝড়ের ঝাপটায় ডানাভাঙা পাখিদের মরণ-চিৎকার ভেসে আসে।

এমন বৃষ্টি-ঝরা বাতগুলোকে একদিন কী ভাল যে লাগত আকলিমার! নারকেল আর হিজল বনের ফাঁক দিয়ে বয়ে-যাওয়া বাতাসকে গানের সুরের মতো মোহময় মনে হ'ত। এমন সব রাতে একা থাকলে স্মৃতিতে অন্য এক জীবনের ছবি ফুটে ওঠে। মনে হয় সেটা যেন পূর্ব জন্মের কথা। সঙ্গে সঙ্গে এভাবে এই বন্দী হয়ে থাকা জীবনটাকে অসহ্য লাগে।

আকলিমা জানে, আর কিছুক্ষণের মধ্যে ডাকাত পড়ার মতো আবির্ভাব ঘটবে রজিবুলের। তার শরীর ডালে পিষে ধামসে চুরমার করে দিতে থাকবে লোকটা। রজিবুলের কথা ভাবতেই বিতৃষ্ণায় মন ভরে যায় আকলিমার। এই কুৎসিত জীবন থেকে কত বার যে সে পালিয়ে যেতে চেয়েছে তার ঠিক নেই। কিন্তু মুক্তির কোনও সম্ভাবনা তার বহুদূর কল্পনাতেও ফুটে ওঠে না।

বাইরে সীসার লক্ষ কোটি ফলার মতো একটানা বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ আকলিমা ফিরে যায় তার আঠার বছরের যৌবনে, যখন প্রথম পুরুষের ভালবাসার উষ্ণ স্বাদ পেয়েছিল। কিন্তু ভাবনাটা বেশি দূর এগোয় না। হঠাৎ জানালার পাশ থেকে একনাগাড়ে অস্বস্তিকর একটা শব্দ হতে থাকে। বৃষ্টির অবিশ্রান্ত ঝমঝমানি ছাপিয়ে মাটির চাঙড় খসার শব্দ। আকলিমা চমকে ওঠে। স্নায়ুগুলো টান টান করে শব্দটা কোত্থেকে আসছে বুঝতে চেষ্টা করে। প্রথমে মনে হয়, কোনও বুনো খটাশ কিংবা শিয়াল মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে ঘরের ভেতর নিরাপদ আশ্রয়ে ঢোকার চেষ্টা করছে। কিন্তু একটু পরেই পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে যায়। তার কান এই আওয়াজের মধ্যে অনিবার্য একটা আভাস পেয়েছে। আসলে ঘরের ভিতে সিঁধকাঠি চলছে।

ভয়ে অসাড় হয়ে বসে থাকে আকলিমা।

গ্রামের শেষ মাথায় আকলিমাদের এই পলকা দোচালা ঘর, তার পর একটা ভাঙা মসজিদ পেরিয়ে ভাতারমারী খাল। খাল পেরিয়ে বেশ খানিকটা গেলে গ্রামের অন্য সব বাড়িঘর। এখান থেকে গলার শির ছিঁড়ে চেঁচালেও এই দুর্যোগের রাতে যখন মেঘের ডাকে, বাজের গজরানিতে আর প্রবল বর্ষণে সমস্ত চরাচরকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র চলছে সেই সময় তার চিৎকার গ্রামের কেউ শুনতে পাবে না। অপরিসীম আতঙ্কে তার বুকের ভেতর শ্বাস আটকে আসতে থাকে।

একসময় ঘরের বাঁশের খুঁটিতে ঠক করে সিঁধকাঠির ঘা শোনা গেল। এবার মনস্থির করে ফেলে আকলিমা। এভাবে সিঁটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। ক'দিন আগে রজিবুল তাকে এক ছড়া রুপোর হার, চার গাছা রুপোর চুড়ি আর সোনার কানফুল কিনে এনে দিয়েছিল। সেগুলো গায়েই রয়েছে। তবু একবার অন্ধকারে হাত বুলিয়ে গয়নাগুলো ছুঁয়ে নেয় আকলিমা।

পদ্মা-মেঘনার দেশের মেয়ে সে। শানানো সড়কি হাতে কত বার সে ঝাঁপিয়ে পড়েছে হিংস্র ভাম কিংবা লাঠি নিয়ে জাতি সাপের ওপর। একবার ছেন্ দা দিয়ে সন্ধের অন্ধকারে একটা বদ লোকের হাত কাঁধ থেকে এক কোপে নামিয়ে দিয়েছিল। যার এত সাহস, আজ কেন তার এত ভয়, এমন আতঙ্ক?

এই দোচালা ঘরের আড়াতেই রয়েছে একটা মারাত্মক বল্লম, সাপের জিভের মতো লিকলিকে হিংস্র সেটার আধ হাত লম্বা ফলা। বল্লমটা নামিয়ে এনে যে সিঁধ কাটছে সে মাথা তুললেই তাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিতে পারে। কিন্তু কিছুই করে না আকলিমা। কয়েক বছর আগের স্মৃতিই কি তাকে দুর্বল করে ফেলেছে?

গাঢ় অন্ধকারেও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, বাঁশের মাচার পাশ দিয়ে একটা লোক কবর ফুঁড়ে যেন জিনের মতো মাথা তুলল। আর তখনই প্রবল ধাক্কায় তার স্নায়ু থেকে আতঙ্ক ঝরে যায়। লাফিয়ে উঠে আড়া থেকে বল্লমটা টেনে বার করার আগেই সিঁধ-কাটা গর্তের ভেতর থেকে শিকারী বেড়ালের মতো নিঃশব্দে, মসৃণ পায়ে ঘরের মধ্যে চলে আসে লোকটা।

নিজের মধ্যে আকস্মিকভাবে কী ঘটে যায়, বুঝতে পারে না আকলিমা। এখন আর উঠে দাঁড়িয়ে দূরে চালার বাতা থেকে বল্লমটা পেড়ে আনার সময় নেই। আচমকা লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে জাপটে ধরে আকলিমা, তারপর প্রাণপণে চিৎকার করে ওঠে, 'চোর—চোর—চোর—'

আকলিমার নির্মম জাপটানোর মধ্যে চমকে ওঠে লোকটা। এই ভয়ঙ্কর দুর্যোগের রাতে সিঁধ কাঠি নিয়ে বেরুবার সময় কে ভাবতে পেরেছিল তার জন্য এমন একটা দুর্ঘটনা ওত পেতে রয়েছে! তার ধারণা ছিল, পৃথিবী যখন রসাতলে তলিয়ে যাচ্ছে তখন এই গ্রহের কেউ আর জেগে নেই, আর সেই সুযোগে সে তার কাজ গুছিয়ে নিশ্চিন্তে সরে পড়তে পারবে কিন্তু তার সব হিসেব ওলটপালট হয়ে যায়।

হাতের সিঁধ কাঠিটা তুলে আকলিমার মাথায় বসিয়ে দিতে পারত লোকটা কিন্তু তা আর হয়ে ওঠে না। হঠাৎ তার মনে হয়, যে মেয়েমানুষটা তাকে জড়িয়ে ধরেছে তার স্পর্শ এবং আলিঙ্গন বড়ই চেনা।

এদিকে আকলিমাও সেই একই কথা ভাবছিল। তবু সে টের পায় লোকটার বৃষ্টিভেজা শরীর থেকে গরম ভাপ উঠে আসছে। তার কঠোর বেষ্টনীর মধ্যে থর থর কাঁপছে লোকটা। নিশ্চয়ই তার জ্বর হয়েছে।

হঠাৎ অন্ধকারে লোকটা তীক্ষ্ণ কাঁপা গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, 'বউ, তুই!' তার কণ্ঠস্বরে জগতের সবটুকু বিস্ময় যেন মাখানো।

'কে তুমি!' আকলিমার স্বরও কেঁপে ওঠে। পরক্ষণে তার দুই হাত আলগা হয়ে লোকটার গা থেকে খসে পড়ে।

'আমি খলিল।'

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে আকলিমা। তারপর বলে, 'তুমি এইখানে!'

গোঙানির মতো আওয়াজ করে খলিল বলতে থাকে, 'কী করুম, তিন দিন প্যাটে ভাত নাই। চুকা (টক) কাউ ফল খাইয়া আছি। আইজ খিদার জ্বালায় ঠিক করলাম

চুরি করুম। যেমুন কইরা পারি প্যাট ভইরা খাইতেই হইব। ডাকাইতা পাড়ার রহমতের কাছ থিকা সিদকাঠিখান চাইয়া আইনা ম্যাঘনা পাড়ি দিয়া এই পারে আইলাম। তর (তোর) ঘরেই যে সিদ দিছি, ভাবতেও পারি নাই। তাজ্জবের ব্যাপার।'

'তুমার তো সাই জ্বর আইছে। গাও বেজায় গরম, ধান দিলে অখনই খই ফুটব।'

অন্ধকারে করুণ হাসে খলিল। বলে, 'হ, জ্বর আইছে। প্যাটে ভাত পড়লে জ্বর ছুইটা যাইব গিয়া।' তার হাসির শব্দ আর্তনাদেরর মতো শোনায়।

দোচালা ঘরখানায় বৃষ্টির ঝমঝমানির মধ্যে বিষাদ ঘন হয়ে উঠছিল। হঠাৎ একেবারে বেসুরো গলায় আকালিমা বলে, 'অখন চৌকিদার ডাইকা যদিন তুমারে ধরাইয়া দেই?'

খলিল কিন্তু আদৌ ভয় পায় না। আগের মতোই ম্লান হেসে বলতে থাকে, 'ভালই তো, চৌকিদারের কিল আর গুতা পিঠে খাওনের পর প্যাটে তো এক সানকি ভাত পড়ব। কিন্তুক মুশকিল তো অগো লেইগা (জন্য)।'

'কাগো লেইগা?'

খুবই বিব্রত হয়ে পড়ে খলিল। আকলিমার প্রশ্নটা সে সাবধানে এড়িয়ে যায়, 'না না, ও কিছু না।'

খলিলের কথাগুলো বুঝিবা শুনতে পায় না আকলিমা। বৃষ্টিপাতের একটানা আওয়াজ যেন এই পৃথিবী থেকে একেবারেই মুছে যায়। নিরাকার হয়ে যায় এই দোচালা ঘর, মামুদপুর গাঁ এবং দুর্যোগের এই রাত। কোনও এক অলৌকিক প্রক্রিয়ায় তার মন উধাও হয়ে যায় মেঘনার ওপারে, বেশ কয়েক বছর আগে তার আঠার বছরের যৌবনের দিনগুলোতে।

বুকের কাছে দাঁড়িয়ে-থাকা এই মানুষটা অর্থাৎ কিনা খলিল, যে পেটের খিদেয় আজ তার ঘর সিঁধ দিয়েছে, একদিন তাকেই জীবনের সর্বস্ব দিয়ে বসেছিল আকলিমা। তার যৌবনের সে-ই ছিল বাদশা।

আশ্চর্য সেই সব দিন!

তখন গান-বাজনা নিয়ে দিনরাত মেতে থাকত খলিল। সেদিন তার হাতে সিঁধকাঠি ছিল না, থাকত একটা পুরনো সারিন্দা। সারিন্দার তারে মিঠে সুর তুলে সে দিনরাত গান গাইত। গানে মাধুর্যের রং ধরেছিল আকলিমার উষ্ণ ঘন সান্নিধ্য পেয়ে।

মল বাজিয়ে গৃহস্থালির কাজ করত আকলিমা। এই ঘরে গিয়ে কাপড়-চোপড় গুছিয়ে রাখছে, পরক্ষণে চঞ্চল পায়ে পাখির মতো উড়ে এসে উঠোনে ধান মেলে দিচ্ছে, তারপরেই হয়তো ছুটে গিয়ে আখার আগুনে শুকনো কাঠ গুঁজে দিয়ে মাটির হাঁড়িতে ভাত বসাচ্ছে। মেঘনার ঢেউ-এর মতো তার পিঠময় ছড়ানো কালো চুলে আর সিঞ্জিনা লতার মতো শ্যামল সতেজ দেহটি ঘিরে রাঙা ডুরে শাড়িটায় তাকে কী অপরূপই না দেখাত!

গানবাজনা তো ছিলই, পেটের জন্য পদ্মা-মেঘনা উথল পাথল করে সে সব দিনে ইলসা ডিঙি বাইত খলিল। নদীর অতল থেকে তুলে আনত রুপোলি ফসল। ইনামগঞ্জের বাজারে সে সব বেচে কিনে আনত চাল ডাল তেল মরিচ আর আকলিমার

জন্য সুগন্ধি ফুলেল তেল, চুলের কাঁটা, হাড়ের কাকুই। কোনও কোনও দিন বা তাঁতের রঙচঙে ডুরে শাড়ি।

তবে বেশির ভাগ দিনই বেরুতে ইচ্ছা করত না। আকলিমা কি যেন যাদু করেছিল তাকে। পদ্মা-মেঘনা দাপিয়ে বেড়াত যে, সেই খলিল ছোট্ট দোচালা ঘরটায় যেন আটকা পড়ে গিয়েছিল। আকলিমা ছোটাছুটি করে ঘরের কাজ করত। তার দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে সে গেয়ে উঠত ঃ

ময়ূরপাঙ্খি নাও ভিড়াইয়া আইলাম
তোমার খালে,
সোতের কোলে ঢেউয়ের দোলে
পরান কেমুন করে।
মেঘবরণ চুল কইন্যা, তুমার
টানা টানা ভুরু,
রাঙ্গা ডুইরা শাড়ি দিমু
আয়না চুড়ি সরু।
তুমার লেইগা আনুম কইন্যা
আসমানেরই তারা—
পৈছা খাড়ু আনুম কইন্যা
রাঙ্গা চান্দের পারা।
ময়ূরপঙ্খি নাও ভিড়াইয়া-য়া-য়া—

সুরেলা গলার সঙ্গে সারিন্দার সুর একাকার হয়ে স্নায়ুগুলোকে আচ্ছন্ন করে ফেলত আকলিমার। গাইতে গাইতে আর বাজাতে বাজাতে পলকহীন তাকিয়ে থাকত খলিল আর পাখির মতো ঘাড় বাঁকিয়ে মিষ্টি করে হেসে উঠত আকলিমা। বলত, 'আমুন ড্যাব ড্যাব কইরা আমারে যে গিলতে লাগলা, শ্যাষে ভাতের খিদা থাকব তো?'

ঘোরের ভেতর থেকে খলিল জবাব দিত, 'না থাউক, প্যাট আমার এমনেই ভরা আছে।'

আর কিছু না বলে, স্বামীকে কটাক্ষে বিদ্ধ করে, রুপোর মল ঝমঝমিয়ে এনামেলের ক'টা এঁটো সানকি নিয়ে সামনের আয়নামতীর খালের দিকে দৌড়ে যেত আকলিমা।

'বউ, বউ—আ গো পরানের বিবি—' আকলিমার পেছন পেছন মেঘনার কাইতানের মতো ছুটে আসত খলিল। সেদিন বুকটা ছিল কপাটের শক্ত পাল্লার মতো বিশাল, কবজিতে ছিল বাঘের তাকত। অথৈ নদীতে ইলসা জাল ফেলে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ টেনে তুলত সে, পাড় থেকে মেঘনার বিশ হাত ফারাকে ছুঁড়ে দিত খ্যাপলা জাল। (কিন্তু সেদিনের সেই শক্তিমান তেজী খলিল আর নেই। কিছুক্ষণ আগে আকলিমা যখন তাকে জাপটে ধরে তখনই টের পেয়েছিল, খলিলের শরীরে হাড় ছাড়া আর কিছুই নেই। একেবারে কঙ্কালসার হয়ে গেছে সে! হাড়ের কাঠামোর ওপর জিলজিলে ঢিলে চামড়ার খোলস কোনওরকম আটকে আছে।)

আয়নামতীর খালের দিকে যেতে যেতে লাজুক হেসে আকলিমা বলত, 'যাও।

কেউ আবার দেইখা ফেলব।' তার হাসিতে লজ্জা মেশানো থাকলেও অনেকটাই ছিল গর্ব—একটি পুরুষকে পুরোপুরি আত্মসাৎ করার দেমাক।

খলিল বলত, 'দেখুক।'

'তুমি বড় আদেখিলা। আমার গন্ধ পাইলে এক্কেবারে ছোক ছোক কর বিড়ালের লাখান (মতো)। যাও, নাও আর জাল লইয়া গাঙ্গে (নদীতে) যাও। পুরুষ মাইনষে ঘরে বিবির আচলের তলে বইসা থাকলে মাইনষে মোন্দ কয়।'

'কউক। কারোর নিন্দামোন্দরে আমি পারোয়া করি না। আমার বিবির গন্ধ আমি শুকি। কারও জরুরে ধইরা তো টান দেই না।'

ফিক করে একমুখ হাসি নরম আলোর মতো ছড়িয়ে দিত আকলিমা। বলত, 'না গো, না। কেউ কিছু কয়ও না, নিন্দামোন্দও করে না। যা কওনের আমিই কই। তুমি দেখাইলা বটে।' একটু থেমে বলত, 'একখান কথা জিগামু?'

'কী?'

'বউ কি আর কারও হয়না?'

'হইব না ক্যান? তবে আমার লাখান (মতো) না।'

এমন বাধ্য, মুগ্ধ স্বামী তেমন কপাল ছাড়া মেলে না। নিজের সৌভাগ্যে আপ্লুত হয়ে যেত আকলিমা। মনে মনে বলত, খলিল সারা দিনরাত তার গায়ে জড়িয়ে থাক। মুখে বলত, 'যাও, ঘরে বইসা থাইকো না। গাঙ্গে যাও। ওই দেখ, ইত্তিমালির ছোট বইনটা আমাগো দেখতে আছে।'

চকিত হয়ে চারিদিক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত খলিল, কিন্তু না, কেউ কোথাও নেই। বলত, 'কী ব্যাপার লো বউ?'

ততক্ষণে মেঘনার ঢেউ-এর মতো উচ্ছ্বসিত হাসিতে ভেঙে পড়েছে আকলিমা।

এবার খেলাটা ধরা পড়ে যেত। চোখ কুঁচকে খলিল বলত, 'বুঝছি, তুই আমারে ফাকি দ্যাস।'

তারপরেই দু'জনে একসঙ্গে হাসির তুফান তুলত।

শাদির পর কয়েকটা মাস সারিন্দার মিষ্টি সুরের মতো মসৃণ ছাঁদে কেটে যায়। আজকের মতো এমন বর্ষার রাতগুলোকে নেশার মতো মনে হ'ত সে সব দিনে। সেই সময় দূরের মেঘনা যখন ফুলে ফুলে গর্জাচ্ছে, বিদ্যুতের আলোয় কাছের আয়নামতীর খালটাকে বাঁকানো খাঁড়ার মতো দেখাচ্ছে, ঢেউটিনের চালে যখন অবিরত বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে তখন খলিলের বুকের ভেতর নিজেকে সঁপে দিয়ে আরামে সুখে তৃপ্তিতে চোখ বুজে থাকত আকলিমা।

আচ্ছন্ন, কাঁপা গলায় ডাকত খলিল, 'বউ—অ বউ—'

আবছা গলায় ঘোরের মধ্যে থেকে সাড়া দিত আকলিমা, 'উঁ—'

'কই তুই?'

'তুমার কাছে।'

'আরও কাছে আয়।'

'তুমার বুকের মইধ্যেই তো রইছি।'

'বুকে না, পরণাটার মইধ্যে আয়।'

আকলিমার মুঠো মুঠো নলথুড়ি ফুলের মতো কোমল দেহটাকে বলিষ্ঠ বুকের ভেতর মিশিয়ে দিত খলিল। শরীরের প্রতিটি রক্তকণায় তখন বিদ্যুৎ চমকে চমকে যেত যেন আকলিমার। বাইরে অবিরাম ধারাপতন, ব্যাঙেদের গলা ফুলিয়ে ডাকাডাকি আর কাঞ্চন কি সোনাল ফুলের বুনো গন্ধ—সব মিলিয়ে স্নায়ুর মধ্যে কি এক মাতন তুলে দিয়ে যেত যেন।

এ তো গেল বর্ষার কথা। তারপর একদিন সাদা সাদা ফেনার মুকুট মাথায় নিয়ে মাঠঘাটের জল নেমে যেত মেঘনার দিকে। শরতে সাদা কাশফুলে চারিদিক ছেয়ে যেত। তারপর আসত সোনালি ধানের হেমন্ত।

সেবার অঘ্রাণ মাসের উজ্জ্বল সকালে আকাশের কোন প্রান্তে যেন অদৃশ্য মেঘ জমতে শুরু করেছিল। খলিল বা আকলিমা কেউ টের পায় নি, কানা রজিবুল আয়নামতীর খালের ওপার থেকে একটি মাত্র চোখে শকুনের নজর দিয়ে আকলিমাকে বেশ কিছুদিন ধরেই লক্ষ করছে। নবীপুরে তখন জমি কেনাবেচার দালালি টালালি কী সব করত সে। তার সারা মুখে ছিল গুটি বসন্তের দাগ। কালো খসখসে চামড়া, ছুঁচলো থুতনি, গোল চোখ, পুরু ঠোঁট, বেজায় ঢ্যাঙা চেহারা—সব মিলিয়ে একেবারে সাক্ষাৎ শয়তানের আকৃতি। সে সুযোগের অপেক্ষায় ওত পেতে বসে ছিল।

একদিন সন্ধেবেলায় জেলে ডিঙি নিয়ে মেঘনায় গেছে খলিল, ফিরতে ফিরতে পরদিন দুপুর হয়ে যাবে। ঘরে একাই থাকবে আকলিমা। সেদিন রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর ঘরের দরজায় খিল তুলে যখন খলিলের কথা ভাবতে ভাবতে সে ঘুমিয়ে পড়েছে সেই সময় ক্যাঁচা বাঁশের বেড়া কেটে কারা যেন তার বিছানার সামনে এসে দাঁড়ায়। ভারি ঠুনকো ঘুম আকলিমার। অন্ধকারে ক'টা মূর্তিকে দেখে চিৎকার করতে যাচ্ছিল সে, তার আগেই একটা শক্ত কর্কশ হাত তার মুখে কাপড় ঠেসে দিয়ে বেঁধে ফেলে। অবরুদ্ধ গোঙানির মতো আওয়াজ তার মুখের ভেতর পাক খেতে থাকে, বেরিয়ে আসার পথ পায় না।

শুধু মুখই না, মোটা কাছি দিয়ে হাত-পা বেঁধে খালের ঘাটে বড় ঘাসি নৌকোয় লোকগুলো আকলিমাকে এনে তুলেছিল। সঙ্গে সঙ্গে নৌকোটা ছেড়ে দিয়েছিল।

আয়নামতীর খাল সিকি মাইল দূরে মেঘনায় গিয়ে পড়েছে। ঘাসি নৌকোটা নদীতে যেতেই একটা পরিচিত গলা আকলিমার কানে করাত চালিয়ে দিচ্ছিল, 'এট্টু কষ্ট কইরা পইড়া থাকো সোনা। মইধ্য গাঙ্গে গিয়া হাত-পাও আর মুখের বান্ধন খুইলা দিমু। ত্যাখন যত পার চিল্লাইও।' বলে খ্যা খ্যা করে কর্কশ আওয়াজ তুলে যে হেসে উঠেছিল সে রজিবুল।

এদিকে তার পরের দিন দুপুরে গ্রামে ফিরে এসেছিল খলিল। পুরো একটা রাত আকলিমার উষ্ণ মধুর সান্নিধ্য সে পায় নি।

গোটা রাত মেঘনায় মাছ মেরে সেই মাছ ইনামগঞ্জে বেচে গোটা পাঁচেক কাঁচা টাকা পেয়েছিল খলিল। তার থেকে একটা ভাঙিয়ে সুগন্ধি সাবান আর সস্তা দামের গন্ধতেল কিনে এনেছিল আকলিমার জন্য। বাকি টাকা আর খুচরো কোমরের গেঁজেতে

ঝন ঝন করে বাজছিল।

লম্বা লম্বা পায়ে ফসলের জমির আঁকাবাঁকা আলপথগুলোর ওপর দিয়ে বাড়ির দিকে আসতে আসতে মনে হচ্ছিল, কতক্ষণে সে আকলিমার কাছে পৌঁছুবে। তার মন বাতাসের আগে আগে পাখির মতো ডানা মেলে যেন উড়ে যাচ্ছিল। নিজের অজান্তেই তার গলায় গানের সুর গুনগুনিয়ে উঠেছিল।

কালনাগিনী কইন্যা তুমি
আমার বুকের জ্বালা,
তুমার গলায় দিমু কইন্যা
সোনাল ফুলের মালা।
চিকন চুমা আইক্যা (এঁকে) দিমু
তুমার রাঙ্গা মুখে,
আমার মনের মধু দিমু
তুমার গহীন বুকে।
কালনাগিনী কইন্যা তুমি-ই-ই-ই—

ধান-কাটা ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে উলটো দিক থেকে আসছিল ফারুক। সে এ অঞ্চলের বড় ভুঁইয়াদের জমিতে পেটভাতায় আর দেড় টাকা রোজে কিষাণী করে।

ফারুক বলেছিল, 'পরাণে ফুর্তির বান ডাকাইয়া বড় যে গান গাও। উই দিকে ঘরে কী হইচে, খপর রাখো?'

ফারুকের বলার ভঙ্গিতে এমন কিছু ছিল যাতে চমকে ওঠে খলিল। প্রবল ধাক্কা খেয়ে তার গলায় সুরটা কেটে যায়। দুশ্চিন্তায় উৎকণ্ঠায় তার বুকের ভেতরটা তোলপাড় হয়ে যেতে থাকে। ভয়-পাওয়া গলায় সে বলে, 'কী হইচে ফারুক ভাই?'

'তুমার বিবিরে কাইল রাইতে কারা য্যান জোর কইরা উঠাইয়া লইয়া গেছে।'

খলিলের হাত-পায়ের জোড় আলগা হয়ে আসে। তার চোখের সামনে গোটা পৃথিবী একেবারে অন্ধকার হয়ে যায়। হাতের মুঠি থেকে গন্ধতেলের শিশি আর সাবান কখন যে জমিতে পড়ে যায়, সে টেরই পায় না।

দু-একদিনের মধ্যে গোটা ব্যাপারটা তার কাছে পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে গেল। আকলিমার সঙ্গে সঙ্গে রজিবুল চৌধুরিও গ্রাম থেকে উধাও হয়েছে।

আকলিমাকে সারা দুনিয়া তোলপাড় করে অনেক খুঁজেছে খলিল কিন্তু কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া যায় নি।

তারপর একে একে কত বিনিদ্র রাত কেটেছে খলিলের। পুবের আকাশে কত বার সূর্যোদয় ঘটেছে, পশ্চিম দিগন্তে কত বার যে সূর্য ডুবে গেছে তার হিসেব নেই। দেখতে দেখতে বছরের পর বছর পেরিয়ে গেছে।

ওদিকে রজিবুল চৌধুরি আকলিমাকে মেঘনার এপারে এই মামুদপুরে এনে তুলেছে। গ্রামের মাঝখানে তারা থাকে না। মামুদপুরের শেষ মাথায় গাছপালায় ঢাকা নির্জন জঙ্গলের ভেতর একটা দোচালা ঘর তুলে নিয়েছে। রজিবুলের মনে সারাক্ষণ সন্দেহ, এই বুঝি আকলিমা পালায়। কাজেকর্মে কোথাও বেরুতে হলে বাইরে থেকে

তালা লাগিয়ে ভয়ঙ্কর গলায় শাসিয়ে যায়, 'পলানের মতলব করবি না। যেইখানেই যাস আমারে ফাকি দিতে পারবি না। ধরতে পারলে এক্কেবারে শ্যাষ কইরা ফেলুম।'

ক'বছর আগের সেই অভিশপ্ত রাতটা থেকে অসহ্য বন্দী জীবন মেনে নিতে হয়েছে আকলিমাকে। অভ্যস্ত হতে হয়েছে এই ভয়াবহ পরিবেশের সঙ্গে। কিন্তু এমনি বৃষ্টিঝরা উদ্দাম সব রাতে বয়রা বাঁশের মাচার ওপর শুয়ে থাকতে থাকতে স্মৃতির ভেতর কয়েক বছর আগের জীবনটা প্রবল নাড়া দিয়ে যায়। বড় সরল, বড়ই মুগ্ধ একটি মানুষের স্মৃতি তাকে অস্থির করে তোলে। এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে তার বুকের ভেতর মুখ গুঁজে নিজেকে পুরোপুরি সঁপে দিতে ইচ্ছা করে।

সেই মানুষটা এখন দাঁড়িয়ে আছে আকলিমার মুখোমুখি। বাইরে অঝোরে বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে। রাতটা পৃথিবীর আদিম দুর্যোগের দিনে ফিরে গেছে যেন।

কতক্ষণ তারা চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল, খেয়াল নেই। একসময় সমস্ত স্তব্ধতা ভেঙেচুরে দিয়ে আকুল স্বরে আকলিমা বলে, 'আমি আর পারি না। শয়তানটা আমারে শ্যাষ কইরা দিছে। আমারে তুমার লগে লইয়া যাইবা?'

বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ড আচমকা লাফিয়ে উঠেই থেমে যায় যেন খলিলের। কাঁপা গলায় সে বলে, 'কিন্তুক—'

'না না, কুনো কিন্তুক না। আমারে নিতেই হইব তুমার লগে। অখনই পলাইয়া যাওনের সুবিধা। খাটাশটা আইসা পড়লে উপায় থাকব না। চল যাই—' খলিলের একটা হাত আঁকড়ে ধরে আকলিমা।

তার ব্যাকুলতা প্রথমটা ভয়ানক বিচলিত করে তোলে খলিলকে। বুকের ভেতর অশান্ত ঝড় বয়ে যেতে থাকে যেন। খানিক পর নিজেকে অনেকখানি সামলে নিয়ে সে বলে, 'কিন্তুক তোরে নিয়া রাখুম কই? খাওয়ামু কী? তিনদিন না খাইয়া আছি। না না, তুই এইখানেই থাক। আর যাই হউক, খাইয়া তো বাচবি।'

আস্তে আস্তে হাতের মুঠি আলগা হয়ে যায় আকলিমার। সে যেন বুঝতে পারে, যেখানে আজ সে এসে দাঁড়িয়েছে সেখান থেকে তার আর খলিলের কাছে ফিরে যাবার উপায় নেই।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে আকলিমা। তারপর হঠাৎ কিছু মনে পড়তে বলে, 'আইচ্ছা, তুমার সেই সারিন্দাখান অখনও আছে?'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে খলিল। করুণ গলায় বলে, 'না। তুই যেই দিন নিখোজ হলি সেইদিনই ম্যাঘনার পানিতে ফালাইয়া দিছি।'

আবার অস্থির হয়ে ওঠে আকলিমা। ফুঁপিয়ে উঠে বলে, 'আমি আর এক মুহূর্তও থাকুম না এইখানে। আমারে এই জঙ্গলের মইধ্যে তালা দিয়ে রাখে বখিলটায়। না খাইয়া মরি তবু তুমার কাছে থাকুম। তুমি আমার সোয়ামী।'

খলিল টের পায় জ্বরটা আচমকা আরও চড়তে শুরু করেছে। ঝাপসা গলায় বলে, 'কিন্তুক অরা যে আছে—' কথাটা আর শেষ করতে পারে না। ঘাড় ভেঙে তার মাথাটা বুকের ওপর ঝুলে পড়ে যেন।

'অরা কারা?' ভয়ে ভয়ে, বুকের ভেতব গভীর আশঙ্কা নিয়ে জিজ্ঞেস করে আকলিমা।

বাইরে প্রবল বৃষ্টি আর ঝড়ে নারকেল আর বউন্যা গাছগুলো লণ্ডভণ্ড হয়ে যেতে থাকে। আকাশটাকে চৌচির করে কোথায় যেন বাজ পড়ে।

খলিল উত্তর দেয় না।

আকলিমা এবার চিৎকার করে ওঠে, 'অরা কারা?'

খলিল ঘাড় নুইয়ে শিথিল গলায় বলে, 'অনেক দিন তোরে তালাশ করছি। ম্যাঘনার দুই পারে গেরামে গেরামে ঘুরছি তোর লেইগা। সগলে কইতে লাগল তুই আর এই দ্যাশে নাই। কিন্তুক হাত পুড়াইয়া কয়দিন আর খাইতে পারে পুরুষ মাইনষে! আমারে তো পয়সার লেইগা ম্যাঘনায় যাইতে হয় রোজ রাইতে। দুফারে য্যাখন ঘরে ফিরি শরীলে আর কিছু থাকে না। কত দিন যে আলসিতে রান্ধি নাই! শ্যাষে উপায় না দেইখা নিকাহ্ করতে হইল। পোলপানও হইছে।' বলতে বলতে তীব্র অপরাধবোধে যেন গলা বুজে আসে তার।

ঘরের ভেতর এবার অদৃশ্য একটা বাজ পড়ে যেন।

আকলিমা চিৎকার করে ওঠে, 'তুমি নিকাহ্ করছ!'

ঝাপসা গলায় খলিল উত্তর দেয়, 'হ।'

বাইরের অশ্রান্ত বৃষ্টিপাত ছাড়া অনেকক্ষণ ঘরের ভেতর আর কোনও শব্দ নেই। দু'টি নরনারীর হৃৎপিণ্ডও বুঝি থমকে গেছে।

একসময় ভাঙা ভাঙা অস্পষ্ট গলায় খলিল বলে, 'আর খাড়ইতে পারি না। জ্বরে শরীল ভাইঙ্গা আইতে আছে। যাই গা। কিছু না লইয়া গেলে ওই গুষ্টি শুটকি দিব। দেখি অন্য কুনোখানে যদি কিছু পাই।' একটু থেমে ফের বলে, 'তুই ভাইবা দ্যাখ, ওই দোজখে গিয়া থাকনের থেইকা তোর এইখানে থাকনই ভাল।'

গভীর বিষাদে মন ভরে যায় আকলিমার। অনেকটা সময় ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে সে। তারপর অন্ধকারে গা থেকে রুপোর গোট, বেসর, নাকফুল—সব খুলে ফেলে জড়ানো গলায় বলে, 'এই গয়নাগুলান ধর। আমি তোমার লগে যামু না। রজিবুল ইবলিশটায় তুমার ঘর এক ফির ভাইঙ্গা দিছে। আমি গিয়া তুমার নয়া ঘর ভাঙ্গুম না। ঘর যেমুন ভাঙছে তার দাম আমি দিয়া দিমু। তুমার নয়া ঘর আর য্যান না ভাঙ্গে। আবার আইসো, আবার দাম লইয়া যাইও।'

হাতের মুঠোয় গয়নাগুলো চেপে ধরে ঘোরের ভেতর থেকে খলিল বলে ওঠে, 'আবার আসুম?'

'হ, আসবা। একবার না, দুই বার না, অনেক বার। রজিবুলরে আমি শ্যাষ কইরা দিমু।' বলে একটু থামে আকলিমা, তারপর গলা নামিয়ে বলে, 'আর পারলে একখান নয়া সারিন্দা কিন্যা লইও।' নতুন করে বুকের ভেতর থেকে কান্নার বেগ উথলে বেরিয়ে আসতে থাকে তার।

হঠাৎ বাইরে তালা খোলার আওয়াজ শোনা যায়। সেই সঙ্গে রজিবুলের কর্কশ গলা ভেসে আসে, 'কি লো হুমুন্দির ঝি, বাদশাজাদীর লাখান পইড়া পইড়া ঘুমাও।

শরীলে জব্বর ত্যাল হইছে তুমার। ঘরে একখান বাত্তি জ্বালাইয়া রাখতে পার নাই? ওঠ্, উইঠা বাত্তি জ্বাল—'

এদিকে ব্যগ্র হাতে ঠেলতে ঠেলতে খলিলকে সিঁধ কাটা গর্তের দিকে নিয়ে যায় আকলিমা, 'তরাতরি যাও গা। রজিবুলটা কিন্তুক ডাকু, মানুষ খুন করতে পারে।'

শরীরে ক্ষিপ্র মোচড় দিয়ে দ্রুত সিঁধের গর্তে ঢুকে যায় খলিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে রজিবুল ঘরে ঢোকে। খোলা দরজা দিয়ে তীরের মতো বৃষ্টির ফলাগুলো ঘরের ভেতর ঢুকতে থাকে।

রজিবুল আর কিছু বলার আগেই তাব বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ডুকরে কেঁদে ওঠে আকলিমা, 'তুমি আমারে একা ফেলাইয়া যাও এই জঙ্গলে। এই দ্যাখো সিদ কাইটা চোরে আমার গয়নাগাটি কাইড়া লইয়া গেছে। একা আছি, ডরে চিল্লাইতে পারি নাই।'

বাইরের আকাশ থেকে মেঘনায় আরেক বার বাজ পড়ে।

নাগমতী

সোনাইবিবির বিল। জনপদ থেকে অনেক দূরে, ভূগোলের কোলাহলের বাইরে নির্জন ভূখণ্ড। এই শীতের দিনগুলোতে তার কঙ্কাল বেরিয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে ক্ষুদ্রজল ডোবা। অসুরমুণ্ডের মত রাশি রাশি মাটির ঢিবি। আর যতদূর নজব ছড়ানো যায়, শুধু হোগলাবন, শরঝোপ আর বিন্নাঘাসের উদ্দাম জঙ্গল। এর মধ্যে বিছিয়ে আছে নিবিড় ছায়াখণ্ড। সোনাইবিবির বিলের শান্তি নিরুদ্বেগ। তার জলজঙ্গলের ঘুম একান্তই নির্বিঘ্ন। অথচ বর্ষায় এই বিলের কিনারা থাকে না, চিহ্ন পাওয়া যায় না দিক্‌চক্রের। নিশ্চিহ্ন দিগন্ত পর্যন্ত শুধু কাজল জলের বন্যা ফুলতে থাকে। উত্তাল মেঘনা ভৈরব আক্রোশে নিজেকে প্রসারিত করে দেয় সোনাইবিবির বিলে। তারপর শুষ্ক হেমন্তদিনে এর দেহ থেকে মুছে যায় বর্ষার যৌবন। জলের কোন অতলান্ত থেকে একটু একটু করে মুখ তোলে কুমারী মাটি।

হেমন্ত পেরিয়ে শীত। আকাশের কোন নিরুদ্দেশ থেকে উড়ে আসে মরশুমি পাখপাখালি। কটোরা, ইমলি, জলপিপি। নানা নামের, নানা রঙের। রঙে রঙে ইন্দ্রধনু হয়ে ওঠে সোনাইবিবির বিল। আর আসে বেদেরা। মরশুমি পাখি আর শীতের যাযাবর। তাদের কলশব্দে ধুক ধুক করে বেজে ওঠে এই নির্জন ভূখণ্ডের ধমনী। সোনাইবিবির বিলের হৃৎপিণ্ডে দোলন লাগে, মাতন জাগে থরথর।

এবারও এসেছে যাযাবরেরা। রাশি রাশি তাঁবু স্থলপদ্মের মতো ফুটে উঠেছে সোনাইবিবির বিলে। আর ফুটেছে কৃষ্ণকলি। কৃষ্ণকলি নয়, নাগমতী বেদের মেয়ে। তাদের তনুদেহে ধাঁধানো রঙের ঘাঘ্‌রা। গ্রন্থিহীন খোঁপা থেকে কাঞ্চনফুল উড়ে উড়ে যেতে চায়। তাদের অলস চোখের মণিতে আচমকা উদয়নাগের ফণা নেচে ওঠে। গলায় ইমলি পাখির হাড়ের মালা, মণিবন্ধে কুঁচিলা সাপের হাড়ের বলয়। কানে

শঙ্খনাগের কণ্ঠাস্থি দুল হয়ে দোদুল দুল দুলছে। তাদের পাশে পাথরপেশী বেদে। সুরারসের প্রভাবে দৃষ্টি রক্তপদ্ম। কালো ঠোঁটে নির্বোধ হাসির রেখা। পিঙ্গল চুলের রাশি চক্রচূড়ার অস্ত্র দিয়ে বাঁধা রয়েছে।

শীতের রোদে প্রচুর অনুরাগ ছড়ানো। সেদিকে পিঠ দিয়ে ডালা-কুলো বুনতে বসেছে নাগকন্যারা। চারপাশে বেত-বাঁশ স্তূপাকার সাজানো। পুরুষেরা কেউ কেউ পাশে এসে বসেছে। বেত চাঁছছে, বাঁশে তোলন দিচ্ছে ছেন্দা দিয়ে। কেউ কেউ চলে গেছে দূরের কোনও গঞ্জে। কারও পদপাত হয়েছে রবিফসলের প্রান্তরে। বিলের ওপারে আচক্রবাল ফসলের মাঠ। তিল, সরষে, কাউন ; ক্ষেতের ঝাঁপি ভরে গেছে। কৃষাণের অলক্ষ্যে মাঠের অকৃপণ ভাণ্ডার থেকে যদি একমুঠো হাতিয়ে আনা যায়, তারই সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছে কেউ। কেউ বা গেছে বালিহাঁসের তল্লাসে। কঠিন মুঠিতে তীক্ষ্ণধার কোঁচের ফলা। শীতের এই মধুর রোদে-ভরা দিনগুলিতে গৃহী পৃথিবীর আস্বাদ নিচ্ছে যাযাবরেরা।

প্রত্যেক বছর শীতের ঋতুতে সোনাইবিবির বিলে এসে নোঙর ফেলে এই বেদেরা। এই দিনগুলি তাদের জীবনে আশ্চর্য এক ব্যতিক্রম। ভাসমান জীবন ছায়াতরুর নিচে এসে গৃহস্থালি রচনা করে। মাত্র কয়েক দিনের পরমায়ু। তারপর, শীতের শেষে দক্ষিণ দিগন্ত থেকে যখন মিঠে সমুদ্রবাতাস বয়ে আসে, তখনও তাদের নৌকোর বাদামে দূরযাত্রার সংবাদ আসে না। শীতের পর চৈত-ফাগুনের দিন। তারও পর খরসান গ্রীষ্ম। তার পরেই আসে বর্ষার আমন্ত্রণ। আকাশের কজ্জলিত মেঘে মেঘে নিরুদ্দেশ অভিসারের বার্তা পৌঁছে যায়। বৈঠার ফলায় মোচড় লাগে, পালে ঝড়ো বাতাস বাজে। মাল্লার মুঠিতে গুণ টানার দড়ি মুখর হয়ে ওঠে। কয়েক দিনের গৃহী জীবন একটা অবাস্তব স্বপ্নের মতো নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় সোনাইবিবির বিলের অতল তলে। ভৈরব গর্জনে ছুটে আসে মেঘনা। বিন্নাবন, কাশঝোপ কোথায় মুছে যায়। চিহ্নহীন দিগন্ত পর্যন্ত শুধু জল আর জল। কালীয়নাগের মত রং। ঢেউয়ের মাথায় মাথায় ফেনার মল্লিকা। মেঘনা ফুলতে থাকে, ফুঁসতে থাকে, দুলতে থাকে। তার ওপর দিয়ে এক ঝাঁক সামুদ্রিক পাখির মতো বেদেদের বহর গিয়ে নামে মেঘনায়, মেঘনা থেকে পদ্মায়, পদ্মা থেকে কালাবদরে। তারপর কোন সাগরের নিরুদ্দেশে উধাও হবে সে খবর জানা নেই। মেঘনার জলে জলে, পদ্মার ঢেউয়ে ঢেউয়ে শুধু জড়িয়ে থাকবে একটি তীক্ষ্ণমিষ্টি বেদেনীকণ্ঠ : বিষপাথর মা, খাঁটি বিষপাথর। জড়িবুটি নিবা মা, সব বিষ বিষহরির দোয়ায় উইঠ্যা আসব। দুধরাজ-চক্রচূড়-আলাদ গোক্ষুর—

যতদিন সেই বর্ষা না আসে, ততদিন এই নীড় মোহ ঘনাতে থাকবে কামনায়, রক্তের কণায় কণায়। এই নীড় শিরায় শিরায় যাযাবর-রক্তে আফিম ফুলের মতো ঘুমের ছায়া ছড়াতে থাকবে। আর অপরূপ এক নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকবে বেবাজিয়ারা।

বেলা চনচন করে বেড়ে উঠছে। শীতের রোদ আরও মধুর, আরও অলস আমেজ ছড়াচ্ছে। নিপুণ হাতে ডালা-কুলো বুনে চলেছে বেদেনীরা। আগামী হাটে কমলাঘাটের

গঞ্জে বিক্রি করতে যাবে পুরুষেরা। আর, একটু পরেই কাঁধে জড়িবুটি আর বিষপাথরের ডালা বেঁধে, মাথার ওপর থরে থরে সাপের ঝাঁপি সাজিয়ে দূরের জনপদে যেতে হবে। তাই দ্রুত তালে হাত চালাচ্ছে নাগকন্যারা। চক্রচূড়ের নাচ দেখিয়ে, জড়িবুটি আর বিষপাথরের বিনিময়ে একমুঠো রূপালি পুলক নিয়ে ফিরতে হবে।

নানা কণ্ঠের কলশব্দে, তীক্ষ্ণ হাসির চমকে চকিত হয়ে উঠছে সোনাইবিবির বিল। মূলি বাঁশে তোলন দিতে দিতে মহবুৎ বলল, 'কী লো পালঙ্কী, শঙ্খিনী কই? তারে যে দেখি না! দলের আম্মা হইয়া একেবারে আসমানের তারা হইয়া গেল নিকি?'

শঙ্খিনী এই বেদের দলের নায়িকা। তার সম্বন্ধে এই মন্তব্য রীতিমত বে-আইনি। তা ছাড়া দলের নেত্রীকে 'আম্মা' নামে ডাকাটাই একমাত্র রেওয়াজ। এর ব্যতিক্রম ভয়াল কিছুকে ডেকে আনতে পারে। কারণ, শঙ্খিনীর একটি নির্দেশে এই বেবাজিয়া দলের যে কোনও মানুষের হৃৎপিণ্ড এক হাত একটা সড়কির ফলায় চৌফালা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু মহবুৎ বড় বেপরোয়া, ভয়ঙ্কর।

এই যাযাবর জীবনে আশ্চর্য এক ব্যতিক্রম পালঙ্ক। উন্মনা একটি ভুঁইচাপার মতো মেয়ে। ভীরু ভীরু দু'টি চোখ থেকে ভ্রমর উড়ে যেতে চায়। নিজের চারপাশে একটি শান্ত স্নিগ্ধতার আলো ছড়িয়ে রাখে পালঙ্ক। দুরু দুরু বুকের কোন নিভৃত থেকে মৃগনাভি-মন সৌরভ ছড়ায়। সে সৌরভ স্নায়ুকে প্রসন্ন করে। পালঙ্কের দিকে তাকালে দৃষ্টি স্নিগ্ধ মায়ায় ভরে যায়।

একবার মহবুতের মুখের দিকে তাকিয়ে ভীরু চোখ দুটো নামিয়ে নিল পালঙ্ক। কোনও জবাব নেই তার মুখে। নিরুত্তর বসে বসে সাজির গ্রন্থিগুলো আরও নিবিড় করে পাক দিতে লাগল। আর চমকে উঠল অন্য বেদেনীরা।

এক পাশে বসে ছিল আতরজান। সুঠাম দেহ কিন্তু মুখখানা কবে যেন ঝলসে বিকৃত আর বীভৎস হয়ে গেছে। শুধু সেই ভয়াল মুখ থেকে একটি খরসান হাসি খলখল করে বেজে উঠল। সোনাইবিবির বিলের ধমনী সেই কর্কশ হাসিতে শিউরে উঠে। একসময় হাসি থামল। তারপর প্রেতকণ্ঠে আতরজান বলল, 'আরে মহবুইত্যা—বান্দীর পুত, শঙ্খিনীর যে ঘরের বউ সাজনের ভাবন লাগছে! আরশির সামনে খাড়াইয়্যা, শাড়ি পইর‍্যা, কপালে সিন্দুর দিয়া ঘরের বউ সাজতে আছে। দ্যাখ গিয়া। হিঃ—হিঃ—হিঃ।' আবারও সেই হাসি শুরু হল আতরজানের ; তারপর তার দৃষ্টিটা চক্রাকারে এসে পড়ল পালঙ্কের ওপর, 'কী লো পালঙ্কী, তোরও তো শখ আছে বউ সাজনের, সোয়ামী পাওনের। যা যা, বউ সাজ গিয়া। যা যা পেত্নী। হিঃ—হিঃ—হিঃ—'

ওপাশের স্বল্পজল খালে পাঁচখানা হাজারমণী নৌকো নিথর দাঁড়িয়ে আছে। বেদেদের বহর। বর্ষার দিনের ভাসমান গৃহস্থালি। সেখান থেকে তীক্ষ্ণতম একটি কণ্ঠ বল্লমের ফলার মত সাঁ করে ছুটে এল। গর্জন করে উঠেছে শঙ্খিনী, 'কে? কে? খাড়, আইতে আছি। এই মহবুইত্যা, এই জিন, এই আতর, এই বান্দী, মুরগীর বদলা আইজ তোগো জবাই করুম।'

মাতলা ঝড়ের মতো সাঁ সাঁ করে ছুটে এল শঙ্খিনী। সিঁথিতে দাউ দাউ জ্বলছে রক্ত সিঁদুরের লেখা। বিজুরি চমকের মতো তনুদেহ। কোত্থেকে যেন একখানা চেলি যোগাড়

করে এনেছিল শঙ্খিনী। কামনা-লাল শাড়িটা দাবাগ্নির মতো ঘিরে রেখেছে দেহখানাকে। অপূর্ব দু'টি বক্ষকুম্ভ। দ্রুত লয়ে উঠছে, নামছে। দু'টি দুরায়ত চোখ আলাদ গোখুরের জিভের মতো ঝক ঝক করছে।

বেপরোয়া মহব্বৎ এই মুহূর্তে একেবারে নিভে গেছে। আতঙ্কে চোখ বুজে এসেছে আতরজানের। ভয়াল কিছু একটা ঘটে যাবে এখনই, পলকপাতের মধ্যে। নিশ্বাস স্তব্ধ হয়ে গেছে বেবাজিয়াদের। শুধু এক পাশে বসে তৃষিত চোখে পালঙ্ক দেখতে লাগল শঙ্খিনীকে। টকটকে লাল চেলি, সিঁদুর। নাগমতী বেদের মেয়ে কল্যাণী বধূ সাজার পাঠ নিয়েছে। দেখতে দেখতে চোখ দু'টো যেন জ্বালা করে উঠল পালঙ্কের। উন্মনা ভুঁইচাপার মতো মেয়ে। তার মৃগনাভি মন। সেই মনে কোন দূর কৃষাণগ্রাম থেকে ভেসে এল সৌরভ। নিরুদ্বেগ গৃহী জীবন। স্বামী নামে একটি প্রেমিক পুরুষ। তার বুকে আনন্দিত আত্মসমর্পণ। একটি নিভৃত লজ্জার মতো সেই পুরুষটিরই সন্তানকে বুকের অমৃতকলস থেকে সুধাদান। কিছু প্রিয়মুখ পরিজন, একটি শ্রীময় গৃহাঙ্গন। ঘরের চালে চালে ছেয়ে-যাওয়া সোনার-রেণু-ছিটানো সিমের লতা। চারপাশে আম আর লেবুগাছের ঘন ছায়ায় ঘুঘুর মেদুর সঙ্গীত।

পদ্মা-মেঘনা-ইলসা—বেহুলা-লখিন্দরের জলবাসরের দেশে বিষপাথর আর জড়িবুটি বিক্রি করে, দুধরাজ-শঙ্খনাগ-গোক্ষুরের নাচ দেখাতে দেখাতে পালঙ্ক দেখেছে কৃষাণী জনপদের প্রেম। সেই থেকে তার মুগ্ধ চোখে, উদ্দাম বেদেনী রক্তে রক্তে ছায়া ফেলেছে একটি নোঙর-ফেলার কামনা। হয়তো সেই স্বপ্নই দেখেছে শঙ্খিনী। এই মুহূর্তে শঙ্খিনীর চেলি-সিঁদুর দেখতে দেখতে পালঙ্কের ভুঁইচাপা মন উধাও হল। কোথায়, কোন ছায়াতরুর নিচে পলাতক হয়ে র'য়েছে সেই ঘরের হাতছানি, সেই গৃহাঙ্গনের ভালবাসা। এক এক সময় এই যাযাবর বহর থেকে পালিয়ে যেতে ইচ্ছা হয় পালঙ্কের। কিন্তু শঙ্খিনীর নির্দেশে অজস্র জোড়া চোখ তাকে পাহারা দিয়ে চলেছে। অহরহ পালঙ্ক দৃষ্টিবন্দী।

ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটে যেতে পারত। এখনও তুঙ্গ বুক খরতালে উঠছে, নামছে শঙ্খিনীর। দৃষ্টি থেকে এখনও আলাদ গোক্ষুরের জিভ মিলিয়ে যায় নি। কিন্তু কিছু ঘটার আগেই ঘটে গেল আর একটা দুর্ঘটনা। সহসা সামনের কাশবন দলিত করে হু হু তুফান ছুটে এল। তুফান নয়, সেকেন্দর, 'আম্মা—আম্মা—সব্বনাশ হইয়া গেছে।'

মুখখানা অমানবিক হয়ে উঠল শঙ্খিনীর। ভ্রূ দুটো কাঁকড়া বিছার মতো কুঁচকে এল, 'কিসের সব্বনাশ! শীগ্‌গির ক' বান্দীর পুত।'

সেকেন্দর বলল, 'বিলের ওই পারে আর একটা বহর আইছে। আমাগো লাখান বেবাজিয়াগো বহর। এই মাত্তর আমি দেইখ্যা আইলাম।'

কেয়াবনের বাঘিনীর দৃষ্টির মতো শঙ্খিনীর পিঙ্গল চোখ দুটো জ্বলতে লাগল। বাজ ডাকল গলায়, 'জুলফিকার—'

অনেকটা দূরে, কষাড জঙ্গলটার পাশে নির্বিকার বসে বসে দেশী মদের আকণ্ঠ সাধনা করছিল জুলফিকার। একটা কালপুরুষের মতো দেখাচ্ছে তাকে। পাহাড়ের মতো কর্কশ কালো দেহ। শঙ্খিনীর গর্জনে ঠক করে তার হাত থেকে একটা শূন্য

বোতল ঝরে পড়ল। ওই গর্জনে একটা অনিবার্য আভাস আছে। শঙ্খিনীর দিকে ভ্রূহীন রক্তাভ চোখে তাকাল জুলফিকার। সমস্ত দেহের স্নায়ুগুলো ধনুকের ছিলার মতো উত্তেজিত হয়ে উঠেছে তার। এই বেবাজিয়াদের সেনাপতি সে। সমস্ত যুদ্ধের নায়ক। তার কণ্ঠে চাপা গজরানি শোনা গেল, 'গর্—র্—র্—র্—।' আসন্ন যুদ্ধের মুহূর্তে সমস্ত কথা হারিয়ে যায় জুলফিকারের জিভ থেকে। শুধু ওই হিংস্র শব্দটা বেরিয়ে আসতে থাকে।

বেতের ডালা-চিনাই বুনতে বুনতে উৎকর্ণ হয়ে বসল যাযাবরেরা। তাদের শিরায় শিরায় বহমান রক্তে একটা নিশ্চিত ইঙ্গিত বইতে শুরু করেছে। শঙ্খিনীর পিঙ্গল চোখ, শঙ্খিনীর গর্জন একখণ্ড করাল মেঘকে টেনে এনেছে শীতের সোনালি সকালে।

শঙ্খিনী আবারও গর্জে উঠল, 'উরা আসলো, আমরা ইখানে আছি। উরা আসলো জাইন্যা-শুইন্যা। একেবারে জানে খাইয়্যা ফেলুম না!'

এই জল-বাংলায় একটা প্রথা আছে বেদেদের মধ্যে। কে যে এ রীতির প্রচলন করে গিয়েছে, আজ তার নাম এক অবলুপ্ত ইতিহাসে হারিয়ে গেছে। একটি দল যখন কোথাও 'পারা' গাঁথে, তখন আর একটি দল সেখানে উপস্থিত থাকতে পারে না। তাতে কাজকর্মের দিক থেকে দু দলেরই নানা অসুবিধা। তাই এই রীতিটিকে বেদেরা বরণ করে নিয়েছে নিজেদের মধ্যে। অথচ আজ সেই প্রচলিত প্রথাটিকে অগ্রাহ্য করে এখানে এসে নোঙর ফেলেছে আর একটি বেদে-বহর। অতএব সেকেন্দরের উত্তেজনা, শঙ্খিনীর গর্জন আর পিঙ্গল চোখে দাবাগ্নি দাউদাউ করে ওঠার নেপথ্যে পর্যাপ্ত কারণ আছে বই কি।

ইতিমধ্যে পাহাড়ের মতো বিশাল দেহখানা নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে জুলফিকার। উঠে দাঁড়িয়েছে মহব্বৎ আর অজস্র জোয়ান যাযাবর। উত্তেজনায় বেদেনীরাও নাগিনী হয়ে উঠেছে। একসময় সকলে সড়কি-বল্লমের সন্ধানে বহরের দিকে চলে গেল। শীতের সোনা-ঝরা সকালের ওপর করাল মেঘের ডানা এসে পড়ল রাশি রাশি। শঙ্খিনী ভুলে গিয়েছে, একটু আগে মহব্বৎ আর আতরজানের মুণ্ডু দু'টো উপড়ে নিতেই ছুটে এসেছিল সে। এই মুহূর্তটা ভুলিয়ে দিয়েছে শঙ্খিনীর সেই প্রতিজ্ঞা।

সকলেই চলে গেছে, শুধু বেতবাঁশের পাহাড় প্রমাণ স্তূপের মধ্যে নিথর হয়ে বসে রয়েছে পালঙ্ক। এই খণ্ডযুদ্ধের মুহূর্তগুলো তার চেতনায় কী এক হিমছায়া ঘনিয়ে আনে। ভীরু জলপিপির মতো বুক দুরুদুরু কেঁপে ওঠে। রক্ত ছলকাতে থাকে। আচমকা একটা সম্মিলিত শোরগোলে চমকে উঠল পালঙ্ক।

সামনের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে কালপুরুষের মতো এগিয়ে চলেছে জুলফিকার। হাতের মুঠিতে একটা অতিকায় বল্লমের ফলা। তার পেছনে শঙ্খিনী, আতরজান, ডহরবিবি, ময়না থেকে শুরু করে শেষতম মাল্লাটি পর্যন্ত লম্বা লম্বা পা ফেলছে। সকলের হাতেই মারণাস্ত্র। রামদা, বল্লম, সড়কি আর কোঁচের ফলায় ফলায় অনিবার্য মৃত্যু ঝিলিক দিচ্ছে। আসন্ন যুদ্ধের প্রতিজ্ঞা যাযাবরদের দৃষ্টিতে অগ্নিশিখা হয়ে জ্বলছে। একসময় জুলফিকারেরা ঘন কাশবনের আড়ালে মিলিয়ে গেল।

এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত। সোনাইবিবির বিলটাকে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে নতুন বহরটার দিকে এগিয়ে এল জুলফিকার। তার পেছন পেছন শঙ্খিনীর পদাতিকেরাও এসে পড়েছে।

নতুন দলটা কয়েক দিন আগে এসেছে। এখনও সোনাইবিবির বিলে তারা জাঁকিয়ে বসাতে পারে নি। বাঁশ, খুঁটি আর তাঁবু তৈরির সব আয়োজন ছত্রখান হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে চারিদিকে। জুলফিকার আকাশ কাঁপিয়ে হুঙ্কার ছাড়ল, 'এই সুমুন্দির পুতেরা, আব্বা-আম্মার সাদি দেখতে এখানে আইছস? কলিজা ফাইড়্যা ফেলামু—'

চমকে নতুন বহরের মানুষগুলো জুলফিকারের দিকে তাকাল। বিরাট মাথাটা তার আকাশে গিয়ে ঠেকেছে। কালো পাষাণে খোদাই-করা নির্মম চেহারা। কঠিন পেশী থরে থরে তরঙ্গিত হয়ে উঠে গিয়েছে সমস্ত শরীরে। হাতে একহাত লম্বা বল্লমের ফলাটা রক্তদর্শনের উত্তেজনায় ঝকমক করছে। আকাশের কোনও অলক্ষ্য থেকে নেমে এসেছে যেন মহাকাল। তার করাল পদপাতে সোনাইবিবির বিলের হৃৎপিণ্ড থরথর কাঁপছে। গলার মধ্যে সেই ক্রূর শব্দ ধ্বনিত হল ঃ গর—র—র—র—র—'

সামনেই সাতখানা নৌকার বহর 'পারা' পুঁতেছে স্বল্পজল খালে। নতুন বেবাজিয়াদের কয়েক জন আতঙ্কে সেদিকে উধাও হল। যারা দুঃসাহসী, তারা বিহ্বল দৃষ্টিতে শুধু তাকিয়ে রইল কৃষ্ণাঙ্গ দানবটার দিকে।

ইতিমধ্যে শঙ্খিনী বিলভূমি কাঁপিয়ে আবার হুঙ্কার ছাড়ল, 'আমরা ইখানে শীতকালে আসি। বান্দীর পুতেগো আক্কল নাই! বাইর হ একবার। এক্কেবারে ফাইড়া ফালামু।'

কয়েকটি মাত্র মুহূর্ত। ও পক্ষও সমান করিৎকর্মা। চোখের পলকে তারাও সড়কি বের করে এনেছে। মাঝখানে খানিকটা ফারাক রেখে দু'টি দল মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ল। দু পক্ষের পাঁয়তারা আর ঘন ঘন গর্জনে সোনাইবিবির বিল কেঁপে কেঁপে উঠছে।

ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব ছিল না। বিলের মাটি মাথা-ফাটা রক্তে চিহ্নিতও হতে পারত, বল্লমের তীক্ষ্ণ ফলাগুলো হৃৎপিণ্ড এফোঁড় ওফোঁড় করে রক্তের তৃষ্ণাও মেটাত। কিন্তু তার আগেই ঘটে গেল ঘটনাটা। বহর থেকে বিকট চিৎকার করতে করতে দু'দলের মাঝখানে বিশাল দু'খানা হাত আকাশের দিকে তুলে এসে দাঁড়াল একটি মানুষ। পুরো সাড়ে চার হাত দীর্ঘ চেহারা। মাথার চুলগুলো থরে থরে কাঁধের সীমানায় নেমে এসেছে। সুগৌর দেহ। টানা টানা ভ্রূরেখার নিচে দূরায়ত চোখ। শিলা-ফলকের মতো বিশাল একখানা বুক যেন অফুরন্ত শক্তি আর সাহসের মোহানা। দৈবপ্রেরিত বলে মনে হল মানুষটিকে।

দু'টো দলই থমকে গেল। মানুষটি বলল, 'কাজিয়া ক্যান? আপোসে মিটমাট কইর‍্যা নেওয়া যায় না?'

কেউ কিছু বলার আগেই জুলফিকারের পাশ থেকে উল্কার মতো ছুটে এল শঙ্খিনী। দশ দশটা বছর, অজস্র গ্রীষ্ম-বর্ষা-হেমন্ত পাড়ি দেবার পরও চিনতে এতটুকু অসুবিধা হয় নি তার। বিস্মিত গলায় শঙ্খিনী বলল, 'রাজাসাহেব!'

'কে?' শঙ্খিনীর দিকে চকিত নজর ফেলল মানুষটি।

'আমি শঙ্খিনী। চিনতে পারছস না রাজাসাহেব!'

'তুই শঙ্খিনী! এইটা তুর দল!' এবার বিস্ময়ের পালা রাজাসাহেবের।

'হ।'—রাজাসাহেবের পেশীতরঙ্গের ওপর ভাসতে ভাসতে শঙ্খিনীর মুগ্ধ দৃষ্টি কী যেন সন্ধান করতে লাগল।

'কী তাজ্জবের কথা। এইটা তুর দল! আর তুর দলের লগে আমার দলের কাজিয়া! সড়কি-বল্লম নামাও হে মরদেরা। খুব হইছে—' মধুর হাসিতে মুখখানা ভরে গেল রাজাসাহেবের, 'উই সব কাজিয়া ভাল না।'

শঙ্খিনীর দু'টি চোখে অপার বিস্ময়। সেই বিস্ময় রাজাসাহেবের সারাদেহে ছড়িয়ে দিচ্ছিল সে। আর তার মনটা স্মরণের বায়ুতরঙ্গ আশ্রয় করে ফিরে গেল অনেক—অনেক বছরের নেপথ্যে। তাদের সেই প্রথম যৌবনের দিনগুলোতে। সেই রাজাসাহেব! আজ কত বদলে গেছে! অথচ সেদিন! সেদিন সে ছিল কেয়াবনের বাঘের মত হিংস্র। বল্লম ফুঁড়ে মেছো কুমীর তুলে আনত অথৈ নদী থেকে। বিলান দেশে চিতাবাঘ কোপাতে যেত। কাজিয়ার ইঙ্গিতে রক্তের খরধারায় গুরু গুরু বাজ চমকাত তার। সে কাহিনী যেন আজ ইতিহাস। গল্পকথার মতো অসত্য মনে হয়। অথচ, সেদিন কী আশ্চর্যভাবেই না সত্য ছিল তারা! আর আজ? এমন একটা মারদাঙ্গার সুযোগ মুঠির মধ্যে পেয়েও দু'দলকে থামিয়ে দিল রাজাসাহেব। সত্যি, অবাক হবার মতো ঘটনা। তবে সেদিনের পেশীতে পেশীতে কালনাগের যে ফণারা নেচে উঠত, কোন সাপুড়েরর বাঁশীতে তারা ঘুমিয়ে পড়েছে? কোন পাশাবতীর কুহকে জন্মান্তর হল রাজাসাহেবের? দিশা হারিয়ে ফেলে নাগমতী বেদের মেয়ে। একই বহরে পাশাপাশি তারা ছেলেবেলা থেকে যৌবনে পৌঁছেছে। শঙ্খিনী আর রাজাসাহেব। সেই আসমানীর বহরের কথা মনে পড়ল শঙ্খিনীর। মনের মধ্যে যখন গুনগুনিয়ে উঠেছিল নতুন বয়সের মৌমাছি, কথারা ফুটেছিল কৃষ্ণকলি হয়ে, রাজাসাহেবের বাঘের মতো চোখ দু'টোতে কী এক মাদক ছায়া নেমেছিল আর তার সারাটা দেহ একটি নিবেদনের মতো কোমল হয়ে উঠেছিল, ঠিক তখনই তাদের মাঝখানে বিশাল একখানা পাহাড় উঠে দাঁড়াল। দৌলতপুরের ঝড়ে তাদের সেই বহর রাক্ষুসে নদীর অতল তলে তলিয়ে গিয়েছিল। স্রোতের টানে কুটোর মতো দলের কে যে কোথায় ভেসে গিয়েছিল তা আজ আর মনে নেই। শুধু মনে আছে রাজাসাহেবকে। প্রথম যৌবনের সেই মনোরম দিনগুলি তার সাহচর্যে কুসুমিত হয়ে উঠেছিল। তাকে আজও ভুলতে পারে নি শঙ্খিনী।

রাজাসাহেব বলল, 'দ্যাখ শঙ্খিনী, তুরা এই বিলে আগে আসছস। আমরা চইল্যা যাই। কাইল সকালে রওনা হমু। এইবার চরসোহাগীতে গিয়া 'পারা' পুতুম। খুশি তো?'

চমকে উঠল শঙ্খিনী। তার কণ্ঠে আর্তনাদ চকিত হল, 'না না, রাজাসাহেব—তুই যাইস না। কতদিন পরে তুরে দেখলাম। তুরে কী আমি ছাড়তে পারি?'

'কিন্তুক দুইটা দল একলগে! বেফয়দা কাজিয়া আমার ভাল লাগে না। সেই দিন আর নাই আমার।'

'আমি আমার দলের আম্মা। আমি যা কমু তাই হইব।' পিঙ্গল চোখ দু'টো ঝলসে উঠল শঙ্খিনীর, 'আর কাজিয়া বাধাইলে তো কাজিয়া হইব।'

কিছু সময়ের যতিপাত। তারপর আবার বললে শঙ্খিনী, 'আইচ্ছা, একটা কথা জিগামু?'

'কী কথা?'

'কাজিয়ার কথায় এমুন ডরাস ক্যান? আগে তো এমন আছিলি না! এই কয়টা বছরে হইল কী তুর?' তৃষিত চোখে তাকাল শঙ্খিনী।

রাজাসাহেবের মুখে বিবর্ণ হাসি, 'আগেই তো কইছি, কাজিয়া আমার ভাল লাগে না। এই বেবাজিয়া জনমটা বিষের মতো লাগে। আইজ এইখানে, কাইল সেইখানে—মনে হয়, কুনোখানে পলাইয়া গিয়া ঘর বান্ধি। চাষ করি, আবাদ করি। এমুন দুনিয়া জুইড়া ঘুরাঘুরি আর ভাল লাগে না শঙ্খিনী। যেই গেরামেই যাই, চৌকিদার লাঠি লইয়্যা আসে, ভূইয়া আইসা শাসাইয়া যায়। বিষপাথর আর সাপের নাচ দ্যাখাইয়া প্যাট ভরে না। চুরি করলে জলপুলিশে ফাটকে লইয়্যা যায়। এইর থিকা চাষীগো লাখান ঘর বান্ধন অনেক ভাল।'

শিউরে উঠল শঙ্খিনী। চমকে উঠল দু'দলের বেবাজিয়ারা। বলে কী রাজাসাহেব! এ কী অশুভ সংকেত! বেবাজিয়ার খরস্রোত জীবনে এ কোন অভিশপ্ত নোঙর ফেলার স্বপ্ন! আল্লা-বিষহরির কাছে এ কোন ভয়ঙ্কর গুণাহ্? আল্লা আর বিষহরির ক্রোধাগ্নিতে ছারখার হয়ে যাবে সারা পৃথিবীর ভাসমান বেদে-সংসার! এ বিশ্বাস বেদেদের আবহমান কালের।

শঙ্খিনী চমকে ওঠে, 'এমুন কথা কইতে নাই রে রাজসাহেব। বিষহরির গুণাহ্ আইস্যা পড়বো। আমরা বেবাজিয়া, ঘরের বান্ধন আমাগো লেইগ্যা না। আর এমুন কথা কইস না। মা বিষহরি যদি একখান শঙ্খচূড় চালান করে তো জান নিয়া নিব। জয় মা বিষহরি!' আশঙ্কায় উদ্বেগে তার গলা কাঁপতে থাকে।

চারপাশে বেদেদের কপালে যুক্তকর উঠে এল, 'জয় মা বিষহরি।'

রাজাসাহেবের পাণ্ডুর হাসি ম্লানতর হল, 'কী করুম ক'! বেবাকই বুঝি শঙ্খিনী। কিন্তুক এই ভাইস্যা বেড়াইতে আর মন লাগে না। সাচা কথাখান কইলাম।'

আর একবার চমকে উঠল বেবাজিয়ারা। তারপর চারপাশ থেকে অখণ্ড নীরবতা পাথরের মতো ঘনিয়ে আসতে লাগল।

একসময় শঙ্খিনী বলল, 'তুর কী হইছে ক' দেখি রাজাসাহেব! শরীলের সেই ত্যাজ নাই, ঘর বানতে চাইস্। আমার কাছে মনের কথাখান সাফা কইর‍্যা ক'।'

রাজাসাহেব বলল, 'তুই যে রাজাসাহেবরে জানতি, সে কবে মইর‍্যা গেছে। আমি অন্য মানুষ।'

আচমক খিল খিল করে হেসে উঠল যাযাবরী, 'আইচ্ছা, আইচ্ছা—তোর বেবাক রোগ আমি সারাইয়া দিমু।'

'ক্যামনে?'

'ফুসমন্তর শিখছি। ধূলপড়া শিখছি ভৈরবীর মশানে বইস্যা। বেবাজিয়া যুয়ানরে বশকরণের মন্তর। মনের উপুর একমুঠ ধূলপড়া ফিক্যা (ছুঁড়ে) দিমু।'—খিল খিল হাসি গমকে গমকে, ঠমকে ঠমকে বেজে উঠল শাঙ্খিনীর, 'আইজ্জ বিকালে আমার বহরে তুর দাওয়াত (নিমন্ত্রণ) রাজাসাহেব। যাবি তো? তুর লেইগ্যা দশ বছরের কথা জইম্যা আছে বুকে। তুর লেইগ্যা দশ বছরের বেদনা উথলপাথল করে কলিজায়।'

চোখ তুলে ধীরে ধীরে মাথা দোলাল রাজাসাহেব। আর একটু পরেই দামঘাসের জঙ্গলটা বিধ্বস্ত করে উধাও হল জুলফিকাররা। পায়ের নিচে নধর দূর্বার গালিচা। চলতে চলতে শঙ্খিনী পুরনো দিনগুলোয় ফিরে গেল।

আসমানীর সেই বহর ডুবির পর কতগুলো বছর পার হয়ে গেছে। ওলট পালট হয়ে গেছে রাজাসাহেবের জীবন। সেদিন শাহাবাজপুরের এক ভুইঞার নির্দেশে এক রাত্তিরে বারোটা লোককে বল্লমের ফলায় লাস বানিয়ে কালিদীঘির ঘাসবনের নিচে লুকিয়ে রেখে এসেছিল। ভোর রাত্রে পোহাতি তারা মাথায় নিয়ে বহরে ফিরেছিল রাজাসাহেব। কোমরের গোপন গ্রন্থিতে ভরে এনেছিল একশোটা কাঁচা টাকার মধুর বাজনা। সেদিনের সেই ভয়াল মানুষটা আজকের রাজাসাহেবের প্রতিটি দেহকোষ থেকে জলের লেখার মতো মুছে গিয়েছে। আশ্চর্য! আজ সামান্য একটা কাজিয়ার ইঙ্গিতেও শিউরে ওঠে রাজাসাহেব। নানা এলোমেলো ভাবনা জটলা করছে শঙ্খিনীর মস্তিষ্কে। নানা গ্রন্থিহীন ভাবনা। আশ্চর্য! দশ বছর আগে রাজাসাহেবের দেহমন ঘিরে মৌচাক বাঁধতে চেয়েছিল শঙ্খিনী। অথচ আজ দু'জনেই আলাদা দল করেছে। আর দু'জনের দলই সড়কি-বল্লম নিয়ে পরস্পরের ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আশ্চর্য এই সময়, আশ্চর্য তার রহস্য! ভাবতে ভাবতে বিমনা হয়ে যায় নাগমতী বেদেনী। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ চমকে উঠল সে। রাজাসাহেবের যাযাবর-রক্তে এ কোন ঘরের স্বপ্ন ছোবল মারল! এ বিষের মন্তর জানে না যাযাবরী। ঘরের নেশা তো তার রক্তকে আচ্ছন্ন করে আনে। একখানা চেলি আর সিঁদুর সেও তো সংগ্রহ করেছে। সেও তো বউ সাজে। কিন্তু চিরকালের বেদে বহরকে নির্বাসন দিয়ে যে গৃহাঙ্গনের আমন্ত্রণ, তার জন্য তেমন কোনও মোহই নেই শঙ্খিনীর। ঘরের সেই কুহক থেকে যাযাবর-জীবনের খরধারায় আবার ফিরিয়ে আনতে হবে রাজাসাহেবকে—যেমন করে হোক, শঙ্খিনী তাকে ফেরাবে।

রাজাসাহেব আসবে। বুকের মধ্যে কোথায় যেন মৌমাছির গুনগুনানি শুনছে শঙ্খিনী। স্নায়ুগুলোর ওপর দিয়ে মধুর আবেশ ছড়িয়ে পড়ছে আফিমের মৌতাতের মতো। দেহমন তরঙ্গিত করে সুখ-শিহরন উঠছে—ছলাৎ ছল। হাজারমণী নৌকোর পাতাল থেকে জানালার মধ্য দিয়ে খুশি খুশি চোখ দু'টো বাইরে ছড়িয়ে ছিল শঙ্খিনী। এখন গোধূলি। সোনাইবিবির বিলের ওপর বেলাশেষের আলো সোনালি আবীর হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। আজ বড় ভাল লাগছে দূরের কাশবন, কষাড় জঙ্গল। ভাল লাগছে অর্জুনের শাখায় ওই পান্নারঙের মাছরাঙাটাকে। ভাল লাগছে নিজের সুধাস্বাদ তনুদেহ। মুগ্ধ কণ্ঠ থেকে গানের বৃষ্টি ঝরছে ঝর ঝর ঃ

সাপের বিষে যেমন তেমুন, প্রেমের বিষে দু'গুণ ধায়—
গৌরাঙ্গ ভুজঙ্গ হইয়া দংশিয়াছে আমার গায়।
বিষের জ্বালা যেমুন জ্বালা প্রেমের জ্বালায় আগুন ধায়।
গহীন গাঙে নামলে পরে এই জ্বালা না জুড়ান যায়।

শঙ্খিনীর চেতনায় এই বিল, এই গোধূলি, এই পৃথিবী অপরূপ হয়ে ধরা দিয়েছে।

একসময় খাল থেকে সাজিমাটি দিয়ে মুখ মেজে এল শঙ্খিনী। রাশি রাশি চুলের মেঘে ছড়িয়ে দিল সুরভিত তেল। কপালের মধ্যবিন্দুতে কাচপোকার সবুজ টিপ আঁকল। এই দেহের প্রতিটি কণাকে সুধায় ভরিয়ে রাখতে হবে। মনের অতলে গুন গুন গুঞ্জন জাগছে। রাজাসাহেব আসবে।

একটু পরে সোহাগী গলায় শঙ্খিনী ডাকল, 'পালঙ্কী, ওলো পালঙ্কী, এই নৌকায় আয় লো আহ্লাদী।'

পাশের একটা নৌকো থেকে শঙ্খিনীর নৌকার পাটাতনে এসে বসল পালঙ্ক। তার বিস্মিত দৃষ্টির সামনে অজস্র প্রসাধনের জিনিস ছড়িয়ে রয়েছে।

শঙ্খিনী বলল, 'আমার চুলটা একটু বাইন্ধ্যা দে লো সোহাগী।'

কাঠের চিরুনি নিয়ে শঙ্খিনীর চুলে পরিপাটি খোঁপা করে দিল পালঙ্ক। সামনে একখানা হাত-আরশি নিয়ে চোখের কোলে সুর্মার নিপুণ রেখা আঁকল শঙ্খিনী। বিন্দু বিন্দু শ্বেতচন্দনের আলপনা টানল কপালে। প্রকাণ্ড খোঁপার ফাঁকে ফাঁকে রক্তমান্দারের ফুল সাজাল একটি একটি করে। তারও পর সবুজ রেশমের কাঁচুলি দিয়ে বক্ষকুম্ভ দু'টি সাজাল। কোমর থেকে জাফরানী ঘাঘ্‌রা দুলিয়ে দিল। শঙ্খমণি সাপের রাশি রাশি হীরকদাঁত দিয়ে মালা গেঁথেছিল। গলায় সাজিয়েছিল সেই হার। নাকে পোখরাজের বেসর। কানে রক্তপাথরের কানফুল। মণিবন্ধে গোছায় গোছায় আয়না-চুড়ি। কোমরে কুঁচিলা সাপের হাড়ের গোট। পায়ে ঝুমঝুম কাঁসার মল। শঙ্খিনীর সারা শরীর বিদ্যুৎ চমকের মতো যেন ঝলকাতে লাগল।

অপলকে শঙ্খিনীর দিকে তাকিয়ে ছিল পালঙ্ক। একেবারেই নির্নিমেষ। শঙ্খিনীর সারাদেহ থেকে নাগমতী মুছে গিয়েছে। একটু একটু করে সে দেহে জন্ম নিয়েছে কে এক অপরূপ রূপকন্যা। কে এক তিলোত্তমা। পালঙ্কের মনে হল, এ শঙ্খিনীকে সে চেনে না। পলক পড়লেই অসত্য একটা স্বপ্নের কুয়াশায় সে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

শঙ্খিনী হাসল, 'কী লো, আমারে পছন্দ হয়?'

একেবারে সম্মোহিত হয়ে গেছে পালঙ্ক। মাথা নাড়ল সে, 'হুঁ।'

'আ লো শালিক পঙ্খী, তোর পছন্দ হয়! আমারে সাদী করবি?' প্রগলভ গলায় হেসে উঠল শঙ্খিনী, 'আমারে সাদী কইর‍্যা আর কী হইব! আমি তো এট্টা মাগী।'

নিরুত্তর বসে রইল পালঙ্ক। একবার ভীরু ভীরু চোখ তুলে তাকাল ভুঁইচাপা মেয়ে। বেদিশা হয়ে যাচ্ছে সে। কী জবাব দিতে হবে, তার জানা নেই।

শঙ্খিনী বলল, 'তুর তো বউ সাজতে সাধ হয়, ঘর বানতে মন লয়। তাই না লো শালিক?'

'হুঁ।' অস্ফুট একটি শব্দ বেরিয়ে এল পালঙ্কের ঠোঁট থেকে।

অন্য কোন সময় হলে হয়তো গর্জন করে উঠত শঙ্খিনী। হয়তো কোন বিপর্যয় ঘনিয়ে আনত। কিন্তু এই গোধূলির রং আলাদা। শুধু খিল খিল করে সারেঙ্গীর বাজনার মতো হেসে উঠল শঙ্খিনী।

খানিকটা সময়ের বিরতি। তারপর শঙ্খিনী বলল, 'হা কইর‍্যা আমারে যে গিলতে আছস, শ্যাষে ভাতের খিদা থাকব তো! শোন, বউ সাজলে আমার থিকা তুরে অনেক সোন্দর দেখায়। এক এক সময় মনে হয়, তুরেই সাদী কইর‍্যা ফেলাই। শোন লো শালিক পাখ্খি, আইজ আমার নাগর আসব। তার দিকে নজর দিবি না লো শালিক। সাবধান!' শেষের কথাগুলো বলেই চমকে উঠল শঙ্খিনী। জিভের ওপর তক্ষকের ছোবল এসে পড়েছে যেন সহসা। গম্ভীর হল শঙ্খিনী। কঠিন হল কণ্ঠ। নাঃ, অনেকটা প্রগলভ হয়ে পড়েছিল সে। শঙ্খিনী বলল, 'যা, ভাগ পালঙ্কী।'

একবার ভীরু চোখে শঙ্খিনীর মুখের দিকে তাকায় পালঙ্ক। সে মুখে কোনও প্রশ্রয়ই লিখিত নেই।

শীতের বেলাশেষ সোনার হরিণ হয়ে পলাতক হল দিগন্তে। এখন প্রাক্‌সন্ধ্যা। সোনাইবিবির বিলে যেন রাশি রাশি ধূসর পাখা ছড়িয়ে দিয়েছে একঝাঁক সিন্ধুশকুন। চারিদিকে ধূপছায়া রং।

বিলের পারে আগুনের কুণ্ড রচনা করেছে বেদের দল। আর সেই আকাশ-ছোঁয়া শিখার মধ্যে হিংস্র আনন্দে বেবাজিয়ারা ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে অজস্র আহত পাখি। বিলের আর এক তেপান্তরে দামঘাসের নিরীহ পাখিদের রাজ্যে বেদেরা গিয়েছিল গোধূলিবেলায়। নিথর জলের আয়নায় খুশি খুশি মুখ দেখছিল পাখিরা। অজস্র পাখি। জলপিপি, বখারি, ডাহুক, বালিহাঁস। নিষ্ঠুর ব্যাধের মতো তারা হত্যা করে এনেছে রাশি রাশি পাখি। দামঘাসের নিরীহ রাজ্যে হাহাকার তুলে এসেছিল বেদেরা। রাজাসাহেব আসবে। তাই এই মৃত্যুর উৎসব। শঙ্খিনীর নির্দেশ, তাই এই হত্যার পার্বণ। মাঝে মাঝে প্রচণ্ড উৎসাহে আনন্দিত চিৎকার করে উঠছে বেবাজিয়ারা, 'হা-লা-লা-লা, হা-লা-লা-লা-লা। হুই ধিনাক্ ধিনা, হুই ধিনাক্ ধিন।' কেউ কেউ আবার ঢোলক আর বাঁশি নিয়ে আগুনের চারপাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেছে। এক কিনারে দু'টি সতর্ক বাহুর আড়ালে গোটাকয়েক দেশি মদের বোতল পাহারা দিচ্ছে জুলফিকার। চারিদিকে অগুনতি শূন্য বোতল গড়াগড়ি দিচ্ছে। সুরারসে সকলের দৃষ্টি আরক্ত। আর সেই রক্তিম দৃষ্টিগুলো লোলুপ হয়ে আগুনের কুণ্ডটায় এসে পড়েছে। পাখির মাংস ঝলসে কাঁচাত্বের পর্যায়টুকু পার হবার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়বে। শিকারী থাবা শানাচ্ছে সকলে। রাজাসাহেব আসবে, শঙ্খিনী তাই এই খুশির ভোজ দিয়েছে। ঢোলকের বাজনা উঠছে কুরু কুরু। মাতাল সুর বাজছে বাঁশিতে। প্রেমিক কণ্ঠ উদাস হয়ে উঠছে কারও, 'কেমন কইর‍্যা থাকি লো সই শ্যামের বিহনে!' মদের একটা আধ্যাত্মিক প্রভাবও আছে। কেউ কেউ আগুনের কুণ্ডটা থেকে অনেক দূরে যোগাসন করে বসেছে। নিরাবরণ আকাশ। শীতের বাতাসে কামটের দাঁত বেরিয়েছে। কোনও দিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই

তাদের। পৃথিবী সম্বন্ধে একেবারেই নির্লিপ্ত তারা। মাঝে মাঝে শুধু উচ্ছৃঙ্খল চিৎকার উঠছে, 'হা-লা-লা-লা হা-লা-লা-লা-লা—'

সন্ধ্যা পার হল। নিবিড় রাত্রি নামল। শঙ্খিনীর দীর্ঘ প্রতীক্ষা শেষ। এতক্ষণে রাজাসাহেব এসেছে। তার পদধ্বনির আশায় ভীরু খরগোশের মতো উৎকর্ণ হয়ে বসে ছিল শঙ্খিনী, সেই বিকেল থেকে। বিলের পারে আগুনের কুণ্ডটার চারপাশ থেকে একটা উল্লসিত সোরগোল উঠল। সেই সোরগোল কুণ্ডলিত হয়ে উঠে গেল আকাশে। রাজাসাহেব আসছে, রাজাসাহেব আসছে।

নৌকার পাটাতনে চকিত হয়ে উঠল শঙ্খিনী। নিজের অঙ্গসজ্জার দিকে তাকিয়ে অপরূপ লজ্জায় দৃষ্টি যেন আচ্ছন্ন হয়ে এল তার। সমস্ত দেহমনে সুখ যেন তরল স্রোতের মতো ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

কয়েকটি বিবশ মুহূর্ত। তারপর ত্রস্ত পদক্ষেপে নৌকোর পাটাতন থেকে বিলের মাটিতে নামল শঙ্খিনী। রাজাসাহেবের কাছাকাছি এসে ব্যগ্র মুঠির মধ্যে বিশাল হাত দু'খানা তুলে নিল তার।

বাইরে শীতের রাত খরধার হয়ে উঠছে। তার কামড় দেহের অনাবৃত চামড়ায় জ্বালা ছড়াচ্ছে। মদির গলায় শঙ্খিনী বলল, 'নৌকায় আয় রাজাসাহেব। বাইরে বেজায় শীত।'

বিলের মাটি থেকে হাজারমণী নৌকোর উষ্ণ, আরামদায়ক অভ্যন্তর। পাটাতনের একধারে হেরিকেন জ্বলছে। লালাভ আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে। একটা রেশমি গালিচা বিছিয়ে দিল শঙ্খিনী। তারপর রাজাসাহেবের পাশে নিবিড় হয়ে বসল।

অভিমানী গলায় শঙ্খিনী বলল, 'তুর লেইগা সেই বিকাল থিকা পথের দিকে চাইয়্যা বইস্যা রইছি। তুর দেখাই নাই। আমার লেইগা তুর মনে কুনো দরদ নাই জানি। বুঝছি, আর কুনো শয়তানী তুরে মন্তর করছে। ধূলপড়া দিছে তুর মনে। আমিও বিষ-বাইদ্যার মাইয়া। বেবাক মন্তর কাটান কইর‍্যা দিমু। তুই আইজ রাইতে আমার কাছে থাকবি।'

শঙ্খিনীর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রক্তে রক্তে আদিম যাযাবর যেন কথা কয়ে উঠল। রাজাসাহেবের মাতাল দৃষ্টির ওপর একটা মাকড়সা যেন জাল বুনতে শুরু করেছে। বাইরে শীতার্ত বিল, হু-হু বাতাসের হাহাকার। আর এই নির্জন নৌকার পাটাতনে অপরূপা এক বেদের মেয়ে। তার জাফরানি ঘাঘরায়, রেশমি কাঁচুলিতে, সুর্মা-টানা চোখে শীতের এই রাত আশ্চর্য এক রহস্য মাখিয়ে দিয়েছে। রমণীয় এক লাস্য জড়িয়ে দিয়েছে। হৃৎপিণ্ডের ভেতর হাজারটা ঢাক দ্রুততলে বেজে উঠল রাজাসাহেবের। শঙ্খিনীর বুকের কাছে ঘন হয়ে এল সে।

শঙ্খিনী বলল, 'আমারে পছন্দ হয় তুর? আসমানীর বহরে থাকলে এতদিন আমাগো সাদী হইয়া যাইত। দশটা বছর দুইজনে চোখের ফারাকে থাকতাম না।' শঙ্খিনীর ফিসফিস কণ্ঠ একসময় গাঢ় হল। তারপর নীরবতা।

কিছু একটা জবাব দিত রাজাসাহেব। তার আগেই নৌকোর ভেতরে এল পালঙ্ক। তার পেছনে আতরজান, গহর আর ডহরবিবি। অনেকগুলো দেশী মদের বোতল এনেছে তারা। মাটির সানকিতে এনেছে নানা স্বাদের, নানা রঙের মাংস। জলপিপি ঝলসে এনেছে। মাংসের পিণ্ডটা কদমফুলের আকার নিয়েছে। কুঁচিলা সাপের কাবাব। ইমলি পাখির ছালুন। খাসীর মাংস দিয়ে কোর্মা বানিয়েছে। ওরা মদের বোতল আর মাটির-সানকিগুলো পরিপাটি করে সাজিয়ে দিল ডহর বিবি।

চারিদিকে একবার তাকাল রাজাসাহেব। পাটাতনের এক পাশে কাঁথাকানির পাহাড়। জড়িবুটির ডালা। শঙ্খনাগ চক্রচূড়ের অজস্র ঝাঁপি। নিরবধি কাল থেকে বেদে-নৌকার সেই এক স্থির চিত্র, সেই অক্ষয় শিল্প। রাজাসাহেবের দৃষ্টিটা চক্রাকারে ঘুরপাক খেতে খেতে আচমকা পালঙ্কের ওপর এসে পড়ল। উন্মনা ভুঁইচাঁপার মতো একটি মেয়ে। রাঙা ডুরে শাড়ি পরেছে পালঙ্ক। ছিমছাম খোঁপায় কিছু হিজল ফুল। ভীরু ভীরু চোখে শান্ত গৃহাঙ্গনের ছায়া। রাজাসাহেবের দৃষ্টি স্নিগ্ধ হল। পালঙ্কের দিকে তৃষিত চোখে তাকিয়ে রইল সে, নির্নিমেষে। মনে হল, ওই শান্ত চোখের ছায়ায় তার কামনা চরিতার্থ হবে। তার ঘরের স্বপ্ন সার্থক হয়ে উঠবে।

একই গালিচার ওপর দু'টি নারী। শঙ্খিনী আর পালঙ্ক। শঙ্খিনীর দিকে তাকালে দৃষ্টিতে নেশা লাগে। চেতনায় ঘোর ঘোর মাতন জাগে। স্নায়ুগুলো ধনুকের ছিলার মতো উত্তেজিত হয়। আর পালঙ্ক ছায়া দেয়, দৃষ্টিকে প্রসন্ন করে, স্নিগ্ধ মায়ায় দু চোখ ভরে দেয়। শঙ্খিনী থির বিজুরি, পালঙ্ক ভুঁইচাঁপা।

এখনও পালঙ্কের দিকে তাকিয়ে আছে রাজাসাহেব। আচমকা বাঘের মতো গর্জে উঠল শঙ্খিনী, 'এই পালঙ্কী, এই নটী মাগী। ভাগ ইখান থিকা।'

চমকে উঠল পালঙ্ক। কখন যেন শান্ত চোখ দু'টি রাজাসাহেবের দৃষ্টিতে সমর্পণ করেছিল সে, খেয়াল ছিল না। রাজাসাহেবের মুগ্ধ চোখে অপরূপ ইঙ্গিত পাঠ করেছে সে। শঙ্খিনীর গর্জনে চকিত হল পালঙ্ক। ত্রস্ত চোখ দু'টো সরিয়ে নিল আর এক দিকে, তারপর উঠে দাঁড়াল। শঙ্খিনীর নির্দেশ, নৌকার বাইরে যেতে হবে।

আচমকা ব্যগ্র হাত বাড়িয়ে পালঙ্কের আঁচল ধরে ফেলল রাজাসাহেব, 'যাও কই নাগরী? বস, বস। এত সব বানাইয়া আনলা, খাইবা না?'

শঙ্খিনী বলল, 'উরে ছাইড়্যা দে রাজাসাহেব। উ মদ খায় না, মাংসও ছাড়ান দিছে। একেবারে বৈষ্টমী। হি-হি-হি!' খিলখিল হাসির তুফান তুলল শঙ্খিনী।

রাজাসাহেব বলল, 'আমিও তো মদ খাওন ছাইড়্যা দিছি।'

কান দু'টো বিশ্বাসঘাতকতা করছে না তো! বলে কী রাজাসাহেব! কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে বসে রইল শঙ্খিনী। তারপরেই প্রবল হাসিতে ভেঙে পড়ল, 'তবে তো তুর লগে উই শালিক পঙ্খীর ভাল মানাইবো।'

বলতে বলতে জিভের ওপর আলাদ গোক্ষুরের ছোবল পড়ল যেন। চমকে থেমে গেল শঙ্খিনী। আর চারটে চোখ চকিতে মিলিত হল আবার। তারপরেই অর্থময় দৃষ্টি সরিয়ে নিল পালঙ্ক আর রাজাসাহেব।

খানিক পর নৌকোর 'ছই' থেকে বেরিয়ে গেল পালঙ্ক। তার পেছনে পেছনে

বাইরের নিশ্ছেদ অন্ধকারে মিলিয়ে গেল ডহরবিবি, গহর আর আতরজান।

বাইরে শীতের রাত্রি আরও গহন হয়েছে। আরও নিবিড় হয়েছে। প্রেতিনীর কান্নার মত বাতাস বেজে চলেছে সাঁইঘাসের মধ্য দিয়ে। বিলের পারে আগুনের কুণ্ডটার চারপাশে যাযাবরেরা আরও ঘন হয়ে বসেছে। শীতার্ত রাত্রি তাদের উৎসাহ স্তিমিত করে দিয়েছে। এখন আর আনন্দিত চিৎকার সোনাইবিবির বিল কাঁপিয়ে তুলছে না।

এদিকে শঙ্খিনীর নৌকোয় পাটাতনের ওপর হেরিকেনের আলোটা স্থির হয়ে রয়েছে। রাজাসাহেবের আলিঙ্গনের সীমানায় অন্তরঙ্গ হয়ে এল শঙ্খিনী। মাদকতা-ভরা গলায় বলল, 'তুরে ছাড়া আমি থাকতে পারুম না রাজাসাহেব।'

'সাচা কথা?'

'সাচা। যে কসম খাইতে কইস, সেই কসম খামু। তুই আমার হ রাজাসাহেব।' নিবিড় আকুলতা ফুটে বেরুল নাগিনীকন্যার কণ্ঠে।

'তাই যদি হয়, তবে চল আমরা ঘর বান্দি। ছানাপোনা হইব। যাবি শঙ্খিনী?' দু'টি ব্যগ্র বাহুর বৃত্তে শাঙ্খিনীকে বন্দি করে ফেলল রাজাসাহেব, 'গেরামে গেরামে চাষীগো দেখছস তো, কী বাহারের সোয়ামী আর বউয়ের পীরিত! তুর মনে ধরে না সেই সগল? ভাল লাগে না?'

'লাগে তো, কিন্তুক এই বহর আরও ভাল লাগে। এই ভাইস্যা ভাইস্যা বেড়াইতে, সাপ নাচাইতে, বিষ নামাইতে আরও ভাল লাগে। আমাগো বাজান আছিল বাইদ্যা, দাদা-নানা আছিল বাইদ্যা। তাগো রক্ত শরীলে রইছে। বেবজিয়া বহর ছাইড়া কেমনে ঘর বান্ধুম! না না রাজাসাহেব, এই মতলব ছাড়। বিষহরির গুণাহ্ লাগলে বেবাক ছারখার হইয়্যা যাইব। তুই আবার আগের মতো হ।'

'আমি উই বিষহরি মানি না।' অত্যন্ত নির্মম শোনাল রাজাসাহেবের কণ্ঠ, 'অনেক দিন ধইর‍্যা বহর ছাইড়্যা যাওনের ইচ্ছা আছিল। নানা ঝামেলায় পারি নাই। এইবার যাইতেই হইব।'

রাজাসাহেবের আলিঙ্গনের মধ্যে একেবারে পাথর হয়ে গেছে শঙ্খিনী। পুরোপুরি নিষ্প্রাণ। মেরুদণ্ড বেয়ে হিমধারা নামতে শুরু করেছে তার। রক্তের প্রতিটি কণায় কণায়, দেহের প্রতিটি কোষে কোষে সে বিষকন্যা। এই জল-বাংলার খালে বিলে নদীতে ভেসে ভেসে লখিন্দরদের পাহারা দেয় সে। তার বিশ্বাস, আজন্ম বেদেরা বিষহরির আদেশে ভেসে বেড়াচ্ছে এ ঘাট থেকে সে ঘাটে। এক বন্দর থেকে আর এক গঞ্জে। এক জনপদ থেকে দূরতম কোনও গাঁয়ে। ভাসমান বহর থেকে তাদের কোনও দিনই মুক্তি নেই। নীড়ের প্রেম তাদের জীবনে অভিশাপ হয়ে আসে। এই বেবাজিয়া জীবন শতবাহু দিয়ে বেঁধে রেখেছে তাদের। এখান থেকে পালিয়ে গেলে আর নিস্তার নেই।

একসময় রাজাসাহেবের বাহু শিথিল হল। সে বলল, 'আমি এইবার যাই শঙ্খিনী।'

আর্তনাদ করে উঠল শঙ্খিনী, 'তুই তো কিছুই খাইলি না?'

'খিদা নাই একেবারে।'

'তুই চইল্যা যাবি রাজাসাহেব! একটা রাইতও তোরে পামু না নিজের মতো

কইর‍্যা!' বিষকন্যার দু চোখে বিন্দু বিন্দু জল জমল। শিশিরের মতো অশ্রু।

রাজাসাহেব হাসল, 'তুই তো আমারে চাস না।'

'ক্যামনে তুরে পামু ক'?'

'এই বহর ছাইড়্যা আমার লগে যাইতে হইব। পারবি? বাইদ্যানী আছিলি, হবি কিষাণের বউ। পারবি?' হো-হো করে হেসে উঠল রাজাসাহেব।

এক দিকে রাজাসাহেব, আর এক দিকে যাযাবর জীবন। বিষবেদের মেয়ে সে। বিষহরির আদেশ অমান্য করে কেমন করে? কেমন করে দলিত করে জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার? একদিকে জীবনের প্রথম পুরুষের উষ্ণ প্রেম, আর একদিকে যাযাবর জীবনের ঊর্ণনাভ-নেশা। দিশাহারা হয়ে গেল শঙ্খিনী। এলোমেলো গলায় বলল, 'আমারে ইট্টু ভাবনের সময় দে রাজাসাহেব। ভাইব্যা লই। তুই আবার আসবি তো?'

'আসুম, লিশ্চয় আসুম। তুর বহরের আর এক পীরিতে পড়ছি আমি। আইতে তো হইবই। না আইলে মনটা ফাকুর-ফাকুর করব।' রহস্যময় গলায় হেসে উঠল রাজাসাহেব।

অজানা এক আশঙ্কায় কেঁপে উঠল শঙ্খিনী। রাজাসাহেবের হাসির ইঙ্গিতটা বার বার ধরতে গিয়েও ধরা যাচ্ছে না। আচমকা চোখ দু'টো তুলে দেখল, রাজাসাহেব কখন যেন চলে গেছে। এই শূন্য নৌকো, এই শূন্য মন, গালিচার ওপর পরিপাটি সাজানো অসংখ্য সুখাদ্যের সানকি—সব মিলিয়ে চেতনাটা যেন জ্বালা করে উঠল। এক রাশ গলিত পিণ্ডের আকারে একটি নাম গলা বেয়ে উঠে আসতে চাইল শঙ্খিনীর। সে নাম সম্ভবত পালঙ্কের। অসহ্য এক জ্বালাকে কয়েকটা ঢোক গিলে ঠেকাতে চেষ্টা করল শঙ্খিনী। প্রচণ্ড আক্রোশে মনটা ফুলতে লাগল, ফুঁসতে লাগল, দুলতে লাগল।

দামঘাসের ঘন জঙ্গলে ঝিঁঝিদের বাজনা বাজছে। পাল্লা দিয়ে ঐকতান শুরু করেছে ব্যাঙেরা। বনহিজলের পাতায় পাতায় সবুজ পান্নার মতো জ্বলছে শত শত জোনাকি। আর সোনাইবিবির বিলে গাঢ় হয়ে নামছে অন্ধকার। ঘনতম হয়ে ঝরছে শীতের রাত্রি। সবুজ ঘাসের পথ—আঁকাবাঁকা, এবড়ো থেবড়ো। একটু অসতর্ক হলেই একেবারে মাধ্যাকর্ষণ। সতর্ক পা ফেলে ফেলে এগোতে লাগল রাজাসাহেব। তিনটে কষাড় ঝাড় পার হয়ে এসেছে সে। পেছনে ফেলে এসেছে ক্ষুদ্রজল খালের পাঁচটা বাঁক। চলতে চলতে একবার ফিরে তাকাল সে। এখান থেকে শঙ্খিনীর বহরটা নজরে আসে না। দূরের কষাড় জঙ্গলটার আড়ালে বেদেদের অগ্নিকুণ্ডটা অদৃশ্য হয়ে গেছে।

শীতার্ত বাতাস অনাবৃত চামড়ার ওপর চাবুকের মতো কেটে কেটে বসছে। অসহ্য যন্ত্রণায় কুঁকড়ে আসছে পেশীগুলো। আঙুলের ডগাগুলো ঝিঁ ঝিঁ করছে। রাজাসাহেবের মনে হল, চামড়া ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসবে। দ্রুত পা চালিয়ে দিল সে। অনেকটা পথ এখনও তাকে পেরিয়ে যেতে হবে। তার পর উষ্ণ বিছানার আশ্বাস।

সামনে একটা পিয়াল গাছের নিচে এসে থমকে দাঁড়াল রাজাসাহেব। একটি স্নিগ্ধ

আহ্বান দ্রোণফুলের মতো ফুটে উঠল সেখানে, 'রাজাসাহেব—'

চমকে উঠল রাজাসাহেবের কণ্ঠ, 'কে?'

'আমি পালঙ্ক।' পিয়ালের আড়াল থেকে রাজাসাহেবের সামনে এসে দাঁড়াল পালঙ্ক। স্নিগ্ধ গলায় সে বলল, 'সেই কখন থিকা তুমার লেইগ্যা খাড়াইয়্যা আছি।'

অস্পষ্ট একটা ছায়াচিত্রের মতো দাঁড়িয়ে আছে পালঙ্ক। ঘন অন্ধকারে পরিষ্কার তাকে দেখতে পাচ্ছে না রাজাসাহেব। তবু তার মনে হল, পালঙ্কের ভীরু ভীরু দু'টি চোখ প্রদীপ হয়ে জ্বলছে। কোমল সৌরভে পিয়ালের ছায়াতলকে যেন ভরে দিয়েছে মেয়েটা। রাজাসাহেব বলল, 'আমি জানতাম, তুমার দেখা আবার পামু।'

থর থর গলায় পালঙ্ক বলল, 'শঙ্খিনীরে তুমি যা কইছ, আমি বেবাক শুনছি আড়ি পাইত্যা। আমি ওই ঘর চাই। বহরে আর ভাসতে ভাল লাগে না। তুমি আমারে লইয়্যা যাইবা কুনোখানে? গৃহস্থি পাতুম আমরা। কিষাণগো লাখান সংসারী হমু। নিবা আমারে?'

'যাইবা তুমি আমার লগে?' ব্যাকুল আগ্রহে পালঙ্কের কাছাকাছি এগিয়ে এল রাজাসাহেব। সহসা কী ঘটে গেল যেন রক্তের ভেতর। রাজাসাহেবের বুকের মোহানায় নদী হয়ে মিশল পালঙ্ক।

একসময় গাঢ় গলায় রাজাসাহেব বলল, 'এইবার যাই। রাইত অনেক হইল পালঙ্ক।'

'আবার আসবা তো তুমি? আবার কবে দেখা পামু তুমার?' আকুল শোনাল পালঙ্কের কণ্ঠ।

'রোজ। রোজ আমি আসুম তুমার বহরে।'

'উঁহু, বহরে না। বহরে শঙ্খিনী আছে। কাইল সাজো বেলায় আবার এইখানে আইসো রাজাসাহেব। আমার মাথার কিরা রইল। তুমি না আইলে গলায় রশি দিমু নিঘ্‌ঘাৎ।' উন্মনা ভুঁইচাঁপার মতো মেয়ে পালঙ্ক। বেদেনী হয়েও তার রক্তে রক্তে নাগিনীর বিষনিশ্বাস ছড়িয়ে যায় নি। তার মন আজ প্রথম পুরুষ চেতনায় সুরভিত হল। মুখরিত হল।

'তাই আসুম। তুমি যখন চাও, তাই হইবো। এইখানেই তুমার লগে মিলতি হমু।'

একসময় রাজাসাহেব চলে গেল। আর লঘুদেহ একটা পারাবতের মতো উড়তে উড়তে ঘাস-বিছানো পথের ওপর দিয়ে ফিরে যেতে লাগল পালঙ্ক।

পরদিন সোনালি বেলাশেষে আবার এল রাজাসাহেব। আর এল পালঙ্ক। পিয়ালের ছায়াতল আর শীতের গোধূলিক্ষণ মদির হল। শ্রান্ত যাযাবর আর বিষকন্যা দু'জনেই শুনেছে গৃহী সাপুড়ের বাঁশি। তার পরের দিনও এল দু'জনে। তার পরের দিনও। তারপর দিনের পর দিন। প্রতিটি বেলাশেষ মনোরম মাধুর্যে ভরে যেতে লাগল।

নিবিড় গলায় রাজাসাহেব বলল, 'আরও কাছে আস বাইদ্যানী।'

ঘনপক্ষ্ম দু'টি ভীরু ভীরু চোখ তুলে পালঙ্ক বলল, 'বাইদ্যানী না, বউ কও।'.

মধুর কণ্ঠে রাজাসাহেব বলল, 'বউ, বুকে আসো।'

বউ! শব্দটির মধ্যে কত সুধা! কত অমৃতের স্বাদ! মন ইমলি পাখির পাখনা হয়ে উড়তে চায়। মুগ্ধ গলায় পালঙ্ক বলল, 'আমি তো তোমার বুকেই রাজাসাহেব।'

'বুকে না, মনের ভিতরে আস বউ।'

রাজাসাহেবের বুকের ওপর রমণীয় এক শিহরনে দু'টি ভীরু চোখ বুজে এল পালঙ্কের। নিঝুম হয়ে রইল দু'জনে। পিয়ালের ছায়াতলে দু'টি হৃৎপিণ্ড পাশাপাশি দুলতে দুলতে অনেক কথা বলল, 'অনেক গান ছড়াল, অনেক অনুরাগের সৌরভে ভরে গেল।

একসময় রাজাসাহেব বলল, 'তুমারে সাদী কইর্‌য়া নিয়া যামু বউ।'

'কবে?'

'বর্ষার দিনটা আসুক।'

'কোথায় নিবা?'

'চরবেহুলায়। সেইখানে কিষাণীরা ঘর বানতে আছে। আমরাও ঘর বান্ধুম।'

'তোমার বহরের কী হইব?'

'শঙ্খিনীরে দিয়া যামু। আমার লেইগ্যা তার মনে বড় পীরিত। কী করুম, ও তো ঘর বান্‌তে চায় না। বহরই ওর কাছে বড়।' একটা গাঢ় বেদনার ছায়া এসে পড়ল রাজাসাহেবের কণ্ঠে, 'তা ছাড়া, আমি তার বহর থিকা তুমারে নিমু। তুমার দাম দিতে হইব তো। বহরটা শঙ্খিনীরেই দিয়া যামু।'

অনেকক্ষণ নীরবতা। একসময় পালঙ্ক বলল, 'তা ঠিক। রোজই যখন বহর থিকা পলাইয়্যা আসি, তখন দেখি তুমার লেইগ্যা সাইজ্যা-গুইজ্যা বইস্যা রইছে শঙ্খিনী। আমারে চাইর দিক থিকা পাহারা দেয়। কত কষ্ট কইর্‌য়া যে আইতে হয়, খোদ বিষহরিই জানে! তুমার কাছে আসি জানতে পারলে একেবারে জানে খাইয়্যা ফেলাইব শঙ্খিনী।'

'ক্যান?'

'ক্যান আবার? উর ভোগের জিনিস আমি কাইড়্যা নিলাম তো ও আমারে ছাইড়্যা দিব! আমি হইলে দিতাম?' অপরূপ চোখে রাজাসাহেবের দিকে তাকিয়ে রইল পালঙ্ক। একেবারেই নিষ্পলক।

আরও একটা বেলাশেষ এল। এল শীতের নির্মেঘ আকাশ থেকে বজ্রপাত নিয়ে, আচমকা একটা দুর্ঘটনা নিয়ে।

পিয়ালের ছায়াতলে আজও এসেছে রাজাসাহেব। এসেছে পালঙ্ক। চারপাশে আদিগন্ত বিল প্রসারিত হয়ে রয়েছে। মাথার ওপরে অনাবরণ আকাশ। বাধাবন্ধহীন প্রকৃতির মতোই প্রেম এখানে উদ্দাম, বেপরোয়া। পিয়ালের ছায়াতলে দু'টি মন, দু'টি কামনা, দু'টি দেহ এক হয়ে মিলে গিয়েছে।

ফিসফিস গলায় পালঙ্ক বলল, 'আর তো একা থাকতে পারি না রাজাসাহেব। রাইতে আতরজানের পাশে শুইয়্যা ঘুম আসে না। খালি উসপাস করি। মনটা পঙ্খী হইয়্যা উড়াল দিতে চায় তুমার কাছে।'

রাজাসাহেবের কণ্ঠে নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি, 'আর কয়টা দিন পালঙ্ক। বর্ষার আগে তো যাওন যাইব না। আর কয়টা দিন ধৈয্য ধর বউ।'

'আর যে পারি না।' রাজাসাহেবের বুকের ওপর বৃষ্টির মতো ঝুরঝুর করে যেন ঝরতে লাগল পালঙ্ক।

'আর পারি না! হারামজাদী নটী মাগী! ঢোড়া সাপ হইয়্যা আমার বুকে ছোবল দিতে চাও!' সামনের লাটাবনটার পাশে কখন যেন এসে দাঁড়িয়েছিল শঙ্খিনী। একটা মধুর স্বপ্নের আবেশে ডুবতে ডুবতে খেয়াল ছিল না কারও। রাজাসাহেবেরও নয়, পালঙ্কেরও নয়। শঙ্খিনীর কুপিত চোখে খরিশ সাপের ফণা দেখতে পেল পালঙ্ক। তার ক্রুদ্ধ বুকে উত্তাল ঢেউ ভাঙছে। দ্রুত শ্বাস প্রশ্বাসের তালে তালে বুকটা ওঠানামা করছে।

পাথর হয়ে গিয়েছে দু'জনে — রাজাসাহেব আর পালঙ্ক। অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে তারা।

প্রখর গলায় চেঁচিয়ে উঠল শঙ্খিনী, 'জুলফিকার—'

লাটাবনের আড়াল থেকে একটি হিংস্র শব্দ ফুটে বেরুল, 'গর্র্-র্-র্।' সঙ্গে সঙ্গে কালপুরুষের আবির্ভাব। দু'টি লালাভ চোখে নিশ্চিত মৃত্যু ঝিলিক দিল জুলফিকারের। পাহাড়ের মতো বিশাল দেহখানা উত্তেজনায় ফুলে ফুলে উঠছে। হাতের ব্যগ্র আঙুলগুলো বার বার মুঠি পাকিয়ে কী যেন গুঁড়ো গুঁড়ো করবার মহড়া নিচ্ছে।

আতঙ্কে আর্তনাদ করে উঠল পালঙ্ক, 'ও বাজান—' তারপরেই রাজাসাহেবের বুকের মধ্যে মুখখানা লুকিয়ে ফেলল। শরাহত শালিকের মতো থরথর কাঁপছে সে।

'বাজান! বাজানের সাদি দেখামু না তুর। রোজ আমি সাইজ্যা-গুইজ্যা বইস্যা থাকি রাজাসাহেবের লেইগা, আর হারামজাদী কালনাগ আমার পুরুষেরে ইখানে আইস্যা ভোগ করে! একেবারে জানে খাইয়্যা ফেলামু না? আমার কলিজার উপুর ছোবল দিছস, তুরে আমি শকুন দিয়া খাওয়ামু।' গর্জে গর্জে উঠতে লাগল শঙ্খিনী। তার দু'টি চোখে পিঙ্গল আলো জ্বলে জ্বলে উঠতে লাগল, 'জুলফিকার! কালনাগিনীরে বহরে লইয়্যা যা। উঃ, তুর মনে এত বিষ! ঢোড়াসাপ একেবারে শঙ্খনাগ হইয়া বসছ! বিষদাত জম্মের মতো কামাইয়া দিমু তুমার।'

অতিকায় একটা গরুড়পাখির মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল জুলফিকার। বিশাল একখানা থাবায় পালঙ্ককে ছিনিয়ে নিল সে। সামনের লাটাবন চুরমার করে পালঙ্ককে শূন্যে তুলে মিলিয়ে গেল জুলফিকার। একপিণ্ড দলিত সবুজ ছত্রখান হয়ে পড়ে রইল লাটাবনে।

আকস্মিক একটা দুর্ঘটনায় একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল রাজাসাহেব। জুলফিকারকে ঠেকাবার চেষ্টা করতে পারে নি সে, পারলও না। দেহমন কেমন যেন বিবশ হয়ে গেছে তার।

একসময় শঙ্খিনীর দৃষ্টি থেকে খরিশের ফণা মুছে গেল। বুক থেকে উত্তাল ঢেউ সরে গেল। জাফরানি ঘাঘরায়, রেশমি কাঁচুলিতে, দুরায়ত চোখে মদিরতা মাখিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল শঙ্খিনী। আশ্চর্য মধুর গলায় ডাকল সে, 'রাজাসাহেব—'

এতক্ষণে হতভম্ব ভাবটা অনেকখানি কেটে গেছে রাজাসাহেবের চেতনা থেকে।

সে বলল, 'কী?'

'আইচ্ছা, আমার থিকা কি পালঙ্কী বেশি সোন্দর?'

'না।'

'তবে উরে তুর মন দিলি ক্যান? তুই আমার হ রাজাসাহেব।' আকুল আবেদনের মত শোনাল শঙ্খিনীর গলা। রাজাসাহেবের নিশ্বাসের সীমানায় ঘন হয়ে এল সে।

'আমি তুর হইতে পারি, তুই তবে আমার হ। আমার লগে উই চরবেহুলায় চল।'

লাস্যময় দেহ কেমন পাণ্ডুর হয়ে এল শঙ্খিনীর। বিবর্ণ গলায় সে বলল, 'কিন্তুক এই বহর, বিষহরি—ইয়াগো যদি গুণাহ্ লাগে?'

রাজাসাহেব বলল, আশ্চর্য নিস্পৃহ দেখাল তাকে, 'তুই সোন্দর, তুই ভাল শঙ্খিনী। কিন্তুক তুই বিষবাইদ্যানী, তুই তো ঘরের বউ হইতে পারবি না। এই বহরও ছাইড়্যা যাইতে পারবি না কুনোদিন। কি লো পারবি?'

'কয়দিন ভাইব্যা লই।'

'তুই ঘরের বউ হইতে পারবি না। তা হইতে পারে পালঙ্ক। পালঙ্কেরে তুই আমারে দে শঙ্খিনী।' শঙ্খিনীর হাত দু'খানা নিজের মুঠিতে তুলে নিল রাজাসাহেব।

আচমকা খানিকটা বিদ্যুৎ চমকে গেল যেন শঙ্খিনীর শিরায় শিরায়। প্রচণ্ড একটা ঝটকায় রাজাসাহেবের মুঠি থেকে নিজের হাত দু'খানা ছিনিয়ে আনল। তারপর ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে লাটাবনের ওপর দিয়ে উধাও হল। আর বিমূঢ়ের মতো নাগমতী বেদেনীর পলায়নের বিজুরিরেখা দেখতে লাগল রাজাসাহেব।

আরও কয়েকটা দিন পার হল। শীতের সকাল রোদের তুলি টানল সোনাইবিবির বিলে। তারপর দুপুরে সেই রোদের তেজ বাড়ল। তারওপর বেলাশেষ পেরিয়ে পাণ্ডুর রাত্রি ঝরল। সকাল-দুপুর-বিকেলের পুনরভিনয় চলল এই ক'টা দিন।

সেদিন পিয়ালের ছায়াতল থেকে পালিয়ে এসে হাজারমণী নৌকোর পাটাতনে আছড়ে পড়েছিল শঙ্খিনী। সারা দেহ ফুলে ফুলে উঠেছিল, হৃৎপিণ্ডটা দুলে দুলে উঠেছিল, আর হু-হু ধারায় দু চোখে অবারণ বন্যা নেমেছিল বিষকন্যার। একটা তীক্ষ্ণ পরাজয়ের অপমানে তার ফুসফুসটা যেন ফেটে শতফালা হয়ে যাবে, মনে হল। পালঙ্ক, উন্মনা ভুঁইচাঁপার মতো একটা মেয়ে। শালিক পাখি বলে তাকে সোহাগ করে শঙ্খিনী। সেই ভীরু চোখের শান্ত মেয়েই আজ তার প্রতিদ্বন্দ্বী! তার একান্ত পুরুষের ওপর প্রখর থাবা বসিয়েছে। রাজাসাহেবের রক্তে রক্তে নীড়ের প্রেম আরও নিবিড় করে ছড়িয়ে দিয়েছে, আরও গহন করে মিশিয়ে দিয়েছে গৃহী পৃথিবীর বিষ। এ বিষ তোলার মন্ত্র শঙ্খিনীর অজানা। এ সাপের ছোবল বিষকন্যাকেও বিষে জর জর করে তুলেছে।

কিছুক্ষণ পর আরক্ত চোখে উঠে বসেছিল শঙ্খিনী। চোখ দু'টো তার অগ্নিশিখার মত জ্বলছে। জোরে জোরে শ্বাস টানছে সে। হ্যাঁ, জুলফিকারকে একটি ইঙ্গিত করলে, এই মুহূর্তে পালঙ্কের মুণ্ডটা উপড়ে আনতে পারে। ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারে পারাবতের মত লঘু দেহটা। দ্রোণফুলের পাপড়ির মতো এই সোনাইবিবির বিলে

ছড়িয়ে ছড়িয়ে দিতে পারে পালঙ্কের ছিন্ন শরীরের প্রতিটি অংশ। কিন্তু কিছুই করল না শঙ্খিনী।

প্রতিশোধ! অসহ্য জ্বালায় রক্তের প্রতিটি কণিকা প্রখর হয়ে উঠেছে। প্রতিশোধ তাকে নিতেই হবে। তিল তিল অত্যাচারে। আঘাতে আঘাতে পালঙ্ককে ক্ষয়িত করবে সে। ভুঁইচাঁপা মেয়ে জানে না কী নিষ্ঠুর দাবাগ্নির দিকে, কী নির্মম দুঃস্বপ্নের দিকে হাত বাড়িয়েছে সে। 'পান্‌হা ঘর'-এর পাশের একটা ডোরার মধ্যে পালঙ্ককে বন্দি করে রেখে দিল শঙ্খিনী।

শীতের রাত এখন আরও গভীর, আরও গাঢ় হয়ে উঠেছে। আকাশে ফুটে বেরিয়েছে সপ্তর্ষি। বাইরের পাটাতনে এসে তীক্ষ্ণ গলায় ডাকল শঙ্খিনী, 'জুলফিকার!'

একটু পরেই কালপুরুষের আবির্ভাব হল। এক হাতের মুঠিতে বিশাল একটা লোহার শিক। সেটার এক মাথা টকটকে লাল। আগুনে পুড়িয়ে এনেছে জুলফিকার। তার আর এক হাতে ভাতের সানকি। 'গর্‌-র্‌-র্‌-র্‌—' একটা প্রেতায়িত শব্দ তরঙ্গিত হয়ে উঠল আকাশতলে। তারপর 'পান্‌হা ঘর'-এর পাশের কামরায় তালা খুলল শঙ্খিনী।

পাটাতনের ওপর একটা নিভু-নিভু কুপি জ্বলছে। তার পাশে ধনুকের মতো বেঁকে রয়েছে পালঙ্কের দেহটা। সে দেহ অনাবৃত, শীতার্ত।

শঙ্খিনী হিস হিস করে উঠল, 'এই কালনাগ, ওঠ—'

শীতের রাত্রি স্নায়ুতে স্নায়ুতে তন্দ্রা ছড়িয়ে দিয়েছিল পালঙ্কের। শঙ্খিনীর হিসহিসানিতে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল সে। তারপর অমানুষিক গলায় আকাশ-ফাটানো চিৎকার করে উঠল। কেননা ওঠার আগেই জুলফিকার তার কপালে জ্বলন্ত শিকটা দিয়ে একটা তিলক এঁকে দিয়েছে।

খল খল উদ্দাম হাসিতে ভেঙে পড়ল শঙ্খিনী, 'কী লো কালনাগ, আমার নাগরেরে আর কাইড়্যা নিবি! এই জনমের লেইগা ওই ঘর, ওই সোয়ামী শিকায় তুইল্যা রাখ লো নটী মাগী।' হাসতে হাসতে পালঙ্কের কাছে অন্তরঙ্গ হয়ে বসে পড়ল শঙ্খিনী, 'তুর কপালে বৈষ্টমীগো লাখান সাতটা তিলক দিছি। কাইল একখান আরশি দিয়া যামু, দেখিস। কী লো, রাজাসাহেবের উপুর অখনও তুর টান আছে?'

'অখন ক্যান? সারা জনম থাকব। পীরিতের জোরে তো মনের মানুষরে ধইর‍্যা রাখতে পার না। আমার উপর তার শোধ লও।' আশ্চর্য জলভরা চোখে তাকিয়ে রইল পালঙ্ক।

'ও, ত্যাজ অখনও আছে দেখি কালনাগের! আইচ্ছা, আর কয়দিন থাকে আমিও দেখুম। আমিও বিষ-বাইদ্যানী। আর বিষ, ছার বিষ, পার বিষ, বেবাক তুলনের মন্তর আমার জানা আছে।'

ভাতের সানকিটা পাটাতনের ওপর রেখে বাইরে বেরিয়ে এল জুলফিকার। তার পেছনে শঙ্খিনী। তালাটা বন্ধ করে আকাশের দিকে একবার দৃষ্টিটা ছড়িয়ে দিল। সে কিছুতেই ধরতে পারছে না, কোন নিরাপদ আশ্রয়ে দাঁড়িয়ে এত তেজ সংগ্রহ করছে পালঙ্ক! কণায় কণায় শক্তি আহরণ করে নিজেকে দুর্জয় করে তুলছে!

দিনের শেষে সপ্তর্ষি-জাগা রাতে একবার আসে শঙ্খিনী আর জুলফিকার। এক সানকি ভাত, আর কপালের ওপর আগ্নেয় শিকের একটি দহনরেখা এঁকে চলে যায়। আজকের মত তার পর্ব শেষ হল।

নিজের নৌকায় আসতে আসতে একটা নিষিদ্ধ ভাবনায় মনটা ভরে গেল শঙ্খিনীর। যে নীড়ের প্রেরণা পালঙ্ককে কণায় কণায় উত্তাপ দিয়ে, শক্তি দিয়ে দুর্বার করে তুলছে, রাজাসাহেবের যে প্রেমের আশ্বাসে দুর্জয় হয়ে উঠেছে পালঙ্ক, সেই নীড়, সেই প্রেমের আলিঙ্গনে নিজেকে সমর্পণ করলে কেমন হয়? কেমন হয় এই যাযাবর-বহর থেকে পালিয়ে গিয়ে রাজাসাহেবের স্নিগ্ধ কামনার হাত ধরে কোনও বনস্পতির নিভৃত ছায়ায় কল্যাণবধূ সাজলে? মধুর একটি গৃহাঙ্গন রচনা করলে?

—পরের দিন সকালে তিনটে লোক এল সোনাইবিবির বিলে। বাজিতপুরের বারুই মহাজন পাঠিয়েছে। তার বাড়ির উঠোনে কাল রাত্রে সাপে কেটেছে এক ভাগকৃষাণকে। এই মুহূর্তে হু-হু তুফানের মতো ছুটে যেতে হবে সেখানে। বিষহরির নির্দেশ সাপে কাটার খবর এলেই তাদের ছুটতে হয়। কাঁধে বিষপাথর, মেটে সরার ডালা, আর মাথায় জড়িবুটির ঝাঁপি সাজিয়ে নিল শঙ্খিনী। ইরানী নৌকার বাদামের মতো নানা রঙের একটা ঘাঘরা দুলিয়ে দিল কোমর থেকে। তারপর 'পান্‌হা ঘর'-এর মধ্যে চলে এল। সঙ্গে যাবে ডহরবিবি।

'পান্‌হা ঘর'। এই ঘরের মধ্যে কোনও বেদেরা এমন কিছু করে না যা অপবিত্র। মনের সমস্ত অশুচিতা, সমস্ত কুশ্রী ভীষণতা চৌকাঠের ও-পাশে নির্বাসন দিয়ে এ ঘরে ঢোকে তারা, মনকে একাগ্র করে নেয়। শুচিস্নান করিয়ে নেয়।

সামনে শ্বেতপাথরের ফলকের ওপর বিষহরির মূর্তি। মাটি দিয়ে নিজেরাই তৈরি করে নিয়েছে বেবাজিয়ারা। সপ্তনাগের চূড়াচক্রে দেবীর অধিষ্ঠান। মাথার ওপর বরুণছত্র ধরেছে কালীয় নাগ। গজমোতি হয়েছে উদয়নাগ। মণিবন্ধে বলয় হয়েছে খৈজাতি। দেবীর সুডৌল বক্ষকুম্ভ কাঁচুলি হয়ে ঢেকেছে চক্রচূড় আর শঙ্খনাগ। তক্ষক আর লউডগা, খরিস আর কালজাতি বুনে বুনে ঘাঘরা রচনা করা হয়েছে। কটিতট থেকে সেই ঘাঘরা দুলিয়ে দিয়েছেন দেবী। আঙুলে আঙুলে অঙ্গুরি হয়েছে সুতোশঙ্খ। পায়ে জড়িয়ে জড়িয়ে মল হয়েছে দাঁড়াস। কর্ণভূষণ হয়ে দোদুল-দুল দুলছে সাদাচিতির ফণা।

সামনের ধূপাধার ধোঁয়ার রেখা ছড়িয়ে ছড়িয়ে 'পান্‌হা ঘর'কে সুরভিত করে তুলেছে। একবার দেবীমূর্তির দিকে তাকাল শঙ্খিনী। সে মূর্তি ভীষণা, অহিভূষণা। মূর্তির সামনে সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়ল যাযাবরী। আটটি অঙ্গ নিবেদন করে প্রণাম করল সে। প্রসাদ চাই। নাগমতীর চোখে প্রার্থনা, একটু কৃপাকণা চাই। সাপে-কাটা রোগী দেখতে যাবে সে, দেবীর করুণা থাকলে লখিন্দরের মৃত্যুবিষও সে নামিয়ে দিতে পারে। তাই বাজিতপুর রওনা হবার আগে বিষহরির করুণা ভিক্ষা করতে এসেছে বিষবেদেনী। বিষহরির দৃষ্টিতে কী অপরূপ স্নিগ্ধতা!

হঠাৎ চমকে উঠল যাযাবরী। একটি ভয়াল ভাবনায়, একটি নিষিদ্ধ চিন্তায় সমস্ত

স্নায়ুগুলো থরথর কেঁপে উঠল। রাজাসাহেব! পালঙ্ক! সে যখন জড়িবুটির ঝাঁপি নিয়ে গৃহস্থের বাড়ি যাবে সেই সময় যদি রাজাসাহেব বহরে আসে? মনের সমস্ত শুচিতার ওপর একখানা কালো পর্দা নেমে এল শঙ্খিনীর। শিউরে উঠল বেদেনী। একবার দেবীমূর্তির দিকে তাকাল সে। দেবীর দৃষ্টি থেকে একটু আগের প্রসন্নতা সরে গেছে। প্রতিটি অঙ্গ থেকে ক্রুদ্ধ ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে চক্রচূড় শঙ্খনাগ তক্ষক খৈজাতি। প্রলয়ের গর্জন শুনতে পেল শঙ্খিনী। সে গর্জন তার কলুষিত মনকে শাসন করার জন্য ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। চেতনাটা কেমন যেন স্তিমিত হয়ে আসছে যাযাবরীর। রক্তের কণাগুলো ঝিমঝিম করছে। মূর্ছিত হয়ে লুটিয়েই পড়ত সে। বাইরে থেকে ডহরবিবির কণ্ঠ ভেসে এল, 'আম্মা, অনেক বেইল হইয়্যা গেল। তরাতরি কর।'

চোখ দু'টো বুজে 'পান্‌হা ঘর' থেকে রুদ্ধশ্বাসে দৌড়ে বেরিয়ে এল শঙ্খিনী। বিগ্রহের দিকে আর একবারও তাকতে পারে নি সে। তার মনে হল, বিষহরির মূর্তি থেকে উলকার মতো ছুটে আসবে নাগিনীরা।

সারা শরীর বেয়ে কালঘাম ছুটেছে শঙ্খিনীর। ফুসফুস ভরে জোরে জোরে শ্বাস টানতে লাগল সে। সমস্ত স্নায়ুগুলো আর্তনাদ করে উঠল তার। সে বাজিতপুর যাবে না। 'পান্‌হা ঘর'-এর মধ্যে এইমাত্র সে যে অপরাধ করে এসেছে তার প্রায়শ্চিত্ত না হওয়া পর্যন্ত মনসার কোনও মন্ত্র উচ্চারণ করার অধিকার সেই তার।

বাজিতপুরের মানুষ তিনটি ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'চলো বাইদানী, অনেকটা পথ যাইতে হইব।'

কী আশ্চর্য, মনের আর্তনাদ কণ্ঠ চিরে মুক্তি পেল না শঙ্খিনীর। বিষকন্যা সে। সাপে-কাটার খবর এলেই ছুটে যেতে হয় তাদের। এই পৃথিবীর সব জায়গায় মনসার আটন। তার সর্বত্রগামী দৃষ্টি থেকে মুক্তি নেই। যেতেই হয় তাদের। নইলে সমস্ত গুণ, সমস্ত মন্ত্র নিষ্ফল হয়ে যাবে। বিষহরির ক্রোধ এসে পড়বে। ময়াল সাপের মতো বাজিতপুর তাকে আকর্ষণ করছে। আর 'পান্‌হা ঘর' পেছন থেকে ক্রুদ্ধ তর্জনী তুলে শাসন করছে। আতঙ্কে কেঁপে কেঁপে উঠল শঙ্খিনী।

একসময় সম্মোহিতের মতো লোক তিনটির সঙ্গে এগিয়ে চলল শঙ্খিনী। তার পাশে ডহরবিবি।

লাটাবন পেরিয়ে, শরজঙ্গল উজিয়ে, বেতঝোপ পাশে ফেলে সেই পিয়ালের ছায়াতলে একটা প্রেতলোকে এসে পড়ল যেন শঙ্খিনী। অনেক দিন পর আবার রাজাসাহেবের সঙ্গে চোখাচোখি হল হঠাৎ। পথ চলতে চলতে মনটাকে একাগ্র করার, শুচিময় করার প্রতিজ্ঞা ছিল যাযাবরীর। রাজাসাহেব সে মনটাকে আবার দিশেহারা করে দিয়েছে। পিয়ালের ছায়াতলে একটি দুর্ঘটনা দাঁড়িয়ে আছে। সে দুর্ঘটনার নাম রাজাসাহেব। সেই মুহূর্তে রাজাসাহেবের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে, ভাবে নি সে।

রাজাসাহেব বলল, 'অনেক দিন পালঙ্কেরে দেখি না শঙ্খিনী, উ গেল কুনখানে?'

যে চিন্তাটাকে প্রবল পেষণে সংহার করতে চেয়েছিল শঙ্খিনী, রন্ধ্রমুখ পেয়ে দুর্বার বেগে সেটা বেরিয়ে এল। মশালের শিখা এসে চেতনাকে ছুঁয়ে গেল। গর্জে উঠল শঙ্খিনী, 'পালঙ্কী কবরে গেছে। শোন রাজাসাহেব, এই বিলে তুরা আর থাকতে পারবি

না। দুই দল একলগে থাকন যায় না। আমি বাজিতপুর যাইতে আছি। আইস্যা যেন দেখি, তুরা চইল্যা গেছস।' রাজাসাহেবের নির্বাক দৃষ্টির সামনে থেকে হন হন পা চালিয়ে চলে গেল শঙ্খিনী। মনের মধ্যে নিষ্ঠুর একটা প্রশ্ন, নির্মম একটা জ্বালা ধরে নিয়ে গেল সে। সত্যিই কী সে চায় সোনাইবিবির বিল থেকে রাজাসাহেব তার বহর নিয়ে অন্য কোনও দিগন্তে উধাও হোক? চলে যাক তার দৃষ্টির বাইরে, তার কামনা থেকে অনেক দূরে কোনও অধরা নিরুদ্দেশে? তবে সেদিন তাকে সে এখানেই 'পারা' গাঁথার প্রার্থনা জানিয়েছিল কেন? কেন?

দু'দিন পর বাজিতপুর থেকে ফিরে এল শঙ্খিনী। শরীরে অসহ্য উত্তাপ, রক্তলাল চোখ, এলোমেলো চুল। ঘাঘরা আর কাঁচুলি শিথিল। অলৌকিক কিছু যেন শঙ্খিনীর দেহমনে ভর করেছে। কোনও দিকে কণামাত্র ভ্রূপাত নেই তার। উদ্‌ভ্রান্তের মতো 'পান্‌হা ঘর'-এর মধ্যে চলে এল সে। তারপর বিষহরির বিগ্রহের সামনে নিজের দেহটিকে ছুঁড়ে দিল।

দুপুরের আকাশে আকাশে অভ্ররঙের রোদ ছড়িয়ে পড়েছে। বেবাজিয়ারা সোনাইবিবির বিলে এদিক-সেদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। একসময় সকলে ভীরু ভীরু পায়ে 'পান্‌হা ঘর'-এর সামনে এসে জড়ো হল। সকলের দৃষ্টি শঙ্কায় ভরে গেছে। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে একই নিরুপায় জিজ্ঞাসার উত্তর সন্ধান করতে লাগল বেবাজিয়ারা। শুধু বিলের পারে একটা শিলামূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল ডহরবিবি। শঙ্খিনীর সঙ্গে বাজিতপুরে গিয়েছিল সে। খানিকটা পর বেদেরা 'পান্‌হা ঘর'-এর দরজা থেকে সরে এল। তারপর ডহরবিবির চারপাশে বৃত্তের মতো নিবিড় হয়ে দাঁড়াল। অজানা এক আতঙ্কে হাসিখুশি বেদেরা একেবারেই নিভে গিয়েছে।

মহব্বতের ভয়াতুর কণ্ঠটা ফিসফিস শোনাল, 'কি লো ডহর, তুই তো গেছিলি উর লগে বাজিতপুর। ব্যাপারখান কী? কিছুই তো বুঝতে পারি না।'

চনমনে দৃষ্টিটা একবার 'পান্‌হা ঘর'-এর মধ্যে ছড়িয়ে দিল ডহরবিবি। দুর্বোধ্য একটা রহস্যের মতো থর থর করে কাঁপছে শঙ্খিনী। পিঙ্গল দু'টি চোখের মণি থেকে ক্ষরিত হচ্ছে লবণাক্ত অশ্রুর বন্যা। সমস্ত পৃথিবী থেকে নিজেকে শামুকের মতো গুটিয়ে এনেছে সে। উচ্ছ্বসিত কান্না দিয়ে নিজেকে শোধন করছে নাগকন্যা, প্রায়শ্চিত্ত করছে।

ডহরবিবি বলল, 'বিষহরির গুণাহ্ লাগছে উর। কাটা-ঘা'র রুগী ঝাড়তে বইস্যা কী জানি খালি ভাবতে লাগল। মন্তর আইল না মুখে। সাপে-কাটা মানুষটা নীলবন্ন হইয়্যা মইর‍্যা গেল। চোখের সামনে মানুষটা মরল আর উ বইস্যা বইস্যা দেখল। এতটুকু ঝাড়ফুক করল না। একেবারে বোবা হইয়া গেল যেন।' শঙ্কিত দৃষ্টিটা সকলের মুখের ওপর দিয়ে চক্রাকারে বুলিয়ে নিয়ে গেল ডহরবিবি। অবর্ণনীয় ভয়ে বেবাজিয়াদের মুখ-চোখ পাণ্ডুর হয়ে গেছে। মনে হল, চোখের তারাগুলো ছিটকে বেরিয়ে আসবে তাদের। ডহরবিবি আবারও বলল, 'কাইল রাইতে উ বিষহরির খোয়াব দেখছে। তারপর বাকি রাইতটুকু দাপাদাপি করছে আর কানছে। বিহানে উইঠ্যা দেখি,

উর গা আগুনের লাখান। চৌখ লাল। মাতালের লাখান দৌড়াইতে দৌড়াইতে উ আইস্যা পড়ল এইখানে। আমিও আইলাম পিছে পিছে।'

দুপুর থেকে সন্ধ্যা। এই সময়টা বিষহরির বিগ্রহের সামনে নিথর পড়ে রইল শঙ্খিনী। তার দেহে এতটুকু স্পন্দন নেই। তার শরীরে জীবনের চিহ্ন অনুপস্থিত।

সন্ধ্যা পেরিয়ে আকাশ থেকে বন্যার মতো রাত্রি নামল সোনাইবিবির বিলে। এতক্ষণে উঠে বসল শঙ্খিনী। দৃষ্টি থেকে ঘোর ঘোর ভাবটা সরে গেছে। সারা দেহ থেকে অলৌকিক সত্তাটা মুছে গেছে। শ্রান্ত দেহটি গোছগাছ করল সে। মন এখন নিরাসক্ত হয়ে গেছে। রাজাসাহেব নামে একটি মরীচিকার পেছনে ঘুরতে ঘুরতে ব্রতচ্যুত হয়েছিল বিষবেদেনী। এই মাত্র তার প্রায়শ্চিত্ত হল। কড়ায় ক্রান্তিতে বিষহরি তার মূল্য আদায় করে নিয়েছে নাগমতীর দেহ-মন থেকে। সাপে-কাটা মানুষ সামনে ফেলে দিয়ে তার ঠোঁট থেকে সমস্ত মন্ত্র শুষে নিয়েছিল। তার ধ্রুবতারার মতো একটি অকলুষ কর্তব্যে সজাগ করে দিয়েছে বিষবেদেনীর মন। রাজাসাহেব নামে একটি দুর্বিপাক ছায়া হয়ে মিলিয়ে গেছে।

সন্ধ্যার পর এক প্রহর পার হয়েছে। শীতাতুর রাতকে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে শিয়ালের কান্না জাগল শরবনে। 'পান্‌হা ঘর'-এর পাটাতনে এসে বসেছে ময়না, ডহরবিবি আর আতরজান। মাঝখানে বিজুরিরেখার মতো বিবসনা শঙ্খিনী। সারা দেহ থেকে ঘাঘরা খুলেছে, কাঁচুলি সরিয়ে দিয়েছে। প্রতিটি অঙ্গভূষণ স্তূপাকার হয়ে পড়ে রয়েছে দরজার সামনে। দু হাতে বিশাল ধূপাধার নিয়ে উঠে দাঁড়াল শঙ্খিনী। আরতি শুরু হল। এই আরতি দিয়ে দেবীকে সন্তুষ্ট করতে হবে। নীড় বাঁধার শেষতম রিপুকে, রাজাসাহেব নামে একটি তীব্র প্রলোভনকে দেহ-মনের কামনা থেকে নিশ্চিহ্ন করতে হবে। এই আরতি, বরাঙ্গী বেদেনীর এই বিবসনা নাচ বেদে-সমাজের চলিত প্রথা। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় 'পান্‌হা ঘর' ভরে গেল। তৃতীয় প্রহরের শেষে নাচ থামাল। মূর্ছিতের মতো বিগ্রহের সামনে আছড়ে পড়ল শঙ্খিনী। মাটির ধূপাধার ভেঙে শতখান হল। রাশি রাশি জ্বলন্ত অঙ্গার ছড়িয়ে পড়ল যাযাবরীর অনাবরণ দেহে।

মনটা এখন অপরূপ প্রশান্তিতে ভরে আছে শঙ্খিনীর। এ ক'দিনের প্রায়শ্চিত্তে আবার বিষহরির কৃপা ফিরে পেয়েছে সে। শীতের হিম-ভরা সকালে যাযাবরীর প্রসন্ন মন গুন গুন করে উঠল ঃ

তাহার দোয়ায় সূর্য ওঠে পুবের আকাশে,
পরাণ পাইয়্যা ভেলায় বইস্যা লখাই হাসে,
হায়, বিষহরির দোয়া!

রক্তপলাশ সকাল একসময় সোনালি হল। শিশু দিন এখন কিশোর। সামনের লাটাবন দলিত করে এল রাজাসাহেব। খালের জলে স্নান সেরে রাশি রাশি মেঘের মতো চুল রোদের দিকে ছড়িয়ে বসে ছিল শঙ্খিনী। রাজাসাহেবের সঙ্গে চোখাচোখি হল। রক্তটা সহসা কেমন যেন ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠল তার। মাত্র একটা অসতর্ক

মুহূর্ত, তার পরেই আশ্চর্য সংযমে নিজেকে নিস্পৃহ করে নিল।

রাজাসাহেব সামনে এলে দাঁড়াল, 'আমরা চইল্যাই যাইতাম শঙ্খিনী। খালি এট্টা কথার লাইগ্যা রইয়্যা গেলাম। আমার কথাখান শুনবি?'

'তুর কথা আমি জানি। পালঙ্কীরে চাস তো?'

'হ। তুই আমারে পালঙ্কেরে দে। আমি তুরে ঠিক ঠিক দাম দিমু। আমার বহরটাই তুরে দিমু।'

'দাম দিতে হইব না। পালঙ্কীরে নিয়া তুই আমারে বাচা। পালঙ্কী থাকলেও তুর কথা মনে পড়ব। তুর কথা মনে পড়লে বিষহরির গোসা আইস্যা পড়ব আমার উপুর। তুই সাদি কর উরে। তার পর কুনোখানে যাইস গিয়া। আর আমার সামনে আসিস না।' আশ্চর্য নির্লিপ্ত শোনাল শঙ্খিনীর কণ্ঠ।

'সাচা কইস? আমার গা ছুইয়্যা ক দেখি!' বিস্ময়ে, উত্তেজনায় আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে এল রাজাসাহেব।

'যা যা, দুরে সর। তুর গায়ে বড় ঘরের গোন্ধ। বড় গুণাহ্। বিষবাইদানী মিছা কয় না। যা কইলাম, তাই হইব। পরশু দিন তুগো সাদি। আমি তুগো সাদি দিমু।'

কিছুক্ষণ শঙ্খিনীর দিকে তাকিয়ে রইল রাজাসাহেব। এই ক'দিনের মধ্যে একটা জন্মান্তর ঘটে গেছে নাকি যাযাবরীর! সমস্ত কামনাকে, সমস্ত যৌবনের একান্ত প্রত্যাশাকে কোথায় নির্বাসন দিল শঙ্খিনী? মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত। তার পরেই হালকা একটা পাখির মতো উড়তে উড়তে লাটাবনের আড়ালে মিলিয়ে গেল রাজাসাহেব।

আর পাটাতনের ওপর বসে ফুসফুসটা যেন স্তব্ধ হয়ে যেতে চাইল শঙ্খিনীর। কিন্তু না, বুকের মধ্যে যে উত্তাল সমুদ্র ঢেউ ভাঙছে, তাকে এতটুকু প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। তা হলে বিষহরির ক্রোধ সহস্রফণা দাবাগ্নির মতো তাকে পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে। শিউরে উঠল নাগকন্যা।

'পান্‌হা ঘর'-এর দুর্গে আশ্রয় নিয়েছে শঙ্খিনী। বিলের পারে মাটি কেটে ছোট পুকুর বানিয়েছিল বেবাজিয়ারা। পুকুরের দু পাশে রাজাসাহেব আর পালঙ্ক দাঁড়িয়ে আছে। মাঝখানে একখানা মুগার চাদর ঝুলিয়ে দিয়েছে হোমরা বেদে। তাদের চারিদিকে বৃত্তের মতো নিবিড় হয়ে দাঁড়িয়েছে দুই বহরের অজস্র যাযাবর আর নাগকন্যারা।

লাল টকটকে ঘাঘরা পরেছে পালঙ্ক। কপালে রক্তচন্দনের আলপনা। গলায় শ্বেতপদ্মের মালা। আর সারা দেহে ঝলমল করছে অপরূপ খুশির গয়না। রেশমি লুঙ্গি পরেছে রাজাসাহেব। কাঁধের সীমানায় নেমে-আসা থরে থরে চুলগুলো গুছিয়ে গুঁজে নিয়েছে ধনেশপাখির পালক। আজ রাজাসাহেব আর পালঙ্কের সাদি। বেলাশেষের আলো এক রঙিন স্বপ্ন আঁকছে দু'জনের মুখের উপর।

দেখতে দেখতে চোখ দুটো জ্বালা করে উঠল শঙ্খিনীর। প্রচণ্ড শব্দ করে জানালার পাল্লা দুটো বন্ধ করে দিল সে। বিলের পারে ওই ছবি তার স্নায়ুতে স্নায়ুতে একটা বিপর্যয়ের মতো ঘনিয়ে আসতে শুরু করেছে।

ভাতারমারীর বিল থেকে আমন্ত্রণ করে আনা হয়েছে হোমরা বেদেকে। হোমরা

বেদে বেবাজিয়াদের সাদিতে পুরোহিত। বেদে আর বেদেনীর মধ্যে সেতুবন্ধ। তার চুলের রং ধূসর, চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে। তার কোমরে ধনুক, খসখসে দেহ থেকে খই উড়ছে। হোমরা বলল, 'শানজর (শুভদৃষ্টি) হইব এইবার। দুল্‌হা রাজি। দুল্‌হন রাজি?'

মাথা দুলিয়ে স্বীকৃতি জানাল রাজাসাহেব আর পালঙ্ক। মুগার চাদরখানা চকিতে তুলে নিল হোমরা। আর ছোট পুকুরের বুকে ঝকঝকে জলের আয়নায় শুভদৃষ্টি হল দু'টি মুগ্ধ মানব-মানবীর।

'সাদি শ্যাষ হইল।' ঘোষণা করল হোমরা বেদে।

সোনাইবিবির বিলকে মুখর করে, শীতের বেলাশেষকে মধুর করে কলধ্বনি উঠল বেবাজিয়াদের। আর সেই আনন্দিত কলরব বিস্ফোরণের মতো 'পান্‌হা ঘর'-এর মধ্যে ফেটে পড়ল। কানের ওপর হাত চাপা দিল শঙ্খিনী। বিষহরির মুখের দিকে তাকাল সে। আশ্রয় খুঁজল, নির্ভরতা খুঁজল।

বিলের পারে অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে উৎসব শুরু হয়েছে বেবাজিয়াদের। গণ্ডা গণ্ডা মদের বোতল শূন্য হয়ে পড়ে আছে চারপাশে। উত্তাল হয়ে উঠছে ঢোলকের বাজনা। মাতাল হয়ে উঠছে বাঁশির সুর। গুরু গুরু দুলে উঠছে সোনাইবিবির বিলের হৃৎপিণ্ড।

বিশাল একখানা ঘাসি নৌকোয় এসে বসেছে রাজাসাহেব আর পালঙ্ক। তাদের চারপাশে ঘন হয়ে বসেছে বেদেনীরা। নানা রঙের ঘাঘরা আর কাঁচুলি, ছুরির মতো ঝকমকে হাসি, বিদ্যুৎচমকের মতো কটাক্ষ একটা রঙিন অলৌকিক স্বপ্ন ঘনিয়ে এনেছে।

'পান্‌হা ঘর' থেকে এক সময় শঙ্খিনী এল। মোহময়ী পালঙ্ক! রাজাসাহেবকে যেন চিনতে পারা যাচ্ছে না। হেবিকেনের রহস্যময় আলোতে, অগুনতি নাগকন্যার মধ্যবিন্দুতে একটি হীরকপদ্ম হয়ে জ্বলছে সে। এই রাজাসাহেবকে কোনওদিন দেখে নি শঙ্খিনী। এ রাজাসাহেব যেন অসত্য, অবাস্তব। অপলকে তাকিয়ে রইল নাগমতী বেদের মেয়ে।

রক্তে রক্তে কী এক নিষিদ্ধ কামনা আবার কথা কয়ে উঠল। জলের লেখার মতো চেতনা থেকে মুছে গেল বিষহরির শাসন। ফিসফিস গলায় সে ডাকল, 'পালঙ্কী, শোন। ইট্টু বাইরে আয়।'

বিলের পারে এসে দাঁড়াল শঙ্খিনী আর পালঙ্ক। শঙ্খিনীর নিশ্বাস দ্রুতলয়ে পড়ছে। চোখ দু'টো দু টুকরো মণির মতো জ্বলছে। স্নায়ুতে স্নায়ুতে সরীসৃপ চলে বেড়াচ্ছে তার। ভয়াতুর গলায় পালঙ্ক বলল, 'কী কইবা আম্মা?'

'তুরে আমি বেবাক দিমু। এই বহর, সোনাদানা বেবাক। তুই আমারে রাজাসাহেবেরে দে।'

আর্তনাদ করে উঠল পালঙ্ক, 'না না, উ আমি পারুম না।' ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘাসি নৌকার দিকে পালাল সে।

'আইচ্ছা, কেমনে তুই আমার পুরুষেরে ভোগ করস, দেখুম।' সমস্ত দেহটা

দাবানলের মতো জ্বলতে লাগল শঙ্খিনীর। কয়েকটি মাত্র মুহূর্ত। তারপরেই লাটাবনের ঘন অরণ্যে লম্বা লম্বা পা ফেলে আদৃশ্য হল শঙ্খিনী। এখনই তার প্রয়োজন, তার একান্ত প্রয়োজন একটা—

জলবাংলায় বেদেদের মধ্যে একটি রীতি আছে। বাসরশয্যায় যাবার আগে দুল্‌হা আর দুল্‌হান সাপের মালাবদল করে। নাগিনীর সাক্ষ্যে তাদের বাসর সিদ্ধ হয়।

রাজাসাহেব আর পালঙ্কের চারপাশ থেকে নাগকন্যারা মৌমাছির মতো চাক ভেঙে উঠে পড়েছে। রাতের পরমায়ু এখন দু প্রহর। ডহরবিবি বলল, 'থাক লো রাক্ষসী, তোর পুরুষ লইয়্যা। দেখিস পয়লা রাইতেই একেবারে গিল্যা ফেলিস না।'

খরধার হাসির রোল উঠল বিল কাঁপিয়ে।

আতরজান বলল, 'সাপের ঝাপি কই লো, মালাবদলটা কইর‍্যা দিয়া যাই।'

'এই যে আমি লইয়্যা আইছি।' বাইরে থেকে ঘাসি নৌকার পাটাতনে চলে এল শঙ্খিনী। তার দু কাঁখে দু'টি সাপের ঝাঁপি। তার দু চোখের মণি দুটো শিখা হয়ে জ্বলছে। তার হাসিতে তীব্র এক নিষ্ঠুরতা।

ইতিমধ্যে নাগকন্যাদের হাসি থেমেছে। শঙ্খিনী আরও একটু এগিয়ে এল। রাজাসাহেবের হাতে একটি ঝাঁপি আর অন্যটা পালঙ্কের দিকে বাড়িয়ে বলল, 'নে রাজাসাহেব, নে লো শালিকপঙ্খী। মালাবদল কর।'

সন্দিগ্ধ চোখে শঙ্খিনীর দিকে একবার তাকাল পালঙ্ক। তারপর দু'জনেই ঝাঁপি টেনে নিল। রাজাসাহেব আর পালঙ্ক।

রাজাসাহেব ঝাঁপির ঢাকনা সরাবার সঙ্গে সঙ্গে উহকার মতো একটা কালচিতির ফণা বেরিয়ে এল। পলকপাতের মধ্যে রাজাসাহেবের কপালে সেই ফণাটা চাবুকের মতো আছড়ে পড়ল। তারপর পাটাতনে নেমে নৌকোর জানালা দিয়ে বাইরের বিলে অদৃশ্য হল।

'উঃ, এ কী করলি শঙ্খিনী!' মাতালের মতো টলতে টলতে পড়ে গেল রাজাসাহেব। কপালের ওপর চুনির মতো দু'টি রক্তবিন্দু ফুটে বেরিয়েছে তার। শিরায় শিরায় মৃত্যুহিম বইতে শুরু করেছে। একসময় হেরিকেনের আলোয় রাজাসাহেবের দেহটা নীল হয়ে আসতে লাগল।

স্তব্ধ হয়ে গেছে বেদেনীরা। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পালঙ্ক।

তীব্র তীক্ষ্ণ হাসিতে বিশাল নৌকোটাতে শিউরে তুলল শঙ্খিনী, 'কি লো শালিকপঙ্খী, আমার পুরুষেরে না ভোগ করতে চাইছিলি? নে, ভোগ কর! হি—হি—হি—'

তারপরেই আর্তনাদ করে রাজাসাহেবের বুকে আছড়ে পড়ল শঙ্খিনী। তার শরীর ঠাণ্ডা হতে শুরু করেছে। শঙ্খিনীর তীক্ষ্ণ আর্তনাদে সারা বিল কেঁপে ওঠে, 'এই আমি কী করলাম রাজাসাহেব! কী করলাম!'

শঙ্খিনী ভাবল, কালচিতির বিষ তো এত তাড়াতাড়ি ক্রিয়া করে না। তবে, এই মাত্র সোনাইবিবির বিল থেকে যে কালচিতিটাকে সে ধরে এনেছিল তার জিভের নিচে এমন

ভয়াল মৃত্যু কোথায় লুকিয়ে ছিল? তবে কি নিজের দেহমনের যে জ্বালা বিষ হয়ে উঠেছিল, আর সেটাই সে সাপটার দাঁতে গুঁজে দিয়েছিল? না, কালচিতির ফণা হয়ে সে-ই ছোবল দিয়েছে রাজাসাহেবকে? ভাবতে ভাবতে নিথর হয়ে গেল নাগমতী বেদের মেয়ে।

রক্তকমল্

ছোট চাষার ছেলে—কোথায় সাতপুরুষের আবাদী জমিতে শক্ত থাবায় ধারাল লাঙলের ফলা চেপে চেপে ধরবে, কি ফসলের জন্য ঘাম-ঝরানো পরিশ্রমে বীজধান ছড়িয়ে আসবে চন্দনের মতো নরম মাটিতে, তা নয়, কোমল মুঠোয় কলম ধরে মোরগ-ডাকা সকাল থেকে সেই শিয়াল-ডাকা মধ্যরাত পর্যন্ত অবিরাম কী যে লেখে আজম, সে-ই জানে। সেদিন পাথরের মতো শক্ত মাটির চাঙড়ের ওপর দিয়ে লাঙল ঠেলতে ঠেলতে রায়েবালি অবশ্য বলেছিল, 'তোমার বড় পোলাটায় জবর গুণীন হইছে হে জিগিরালি চাচু, ভারি মিঠা মিঠা কবির গান বান্ধে। কথাখান শোনলাম নাপিত-বাড়ির কাত্তিকের মুখে।' আরও কয়েকজন সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়েছিল, 'ঠিক ঠিক। আমরাও শুনছি আজমের গান। চোমৎকার।'

জিগিরালির গলায় তীব্র বিরক্তির উত্তাপটা চাপা রইল না। অনেক দিন ধরেই বুকের ভেতর আজম সম্পর্কে একটা ক্ষোভ টগবগ করছিল। বিকৃত একটা মুখভঙ্গি করে উঠেছে জিগিরালি, 'আরে থুইয়া দ্যাও অমুন কবির গান! তোমারেই জিগাই সানকিতে ভাত আসে কুনখান থিকা? চাষার পোলা, ওই সগল সুখী ব্যারামে ধরলে খাইব কী? আমি আর কয়দিন বাচুম! আমারে গোরে যাইতে দ্যাও, তখন ঠেলাটা ট্যার পাইব। থুইয়া দ্যাও তোমার অমুন গুণীন সিন্দুকে ভইরা।'

গজগজ করতে করতে বাঁ পাশের বলদটার ল্যাজে একটা নির্মম মোচড় দিয়েছিল জিগিরালি।

বৈশাখ মাসের দুপুর। রৌদ্রঝকিত দিগন্তের ওপর হলদে রঙের আগুন জ্বলছিল হা হা করে। জিগিরালির পোড়া তামাটে শরীরে অজস্র ধারায় ঘামের ফোয়ারা ফুটে বেরুচ্ছিল।

জিগিরালি বলেছিল, 'এইবার বাড়িমুখি চল রায়েবালি, প্যাটটা জ্বলতে আছে ক্ষুদায়। দেখ গিয়া তোমার গুণীনে অখন কবির গান বান্‌তে (বাঁধতে) আছে। ক্যান, এট্টু খ্যাতের কাম করলে সোম্মানটা কি খোয়া যায়? ইট্টু লাঙ্গলখান ধরলে আমার কতখানি কামের সুসার হয় কও তো রায়েবালি, তুমিই কও। চাষার পোলার যত নবাবী রোগ!'

নিঃশব্দে মাথাটা সামনে পিছনে একবার নেড়েছে রায়েবালি।

বৈশাখের অগ্নিঝলসিত প্রান্তর যাকে নিয়ে এতক্ষণ নানা কথায় মুখর হয়ে ছিল সে কিন্তু তখন পরম নির্বিকার। বাড়ির পেছনে ঘন গাছগাছালির ছায়ায় ঘুঘুর নরম ডাকে বৈশাখী দুপুর আচ্ছন্ন হয়ে আছে। আর সেখানে একটা ছেঁড়া পাটি বিছিয়ে আজম স্বপ্নাতুর দুটো চোখ ছড়িয়ে দিয়েছে একখানা পুরনো মনসামঙ্গলের জীর্ণ পাতার ভেতর। আজ সন্ধেয় বরিসুরের কেরায়া মাঝিরা ভাসানের গান শুনতে চেয়েছে। তার জন্যই এই একাগ্র প্রস্তুতিপর্ব।

আর এমনি সময় তৃষ্ণার্ত বলদ দুটোকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে এনে সামনের মান্দার গাছটার গায়ে বাঁধল জিগিরালি। আজমের দিকে নজর পড়তেই চন করে রক্ত একেবারে ব্রহ্মতালুতে লাফিয়ে উঠল, 'নবাবের ছাও বইসা বইসা কিতাব পইড়া আর কাগজ লেইখা ভুর করলেই দিন যাইব? আমি আর কয় দিন? তখন ট্যার পাইবা কত ধানে কত চাউল! কয় দিন ঠোটের আগায় এই গান থাকে, দেখব গেরামের মাইন্‌ষে।'

যাকে লক্ষ করে একটার পর একটা এতগুলো চোখা চোখা তীর ছোঁড়া হল সে কিন্তু পরম নিশ্চিন্তে মনসামঙ্গলের পাতায় ঝুঁকেই রয়েছে। কোনও দিকে একবিন্দু ভ্রুক্ষেপ নেই। আপাতত পেটের ভেতর খিদের ফণা আছড়ে আছড়ে পড়ছে জিগিরালির। ওধারের ঘরে ঢুকে মাথায় সামান্য একটু সরষের তেল চাপিয়ে গজগজ করতে করতে সোনারঙের খালের দিকে পা বাড়াল সে। ভারি আহাম্মকি করে ফেলেছে জিগিরালি, সারা জীবনে একটা প্রচণ্ড ভুল হয়ে গেছে আজমকে দস্তখত শেখাবার জন্য ইউনিয়ন বোর্ডের স্কুলে পাঠিয়ে। চাষার ছেলে—দস্তখত করা আর চিঠি লেখার বিদ্যাকে ছাপিয়ে এতখানি উজিয়ে এসেছে যে দিনরাত বই-কাগজে নিজেকে ডুবিয়ে রেখে সংসারের দিকে চোখ তুলবার ফুরসতটুকুও পায় না! স্কুলগুলো শুধু দস্তখত করতেই শেখায় না, আরও ভয়ঙ্কর কী যেন শেখায়; যাতে ছোট চাষার ছেলে সংসার বিমুখ হয়ে কিনা কেতাবের মধ্যেই পড়ে থাকে অষ্টপ্রহর! মাস্টারেরা কী মন্ত্র যে কানের ভেতর ঢেলে দিয়েছে, আজমই জানে ভাল। আপাতত এই ভীষণ সত্যটা অবিষ্কার করতে করতে এলোমেলো পা ফেলে খালের দিকে এগিয়ে যায় জিগিরালি।

আজম বাপজানের দিকে এক পলক তাকিয়ে ফের মনসামঙ্গলের মধ্যে ডুবে যায়। আসলে তাকে প্রথম সেই বিচিত্র জগৎটার সন্ধান দিয়েছিল মনসুর। বরিসুরের কেরায়া নৌকার ঘাট থেকে ফিরবার পথে অনেকদিন আগের একটা সন্ধে রক্তের মধ্যে যেন এখনও ঝমঝম করে বেজে ওঠে আজমের। পাশাপাশি আসতে আসতে স্বপ্নভরা গলায় মনসুর বলেছিল, 'আমাদের সাহিত্য পড় আজম। তুমি কবি, তুমি গুণী। আমাদের বাংলা ভাষা আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ, আমাদের বুকের রক্ত দিয়ে কত কাল ধরে এ সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে। কত কবি এসেছেন, কত কবি আসবেন, কত সাহিত্যিক কত নীরব সাধনায় একে সাজিয়ে দিয়ে গেছেন। তুমি বুঝবে আজম, বাংলা শুধু হিন্দুদের ভাষা নয়, হিন্দু-মুসলমান দু'জনের রক্ত সমান লেগেছে এ ভাষা তৈরি করতে।'

পথের দু-পাশে হিজল আর আকন্দেব মাথায় মাথায় আবছা অন্ধকার নামছিল

সন্ধের। মনসুরের কথাগুলোর অর্থ পরিষ্কার বোঝেনি আজম কিন্তু চেতনার মধ্যে সেই ঝাপসা দিনান্তে একটা কেমন যেন নেশার সঞ্চার হয়েছিল।

মনসুরের গলার ওপর ক্রমশ আবেগ যেন ভর করছিল, 'কিন্তু যারা এই ভাষার গলা টিপতে চাইছে, হত্যা করতে চাইছে আমাদের আবহমান কাল থেকে এই পূর্বপুরুষের পবিত্র সাধনাকে, তাদের আমরা কিছুতেই ক্ষমা করব না। সেদিন যদি আমাদের প্রাণও দিতে হয় তার জন্য প্রস্তুত থাকব। তুমি কবি, তুমি গুণী আজম, সেদিন যেন তোমরা পিছিয়ে থেকো না।'

মনসুরের শেষ কথাগুলো দুর্বোধ্য হয়ে এসেছিল আজমের কাছে। প্রাণ দিতে হবে কেন? কী একটা কুহেলি-ভরা বিপদের সংকেত যেন রয়েছে মনসুরের বিচিত্র কথাগুলোর মধ্যে।

মনসুর আলি জমিদার ফিরোজউদ্দিন সাহেবের ছোট ভাই। মস্ত পণ্ডিত মানুষ। বরিসুরের খেয়া পেরিয়ে রোজ ঢাকায় চলে যায় পড়াশোনা করতে। স্কুলের পর কলেজ, কলেজের পর এখন কোথায় পড়াশোনা করছে, তা অবশ্য বলতে পারবে না আজম। অত বড় বিদ্বান মানুষটা তাকে বার বার গুণী বলছিল, কবি বলছিল, পাশাপাশি চলতে চলতে স্নায়ুগুলো কেমন যেন সঙ্কুচিত হয়ে আসছিল আজমের। আসলে গেঁয়ো কবির গানের আসরে আগে থেকেই নিজের বাঁধা গান গাইত আজম। যাত্রাপালায় কর্ণ, কৃষ্ণ কি অভিমন্যু সাজত। পালা গাইতে চলে যেত দূর দূর জেলায়। চাষাভুষো এবং সাধারণ মানুষের ভেতর তার বেশ নামও হয়েছে তখন। যেভাবেই হোক তার গানের খ্যাতি মনসুরের কানে গিয়েছিল।

মনসুরকে দেখলেই শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে মন কেমন আচ্ছন্ন হয়ে যায় আজমের।

এক কালে অমূল্য ভুঁইমালীর শখের যাত্রার দলে কর্ণ সাজত আজম—একদিন সেই দলটাই ভেঙে গেল। নোয়াখালির এক বারুই-বাড়ির উঠোনে তখন 'কর্ণবধ' পালা হচ্ছে, অর্জুনের পার্ট বলছে স্বয়ং অমূল্য ভুঁইমালী। কর্ণবধের অনেক আগেই একটা শাণিত বল্লমের ফলা কোত্থেকে যেন অর্জুনের বুক বিদীর্ণ করে সমস্ত আসরটাকে রক্তস্নান করিয়ে দিয়েছে। একটা বীভৎস চিৎকারের মধ্যে সবচেয়ে বড় সত্যটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল—'দাঙ্গা বান্‌ছে (বেঁধছে)।'

শ্রোতারা উঠোনে হোগলার ওপর বসে তন্ময় হয়ে পালা শুনছিল, জলধর বারুইর ছোট শালা ম্যাচবাতি (দেশলাই) জ্বেলে ইদ্রিস মিঞার মুখের বিড়ি ধরিয়ে দিচ্ছিল, পাশাপাশি ঢুলছিল ফারুক আর রসময় নাপিত। দাঙ্গার কথায় সকলে উঠে পড়ে প্রাণপণে ছুটতে ছুটতে কোথায় যেন ছিটকে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে বারুইদের ময়ূরমুখী টিনের চালে হিস হিস করে উঠল একটা লকলকে আগুনের ফণা। আর তারই আলোতে অনেকগুলো প্রেতমূর্তির মতো মানুষের মুঠোতে অসংখ্য বল্লমের ফলা ঝকমক করে উঠেছিল। 'কর্ণবধ'-এর আসরে রক্তাক্ত এক নাটকের স্তব্ধ সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কর্ণবেশী আজম।

বিরাট আঘাত পেয়েছিল আজম, বুকের কোন একটা কোমল অংশ ছিঁড়ে ফালাফালা হয়ে গিয়েছিল তার। অমূল্য ভুঁইমালী তাকে দিয়েছিল গানের গলা,

দিয়েছিল অভিনয়ের মদাকতা-ভরা শিল্প। সেই দাঙ্গার রাতেই গ্রামে চলে এসেছিল আজম।

নোয়াখালির বারুই-বাড়ির আগুন শেষ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল জল-বাংলার অগুনতি গ্রামে-গঞ্জে আর শহরে। কিন্তু তাদের এই ছোট্ট নগণ্য বরিসুরকে দু'হাত মেলে আগলে রেখেছিল মনসুর। অন্য জায়গার রক্ত কি আগুনের ছোঁয়া এখানে লাগতে দেয়নি। দাঙ্গা তাই এই সামান্য গ্রাম এড়িয়ে ক্রুদ্ধ আক্রোশে আছড়ে পড়েছে কুমারগঞ্জ, নবীপুর, বাসাইল, হাসাড়া, এমনি আরও কত জায়গায়। এতদিন দূর থেকে দেখেছে মনসুরকে, সেদিন কেরায়াঘাট থেকে ফেরার সময় প্রথম কথা হল। আড়ষ্ট গলায় ফিসফিস করে বলেছিল, 'আমি যে লিখাপড়া কিছুই জানি না।'

একটু আগের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর উদার কোমলতায় ভরে গিয়েছিল মনসুরের। মিষ্টি করে হেসে সে বলেছিল, 'আমি শুনেছি তুমি গান বেঁধে আসরে আসরে গাও। দেশের কথা মানুষের কথা মানুষের কাছে বলতে পার না? গানে বেঁধে বেঁধে তাদের না খাওয়ার কথা, তাদের গলায় দড়ি দিয়ে মরার কথা লিখতে পার না? এই যারা দাঙ্গা বাধাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে গান বাঁধতে পার না?'

গান সে বাঁধে বই কি। পুরাণের ঢঙে সে গান লিখেছে। কিন্তু সে সব চাষাভুষোদের জন্য। কিন্তু মনসুর যা বলছিল অর্থাৎ মানুষের দুঃখকষ্ট, অভাব-অভিযোগ, দাঙ্গা—এ সব নিয়ে গান বাঁধার কথা কোনও দিন সে ভাবে নি। অবাক বিস্ময়ে সে শুধু তাকিয়ে থেকেছে।

মনসুর আবার বলেছিল, 'ওরা গরিব মানুষের হাত থেকে তো ভাত কেড়ে নিয়েছেই, এবার এতদিনের বাপ-নানার ভাষাটাও কেড়ে নিতে চাইছে ঠোঁট থেকে। কিন্তু শরীরে শেষ রক্তকণাটা থাকা পর্যন্ত তা আমরা হতে দেব না। আজম—তুমি কবি, তুমি গুণী। তোমরা পার না দেশের লোকগুলোকে জানিয়ে দিতে যে তাদের মুখের ভাষা, তাদের পরিচয় ছিঁড়ে নিতে চাইছে ইবলিশেরা?' বলতে বলতে ক্ষোভে, ক্রোধে তার কণ্ঠস্বর তীব্র হয়ে উঠেছিল। কথাগুলো বলে আর দাঁড়ায় নি মনসুর, সোজা ডান দিকে ঘুরে চলে গিয়েছিল।

কথাগুলোর অর্থ সেদিন পরিষ্কার ছিল না আজমের কাছে। যে ইবলিশেরা তাদের পেটের ভাত, মুখের ভাষা ছিনিয়ে নিতে চাইছে তাদের পরিচয় জানত না সে। তবু সোনারঙের খালের ওপাশে ছোট টিলাটার ওপর একা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথাগুলো ভাবতে ভাবতে আজমের হৃৎপিণ্ডটা বিচিত্রভাবে নাড়া খেয়ে উঠেছিল। চারপাশের অন্ধকার ঘন কালির মতো ছড়িয়ে পড়েছে তখন।

কতক্ষণ দাড়িয়ে ছিল খেয়াল নেই। হঠাৎ একটা কালপেঁচার কর্কশ চিৎকার কানে করাত চালিয়ে দিতেই চমকে উঠেছিল আজম। নাঃ, বেশ রাত হয়ে গেছে। এতক্ষণে সাগ্রহ প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকার পর গ্রামের শেষ প্রান্তে দীঘির পাড়ের তালগাছটার আড়াল থেকে নিশ্চয়ই রোশেনা চলে গেছে। সেদিন সন্ধের পর দেখা করার কথা ছিল যে। তা যাক। মনসুরের কথাগুলো শুনতে শুনতে আজমের মন নতুন উন্মাদনায় ভরে গিয়েছিল। সে কবি, সে গুণী—অত বড় একটা বিদ্বান মানুষের কাছ থেকে সেই প্রথম

স্বীকৃতি পেয়েছিল সে। বাজানের বিরক্তিকর গজগজানিকে তারপর থেকে আর পরোয়া নেই আজমের। হ্যাঁ, সে গান লিখে যাবে, পালা বেঁধে যাবে।

সেদিন সন্ধের রহস্যময় পথটা ধীরে ধীরে একটা বিচিত্র জগতের দিকে টেনে নিয়ে গেছে আজমকে। আজ অনেক পরিষ্কার হয়ে এসেছে মনসুরের সেই প্রায় দুর্বোধ্য কথাগুলো। মনসুরই তাকে পরে অনেক বই পড়তে দিয়েছে—পদ্মপুরাণ, চণ্ডীমঙ্গল, ময়মনসিংহ-গীতিকা, তারও পর মেঘনাদবধ, রৈবতক, পলাশির যুদ্ধ—ধীরে ধীরে সেই রহস্যের কুয়াশাঘেরা জগৎটার দরজা খুলে দিয়েছে আজমের সামনে।

রঙিন কাচের মতো ঝকঝকে বৈশাখের বিকেল।

সারা দুপুর গান বাঁধার পর এখন সোনারঙের খাল বাঁয়ে রেখে ফসলশূন্য প্রান্তরের ওপর দিয়ে হনহন করে আজম এগিয়ে চলল বরিসুরের কেরায়া ঘাটে। আজ সেখানে বেহুলার গান গাইবে সে। গান লিখতে লিখতে সুর করে নিয়েছিল মিষ্টি গলায়। বেহুলা-লখাইর কথা নিজের ভাষায় লিখতে ভাল লাগে তার, তন্ময় হয়ে যায় পদগুলো আবৃত্তি করতে করতে। বিজয় গুপ্তের একখানা ছেঁড়া পুঁথি যোগাড় করেছে কোত্থেকে যেন—রোজ খানিকটা খানিকটা করে পড়ে। তার এই জলের দেশকে তারই প্রাণের ভাষা দিয়ে কি অপরূপভাবেই না সাজিয়ে রেখেছেন কবি। ভাবতে ভাবতে আশ্চর্য হয়ে যায় আজম। তারই নকল করে গান লিখেছে সে।

সন্ধের আসরে কেরায়া মাঝিরা জমায়েত হল। নানা গাঁ থেকে ভাগচাষী, ছোট ছোট ব্যাপারী আর পথচলতি হাটুরে মানুষও ঘন হয়ে বসল পাশাপাশি। এত মানুষের ঘেরের ভেতর কেন্দ্রবিন্দুর মতো বসেছে আজম, মিষ্টি গলায় লহর তুলে এক সময় গান ধরল সে ঃ

> একটুখানি ছিদ্র আছে লোহার বাসর ঘরে,
> কালশঙ্খিনী সুতা হইয়া ভিতরে পরবেশ করে
> পিরদীমের শইলতাখান মাথা কুইট্যা মরে
> রে বিধির কী হইল!
> পিরদীমের শইলতাখান থরথরইয়া কাপে
> বেউলা সতী কান্দে শোন বিষহরির শাপে
> রাইত পোহাইলে লখাই শোবে ভেলার পালঙ্কেতে—
> রে বিধির কী হইল!

গান থামার পর একটা অদৃশ্য রেশ ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত আসরের ওপর। কত কালের পুরনো কাহিনী, পুরনো ভাষা, বহু বার শোনা হয়েছে, তবু শ্রোতাদের চোখের তারা ভিজে ঝাপসা হয়ে গেল। কী ভাব আর কী অপূর্ব মধুর এই ভাষা, আর তাকেই কিনা রক্তাক্ত থাবা বসিয়ে হত্যা করতে চাইছে কারা যেন। মনসুরের সঙ্গে সেদিন সন্ধের পর আরও অনেক বার দেখা হয়েছে। যতবারই দেখা হয়, সে বলে, আজমকে ঢাকায় নিয়ে দেখিয়ে দেবে, বুঝিয়ে দেবে এ কাদের করসাজি, কারা মুখের গ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভাষাকেও ছিনিয়ে নিতে চাইছে।

আজম গান শেষ হলে আসরের মাঝখানে বসে মনসুরের কথাগুলো ভাবছিল। সে হঠাৎ চারপাশের মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, 'ভাইরা, বাংলা ভাষায় আমাগো আর কথা কইতে দিব না অরা। এই গানও গাইতে দিব না।'

'কারা? হিন্দুরা?' অনেকগুলো কণ্ঠস্বর গর্জে উঠল সমস্বরে।

'না।' আস্তে মাথা নাড়ে আজম।

'তবে কারা? নাম কও। আমাগো বাপ-নানার ভাষায় কথা কমু না তো কমু কোন ভাষায়?' একটা হিংস্র উত্তেজনায় ঝকমক করতে থাকে গোটা আসর, 'না খাইয়া থাকি একবেলা, তাও সয়। দুঃখুর কথাটা যদি না কইতে পারি তো জীয়ন্তেই মইর‍্যা থাকুম। গায়ের লৌ (রক্ত) থাকতে এই অন্যায় সমু (সহ্য করব) না আজম ভাই। নামটা কও, কোন শালায় এমুন সব্বনাইশ্যা মস্করা করতে চায় আমাগো লগে—দেখি এক ফির।"

নামটা আজমও এখন পর্যন্ত জানে না। তাকে বলেনি মনসুর। শুধু একটা অনিবার্য ঝড়ের আভাস দিয়েছে মাত্র। এবার মনসুরের কথাগুলোর নির্ভুল প্রতিধ্বনি করল আজম, 'এর লেইগা দরকার হইলে জানও দিতে হইতে পারে ভাইরা। বাংলার বদলা কি একটা বিজাত ভাষা শিখতে লাগব নিকি!'

'না, না—বাজান-দাদার, চৈদ্দ পুরুষের জবান থুইয়া অন্য কিছুতে আমরা কথা কইতে পারুম না আজম ভাই। বুকের লৌ দিতে হয়—তাও সই। তোমার মুখের মনসার গান, ময়নামতীর গান, ভাসান গান না শুইন্যা পারুম না। কী অন্যায় কথা এইটা, কও দেখি।' বুড়ো মাঝি হাজিরদ্দি চেঁচিয়ে ওঠে।

আসরের পেছন দিকের অন্ধকার থেকে আর একটা গলা ভেসে আসে, 'দ্যাশ ভাগ হইতে হিন্দু ভাইরা যাইতে আছে গিয়া—বুকের বল হারাইলাম। আবার মুখের ভাষা হারাইয়া মরুম নিকি! এক্কেবারেই না।'

থম থম করতে লাগল নদীতীরের আসর। একটা অশুভ ঝড়ের সূচনা যেন দেখা দিয়েছে এখানকার শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবনে।

সেদিন আসরে বেহুলা-লখিন্দরের পালা গেয়ে আসার পর কয়েকটা দিন কটে গেছে।

এখন সন্ধে নামতে শুরু করেছে। আজম নিজেদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে যায়।

সে কবি, সে গুণী। পৃথিবীর দাবিকে সে অস্বীকার করেনি, অস্বীকার করেনি মনসুরের আশ্চর্য উজ্জ্বল কথাগুলোকে। কিন্তু তার হৃদয়ের কাছে আর একজনেরও অনেক প্রত্যাশা আছে। সোনারঙের বেলাশেষে সে এসে অপেক্ষা করে মর্মরিত তালগাছের নিচে নিবিড় ছায়ায় দাঁড়িয়ে। রোশেনার সেই দাবিকে সে প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না।

আজম গলায় মিষ্টি সুর তুলে এগিয়ে চলল দীঘির পাড়ের তালবনের দিকে।

কি আশ্চর্য, যখনই রোশেনার দিকে একটা স্বপ্নাচ্ছন্ন মন নিয়ে পা বাড়িয়েছে, যখনই সন্ধের এই রহস্যময় পথটার ওপর দিয়ে চলতে চলতে রোশেনার ভুঁইচাঁপার

মতো উন্মনা মুখখানা মনের আয়নায় ফুটে ওঠে, ঠিক তখনই দেখা হয়ে যায় মনসুরের সঙ্গে। আজও দেখা হল। ওপাশের উঁচু টিলাটা পেরিয়ে দ্রুত পায়ে সামনে চলে এল মনসুর। ব্যস্তভাবে বলতে থাকে, 'তোমার বাড়িতেই যাচ্ছিলাম। যাক, পথেই দেখা হয়ে গেল।'

বেশ অবাক হয়ে যায় আজম। আগে কোনও দিন মনসুর তাদের বাড়ি যায় নি। সে জিজ্ঞেস করে, 'আমাগো বাড়িত্ যাইতে আছিলেন ক্যান মনসুর ভাই? কুনো কাম আছে?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে মনসুর। তারপর বিষণ্ণ গলায় বলে, 'আজম ভাই, আর বুঝি পারব না। এবার তোমাদের নৌকোর বদলে বলতে হবে কিশ্‌তি, কুটুম্বের বদলে মেহমান, কর্তব্যের বদলে ফর্জ, ভব্যতার বদলে তমীজ, ক, খ, অ, আ-র বদলে আলে, বে, তে, সে, জিম, হে, খে মুখস্থ করতে হবে। ওই মনসামঙ্গল, ওই মেঘনাদবধ বুড়িগঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিতে হবে, নয় আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেবে ওরা ছারখার করে।'

অদ্ভুত করুণ হাসি ফুটে উঠল মনসুরের মুখে। পরক্ষণে প্রবল উত্তেজনায় গলার স্বর তীব্র হয়ে ওঠে, 'জোর করে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে চাইছে সরকার। আমাদের পূর্বপুরুষের এতদিনের সাধনা ভেঙে চুরমার করে দিতে চাইছে। আজ ঢাকায় গুলিগোলা চালিয়েছে এই জন্যে। কিন্তু আমরাও দেখব ওদের বুলেট আমাদের ক'টা পাঁজর ফুটো করতে পারে, আমরাও দেখব ওদের লাঠি আমাদের ক'টা মাথা গুঁড়িয়ে দিতে পারে!' বলতে বলতে হঠাৎ উত্তেজনা কেটে যায়। কোমল স্বরে এবার বলে, 'আজম তুমি কবি, তুমি গায়ক, একটা গান বাঁধতে পার তুমি? কাল আমরা য়ুনিভার্সিটির সামনে মিটিং করব। ১৪৪ ধারা যদিও আছে, তা ভাঙতে হবে— তোমার গান দিয়েই আমরা সভা শুরু করব। পারবে?'

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল আজম। সবগুলো কথার সে অর্থ বোঝেনি কিন্তু গান বাঁধার আবেদনটা সে পরিষ্কার বুঝেছে। মনসুরের কথাগুলো তার রক্তে অনেকখানি উন্মাদনা যেন ঢুকিয়ে দেয়। সে কবি, সে গায়ক—আজ রাতেই সে গান লিখবে, যারা তাদের ভাষাকে বন্দুকের ঔদ্ধত্যে স্তব্ধ করে দিতে চাইছে, যারা তাদের আবহমানের সাধনাকে গুঁড়িয়ে দিতে চাইছে, সেই সব ইবলিশদের বিরুদ্ধে কলমের মুখ থেকে আগুন ঝরাবে আজম।

মনসুর বলল, 'কাল আমার সঙ্গে ঢাকায় যেতে হবে আজম। তোমার ভয় পেলে চলবে না ভাই। যেতেই হবে তোমাকে। কাল সকালে আমাদের বাড়ি চলে এস। একসঙ্গে লঞ্চে করে ঢাকায় চলে যাব। আমি এখন চলি। রাত্তিরে অনেক কাজ সারতে হবে।' বলতে বলতে মনসুর উত্তর দিকে এগিয়ে যায়।

রোশেনার কাছে আজ আর যাওয়া হয় না আজমের। মনসুরের সঙ্গে কথা বলতে বলতে এত দেরি হয়ে গেছে যে রোশেনাকে পাওয়ার আশা আর নেই। আজম ঠিক করে ফেলে ঢাকা থেকে ফিরে এসে রোশেনার সঙ্গে দেখা করবে। অনেক দিন হয়ে গেল। এবার শাদির ব্যাপারে একটা কিছু করতেই হবে। কিন্তু তার আগে গান বাঁধা এবং ঢাকায় যাওয়া।

বাড়ি ফিরে নিজের ঘরখানায় ঢুকে কুপি জ্বালিয়ে দোয়াত-কলম নামিয়ে বসল আজম। মনসুরের কথাগুলো একটা অদ্ভুত উত্তেজনার মতো রক্তকণাগুলোর ওপর ভেঙে ভেঙে পড়ছে—সে কবি, সে গায়ক। আগামী কাল তাকে ঢাকায় যেতে হবে, আগামী কালের ঝড় আর উন্মাদনাকে সাতপুরুষের ভাষার মধ্যে সঞ্চারিত করতে হবে আজ রাতেই। মনের ভেতরটা আমূল তোলপাড় হয়ে যেতে থাকে।

সারাদিন ধানখেতে মই দিয়েছিল জিগিরালি। শরীর ভেঙে আসছে এখন। উঠানের এক কোণে বসে তামাক টানতে টানতে আজমের ঘরের দিকে চোখ পড়তে একেবারে খেপে উঠল, 'এই যে নবাবের ছাও ঘরে ফিরল! এইবার রাইতভর বাত্তি (আলো) জ্বালাইয়া গুষ্ঠীর মাথা লেখতে বসব। আমি জিগাই কেরাচিন আনতে পয়সা লাগে না, দোকানীরা আমার সুমুন্দি হয় নিকি যে মাগ্‌না দিব বুইনের জামাইরে!'

বিরক্ত হয়ে উঠল আজম। বলে, 'চুপ মার বাজান। এই রাইতে আমার চিল্লাচিল্লি ভাল লাগে না।'

'ভাল লাগে না! আমার বদশাজাদা রে! যা, বাইর হ, আমার বাড়িতে তর ভাত নাই, অখনই বাইর হইয়া যা।' একেবারে খেপে ওঠে জিগিরালি।

কোনও জবাব দিল না আজম। কাগজপত্র, দোয়াতকলম, বইপত্তর নিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল।

আজমের মা ঘরের বারান্দা থেকে ককিয়ে উঠল, 'এই রাইতে যাস কই আজমা?'

'গোরে।'

আজমদের বাড়ির পর আগাছায়-ভরা ছোট মাঠ। তারপর বারোড়ি বাড়ি। সেখানে এসে মৃদু গলায় ডাকে আজম, 'ঠাইন দিদি, অ ঠাইন দিদি।'

'কে রে, আজমা নিকি? আয় আয়।' একটা কুপি জ্বালিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন একজন বৃদ্ধা। তিনি ছাড়া এতবড় বাড়িটায় আর কেউ নেই। দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে ওদের পরিবারের বাকি সবাই কলকাতায় চলে গেছে। একা এত বড় ভিটে আগলে পড়ে আছেন এই বৃদ্ধা। দেশ ছেড়ে, স্বামী শ্বশুরের ভদ্রাসন ছেড়ে তিনি কোথায় যাবেন? গোটা বাড়িটা যেন এক মহাশ্মশান।

আজম বলল, 'আপনেগো পুব দিকের ঘরখান খুইলা দ্যান, আমি আইজ রাইতটা থাকুম এইখানে। আমারে একটা কুপি দিবেন ঠাইন দিদি।'

বৃদ্ধার সঙ্গে আজমের সম্পর্ক বড় মধুর। দেশভাগের পর ছেলেমেয়ে আত্মীয়-স্বজন সবাই যখন কলকাতায় চলে গেল, বৃদ্ধা যখন সম্পূর্ণ একা, সেই সময় প্রতিবেশী আজমরা ছাড়া তাঁর আর আছেই বা কে? আজম মাঝে মধ্যে এসে তাঁর খোঁজখবর নিয়ে যায়।

একপলক আজমের মুখের ওপর নজরটা স্থির রেখে বৃদ্ধা বলে উঠলেন, 'বাপের উপর গোসা হইয়া নি আইছস? ভাত খাস নাই তো বুঝতেই পারতে আছি। পুবের ঘরে ছিকল (শিকল) লাগাইনা আছে। তুই গিয়া খুইলা ব'য় (ব'স)। ভাত তো নাই—আমি দু'গা চিড়ামুড়ি লইয়া আসি।' গান পাল্লা ইত্যাদি নিয়ে বাপজানের সঙ্গে

আজমের সম্পর্কটা কত তিক্ত তা জানেন বৃদ্ধা।

একটু পরেই একটা বেতের ডালায় কিছু মুড়ি আর মুড়ি গুড় নিয়ে এলেন বৃদ্ধা। বললেন, 'এগুলা খা। কয়দিন আসস নাই। তোর মুখে 'কর্ণবধ'-এর পালাটা এত মিঠা লাগে, অথচ তুই কতকাল শুনাইয়া যাস না!'

'আর ওই কর্ণবধ গাইতে দিব না, এইবার থিকা উর্দু শিখতে হইব সগলেরে। গরমেন্ট আইন বাইন্ধা দিব। বাংলা ভাষা ভুইলা যান।'

শঙ্কিত মুখে বৃদ্ধা বলেন, 'বাংলা ভাষা ভুলুম ক্যামনে, ও যে বুকের মইধ্যে মিশ্যা আছে। আমাগো চৈদ্দ পুরুষের ভাষা। ক'স কি তুই আজমা যত সব্বনাইশা কথা!'

'যা কই সত্য। বন্দুকের গুল্লি দিয়া বুকখান ফুটা কইরা দিলেই ভুইলা যাইবেন ঠাইন দিদি।' বলে মজা করে হাসে আজম।

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে চিন্তাগ্রস্তের মতো একসময় বৃদ্ধা উঠে গেলেন। রাত বাড়তে থাকে। মুড়ি গুড় খাওয়ার পর লিখতে বসে আজম। তার কলম হরফের পর হরফ সাজিয়ে কাগজ ভরিয়ে তুলতে থাকে। লিখতে লিখতে কখন একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিল, খেয়াল নেই।

আবার সেই মোরগ-ডাকা সকাল।

বিছানা থেকে উঠেই মনসুরদের বাড়ি চলে এল আজম। মনের ভেতর কাল রাতের লেখা গানখানা বিচিত্রভাবে দোলা দিয়ে যাচ্ছে। একটা অদ্ভুত ঝঙ্কার উঠছে কথাগুলোর।

ঘন্টাখানেক পর সোনারঙের খাল পেরিয়ে, বরিসুরের কেরায়া নৌকাগুলো পেছনে রেখে নদীর পাড়ে লঞ্চঘাটে এসে পড়ল মনসুর আর আজম।

লঞ্চ দাঁড়িয়েই ছিল। আজমরা টিকেট কেটে উঠে পড়ে।

এখান থেকে ঢাকা দেড় ঘন্টার পথ। একসময় দু'জনে সেখানে পৌঁছে যায়।

সদরঘাটে নেমে, সবজিবাগান উজিয়ে, রমনা পেরিয়ে দু'জনে চলে এল বিদ্যার সেই পবিত্র ভূমিতে। ঢাকা ইউনিভার্সিটি। এখানেই তবে পড়াশোনা করতে আসে মনসুর!

বিরাট দালান, সামনে ছোট ছোট করে ছাঁটা ঘাসের 'লন'। সেখানে মিলিটারি ভ্যান। সমস্ত জায়গাটা ছেয়ে গেছে পুলিশ-বন্দুক-লাঠির একটা মিলিত হিংস্রতায়। পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে উদ্যত রাইফেল গর্জে উঠবে।

ইউনিভার্সিটির বাইরের রাস্তায় অনেক ছাত্র এবং যুবক ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ছাত্রীও রয়েছে ক'টি। সবগুলো ছেলেমেয়ের চোখে ঝকমক করছে কী এক শাণিত প্রতিজ্ঞা, কী এক অগ্নিগর্ভ শপথ। এদের কাছে জীবন এবং মৃত্যুর মাঝখানে কোনও সীমারেখা নেই।

মনসুরকে দেখেই একটা গুঞ্জন উঠল। একটি তরুণী এগিয়ে এসে বলে, 'তোমার কাল রাতেই না আসার কথা ছিল?'

'আসতে পারি নি। এস, পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। এই যে সেই ফোক পোয়েট,

জনগণের কবি—এর কথা তোমাদের সেদিন বলেছিলাম। এর নাম আজম। এর গান দিয়েই আজকের মিটিং শুরু করব।'

আজম লাজুক মুখে সেলাম জানায়।

তরুণী এবং অন্য ছেলেমেয়েরা এগিয়ে এসে আজমকে ঘিরে ধরে। সেই তরুণীটি বলে, 'খুব খুশি হয়েছি কবি আপনাকে পেয়ে। মাতৃভাষার এই সংকটে আপনারা ঝাঁপিয়ে না পড়লে কী করে চলবে? আসুন আসুন, এদিকে আসুন।'

মেয়েটির সঙ্গে পায়ে পায়ে ইউনিভার্সিটির গেটটার দিকে এগিয়ে যায় আজম।

ইতিমধ্যে আরও অনেকগুলো ছেলে এসে ঘিরে ধরেছে মনসুরকে। বলে, 'মনসুর ভাই, এখনই কি গেটটা ভেঙে ঢুকব আমরা? মিটিং করতেই হবে আজ। শুধু আপনার জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছি সেই সকাল থেকে।'

'নিশ্চয়ই, মিটিং আমরা আজ করবই য়ুনিভার্সিটির ভেতর।'

কে যেন বলে, 'আজও গুলি চলবে মনে হচ্ছে। গভর্নমেণ্ট এত বর্বর হয়ে উঠবে, পাকিস্তান হওয়ার আগে কে ভাবতে পেরেছিল!'

অনেকগুলো গলা বুড়িগঙ্গার উত্তাল বন্যার মতো গর্জে উঠল, 'দেশের মানুষকে না খাইয়ে মারছে, ইস্ট বেঙ্গলকে ওরা শেষ করে দিচ্ছে। এখন হাত দিয়েছে মুখের ভাষার ওপর। এ আমরা কিছুতেই সহ্য করব না। করুক গুলি, দেখব কত রাইফেল-বুলেট ওরা বানাতে পারে! দেখব কত বড় ফ্যাসিস্ট ওরা!'

মনসুর বলল, 'ভাই সব, তোমরা অপেক্ষা কর। আমি বাকি সবাইকে নিয়ে আসছি, তারপর একসঙ্গে গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকব।'

আজমের কাছে এসে মনসুর দাঁড়াল, পিঠের ওপর হাত রেখে বলল, 'ভয় পেয়েছ আজম ভাই?'

'জি।' আড়ষ্ট অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর শোনা গেল আজমের।

এদিকে সেই মেয়েটি এসে পাশে দাঁড়িয়েছে। পিঠের ওপর একবেণী করা চুল। আজমের কাছে সমস্ত পরিবেশটা কেমন যেন দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে।

মেয়েটি হঠাৎ তাড়া দিয়ে ওঠে, 'আর দেরি নয়। চল এবার, এগিয়ে চল। শিডিউল্ড টাইম মনে আছে মিটিং-এর? এগারটা বাজে যে।'

সেই ছাত্র-জনতার বিপুল প্রবাহ ইউনিভার্সিটি গেটটার দিকে এগিয়ে চলেছে। সকলের আগে আগে সেনাপতির মতো পা ফেলছে মনসুর আর সেই মেয়েটি। তাদের পেছনে অসংখ্য মানুষের স্লোগান শুনে মনে হয় এই শব্দ বুড়িগঙ্গা-পদ্মা-মেঘনা ছাড়িয়ে গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে যাচ্ছে। আজমও ওদের সঙ্গে এগুতে থাকে।

গেটের কাছাকাছি আসতেই ওধার থেকে অনেকগুলো রাইফেলের নল হিংস্র ভঙ্গিতে উদ্যত হয়ে উঠল। একটা নির্মম গলা ভেসে এল, 'হল্ট। ডোণ্ট প্রসীড—'

একবার থমকে দাঁড়াল মনসুর। পেছন ফিরে তাকাতেই তার চোখের ওপর বৈশাখের আগুন-জ্বলা সূর্যের উত্তাপ যেন পেল আজম। ততক্ষণে মনসুরের গলায় ক্রুদ্ধ আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ঘটল যেন, 'বন্ধুগণ, যারা মরতে না চাও এখনও ঘরে ফিরে যাও। ভয় যাদের বেশি তারা, ভয় যাদের নেই তাদের অগ্রগতিকে গন্ডগোল

করে জটিল করে তুলো না।'

কী আশ্চর্য, ওপাশের হাফপ্যান্ট-পরা, কাঁধের ওপর দিয়ে আড়াআড়ি করে স্কুলের ব্যাগ-ঝোলানো ছেলেটাও এক পা সরে গেল না পেছন দিকে। কে যেন আকাশ বিদীর্ণ করে চেঁচিয়ে ওঠে, 'বাংলা ভাষা—'

'রক্ষা কর, রক্ষা কর।' বাকি সবাই একসঙ্গে গলা মিলিয়ে গর্জে ওঠে।

চমকে উঠল আজম। সেই মেয়েটি হঠাৎ মনসুরের হাতদুটো আঁকড়ে ধরেছে। ব্যাকুল গলায় বলে ওঠে, 'ফিরে চল মনসুর। বুলেট তো তোমার বুকেই প্রথম লাগবে। ফিরে চল মনসুর।'

হাত ছাড়িয়ে মনসুর দৃঢ় স্বরে বলে ওঠে, 'ফার্স ক'রো না রুবি।' তারপর অত্যন্ত অচেনা স্বরে বলে, 'ভুলে যেও না সেই কথা ক'টা—স্কাইহাই দি সিগন্যাল ফ্লেম—'

এই কথাগুলোর অর্থ আজম বোঝে না, মনসুরের ওই কণ্ঠস্বরের পরিচয়ও এই প্রথম পেল। কিন্তু নির্ভুলভাবে সে বুঝেছে ওই কথাগুলো একটা নিশ্চিত ঝড়ের সওয়ার হয়ে কী একটা অনিবার্য সংকেতকে টেনে নিয়ে আসছে এই মুহূর্তে, ঢাকা ইউনিভার্সিটির এই অগ্নিগর্ভ পটভূমিতে।

এদিকে গেটের খুব কাছে চলে গেছে মনসুর। সঙ্গে সঙ্গে অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ। হাঁটুর ওপর এসে বিঁধেছে একটা গুলি। পা চেপে যন্ত্রণাবিকৃত মুখে বসে পড়ে মনসুর।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যায় মিছিলটা।

একমুহূর্ত দ্বিধা করল আজম। সে চাষার ছেলে—না না, সে কবি, সে গায়ক, সে সুরকার। বিপুল পৃথিবী তাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। সোনারঙের খালের পাশ দিয়ে মনসুরের পাশে পাশে চলা সন্ধের সেই রহস্যময় পথটা এতদূরে এই মহানগরী ঢাকার রাজপথে তাকে যেন টেনে এনেছে।

বাপজান তাকে ভাত দেবে না বলে শাসিয়েছে, না দিক। সন্ধের আবছা অন্ধকারে বাতাসের দোলা-লাগা মর্মরিত তালের বীথিটায় এসে অপেক্ষা করবে রোশেনা—করুক। বরিসুরের কেরায়া ঘাটে তার জন্য মনসার আসর জমাবে মাঝিরা, কিংবা বারোড়ী-বাড়ির বৃদ্ধাও শুনতে চেয়েছিল মনসার গান, 'কর্ণবধ' পালা। থাক ওরা। আজমের জায়গায় নতুন কেউ আসবে, আসবে নতুন কবি, নতুন সুরকার, নতুন শিল্পী। মহান বাংলা ভাষা দিয়ে বাঁধবে কত সুরম্য পদ। উত্তরসূরীদের জন্য নিরাপত্তা দিয়ে যাবে আজম। এই রক্তাক্ত মুহূর্তটা তার কাছে বড় পবিত্র। জীবনের সবচেয়ে বিরাট পরিচয় সে পেয়েছে ঃ সে কবি, সে সুরকার, সে জনগণের শিল্পী। কথাগুলো এমন গুছিয়ে সে ভাবতে পারে না। তবে তার মনোভাব এই রকমই।

আচমকা নজরটা চলে গেল মনসুরের দিকে। তার সমস্ত শরীর রক্তকমলের মতো লাল হয়ে উঠেছে। মনসুরের চোখের দিকে দৃষ্টিটা পড়তেই চমকে উঠল আজম। সে চোখে জ্বলন্ত সূর্যের জ্যোতির্ময় শিখা।

এক মুহূর্তে দ্বিধাটা কেটে গেল আজমের। নিজের অজান্তে মিছিলের ভীত-চকিত গুঞ্জন ছাপিয়ে গলার ভেতর থেকে কাল রাতের লেখা সেই গানটা আপনা থেকেই বেরিয়ে এল ঃ

'ওরে আমার বাংলা ভাষা—
তুমি আমার পরাণ-বন্ধু, আমার বুকের লৌ,
মায়ের মুখের মিষ্ট কথা, সখীর মুখের মৌ।
কোন দানবে বান্ধিতে চায় তোমার হস্ত ধরি,
তোমার দুখে ধিকি ধিকি আমরা জ্বইল্যা মরি
হে সুন্দরী।
ওরে আমার বাংলা ভাষা—
কোনখানে কোন ভাইরা আছ বাঙ্গালী সুজন
বাংলা মায়ের চুল ধইরাছে দুষ্ট দুঃশাসন—
তোমার বুকে রক্ত নাই কি বাঙ্গালী সুজন?
দানব মাইর‍্যা মায়ের তুমি ঘুচাও বন্ধন।'

গাইতে গাইতেই গেটটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল আজম। আর এক ঝলক আগুন ঝলসাল রাইফেলের হিংস্র ব্যারেলের মুখে, সঙ্গে সঙ্গেই বিদীর্ণ পাঁজর চেপে বসে পড়ল সে।

আর সেই মুহূর্তে ঘটে গেল ঘটনাটা।

পেছনের সহস্র পায়ের শব্দ এবার বন্যার মতো গেট ভেঙে হু হু করে এসে পড়ল সেই ছোট ছোট করে ছাঁটা ঘাসের লন-এ। মিলিটারি পুলিশের সেই অবরুদ্ধ দুর্গ ভেঙে ছত্রখান হয়ে গেল। সব কিছু ছাপিয়ে, সব হইচই চিৎকারের ওপর দিয়ে ছাত্রজনতার পাঁজরের ভেতর থেকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার গর্জন উঠছে ঃ

'বাংলা ভাষা....'

'রক্ষা কর, রক্ষা কর।'

দেখতে দেখতে চোখের ওপর কেমন যেন কালো পর্দা নেমে আসছে আজমের। দৃষ্টিটা স্তিমিত হয়ে আসে একটু একটু করে। কিন্তু হৃৎপিণ্ডের শেষ স্পন্দনগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে আজম নির্ভুল শুনতে লাগল ঃ

'বাংলা ভাষা.....'

'রক্ষা কর, রক্ষা কর।'

একসময় একেবারেই দৃষ্টিটা নিভে যায় তার। সে কবি, সে গায়ক, সে সুরকার, সে মৃত্তিকার শিল্পী। জীবনের দাবিকে সে অস্বীকার করেনি, করতে পারে না।

ডোনার জন্য

সল্ট লেক স্টেডিয়ামের ঠিক পরের স্টপেজে স্টেট ট্রান্সপোর্টের ঝকঝকে, নতুন বাসটা জয়ন্তীকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংক্রিয় কোনও পদ্ধতিতে তার চোখ বাঁ হাতের কবজিতে বাঁধা সুন্দর, চৌকো ঘড়িটার দিকে চলে যায়। এখন তিনটে বেজে একচল্লিশ। কাঁটায় কাঁটায় চারটেয় 'স্কাইলার্ক' নামের

বাড়িটায় ডোনার সঙ্গে তার দেখা হবে। শনিবারের বিকেল চারটে থেকে পাঁচটা, এই এক ঘন্টা সময় ডোনার সঙ্গে কাটাতে পারে সে। চারটের আগে 'স্কাইলার্ক'-এ প্রবেশ তার পক্ষে নিষিদ্ধ। পাঁচটার পর এক মিনিটও সে ওখানে থাকতে পারবে না, আদালতের সেরকমই নির্দেশ।

পাঁচ বছর ধরে প্রতি শনিবার তিনটে পাঁচের বাস ধরে সল্ট লেকে আসছে জয়ন্তী। শীত-গ্রীষ্ম বারো মাস এর এতটুকু হেরফের হওয়ার উপায় নেই। শনিবারের বিকেল চারটেয় ডোনার সঙ্গে দেখা হবে, এর জন্য সারা সপ্তাহ সে উন্মুখ হয়ে থাকে।

অন্য সব শনিবার তিনটে পাঁচের বাসটা চারটে নাগাদ সল্ট লেকে পৌঁছে যায়। কিন্তু আজ রাস্তা ছিল প্রায় ফাঁকা, কোথাও জ্যাম-ট্যাম হয়নি। প্রায় ঝড়ের গতিতে তিনটে একচল্লিশে, অর্থাৎ উনিশ মিনিট আগে বাসটা চলে এসেছিল। এই উনিশটা মিনিট জয়ন্তীকে রাস্তায় কাটিয়ে দিতে হবে।

জয়ন্তীর বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। শ্যামবর্ণ। এই বয়সেও ভরাট, লম্বাটে মুখ। মাঝারি ধরনের হাইট। ত্বক টান টান, মসৃণ। নাক ঈষৎ মোটা, ঠোঁট দু'টি পাতলা, চিবুকের ডৌলটি চমৎকার, ডান গালে মসুর ডালের মতো লালচে একটা তিল-ঘন পালকে ঘেরা বড় বড় চোখ দু'টিতে গভীর দৃষ্টি। অজস্র চুল একটা বড় খোঁপায় আটকানো। পরনে হালকা গোলাপি রঙের প্রিন্টেড শাড়ি, যার জমিতে ফুল-লতাপাতার নকশা। বাঁ হাতে ঘড়ি, ডান হাতে খাঁজ-কাটা সোনার কঙ্কণ, গলায় লকেটওলা সরু চেন, নাকে ছোট্ট হীরের নাকছাবি। তার বাঁ কাঁধ থেকে সুদৃশ্য লেডিজ ব্যাগ কোমরের কাছে ঝুলছে। ডান হাতে পলিথিনের বড় একটা প্যাকেট।

আগস্ট মাস শেষ হয়ে এল। সারা বর্ষার জলে ধুয়ে ধুয়ে আকাশ এখন ঝকঝকে নীল। মনে হয় মাথার ওপর গোটা সল্ট লেক জুড়ে কেউ যেন পালিশ-করা একখানা আয়না টাঙিয়ে রেখেছে। ঝড়বৃষ্টির আর সম্ভাবনা নেই। এ বছরের মতো বর্ষা আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় নিলেও আকাশের এ-কোণে ও-কোণে পেঁজা তুলোর মতো সাদা ধবধবে কিছু মেঘ এলোমেলো ভেসে বেড়াচ্ছে। তাদের নির্দিষ্ট কোনও গন্তব্য নেই, শরতের ঝিরঝিরে হাওয়া ধাক্কা দিতে দিতে যেদিকে নিয়ে যাচ্ছে সেদিকেই তারা চলেছে।

বাস স্টপেজে এখনও দাঁড়িয়েই আছে জয়ন্তী। সুদূর নীলাকাশ থেকে লক্ষ লক্ষ মাইল নিচে সল্ট লেকের এই রাস্তাটায় দুরন্ত গতিতে বাস কি প্রাইভেট কার ছুটে যাচ্ছে। মানুষজন তেমন একটা চোখে পড়ে না। কোনাকুনি তাকালে গোলাকার, সুবিশাল স্টেডিয়াম। আবছাভাবে জয়ন্তীর মনে পড়ল, কার কাছে যেন শুনেছিল, এতবড় স্টেডিয়াম নাকি এশিয়ায় আর কোথাও নেই। দূরমনস্কর মতো কয়েক পলক সেদিকে তাকিয়ে থেকে চোখ অন্য দিকে ফিরিয়ে নেয় সে। এখানে যেধারেই তাকানো যাক, লাইন দিয়ে চোখ-ধাঁধানো সব বাড়ি, পিকচার পোস্টকার্ডে যেমনটি দেখা যায় অবিকল তেমনি। রাস্তার ওধারের অনেকটা জায়গা এখনও ফাঁকা পড়ে আছে, বাড়ি-টাড়ি তৈরির কাজ শুরু হয়নি। ওখানে কাশফুলে চারিদিক ছয়লাপ। শরৎকাল যে তার নিজের মহিমায় হাজির হয়েছে, এই সল্ট লেকে এলে খানিকটা টের পাওয়া যায়।

আশেপাশের দৃশ্যাবলী জয়ন্তী দেখছিল ঠিকই, তবে তার মাথার ভেতর অদৃশ্য কোনও কম্পিউটারে সেই উনিশ মিনিটের হিসেবটা চলছিলই। হঠাৎ তার ষষ্ঠেন্দ্রিয় যেন জানান দেয়, সময় হয়ে গেছে। দ্রুত বাঁ হাতটা উলটে সে দেখতে পায় চারটে বাজতে তিন মিনিট বাকি।

বাস স্টপেজ থেকে বাঁ দিকে যে সোজা রাস্তাটা চলে গেছে তার শেষ মাথায় 'স্কাইলার্ক'। স্বাভাবিকভাবে হাঁটলে ঠিক তিন মিনিটে পৌঁছুনো যায়। কিন্তু নিজের অজান্তেই জোরে জোরে পা ফেলে 'স্কাইলার্ক'-এর সামনে এসে থমকে দাঁড়ায় সে। ইওরোপের কোনও স্বাস্থ্যনিবাসে যে সব 'ভিলা'র ছবি ভ্রমণের বইতে দেখা যায়, অনেকটা সেই ধরনের চমৎকার দোতলা বাড়ি, সামনের দিকে বাগান। একধারে নিচু নকশা-করা গেট।

'স্কাইলার্ক'-এ জীবনের অত্যন্ত মূল্যবান আটটা বছর কাটিয়ে গেছে জয়ন্তী। এই সময়ের প্রথম দিকের ক'টি বছরের স্মৃতি খুবই মধুর, প্রায় স্বপ্নের মতো। পরে শুধুই তিক্ততা, উত্তেজনা, অশান্তি। এ বাড়ির সঙ্গে তার সম্পর্ক কবেই চুকে গেছে তবু প্রতি শনিবার যখনই সে এখানে আসে, বুকের ভেতর তীব্র এক ব্যাকুলতা তাকে কিছুক্ষণ অস্থির করে রাখে।

নিজের মধ্যে যে অদৃশ্য তোলপাড়টা চলছিল সেটা সামলে নিয়ে গেট খুলে ভেতরে চলে এল জয়ন্তী। গেটের পর থেকে নুড়ির রাস্তা, যার দু'ধারে নানা রকম দুষ্প্রাপ্য ফুলের গাছ, অর্কিড আর মসৃণ করে ছাঁটা সবুজ ঘাসের কার্পেট। রাস্তাটা যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে সেখানে রঙিন পাথরের পাঁচটা সিঁড়ি। সিঁড়িগুলো পেরিয়ে ওপরে উঠলে মোজেইক-করা গ্রিল-বসানো বারান্দা।

এ বাড়ির একতলায় এবং দোতলায় ক'টা বেডরুম, ক'টা বাথরুম, কোথায় ডাইনিং হল, কোথায় ড্রইং রুম, কোন ঘরের সঙ্গে ব্যালকনি—সব জয়ন্তীর মুখস্থ। এমন কি, ফি শনিবার সে যে এক ঘন্টা সময় এখানে কাটিয়ে যায় তখন কী কী ঘটবে, কার কার সঙ্গে দেখা হবে, সমস্ত কিছুই আগে থেকে তার জানা। পাঁচ বছর ধরে একটা ছকে-বাঁধা রুটিনে দাঁড়িয়ে গেছে ব্যাপারটা। কিংবা বলা যায় অভ্যাসে।

রাস্তা পার হয়ে বারান্দায় পা দিতে না দিতেই ডান পাশের বার্নিশ-করা ওভাল শেপের দরজাটা অন্য সব শনিবারের মতো খুলে হরেন সসম্ভ্রমে বলে, 'আসুন বৌদি—'

হরেন এ বাড়ির কাজের লোক। বহুদিন ধরে এখানে আছে। বয়স চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ। মাঝারি হাইট, গায়ের রং তামাটে, অটুট স্বাস্থ্য, গোল মুখ এবং মাথার মাঝখান দিয়ে সিঁথি। পরনে মোটা সুতোর ধুতি আর রঙিন হাফ শার্ট। অনেকগুলো বছর কলকাতায় কাটালেও তার চেহারায় বা চালচলনে শহুরে পালিশ সেভাবে পড়েনি। গ্রামীণ সরলতার অনেকখানিই হরেনের মধ্যে টিকে আছে। 'স্কাইলার্ক'-এর সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেলেও সে জয়ন্তীকে যথেষ্ট মর্যাদা দিয়ে থাকে।

হরেন দরজার একধারে সরে গিয়ে জায়গা করে দিয়েছিল। ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে জয়ন্তী জিজ্ঞেস করে, 'তুমি ভাল আছ তো হরেনদা?' এই রুটিন প্রশ্নটা পাঁচ বছর

ধরে নিয়মিত করে আসছে সে। হরেন সম্পর্কেই খোঁজখবর নেয় জয়ন্তী। 'স্কাইলার্ক'-এর অন্য বাসিন্দাদের সম্পর্কে তার আদৌ কোনও কৌতূহল নেই।

হরেন মাথাটা সামান্য হেলিয়ে বলে, 'হ্যাঁ বৌদি। আপনি?'

'একরকম চলে যাচ্ছে।'

'আপনি কিন্তু অনেক রোগা হয়ে গেছেন।'

এ কথার উত্তর না দিয়ে জয়ন্তী বলে, 'ডোনা কোথায়?' আসলে মেয়ের সঙ্গে তার দেখা হয় একতলার ড্রইং রুমে। কোনও কোনও শনিবার সে এসে জানতে পারে, ডোনা দোতলায় রয়েছে। তার আসার খবর পেলে নিচে নেমে আসে। অবশ্য বেশির ভাগ দিনই একতলায় সে অপেক্ষা করে।

হরেন বলে, 'নিচেই আছে বৌদি—'

বাইরের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলে ডান পাশে চমৎকার সাজানো বিশাল ড্রইং রুম। এখানকার সোফা, ডিভান, সেন্টার টেবল এবং অন্য সব ক্যাবিনেট, আর সুদৃশ্য রঙিন টেলিভিশন সেট, সব একদিন নিজে পছন্দ করে কিনেছিল জয়ন্তী। সে এখান থেকে চিরকালের মতো সম্পর্ক ছিন্ন করে চলে যাবার পর কিছুই বদলানো হয়নি। অবিকল তেমনটিই থেকে গেছে। শুধু এই বসার ঘরটিই না ; ডাইনিং হল, কিচেন, বাথরুম এবং সবগুলো শোওয়ার ঘরও মনের মতো করে সাজিয়েছিল সে। জয়ন্তী শুনেছে তার পছন্দ-করা একটি আসবাবও এদিক-ওদিক হয়নি। অনীশ অর্থাৎ তার প্রাক্তন স্বামী ফের বিয়ে করেছে। অনীশের নতুন স্ত্রী পারমিতাও কেন কে জানে, 'স্কাইলার্ক'-এর খাট সোফা ইত্যাদির সঙ্গে জড়ানো যে সব পুরনো স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে সেগুলো বিদায় করার কথা ভাবেনি।

ডোনা একধারে একটা সোফায় বসে ছিল। জয়ন্তী ড্রইং রুমে পা দিতেই দৌড়ে ছুটে এসে তাকে দু হাতে জড়িয়ে ধরল। জয়ন্তীর দু'টো হাতও নিঃশব্দে মেয়ের কাঁধের ওপর উঠে আসে। অনেকক্ষণ চুপচাপ দু'জনে সেইভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর জয়ন্তী মেয়েকে নিয়ে একটা বড় সোফায় পাশাপাশি বসে।

ডোনার বয়স এখন দশ। এর মধ্যেই ভারি সুন্দর হয়ে উঠেছে সে। তার চোখেমুখে চেহারায় অবিকল জয়ন্তীর আদলটি যেন বসানো।

আগে আগে শনিবার জয়ন্তীকে দেখলেই কাঁদতে শুরু করত ডোনা। তার সঙ্গে চলে যেতে চাইত। কান্নাজড়ানো গলায় বার বার বলত, এ বাড়িতে থাকতে তার একটুও ভাল লাগে না। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাকে শান্ত করতে হ'ত। এখন আর কাঁদে না ডোনা। সে জেনে গেছে মায়ের সঙ্গে তার যাওয়ার উপায় নেই। 'স্কাইলার্ক'-এই তাকে থেকে যেতে হবে। আজকাল না কাঁদলেও তার চোখেমুখে সারাক্ষণ বিষাদ মাখানো থাকে। জয়ন্তী বুঝতে পারে, মেয়েটার সারল্য ক্রমশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

ডোনা একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ক্লাস ফাইভে পড়ে। শনি-রবি, দু'দিন তার ছুটি। জয়ন্তী জানে, শনিবার তার জন্য সেই সকাল থেকে উন্মুখ হয়ে থাকে মেয়েটা।

ডোনার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে জয়ন্তী জিজ্ঞেস করে, 'লাস্ট শনিবার দেখে গিয়েছিলাম, ঠাণ্ডা লেগে কাশি হয়েছিল। সেরে গেছে?'

আস্তে মাথা হেলিয়ে দেয় ডোনা। বলে, 'হ্যাঁ। ঠাকুমা হরেন কাকুকে দিয়ে ডাক্তার ডাকিয়ে এনেছিল। তার ওষুধ খেয়ে ভাল হয়ে গেছি।'

ভেতরে ভেতরে বেশ একটু ধাক্কা খায় জয়ন্তী। ঠাকুমা অর্থাৎ তার প্রাক্তন শাশুড়ি প্রীতিলতা ডাক্তারকে খবর দিয়েছিলেন ; অনীশ বা পারমিতা নয়। সে শুনেছে, অনীশ আর পারমিতা ডোনার সম্পর্কে খুবই উদাসীন। তার লেখাপড়া, অসুখবিসুখ—সব দিকে প্রীতিলতার নজর। এ বাড়িতে তিনিই তাকে আগলে আগলে রেখেছেন। অথচ অনীশ একরকম জোর করে আদালতে জয়ন্তীর বিরুদ্ধে হাজারটা সাক্ষী দাঁড় করিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিল মেয়ে তার কাছে থাকলে খারাপ হয়ে যাবে। হয়তো নিজের অধিকার বা কর্তৃত্ব জাহির করার জন্য এটা করেছিল ; মেয়েকে ভালবেসে নয়। আশ্চর্যের ব্যাপার, প্রীতিলতাও ছেলের এই কাজে পুরোপুরি সায় দিয়েছিলেন। নাতনিকে তিনি সত্যিই ভালবাসেন। তাকে হারানোর ভয়ে এটা তিনি করে থাকবেন। কিছুদিন ধরেই একটা প্রবল দুর্ভাবনা জয়ন্তীকে প্রায় সারাক্ষণ তাড়া করে বেড়াচ্ছে। প্রতিলতার বয়স সাতাত্তর, স্বাস্থ্যও ভেঙে গেছে। বছর চারেক আগে একটা বড় ধরনের স্ট্রোক হয়েছিল। তার জের এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেননি। প্রায়ই এটা-সেটা লেগে আছে। হার্ট অ্যাটাকটা তাঁর আয়ু যে দ্রুত কমিয়ে আনছে তাতে কোনও রকম সংশয় নেই। তাঁর কিছু হয়ে গেলে মেয়েটার কী হবে, ভাবতেও সাহস হয় না। পারমিতার এখনও ছেলেমেয়ে হয়নি। হলে ডোনার প্রতি ওদের উদাসীনতা, অবহেলা হাজার গুণ বেড়ে যাবে, আর সেই চাপে মেয়েটা ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। এই কথাটা যখনই মনে পড়ে, মারাত্মক এক ভয়ে তার শ্বাস আটকে আসে। আদালতের রায় জয়ন্তীর বিপক্ষে। ডোনাকে যে নিজের কাছে নিয়ে যাবে তারও উপায় নেই। ওর কিছু হলে সে বাঁচবে না।

অনীশ একটা বিরাট মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানির টপ একজিকিউটিভ। পারমিতাও সেই কোম্পানির একজন বড় মাপের অফিসার। শনি আর রবি দু'জনেরই ছুটি। তবে এই দু'দিন ওরা বাড়িতে প্রায় থাকেই না। কচিৎ কখনও শনিবারটা থাকলে চারটে থেকে পাঁচটা, এই একটা ঘন্টা দোতলাতেই কাটিয়ে দেয়। ওরা ছাড়া এ বাড়িতে প্রীতিলতা এবং জন চারেক কাজের লোক রয়েছে। হরেনকে বাদ দিলে অন্য কাউকে এ সময় নিচে দেখা যায় না। একতলাটা যেন তাদের পক্ষে নিষিদ্ধ এলাকা।

জয়ন্তী জিজ্ঞেস করে, 'তোর পড়াশোনা ঠিকমতো হচ্ছে?'

ডোনা বলে, 'হচ্ছে—'

'স্কুলে রেগুলার যাচ্ছিস?'

'কাশি হয়েছিল বলে ঠাকুমা একদিন পাঠায়নি।'

'ঠিকই করেছেন।'

জয়ন্তী লক্ষ করল, ডোনা তার কথার উত্তর দিচ্ছে ঠিকই কিন্তু আজ তাকে কেমন যেন অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে। মনে হয়, কিছু ভাবছে সে।

জয়ন্তী এবার বলে, 'লাস্ট উইকে যখন এসেছিলাম, তুই বলেছিলি, পুজোর আগে

স্কুল থেকে তোদের এক্সকারসনে নিয়ে যাবে।'

ডোনা বলে, 'হ্যাঁ। ডেটও ঠিক হয়ে গেছে। থার্ড অক্টোবর।'

জয়ন্তী বলে, 'কোথায় নিয়ে যাবে?'

'চাঁদিপুর।'

'ক'দিনের এক্সকারসন?'

'পাঁচদিন। থার্ড যাব, আট তারিখে ফিরে আসব।'

'সাবধানে থাকবি। টিচাররা ছাড়া একা একা সমুদ্রে নামবি না।'

'হুঁ—'

একটু ভেবে জয়ন্তী হলে, 'ভালই হল, তোর জন্যে একটা জিনিস এনেছি। বেড়াতে যাবার সময় কাজে লাগবে।'

অন্যমনস্কতা যেন ক্রমশ বাড়ছে ডোনার। সে ঔৎসুক্য দেখাল না, চুপচাপ বসে রইল।

যে বড় পলিথিনের প্যাকেটটা সঙ্গে করে এনেছিল, সেটা এবার খুলে ফেলে জয়ন্তী। ফি শনিবারই মেয়ের জন্য কিছু না কিছু নিয়ে আসে সে। কোনও বার বড় চকোলেট বার, কোনও বার কাজুবাদাম বা আঁকার জন্য রঙের বাক্স বা জিনসের প্যান্ট কিংবা কোয়ার্টজ ঘড়ি। আজ সে নিয়ে এসেছে অদ্ভুত ধরনের সাইড ব্যাগ, যেটার আকৃতি লোমওলা কুকুরের মতো, সারা গা নরম সোনালি লোমে বোঝাই। পিঠে জিপ লাগানো, ভেতরটা ফাঁপা। এই ব্যাগটায় দু' চারটে জিনস, ফ্রক, স্কার্ট, তোয়ালে ইত্যাদি নানা দরকারি জিনিস ভরে তিন-চারদিনের জন্য কোথাও বেড়িয়ে আসা যায়।

জয়ন্তী জিজ্ঞেস করে, 'কি রে, ব্যাগটা তোর পছন্দ হয়েছে?'

অন্য সময় সে কিছু নিয়ে এলে দারুণ খুশি হয় ডোনা। চকোলেট-টকোলেট আনলে তক্ষুনি প্যাকেট খুলে খেতে শুরু করে। ফ্রক, জিনস, ঘড়ি-টড়ি আনলে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে। তার চোখমুখ চকচক করতে থাকে। কিন্তু আজ তার কী যে হয়েছে কে জানে; একেবারে আগ্রহশূন্যের মতো ব্যাগটার দিকে তাকিয়ে আস্তে মাথাটা হেলিয়ে দেয়। অন্যমনস্কতাটা কিছুতেই কাটছে না মেয়েটার।

অনেকক্ষণ ধরেই ডোনাকে লক্ষ করছিল জয়ন্তী। এবার সে বলল, 'কী ভাবছিস রে ডোনা?'

একটু যেন চমকে ওঠে ডোনা। নিজের অজান্তেই বুঝিবা বলে, 'মা, ঠাকুমা তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়।'

ব্যাপারটা এমনই অপ্রত্যাশিত যে ভীষণ হকচকিয়ে যায় জয়ন্তী। বিবাহ বিচ্ছেদের পর পাঁচ বছর, প্রতি সপ্তাহে এখানে আসছে সে, কিন্তু প্রীতিলতা কোনও দিনও তাঁর সঙ্গে কথা বলেননি। পাছে দেখা হয়ে যায়, তাই শনিবারের বিকেলে এই সময়টা তিনি একতলার ধারে কাছে ঘেঁষেন না। এত বছর বাদে হঠাৎ কী এমন ঘটতে পারে যাতে প্রাক্তন পুত্রবধূর সঙ্গে কথা বলার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠেছেন? ডোনার মুখে শোনার পরও পুরোপুরি বিশ্বাস হচ্ছিল না জয়ন্তীর। মেয়ের দিকে তাকিয়ে বিমূঢ়ের মতো সে জিজ্ঞেস করে, 'তোকে কে বললে?'

ডোনা বলে, 'ঠাকুমা নিজে।'

এরপর আর সংশয় না থাকার কথা। তবু বিস্ময়টা কোনওভাবেই কাটছে না জয়ন্তীর। মেয়ের কথার কী উত্তর দেবে সে ভেবে পেল না।

এই সময় হরেন একটা ট্রেতে চায়ের কাপ আর খাবারের প্লেট সাজিয়ে এনে সেন্টার টেবলে রেখে গেল। ফি শনিবার জয়ন্তীর জন্য এসব নিয়ে আসে সে। এটা একটা রুটিনের মতো ব্যাপার। কিন্তু জয়ন্তী চা বা খাদ্যবস্তুগুলো কখনও ছোঁয় না।

হরেন চলে যাবার পর জয়ন্তী বলে, 'ঠাকুমা কেন আমার সঙ্গে কথা বলতে চায় তুই জানিস?'

ধীরে ধীরে মাথাটা ডাইনে এবং বাঁয়ে নাড়তে নাড়তে ডোনা বলে, 'না। কাল বিকেলে বলছিল তুমি এলে ঠাকুমাকে যেন নিচে ডেকে আনি।'

এত বছর পর তাকে কী বলতে চান প্রীতিলতা? প্রবল এক উৎকণ্ঠা বোধ করছিল জয়ন্তী। সেই সঙ্গে তীব্র কৌতূহলও।

মায়ের দিকে পলকহীন তাকিয়ে ছিল ডোনা। জয়ন্তীর সঙ্গে এ বাড়ির সম্পর্কটা কী, এই অল্প বয়সেই সে জেনে গেছে। ঠাকুমা কথা বলতে চাইলেও, মা বলবে কিনা, এ বিষয়ে সে যথেষ্ট সন্দিহান। নিচু গলায় ডোনা বলে, 'ঠাকুমাকে ডেকে আনব মা?—যাই?'

উত্তর দিতে একটু সময় লাগে জয়ন্তীর। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলে, 'যা।'

ডোনা চলে গেল।

আর সুসজ্জিত, বিশাল ড্রইং রুমে একা চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে আশ্চর্য এক উজান টানে কয়েক বছর পিছিয়ে যায় জয়ন্তী।

খুবই সাদামাঠা মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে সে। বাবা, মা আর সে, এই তিনজনকে নিয়ে ছোট্ট ছিমছাম সংসার। বাবা ছিল স্টেট গভর্নমেন্টের একটা ডিপার্টমেন্টে সেকসান অফিসার। লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক হিসেবে শুরু করে ঘষতে ঘষতে শেষ পর্যন্ত ওইখানে পৌঁছেছিল। মিডল ক্লাস ফ্যামিলির অল্পশিক্ষিত, গিন্নিবান্নি জাতীয় মহিলারা যেমন হয়, মা ছিল তাই। সরল এবং স্নেহপ্রবণ। যাদবপুরে আড়াই কাঠা জমির ওপর পুরনো আমলের একতলা নিজস্ব একটা বাড়ি ছিল ওদের।

সেকেন্ড ডিভিশনে আই. এ পাশ বাবা আর ক্লাস সিক্স পর্যন্ত পড়া মায়ের একমাত্র সন্তান জয়ন্তী কিন্তু ছাত্রী হিসেবে ছিল দুর্ধর্ষ। মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকে মেয়েদের মধ্যে ফার্স্ট, বি. এ ইংরেজি অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড এবং এম. এ'তেও তাই।

ইউনিভার্সিটিতে পড়তে গিয়ে অনীশের সঙ্গে জয়ন্তীর আলাপ। সাবজেক্ট অবশ্য তাদের এক ছিল না। অনীশ ইকনমিকসের ছাত্র। মাধ্যমিক থেকে এম. এ পর্যন্ত তার রেজাল্টও চোখ ধাঁধিয়ে দেবার মতো।

যাই হোক, আলাপ থেকে বন্ধুত্ব এবং তারপর প্রেমে পৌঁছুতে ওদের তিন মাসের বেশি সময় লাগেনি। তবে গোড়ার দিকে খানিকটা দ্বিধা ছিল জয়ন্তীর। তারা একেবারেই মধ্যবিত্ত। আর অনীশরা সোসাইটির সবচেয়ে উঁচু স্তরের মানুষ। তার বাবা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের জয়েন্ট সেক্রেটারি হিসেবে রিটায়ার করেছেন। মা বেথুন

কলেজ থেকে স্বাধীনতার আগে অঙ্কে অনার্স নিয়ে বি. এ পাশ করেছিলেন। অনীশের মা এবং বাবার দিকের আত্মীয়স্বজনরা প্রায় সবাই অত্যন্ত কৃতী। দু দিকেই আই. এ. এস, আই. পি. এস, চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্ট, ডাক্তার, সলিসিটর বা সফল বিজনেসম্যানের ছড়াছড়ি। দুই পরিবারের আকাশ-পাতাল পার্থক্যের কথাটা কখনও কখনও জয়ন্তী মনে করিয়ে দিলে প্রায় তুড়ি মেরেই উড়িয়ে দিত অনীশ। সে শুধু বলত, 'আই লাভ ইউ। দ্যাটস অল।'

এদিকে তার সম্বন্ধে স্ক্যান্ডালের কিছু কিছু খবর কানে আসছিল জয়ন্তীর। 'ফুলে ফুলে মধু খাওয়া' বলে বহুকালের পুরনো একটা কথা আছে। অনীশের স্বভাবটা নাকি সেইরকম। সুন্দরী মেয়ে দেখলে সে ঝাঁপিয়ে পড়বেই। দু চারটে বেনামী চিঠিও এসেছিল জয়ন্তীর কাছে। কোন কোন মেয়ের কীভাবে কতটা ক্ষতি অনীশ করেছে তার বিবরণ সেগুলোতে ছিল। পত্রদাতারা তাকে বার বার সতর্ক করে দিয়েছে—অনীশের মতো বাজে, লম্পট ছেলের সঙ্গে কোনওরকম সম্পর্ক যেন সে না রাখে, রাখলে তার ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাবে।

চিঠিগুলো অনীশকে দেখিয়েছিল জয়ন্তী। অনীশ হেসে হেসে বলেছে, 'সব মিথ্যে। ব্যাপারটা কী জানো—জেলাসি। তোমার আমার রিলেশানটা অনেকেই সহ্য করতে পারছে না। আমার এগেনস্টে যে সব স্ক্যাণ্ডাল রটেছে সেগুলো যদি সত্যি হ'ত, কেউ চিঠি লিখত না, স্ট্রেট তোমার সঙ্গে দেখা করে বলে যেত। সব কাওয়ার্ড, স্কাউন্ড্রেলের দল। পেছনে থেকে ছুরি মারা ছাড়া এদের আর কোনও কাজ নেই। এই চিঠিগুলোর একটা ওয়ার্ডও বিশ্বাস ক'রো না।'

তখন জয়ন্তী এমনই আচ্ছন্ন যে অনীশ ছাড়া তার কাছে এই পৃথিবীতে বিশ্বাসযোগ্য অন্য কেউ ছিল না। যা অনিবার্য, এরপর তাই ঘটেছিল। যে যুবক প্রচুর নারীসঙ্গ করেছে, কেন কে জানে সে দুম করে জয়ন্তীকে বিয়ে করে ফেলেছিল। এ নিয়ে কম অশান্তি হয়নি। বিয়েটা আদৌ মেনে নিতে পারেননি প্রীতিলতা এবং অনীশের বাবা শোভনদেব। অতি মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির মেয়ে যার কোনওরকম উজ্জ্বল পারিবারিক ব্যাকগ্রাউণ্ড নেই, নেই কোনও বলার মতো পেডিগ্রি, না মাথা ঘুরিয়ে দেবার মতো ব্যাঙ্ক ব্যালান্স, তাকে পুত্রবধূ হিসেবে সহ্য করা অসম্ভব ব্যাপার। শোভনদেব যতকাল বেঁচে ছিলেন, জয়ন্তীর সঙ্গে কোনওদিন একটি কথাও বলেননি। প্রীতিলতা অতটা রূঢ় হননি, তবে বরাবর একটা দূরত্ব বজায় রেখে চলতেন। অনীশের হঠকারী সিদ্ধান্তের কারণে জয়ন্তী 'স্কাইলার্ক' নামের অভিজাত বাড়িটিতে ঢুকতে পেরেছিল ঠিকই, কিন্তু সে যে এ বাড়ির কেউ নয়, নিতান্তই অবাঞ্ছিত, সেটা বুঝিয়ে দিতেন প্রতি মুহূর্তে।

বিয়ের আগেই এম. এ'টা হয়ে গিয়েছিল জয়ন্তীর। রেজাল্ট ভাল হওয়ায় একটা কলেজে লেকচারশিপ পেয়ে যায় সে। অনীশ অবশ্য ইউনিভার্সিটি থেকে বেরুবার পর চাকরি নেয়নি ; ম্যানেজমেন্ট কোর্স শেষ করে একটা বড় কোম্পানিতে জয়েন করেছিল। ছ'মাস পর সে অফিস বদলায়। এইভাবে তিন-চারটে কোম্পানি ঘুরে এখন একটা নাম-করা মাল্টি-ন্যাশনাল ফার্মে আছে।

শ্বশুর-শাশুড়ি মর্যাদা না দিলেও অনীশের ব্যাপারে তার বিন্দুমাত্র দুঃখ বা অভিযোগ ছিল না। কিন্তু বিয়ের তিন-চার বছর বাদে হঠাৎ বদলে যেতে শুরু করে অনীশ। যে শুভাকাঙক্ষীরা বেনামী চিঠি লিখে তাকে সতর্ক করে দিয়েছিল, তাদের আশঙ্কা যে মিথ্যে নয় সেটা বুঝতে পারে জয়ন্তী। একদিন জানা গেল, অফিসের এক সহকর্মী পারমিতার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে অনীশ। এদিকে একটি মেয়ে হয়ে গেছে তাদের—ডোনা।

প্রথমটা দিশেহারা হয়ে পড়েছিল জয়ন্তী। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে অনীশকে ফেরানোর জন্য কী না করেছে সে! কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই টের পেল অসম যুদ্ধে নেমেছে। পারমিতা কলকাতার বিখ্যাত, বনেদি বংশের মেয়ে। অঢেল টাকা তাদের। উত্তর এবং মধ্য কলকাতায় তাদের বারো চোদ্দটা বাড়ি। পুরনো ভিনটেজ কার থেকে আধুনিক মডেলের ঝকঝকে টোয়োটা ইত্যাদি মিলিয়ে ডজনখানেক দেশি-বিদেশি গাড়ি। ব্যাঙ্কে কত যে টাকা, বড় বড় কোম্পানিতে কত যে শেয়ার তার হিসেব নেই। তা ছাড়া চোখ ঝলসে দেবার মতো সৌন্দর্য পারমিতার। ইউনিভার্সিটির শেষ পরীক্ষা তার রেজাল্টটাও অসাধারণ। গ্ল্যামার, অর্থ, আভিজাত্য, পেডিগ্রি—কোনও দিক থেকেই তার ধারে কাছে ঘেঁষার যোগ্যতা নেই জয়ন্তীর। প্রতিদিন তখন অশান্তি, উত্তেজনা আর তিক্ততা।

অনীশের দিক থেকে একদিন জানানো হয়েছিল জয়ন্তী যেন ঝঞ্ঝাট না করে ডিভোর্সে রাজি হয়ে যায়। এর জন্য যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ তাকে দেওয়া হবে। জয়ন্তীর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল বিবাহ বিচ্ছেদ মেনে নেবে না, যুদ্ধ চালিয়েই যাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখেছে ডিভোর্সটা ঠেকিয়ে রেখে লাভই বা কী। অনীশের সঙ্গে সম্পর্কটা কোনওদিনই ভাল হওয়ার নয়। গ্লানিকর, অসম্মানজনক অস্তিত্ব নিয়ে 'স্কাইলার্ক'-এ পড়ে থাকার মানে হয় না। সে ডিভোর্সে রাজি হয়ে গিয়েছিল একটি মাত্র শর্তে। ডোনাকে তার চাই। কিন্তু মেয়েটাকে পাওয়া যায় নি। অগত্যা কোর্টে যেতে হয়েছিল। অনীশরা তার বিরুদ্ধে ব্যভিচারের মামলা এনে, ভাড়াটে সাক্ষী যোগাড় করে এমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিল যাতে মনে হয়েছে ডোনা তার কাছে থাকলে তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আশ্চর্যের ব্যাপার, প্রীতিলতার মতো শিক্ষিতা মহিলা তার বিরুদ্ধে আদালতে দাঁড়িয়ে যেন বিষ উগরে দিয়েছিলেন। ফলে মেয়েকে ওরাই পেয়ে গিয়েছিল। তবে সামান্য একটু করুণা করা হয়েছিল। সপ্তাহে একদিন ঘন্টাখানেকের জন্য ডোনাকে দেখে যেতে পারবে জয়ন্তী। পাঁচ বছর ধরে সেইভাবেই চলছে।

আদালতের রায় বেরুবার অনেক আগেই যাদবপুরে নিজেদের বাড়ি চলে গিয়েছিল জয়ন্তী। এর মধ্যে বাবা রিটায়ার করেছে। ইচ্ছা করলে ফের বিয়ে করতে পারত সে। কলেজের অবিবাহিত সহকর্মীদের কেউ কেউ এ ব্যাপারে এগিয়েও এসেছিল। তারা যে শেষ পর্যন্ত অনীশের মতো বিশ্বাসঘাতক হয়ে উঠবে না, তার কোন গ্যারান্টি নেই। জয়ন্তী রাজি হয়নি। হাতজোড় করে বিনীতভাবে সে তাদের ফিরিয়ে দিয়েছে। আসলে একবার বিয়ে করেই তার মোহভঙ্গ ঘটে গেছে।

এদিকে অনীশদের বাড়িতেও কিছুটা ওলট পালট ঘটে গেছে। শোভনদেব মারা গেছেন। প্রীতিলতার বড় ধরনের হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। পারমিতাকে বিয়ে করে সল্ট লেকে নিয়ে এসেছে অনীশ। ওরা বাড়িতে বেশির ভাগ সময়ই বাড়িতে থাকে না। অফিস, ট্যুর—এসব নিয়েই আছে। বাড়িতে থাকলে বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে পার্টি, মদ্যপান, চড়া সুরের ওয়েস্টার্ন মিউজিক। পারমিতা তো বটেই, অনীশ পর্যন্ত ডোনার খোঁজখবর নেয় না। ডোনা বা হরেন যে দু'জনের সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে, তারা এসব তাকে জানায়নি। 'স্কাইলার্ক'-এর আশেপাশে যাদের বাড়ি তাদের কেউ কেউ তার কলেজে ফোন করে বলেছে। এই খবরগুলো পাওয়ার পর থেকে ডোনার জন্য সারাক্ষণ সে উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকে।

কতক্ষণ একা একা বসে ছিল, খেয়াল নেই। পায়ের শব্দে চকিত হয়ে মুখ ফেরাতেই জয়ন্তী দেখতে পায়, ডোনার কাঁধে হাতের ভর দিয়ে খুব ধীরে ধীরে পা ফেলে ড্রইং রুমে ঢুকছেন প্রীতিলতা। একেবারে স্তম্ভিত হয়ে যায় জয়ন্তী। এ কাকে দেখছে সে? এই কি সেই অভিজাত, দাম্ভিক, বৃদ্ধ বয়সেও অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারিণী প্রীতিলতা? পাঁচ বছর তাঁকে দেখেনি সে কিন্তু এর ভেতর তাঁর শরীর ভেঙেচুরে এমন ধ্বংসস্তূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে, কে তা ভাবতে পেরেছিল?

হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল প্রীতিলতার, দোতলা থেকে নেমে আসতে হাঁফ ধরে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে হাঁ করে জোরে জোরে শ্বাস টানছিলেন।

অদৃশ্য কেউ যেন প্রবল এক ধাক্কায় জয়ন্তীকে দাঁড় করিয়ে দেয়। নিজের অজান্তেই সে প্রায় দৌড়ে প্রীতিলতার কাছে গিয়ে তাঁর একটা হাত ধরে সযত্নে সোফায় বসিয়ে দেয়। তারপর তাঁকে প্রণাম করে একধারে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে। এতদিন পর প্রীতিলতার সঙ্গে দেখা, সে আড়ষ্ট বোধ করছিল।

খানিকটা সুস্থ হয়ে প্রীতিলতা বলেন, 'দাঁড়িয়ে কেন বৌমা, ব'সো।'

প্রীতিলতার মুখে 'বৌমা' শব্দটা খচ করে কানে যেন বিঁধে যায় জয়ন্তীর। এ বাড়ির সঙ্গে তার যে কোনও সম্পর্কই নেই সেটা হয়তো মনে নেই প্রাক্তন শাশুড়ির। পুরনো অভ্যাসবশেই বুঝিবা তিনি শব্দটা উচ্চারণ করেছেন। জয়ন্তী কিছু বলে না, প্রীতিলতার মুখোমুখি অন্য একটা সোফায় ধীরে ধীরে বসে পড়ে।

প্রীতিলতা তার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'কেমন আছ বৌমা?'

নিচু গলায় জয়ন্তী বলে, 'ভাল। কিন্তু এ কী চেহারা হয়েছে আপনার!'

প্রীতিলতা বলেন, 'আমার যে একটা স্ট্রোক হয়ে গেছে, সেটা কি তোমাকে কেউ বলেনি?'

'বলেছে। কিন্তু—' কথা শেষ না করেই জয়ন্তী থেমে যায়।

সে কী বলতে চায়, বুঝতে অসুবিধা হয় না প্রীতিলতার। স্ট্রোকের খবর পেয়েও ওর পক্ষে তাঁর সঙ্গে দেখা করা যে সম্ভব ছিল না সেটা তিনি জানেন। এ ব্যাপারে আর কিছু না বলে ডোনার দিকে ফিরে বলেন, 'দিদিভাই, তুমি একটু ওপরে যাও।

আমি মায়ের সঙ্গে কথা বলব। পরে হরেনকে দিয়ে খবর পাঠাব। তখন এসে মায়ের সঙ্গে গল্প ক'রো।'

ডোনা খুব বাধ্য মেয়ে, 'আচ্ছা' বলে চলে যায়।

ফের জয়ন্তীর দিকে ঘুরে প্রীতিলতা বলেন, 'এতকাল বাদে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছি বলে নিশ্চয়ই খুব অবাক হয়ে গেছ, তাই না?'

মাথাটা সামান্য হেলিয়ে জয়ন্তী বলে, 'হ্যাঁ।'

'তোমার কাছে আমার বিশেষ একটা অনুরোধ আছে।'

উৎসুক চোখে প্রীতিলতার দিকে তাকিয়ে থাকে জয়ন্তী।

প্রীতিলতা দু'হাত বাড়িয়ে জয়ন্তীর একটা হাত ধরে বলেন, 'অনীশ যে ফের বিয়ে করেছে সেটা নিশ্চয়ই তোমার অজানা নয়। পারমিতা আর অনীশ একেবারেই অমানুষ। ওরা যা সব করে বেড়ায় সে সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই না। কিন্তু দু'জনের কারুরই ডোনার দিকে নজর নেই। মায়া-মমতা, দায়িত্ববোধ—এসব না থাকলে ছেলেমেয়েকে কি মানুষ করে তোলা যায়? আমি যতকাল আছি ডোনাকে দেখে রাখতে পারব। কিন্তু টের পাচ্ছি বেশিদিন আর আয়ু নেই। যে কোনও সময় ডাক এসে যেতে পারে। তাই বলছিলাম তুমি ডোনাকে তোমার কাছে নিয়ে যাও।'

স্নায়ুমণ্ডলীর ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহের মতো কিছু একটা ঘটে যায় জয়ন্তীর। অনেকক্ষণ পলকহীন প্রীতিলতার দিকে তাকিয়ে থাকে সে। তারপর শ্বাসরুদ্ধের মতো বলে ওঠে, 'কিন্তু একদিন তো কোর্টে সাক্ষ্য দিয়ে আপনারা ডোনাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ, ভুল করেছিলাম। ডোনা এই বংশের মেয়ে। তাকে ছেড়ে দিতে আমাদের, বিশেষ করে আমার অধিকার বোধে লেগেছিল। এখন দেখছি অধিকারের চেয়ে মেয়েটার জীবন, তার ভবিষ্যৎ অনেক বেশি মূল্যবান। তুমি ওকে নিয়ে যাও।'

'আপনার ছেলে কি ওকে ছাড়তে চাইবে?'

অদ্ভুত একটু হাসি ফুটে ওঠে প্রীতিলতার মুখে। তিনি বলেন, 'তার আপত্তি হবে না।'

জয়ন্তী বলে, 'আদালত কি এভাবে নিয়ে যেতে দেবে?'

'সে ব্যবস্থা আমি করব। কোর্টে অ্যাপিল করে বলব, আমি অন্যায় করেছিলাম। যার কাছে থাকলে ডোনার সবচেয়ে ভাল হবে তার কাছে ওকে ফিরিয়ে দিতে চাই।'

হঠাৎ প্রীতিলতার কোলে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে জয়ন্তী। কান্নার উচ্ছ্বাসে তার পিঠ ফুলে ফুলে উঠতে থাকে। প্রীতিলতা ধীরে ধীরে তাঁর রুগ্ন, দুর্বল একটি হাত তার মাথায় রেখে বসে থাকেন। জয়ন্তী অনুভব করে বৃদ্ধা মহিলাটির স্পর্শের ভেতর দিয়ে আশ্চর্য এক মমতা তার মধ্যে চারিয়ে যাচ্ছে।

জনক

শীতের দুপুরে সূর্য যখন সোজা মাথার ওপর উঠে আসে সেই সময় দোতলার পশ্চিম দিকের লম্বা বারান্দায় লাল গালিচার ওপর বিছানা পেতে তার এক পাশে চশমার খাপ, রামায়ণ, মাহাভারত, চণ্ডী আর দু'খানা বাংলা খবরের কাগজ যত্ন করে সাজিয়ে রেখে আসে শোভনা। ততক্ষণে দুপুরের খাওয়া শেষ হয়ে যায় শেখরনাথের। আঁচিয়ে, তোয়ালেতে মুখ মুছে আশি বছরের জীর্ণ, নড়বড়ে শরীর টানতে টানতে বারান্দায় চলে যান তিনি। শোভনা তাঁর পুত্রবধূ।

দুপুরে ধর্মগ্রন্থ আর খবরের কাগজ পড়াটা শেখরনাথের বহুকালের প্রিয় অভ্যাস। কিন্তু ইদানীং ক'বছর আর্থারাইটিসে ভীষণ কাহিল হয়ে পড়েছেন। দুই কাঁধে এবং কোমরে মাঝে মাঝে প্রচণ্ড যন্ত্রণা হয়। তখন মনে হয়, কেউ যেন তাতানো লোহার ফলা শরীরের ওই অংশগুলোতে জোর করে ঢুকিয়ে দিয়েছে। কড়া ডোজের ওষুধ আর ফিজিও-থেরাপিতেও বিশেষ কাজ হচ্ছে না। আজকাল পেটে দুপুরের ভাতটি পড়লেই দু'চোখ জড়িয়ে আসে। বই বা কাগজ টাগজ আর পড়া হয়ে ওঠে না, ওগুলো নাড়াচাড়া করতে করতেই ঘুমিয়ে পড়েন।

দোতলার এই বারান্দাটা এমনভাবে টানা যে প্রথম দিকে দুপুরের রোদ একটু কোনাকুনি শেখরনাথের পাযেব ওপর স্থির হয়ে থাকে। আকাশের ঢাল বেয়ে সূর্য যত পশ্চিমে নামে, রোদ ক্রমশ তাঁর সারা গায়ে ছড়িয়ে যায়। রোদের টনিকটা তাঁর খুব দরকার।

অন্য দিনের মতো আজও শোওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন শেখরনাথ। যখন জেগে উঠলেন, বিকেল হয়ে গেছে। পশ্চিমের উঁচু উঁচু বাড়ি আর গাছপালার আড়ালে সূর্য ধীরে ধীরে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে।

ঘুম ভাঙলেও শুয়েই রইলেন শেখরনাথ। মখমলের খাপ থেকে বাই-ফোকাল লেন্সের গোল চশমাটা বার করে চোখে পরে নিলেন। তাঁর সমস্ত শরীর এখন বেলাশেষের অনুজ্জ্বল সোনালি রোদের আরকে ডুবে আছে। শেখরনাথ জানেন কিছুক্ষণের মধ্যেই শোভনা স্যাকারিন-দেওয়া এক কাপ চা নিয়ে আসবে, সেটি শেষ হতে না হতেই দিনের শেষ আলোটুকু আর থাকবে না। হালকা পায়ে নেমে আসবে শীতের সন্ধে, তাপমাত্রা ঝপ করে নেমে যাবে কয়েক ডিগ্রি। তখন আর এক মুহূর্তও এই খোলা বারান্দায় শ্বশুরকে থাকতে দেবে না শোভনা; তাড়া দিয়ে দিয়ে ঘরের ভেতর নিয়ে যাবে। তার জন্যই অপেক্ষা করছেন শেখরনাথ।

আজ রবিবার।

বারান্দার ও-মাথায় একঝাঁক শালিক চঞ্চল পায়ে নাচানাচি করছে আর মাঝে মাঝেই হঠাৎ খুশিতে কিচিরমিচির করে উঠছে। একতলায় চলছে তুমুল হইচই। তার মানে সন্দীপ, শোভনা, রাজা আর রুকু টেবল টেনিস কি ক্যারম নিয়ে মেতে উঠেছে।

সন্দীপ শেখরনাথের একমাত্র ছেলে, একটা নাম-করা বড় কোম্পানির

অ্যাকাউন্টস অফিসার। রাজা আর রুকু তাঁর নাতি-নাতনী। রাজা সেন্ট জেভিয়ার্সে ইংলিশ অনার্স নিয়ে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছে। রুকুর এবার ক্লাস ইলেভেন, সে পড়ে ক্যালকাটা গার্লসে। ছেলেমেয়ের সঙ্গে সন্দীপ আর শোভনার সম্পর্ক বন্ধুর মতো। কোথাও যাবার না থাকলে ছুটির দিনগুলো আড্ডা দিয়ে, ভিসিআর-এ ভাল ছবি দেখে কি ক্যারম-ট্যারম খেলে ওরা কাটিয়ে দেয়। শালিকদের চেঁচামেচি কি নিচের তলার চিৎকার ছাড়া এখন আর কোথাও কোনও শব্দ নেই।

বাড়ির সামনে দিয়ে তিরিশ ফুট চওড়া অভয় হালদার রোড সোজা ট্রাম রাস্তায় গিয়ে পড়েছে। তার ওধারে একটা মাঝারি পার্ক। শেখরনাথদের এদিকটায় বেশির ভাগ বাড়িই একতলা কি দোতলা, ক্বচিৎ দু-চারটে তেতলা। কিন্তু পার্কের ওধারে হাই-রাইজের ছড়াছড়ি।

অভয় হালদার রোডে লোকজন বিশেষ নেই। বড় রাস্তায় দু-একটা ট্রাম, মিনি বাস কি ট্রাক গড়িয়ে গড়িয়ে চলে যাচ্ছে। তাদের যেন কোথাও যাবার তাড়া নেই—সব কিছুই গন্তব্যহীন, ঢিলেঢালা, আলস্য মাখানো। দূরের পার্কটায় নানা রঙের পোশাক-পরা অসংখ্য বাচ্চা ছোটাছুটি করছে, ওদের সঙ্গে রয়েছে মা কিংবা আয়ার দল। ইস্টম্যান কালারে তোলা নির্বাক সিনেমার একটি দৃশ্য যেন।

রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় উঠে বসেন শেখরনাথ। গা থেকে কম্বলটা খসে পড়ে, আস্তে আস্তে সেটা তুলে যখন ফের ভাল করে জড়িয়ে নিচ্ছেন সেই সময় চোখে পড়ে ট্রামরাস্তার মুখে এসে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে গেল আর তার ভেতর থেকে মধ্যবয়সী একটি মহিলা নেমে রাস্তার লোকজনকে কিছু জিজ্ঞেস করতে করতে এদিকেই এগিয়ে আসছে। খুব সম্ভব কারও ঠিকানা খুঁজছে। ট্যাক্সিটা কিন্তু মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়েই থাকে। আশি বছরের নির্জীব চোখেও শেখরনাথ আবছাভাবে দেখতে পান, ড্রাইভার ছাড়া ট্যাক্সিটায় আরও একজন বসে আছে।

মহিলাটির বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। সুশ্রী, সম্ভ্রান্ত চেহারা। চিবুকের তলায়, গালে এবং কোমরে বেশ মেদ জমেছে কিন্তু সৌন্দর্যের শেষ রশ্মিগুলি এখনও তাঁর চোখমুখ থেকে একেবারে বিলীন হয়ে যায় নি। পরনে কাঁথা স্টিচের দামি শাড়ি, চোখে ফ্যাশনেবল চশমা, ডান কাঁধ থেকে চমৎকার লেডিজ ব্যাগ ঝুলছে, বাঁ হাতে বড় একটা সুটকেশ।

কৌতূহলশূন্য চোখে লক্ষ করছিলেন শেখরনাথ। মহিলাটি বাড়ির নম্বর দেখতে দেখতে যখন তাঁদের 'শান্তি নিবাস'-এর সামনে এসে দাঁড়ায় তখন চমকে ওঠেন। শরীর ভারী হয়ে গেলেও তিরিশ বছর আগের এক মেদহীন প্রাণবন্ত তরুণীর আদল যেন মহিলার সর্বাঙ্গে বসানো। সেই ডিম্বাকৃতি নিষ্পাপ মুখ, ঘন পালকে-ঘেরা উজ্জ্বল চোখ, তেমনই চিবুকের খাঁজ, মসৃণ ভাঁজহীন গলা। মনে মনে বিড় বিড় করেন শেখরনাথ, 'হে ঈশ্বর, এ যেন সে না হয়।'

দোতলার বারান্দার ঠিক তলায় সদর দরজা। মহিলা সেখানে গেলে ওপর থেকে তাকে আর দেখা যায় না। তবে সে যে কলিং বেল টিপেছে তার সুরেলা আওয়াজ গোটা বাড়িটায় ছড়িয়ে পড়ছে। কিছুক্ষণ পর দরজা খোলার শব্দ শুনতে পান

শেখরনাথ। টের পাওয়া যায়, সন্দীপরা সবাই হুড়মুড় করে আগন্তুককে দেখার জন্য দৌড়ে গেছে।

শেখরনাথ স্নায়ুমণ্ডলীকে টান টান করে বসে থাকেন। একসময় মহিলার গলা আবছাভাবে শোনা যায়, 'এটা কি শেখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি?'

কণ্ঠস্বর চিনতে পারলেন শেখরনাথ। তিরিশ বছর আগে ছিল সেতারের ঝঙ্কারের মতো সতেজ ; এতকাল বাদে কিছুটা মোটা আর খসখসে হয়ে গেলেও আগের রেশ অনেকটাই এখনও থেকে গেছে।

সন্দীপ বলে, 'হ্যাঁ। আপনি কাকে চাইছেন?'

'আমি—আমি ঢাকা থেকে আসছি। বসে কথা বলা যেতে পারে কি?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই, আসুন।'

এরপর দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ পাওয়া গেল।

আগন্তুক বলছিল ঢাকা থেকে আসছে। তার মানে সে—নিশ্চয়ই সে। এই শীতের বিকেলে অঢেল বাতাস চারিদিকে, তবু মনে হল দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে শেখরনাথের; ফুসফুস যেন ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।

ওদিকে হইচই মাতামাতি থেমে গিয়ে নিচের তলাটা একেবারে নিঝুম হয়ে গেছে।

কী করবেন, প্রথমটা স্থির করতে পারলেন না শেখরনাথ। ব্যাকুল, বিহ্বল দৃষ্টিতে শীতের এই মলিন বেলাশেষে ম্রিয়মাণ রাস্তাঘাট আর বাড়িঘরের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে হঠাৎ মনস্থির করে ফেলেন। একটু পরে শোভনা কি সন্দীপ, কিংবা দু'জনেই দোতলায় ছুটে আসবে কিন্তু ঢাকা থেকে এইমাত্র যে এসেছে তিনি তার মুখ দেখতে চান না। এতকাল তাঁদের ধারণা ছিল সে মৃত। কিন্তু না, এখনও বেঁচে আছে, অথচ বছরের পর বছর তার মৃত্যুকামনা করতে করতে কবে যেন তাকে ভুলে গিয়েছিলেন শেখরনাথ। কী প্রয়োজন ছিল তিরিশ বছর পর কলকাতায় এসে তাঁর বুকের গভীরে লুকনো একটি ক্ষতকে ঘা দিয়ে দিয়ে রক্তাক্ত করে তোলার?

বিকল শরীরটাকে এক টানে টেনে তোলেন শেখরনাথ। যন্ত্রণার একটি প্রবাহ কোমর থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত তীব্র গতিতে নেমে যায়। অন্য সময় হলে তাঁর গলা দিয়ে কাতর আওয়াজ বেরিয়ে আসত। এখন কিন্তু তেমন কোনও অনুভূতিই হল না।

বারান্দার বাঁ পাশে তাঁর নিজস্ব ঘর। সেটায় দু'টো দরজা। একটা দিয়ে বাড়ির ভেতরে যাওয়া যায়, আরেকটা এই বারান্দায় যাতায়াতের জন্য। ধড়ফড় করে ঘরে ঢুকে দু'টো দরজাই বন্ধ করে দিলেন শেখরনাথ।

এখানে আসবাব বলতে খুব সামান্যই। এক ধারে দেওয়াল ঘেঁষে পুরনো আমলের খাটে পুরু জাজিমের ওপর ধবধবে বিছানা। আরেক পাশে কাঠের ছোট সিংহাসনে কালী থেকে গণেশ পর্যন্ত নানা দেবদেবীর মূর্তি। এ ছাড়া আছে আলনা, আলমারি, দু-একটা সেকেলে লোহার ট্রাঙ্ক। এক দেওয়ালে লক্ষ্মীর ছবিওলা বাংলা ক্যালেণ্ডার এবং তার ওপর ফ্রেমে-বাঁধানো পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ বছরের এক মধ্যবয়সিনীর ফোটো। হাস্যোজ্জ্বল, সুন্দর এই মানুষটি হেমলতা—শেখরনাথের স্ত্রী। তেষট্টিতে

যেবার তিনি মীরপুরে পুড়ে মারা যান সে বছরই ছবিটা তোলা হয়েছিল। এটাই হেমলতার শেষ ছবি।

দুই দরজায় খিল তুলতেই কেউ যেন ধাক্কা দিতে দিতে শেখরনাথকে বিছানায় তুলে দেয়। অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে তিনি স্ত্রীর ফোটোর দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে বসে থাকেন।

বহুবার শেখরনাথ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছেন, পেছন ফিরে তাকাবেন না। তিরিশ বছর আগে যা ঘটেছে, তার জন্য ভেতরে বাইরে ভেঙেচুরে তিনি শতখান হয়ে গেছেন। হৃৎপিণ্ডে কত যে রক্তক্ষরণ হয়েছে তার খবর কে রাখে? সন্দীপ তখন পনের বছরের কিশোর। তার মুখের দিকে তাকিয়ে শোক, দুঃখ, কাতরতা ভুলতে চেষ্টা করেছেন শেখরনাথ।

সময়ের হাতে এমন এক ম্যাজিক থাকে যা সমস্ত কিছুর তীব্রতা কমিয়ে দেয় ; দিয়েও ছিল। শেখরনাথের মনে হয়েছিল সব ভুলে গেছেন কিন্তু তিরিশ বছরের পলির স্তর সরিয়ে উঠে আসছে সেই দিনগুলো—ভীতিকর, আতঙ্কজনক, দুঃস্বপ্নে-ভরা। বিস্মৃতিতে যা লুপ্ত হয়ে গেছে মনে হয়েছিল, এখন দেখা যাচ্ছে তার কিছুই হারায় নি ; স্মৃতির কালাধারে অবিকল সংরক্ষিত আছে।

মনে পড়ে, দেশভাগের পর সেই আমলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে যখন শরণার্থীর ঢল নামল পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা বা আসামের দিকে, ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন হেমলতা। শেখরনাথকে বলেছিলেন, 'চল, বাড়ি বেচে কলকাতায় চলে যাই।' সে সময় ইস্ট পাকিস্তানে জমিজমা বাড়িঘর বিক্রির তেমন সমস্যা ছিল না।

শেখরনাথ তখন ম্যাকেঞ্জি ব্রাদার্সের জুট মিলে জুনিয়র অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার। বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। ঢাকা থেকে মাইল চল্লিশেক দূরে ধলেশ্বরীর পারে মীরপুরে ছিল চটকলটা। দেড়শ' বছর ধরে শেখরনাথরা ওই শহরের স্থায়ী বাসিন্দা। বংশ-লতিকার দিক থেকে তাঁদের সপ্তম প্রজন্ম চলছিল। এর মধ্যে তাঁদের কেউ কোনওদিন অন্য কোথাও যাবার কথা ভাবেন নি। প্রজন্মের পর প্রজন্ম বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের শিকড় এই পুরনো শহরটির মাটির তলায় বহুদূর ছড়িয়ে গেছে। এক কথায় তা উপড়ে ফেলা সহজ ছিল না। শেখরনাথ বলেছেন, 'কলকাতায় যাব কেন? আমরা কি কোনও অপরাধ করেছি? এটা আমার দেশ, এখানেই থাকব।'

'কিন্তু দেখছ না, রোজ কত লোক চলে যাচ্ছে—'

'যাক, আমরা যাচ্ছি না।'

হেমলতা উদ্বিগ্ন মুখে বলেছেন, 'আমার মন বলছে, শেষ পর্যন্ত এদেশে থাকতে পারব না।'

শেখরনাথ ছিলেন প্রচণ্ড গোঁড়া, ব্রাহ্মণত্বের যাবতীয় সংস্কারকে তিনি প্রায় ধর্মপালনের মতো আগলে আগলে রাখতেন। কিন্তু তাঁর চরিত্রের অন্য একটি দিক ছিল, প্রতিবেশীদের তিনি বিশ্বাস করতেন, তাদের ওপর ছিল ছিল তাঁর অগাধ আস্থা। কণ্ঠস্বরে জোর দিয়ে বলেছেন, 'এই শহরের সবাই আমাদের চেনে। তারা থাকতে কেউ আমাদের গায়ে একটা আঁচড় কাটতে পারবে না।'

হেমলতা উত্তর দেন নি।

শেখরনাথ ফের বলেছেন, 'মীরপুরে কম রায়ট হয় নি কিন্তু আমাদের কি কোনও ক্ষতি হয়েছে? লোকজন বিপদের সময় ছুটে আসে নি?'

তাঁদের প্রতিবেশীরা ছিল সহৃদয়, সহানুভূতিশীল। ঘোর দুঃসময়ে তারা চিরকাল পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ছেচল্লিশের দাঙ্গার সময় যখন অখণ্ড ভারত জুড়ে রক্তের স্রোত বয়ে যাচ্ছিল তখনও তারা শেখরনাথের গায়ে কাউকে একটা আঙুল ঠেকাতে দেয়নি। সবই ঠিক, তবু স্বামীর মতো মানুষের ওপর আস্থা রাখতে পারছিলেন না হেমলতা। দেশভাগের পর তাঁর বিশ্বাসের ভিতটাই আলগা হয়ে গিয়েছিল। তিনি অবশ্য শহরের মানুষ সম্পর্কে নিজের সংশয়ের কথাটা পরিষ্কার করে সেদিন কিছু বলেন নি। শুধু শঙ্কাতুর সুরে জিজ্ঞেস করেছেন, 'কিন্তু খুকু? তার ভবিষ্যৎ কী?' তখন তাঁদের একটি সন্তানেরই শুধু জন্ম হয়েছে যার আদরের নাম খুকু। অন্য একটি নামও রাখা হয়েছিল—মণিকা, যা পরে স্কুল-কলেজে ব্যবহার করা হবে। তখন খুকুর বয়স ছিল পাঁচ।

হেমলতার প্রশ্নের ভেতর পরিষ্কার একটা ইঙ্গিত ছিল যা বুঝতে অসুবিধে হয় নি শেখরনাথের। তাঁর স্ত্রীটি তাঁদের মতোই বরিশালের এক গোঁড়া ব্রাহ্মণ বংশের মেয়ে, বাপের বাড়ির যাবতীয় প্রাচীন সংস্কার এবং রক্ষণশীলতা অস্থিমজ্জায় পুরে তিনি শ্বশুরবাড়ি এসেছিলেন। তার সঙ্গে যোগ হয়েছিল বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের গোঁড়ামি। হেমলতার ভাবনাচিন্তা ধ্যানধারণা সব কিছুই শক্ত লোহার ফ্রেমে আটকানো, এই ফ্রেমটির বাইরে একটি পা ফেলাও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

মনে মনে কিন্তু একটু কৌতুকই বোধ করেছিলেন শেখরনাথ। বলেছেন, 'পাঁচ বছরের একটা ছোট্ট মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে এখনই ভেবে ভেবে মাথা খারাপ করে ফেলছ!'

'ভাবতাম না, যদি দেশটা আগের দেশ থাকত। তা ছাড়া খুকুর বয়েস চিরদিন পাঁচ বছর থাকবে না।'

'তোমার কি ধারণা এখানকার সবাই অমানুষ হয়ে গেছে?'

'হয়তো হয়নি। কিন্তু খুকুর—'

'বিয়ের কথা বলতে চাইছ তো?'

কিছু না বলে সোজা স্বামীর দিকে তাকিয়েছিলেন হেমলতা।

শেখরনাথ বলেছেন, 'দেশে ভাঙন ধরলেও সবাই বাড়িঘর ফেলে ওপারে চলে যাবে না। যারা থাকবে তাদের ভেতর থেকে খুকুর জন্যে তোমার মনের মতো একটি ছেলে নিশ্চয়ই পেয়ে যাবে।'

.....হঠাৎ ভেতর দিকের বন্ধ দরজায় আস্তে আস্তে টোকা পড়ে, সেই সঙ্গে শোভনার চাপা কণ্ঠস্বর শোনা যায়, 'বাবা—বাবা—'

স্মৃতির ভেতর থেকে উঠে আসেন শেখরনাথ। কিন্তু সাড়া দিতে গিয়েও থমকে যান। শোভনা কেন এসেছে, তিনি জানেন।

কিছুক্ষণ ডাকাডাকি করে শোভনা চলে যায়। একটু পরেই অন্য একজোড়া চেনা পায়ের শব্দ সিঁড়ি বেয়ে ব্যস্তভাবে দরজার সামনে এসে থামে। সন্দীপ, যার ডাকনাম

লালু—এবার সে এসেছে।

সন্দীপ ডাকে, 'বাবা, দরজা খোল—' তার গলা উত্তেজনা এবং অস্থিরতায় কাঁপছে।

শেখরনাথ চুপ, আচ্ছন্নের মতো বসে থাকেন।

সন্দীপ একটানা বলে যায়, 'দরজা খোল—দরজা খোল। ঢাকা থেকে দিদি এসেছে।'

শেখরনাথের হৃৎপিণ্ড পলকের জন্য থেমে এমন প্রবল গতিতে লাফাতে থাকে যে তার উত্থানপতনের শব্দ তিনি নিজেই যেন শুনতে পান। মনে হয়, বুকের ভেতর কেউ এলোপাথাড়ি হাজারটা ঢাক পিটিয়ে চলেছে।

ব্যাকুলভাবে সন্দীপ এবার বলতে থাকে, 'বাবা, তুমি কি দিদির সঙ্গে দেখা করবে না? ও কি চলে যাবে?'

শেখরনাথ বসেই থাকেন। হতাশ, ব্যর্থ, বিপর্যস্ত সন্দীপ ডেকে ডেকে একসময় নিচে নেমে যায়।

স্বয়ংক্রিয় কোনও নিয়মে ধলেশ্বরী পারের সেই সব দিন আবার স্মৃতিতে হানা দেয় শেখরনাথের।

......সেই যে খুকুকে নিয়ে হেমলতার সঙ্গে কথা হয়েছিল তারপর মীরপুরের আবহাওয়া দ্রুত বদলে যেতে থাকে। ওপার থেকে জলোচ্ছ্বাসের ঢলের মতো শরণার্থীরা যেমন ইণ্ডিয়ায় চলে এসেছিল তেমনি বিহার উত্তরপ্রদেশ থেকেও অজস্র মানুষ উৎখাত হয়ে পূর্ব পাকিস্তানে চলে গেছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম কি খুলনার মতো বড় বড় শহর ভরে যাবার পর তাদের অনেকেই চলে এসেছিল মীরপুরে। পূর্ব পাকিস্তানের শরণার্থীদের মতো এদের মনেও ছিল সর্বস্ব হারানোর জন্য ক্রোধ, হতাশা আর তীব্র প্রতিশোধস্পৃহা। মীরপুরের নতুন আগন্তুকদের শক্ত চোয়ালে সবসময় নিষ্ঠুরতা ফুটে থাকত, দু'চোখে আগুন জ্বলত।

দ্বিজাতি তত্ত্বের মধ্যে যে প্রচণ্ড ঘৃণা আর অবিশ্বাস ছিল, দেশভাগের পরও তার বিষ এতটুকু কমেনি, বরং ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছিল। ভারত আর পাকিস্তানের সম্পর্ক এমনই জটিল আর স্পর্শকাতর যে কোথাও পান থেকে সামান্য চুনটুকু খসলে সীমান্তের দু'ধারেই তুলকালাম ঘটে যেত। বাতাসে তখন বিদ্বেষের বারুদ, একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এসে পড়ার শুধু অপেক্ষা।

যত দিন যাচ্ছিল, মীরপুরও উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল। মাঝে মাঝে ছোটখাট দাঙ্গাও হচ্ছিল। তবে আগের মতোই প্রতিবেশীরা শেখরনাথদের আগলে আগলে রেখেছে।

দেখতে দেখতে ক'টা বছর কেটে গেল। এর মধ্যে ম্যাকেঞ্জি ব্রাদার্সের ব্রিটিশ মালিক ঢাকার এক ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের কাছে চটকল বেচে দিয়ে দেশে চলে গেলেন। কারখানার পরিবেশও আগের মতো রইল না। শেখরনাথ বুঝতে পারছিলেন এখানে তিনি অবাঞ্ছিত। হেমলতার সঙ্গে এ নিয়ে বহু আলোচনাও হয়েছে। এদিকে খুকু বড় হচ্ছিল। তাঁদের আরও দু'টি ছেলেও হয়েছে—সন্দীপ আর সঞ্জয়।

শুধু কারখানাতেই নয়, যে প্রতিবেশীরা ছিল তাঁদের আশাভরসা তাদের কারও

কারও আচরণ, চোখমুখের চেহারা বদলে যাচ্ছিল। দেশভাগের পরও মানুষের প্রতি শেখরনাথের যে অগাধ বিশ্বাস ছিল তখন তাতে চিড় ধরতে শুরু করেছে। একবার ভাবছিলেন কলকাতায় চলে যাবেন, পরক্ষণে মনে হচ্ছিল দেখাই যাক না আর ক'টা দিন। আসলে কলকাতা ছিল তাঁর কাছে প্রায় অচেনা। সেখানে গিয়ে কী করবেন, কোথায় থাকবেন, ছেলেমেয়ে এবং স্ত্রীকে কিভাবে বাঁচাবেন, ভেবে উঠতে পারছিলেন না। ঘোর অনিশ্চয়তা তাঁকে স্থির কোনও সিদ্ধান্ত নিতে দিচ্ছিল না।

শেষ পর্যন্ত আচমকা আবার দাঙ্গা বাধল মীরপুরে। পুরনো প্রতিবেশীদের মধ্যে যারা শুভাকাঙ্খী ছিল তারা দৌড়ে আসার আগেই বাড়িতে আগুন লাগানো হল, পুড়ে মারা গেলেন হেমলতা, লুট হয়ে গেল খুকু। সন্দীপ আর সঞ্জয় তখন স্কুলে, শেখরনাথ তাঁর জুট মিলে, তাই তাঁরা প্রাণে বেঁচে গেলেন।

এরপর শেখরনাথ ঠিক করে ফেললেন, এদেশে আর থাকবেন না। হিতাকাঙ্খীরা বললেন, 'কলকাতায় চলে যান। এখানকার যা হাল, না থাকাই ভাল।' তারাই বাড়ি বিক্রির ব্যবস্থা করে দিল। যা দাম হওয়া উচিত তার আট ভাগের একভাগ মাত্র পাওয়া গেল।

কলকাতায় আসার পর এপারের আত্মীয়স্বজনরা, যারা পার্টিশানের সঙ্গে সঙ্গে দেশ ছেড়েছিল—অভয় হালদার রোডের এই বাড়িটা কিনে দেয়। ভাল একটি স্কুলে ভর্তি হল সন্দীপ আর সঞ্জয়। শেখরনাথ এখানকার এক মার্কেন্টাইল ফার্মে ছোটখাট কাজও যোগাড় করলেন। সঞ্জয় কিন্তু বেশিদিন বাঁচে নি, কলকাতায় আসার বছরখানেকের মধ্যে ভুল চিকিৎসায় মারা যায়।

সর্বস্ব খোয়াবার পর সন্দীপকেই আঁকড়ে ধরেছিলেন শেখরনাথ। এই ছেলেই তখন তাঁর ধ্যানজ্ঞান। সন্দীপও খুব শান্ত, বাধ্য, বাবা ছাড়া কিছুই জানত না। ছাত্র হিসেবেও আসাধারণ, মেধাবী। এম. কম-এ ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে কোম্পানি সেক্রেটারিশিপে ডিগ্রি নেবার পর অ্যাকাউন্টস অফিসারের চাকরি পেল। তারপর ওর বিয়ে দিলেন শেখরনাথ।

পূর্ব পাকিস্তান থেকে বুকের ভেতর দু'টো দগদগে রক্তাক্ত ক্ষত নিয়ে শেখরনাথ কলকাতায় এসেছিলেন—হেমলতা আর খুকু। হেমলতা তো খুনই হয়েছেন। কিন্তু খুকু? প্রতিদিন তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছেন, খুকুরও যেন মৃত্যু হয়। ঈশ্বর তাঁর প্রার্থনা শোনেন নি।

কখন সন্ধে নেমে গিয়েছিল, শেখরনাথ জানেন না। শীতের অন্ধকার আর হিমে বাইরের রাস্তায় কার্পোরেশনের আলোগুলোর তলায় কুয়াশার ছোট ছোট বৃত্ত চোখে পড়ে।

শেখরনাথ বিছানা থেকে নেমে যে ঘরের আলোটা জ্বালবেন, তেমন কোনও ইচ্ছাই নিজের মধ্যে খুঁজে পেলেন না। ঠাণ্ডা উত্তুরে হাওয়া যে খোলা জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকছে, সেদিকেও তাঁর খেয়াল নেই। আচ্ছন্নের মতো, অনুভূতিশূন্যের মতো তিনি বসেই থাকেন।

কতক্ষণ পর মনে নেই, আবার সিঁড়িতে পরিচিত চার জোড়া পায়ের আওয়াজ

শোনা যায়। এবার আর সন্দীপ বা শোভনা আলাদা আলাদা আসে নি। রাজা আর রুকুও ওদের সঙ্গে এসেছে।

ফের দরজায় ধাক্কা পড়ে। ওরা একসঙ্গে ডাকতে থাকে, 'বাবা—বাবা—দাদু—'

কিছুক্ষণ আগের মতোই সাড়া না দিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন শেখরনাথ।

এবার অন্য সবার গলা ছাপিয়ে সন্দীপের কণ্ঠস্বর কানে আসে, 'তোমার ভয় নেই, দিদি চলে গেছে। ওর মুখ তোমাকে দেখতে হবে না। দরজা খোল—' তার গলায় ক্ষোভ, দুঃখ, হয়তো বা কিছুটা অধীরতাও মেশানো।

আশ্চর্য! যাকে তিনি দেখতে চাননি, যার জন্য তিরিশ বছর তাঁর কাছে মৃত্যু ছাড়া আর কিছু কাম্য ছিল না, সে চলে গেছে শুনে অদ্ভুত এক ব্যাকুলতা বোধ করতে থাকেন শেখরনাথ। নিজেকে টেনে-হেঁচড়ে খাট থেকে নামিয়ে আনেন, আলো জ্বেলে দরজা খুলে দেন।

কিছুক্ষণ স্থির চোখে শেখরনাথকে লক্ষ করে সন্দীপরা। তারপর একসঙ্গে সবাই ঘরে ঢোকে।

শেখরনাথের পরনে ধুতি এবং হাফ-হাতা খদ্দরের জামা ছাড়া আর কিছু নেই। রাস্তার দিকের জানালা দিয়ে হু হু করে উত্তুরে হাওয়ার সঙ্গে হিম ঢুকছে। ঠাণ্ডায় তাঁর শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে কিন্তু তিনি বুঝি টের পাচ্ছেন না। শোভনা ছুটে ঘরের এক কোণের আলনা থেকে শাল এনে শ্বশুরের গায়ে ঘন করে জড়িয়ে দিয়ে তাঁকে ধরে ধরে বিছানায় বসিয়ে দেয়।

সন্দীপ রুকু আর রাজা শেখরনাথের কাছে এগিয়ে এসেছিল, তবে তারা বসে না।

সন্দীপ বলে, 'এ তুমি কী করলে বাবা! দিদিরা কত বছর ধরে আমাদের খোঁজ করেছে। শেষ পর্যন্ত ঢাকার ইন্ডিয়ান হাই কমিশন এ বাড়ির ঠিকানা যোগাড় করে দিতে পেরেছে; আর সেটা পেয়েই ওরা ছুটে এসেছিল, কিন্তু তুমি দরজায় খিল দিয়ে বসে রইলে, একবারও দিদিকে কাছে ডেকে নিলে না! দিদি কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল। আর কোনওদিনই সে আসবে না।' একটু থেমে আবার বলে, 'হারুণদা কী ভাবল বল তো?'

রুদ্ধস্বরে শেখরনাথ জিজ্ঞেস করেন, 'কে হারুণদা?'

'দিদির স্বামী।'

সন্দীপের কথা শেষ হতে না হতেই শেখরনাথের মুখচোখের চেহারা একেবারে বদলে যায়। তাঁকে অত্যন্ত অসুস্থ দেখায়। মনে হয় তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছে। হারুণ নামটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণত্বের প্রাচীন সংস্কারগুলি শেখরনাথকে বিপর্যস্ত করে তুলতে থাকে। ভাঙা, আবছা আবছা গলায় তিনি বিড়বিড় করেন, 'স্বামী—খুকুর স্বামী!'

সন্দীপ বাবার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছিল। বরাবরই সে ধীর, স্থির, ধৈর্যশীল। কিন্তু এখন তাকে কিছুটা উত্তেজিত দেখায়, 'জানো, হারুণদা দিদির জন্য কী করেছেন! তিনি হাত না বাড়িয়ে দিলে দিদি আজ কোথায় তলিয়ে যেত!' এরপর একটানা সে যা বলে তা এইরকম। তেষট্টিতে মীরপুরের সেই রায়টের পর দাঙ্গাবাজরা যখন

খুকুকে লুট করে নিয়ে যায় সেই সময় ওই অঞ্চলের সাব-ডিভিসানাল অফিসার ছিলেন হারুণ। তিনিই কয়েক মাস বাদে খুকুকে উদ্ধার করে নিজেদের বাড়ি নিয়ে যান। তারপর তাকে ফিরিয়ে দেবার জন্য শেখরনাথদের খোঁজ করতে থাকেন। কিন্তু ততদিনে তাঁরা কলকাতায় চলে এসেছেন।

বছরখানেক চেষ্টার পরও যখন শেখরনাথদের সন্ধান পাওয়া যায় না তখন লাঞ্ছিতা একটি মেয়েকে সামাজিক মর্যাদা দেবার জন্য বিয়ে করেন। তাঁর মা-বাবার দিক থেকে কোনওরকম বাধা আসেনি, বরং তাঁরা পরম উদারতায় খুকুকে গ্রহণ করেছিলেন।

সেদিনের সেই তরুণ অফিসার হারুণ এখন ঢাকায় এডুকেশন মিনিস্ট্রির জয়েন্ট সেক্রেটারি। ওঁদের এক ছেলে, দুই মেয়ে। ছেলে ডাক্তার, মেয়েরা কলেজে পড়ছে।

সন্দীপ বলে, 'ভীষণ অন্যায় হয়ে গেল বাবা, দিদি আর কোনওদিন আমাদের এখানে আসবে না।'

শেখরনাথ চুপ করে থাকেন।

সন্দীপ এবার বলে, 'হারুণদাও এসেছিলেন। মেয়ে বাপের বাড়িতে কিরকম অভ্যর্থনা পায় সেটা বুঝে বাড়িতে ঢুকতেন। তা আর হল না।'

ছেলের কথায় শ্লেষ ছিল। সেদিকে লক্ষ্য নেই শেখরনাথের। জোরে শ্বাসটানার মতো শব্দ করে বলেন, 'এসেছিল!'

'হ্যাঁ। ট্রাম রাস্তায় ট্যাক্সিতে বসে ছিলেন।'

শেখরনাথের মনে পড়ে, বিকেলে খুকু যে ট্যাক্সি থেকে নেমেছিল তার ভেতর একজনকে বসে থাকতে দেখেছেন। সে-ই তা হলে হারুণ!

আরও খানিকক্ষণ বাদে সন্দীপরা চলে যায়। সাড়ে আটটা বাজলে শোভনা শেখরনাথের জন্য রাতের খাবার নিয়ে আসে—দু'খানা সুজির রুটি, আলু-কপির তরকারি, এক বাটি দুধ আর একটি সন্দেশ। শ্বশুরকে খাইয়ে, বিছানা করে তাঁকে শুইয়ে দিয়ে, চারপাশে নেটের মশারি গুঁজে চলে যায়।

অন্যদিন শোবার সঙ্গে সঙ্গে দু'চোখ জুড়ে আসে কিন্তু আজ ঘুম আসছে না। বার বার খুকুর মুখটা শেখরনাথের চোখের সামনে ফুটে উঠতে থাকে। অনেকক্ষণ শুয়ে থাকার পর মশারি সরিয়ে তিনি বাইরে বেরিয়ে আসেন এবং অস্থির পায়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘরময় পায়চারি করতে থাকেন। টের পান, বুকের ভেতর অনবরত কিসের ভাঙচুর চলছে।

সারারাত নিদ্রাহীন কাটিয়ে ভোরবেলায় শেখরনাথ মনস্থির করে ফেলেন। তাঁর ঘরের সঙ্গে যে বাথরুমটি রয়েছে সেখানে গিয়ে চোখে মুখে জল দিয়ে দোতলার শেষ মাথায় রাজার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ান। কিছুক্ষণ ডাকাডাকি করার পর ঘুম ভাঙে রাজার। দরজা খুলে অবাক হয়ে যায় সে। বলে, 'দাদু তুমি! কী হয়েছে?'

শেখরনাথ বলেন, 'কিছু না। তোর পিসি কলকাতায় কোথায় উঠেছে রে?'

'পার্ক স্ট্রিটের একটা হোটেলে।'

'তুই আমাকে এখনই সেখানে নিয়ে যেতে পারবি?'

নিজের কানে শোনার পরও যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না রাজার। বিভ্রান্তের মতো সে বলে, 'তুমি যাবে!'

শেখরনাথ আস্তে মাথা নাড়েন, 'হ্যাঁ।'

'কিন্তু গেলে তো দেখা হবে না।'

'কেন?'

'আজ সকালের ফ্লাইটে ওরা ঢাকায় যাচ্ছে। আমরা যেতে যেতে পিসিরা বেরিয়ে পড়বে।'

একটু ভেবে শেখরনাথ বলেন, 'তা হলে তাড়াতাড়ি মুখটুখ ধুয়ে রেডি হয়ে নে। আমরা এয়ারপোর্টেই যাব। কাউকে এখন এ কথা বলার দরকার নেই।'

নিজের ঘরে ফিরে এসে দ্রুত পোশাক পালটে নেন শেখরনাথ। এক ধারে ছোট একটা লোহার সিন্দুক আছে, সেটা খুলে তার ভেতর থেকে মাঝারি একটা চামড়ার ব্যাগ বার করে সিন্দুকটা ফের বন্ধ করে দেন।

আরও কিছুক্ষণ পর রাজাকে সঙ্গে নিয়ে শেখরনাথ যখন চুপিসারে বেরিয়ে পড়েন তখনও এ বাড়ির অন্য কারও ঘুম ভাঙে নি।

শীতের এই ভোরে চারপাশের বাড়িঘর, ট্রামরাস্তা, দূরের পার্ক—সব কুয়াশায় ঝাপসা হয়ে আছে। কর্পোরেশনের বাতিগুলো এখনও কেউ নিভিয়ে দিয়ে যায় নি, মরা মাছের চোখের মতো সেগুলো জ্যোতিহীন। রোদ উঠতে এখনও অনেক দেরি।

একটা ট্যাক্সি নিয়ে শেখরনাথরা এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেখেন খুকুরা আগেই এসে গেছে।

দূর থেকে খুকু অর্থাৎ মণিকা শেখরনাথদের দেখতে পেয়েছিল। হারুণ আর সে থমকে দাঁড়িয়ে যায়। ওদিকে রাজা আর শেখরনাথও থেমে গিয়েছিলেন। তাঁর হৃৎপিণ্ড তোলপাড় হয়ে যাচ্ছিল। লক্ষ করছিলেন, খুকুর ঠোঁট দু'টো থরথর করছে। তার মুখে কষ্ট আনন্দ অভিমান অভিযোগ—কত রকমের অভিব্যক্তি যে খেলে যায়!

কতক্ষণ পর খেয়াল নেই, পায়ে পায়ে মেয়ের কাছে চলে এসেছিলেন শেখরনাথ। হঠাৎ পঞ্চাশ বছরের মধ্যবয়সী খুকু বালিকার মতো ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। তার হাত-পায়ের জোড় যেন বিচিত্র আবেগে আলগা হয়ে যাচ্ছিল, হুড়মুড় করে সে বাবার পায়ের কাছে আছড়ে পড়ে কিন্তু তাঁকে ছোঁয় না।

নিচু হয়ে মেয়েকে বুকের কাছে তুলে নিয়ে দু'হাতে অনেকক্ষণ জড়িয়ে রাখেন। শেখরনাথ টের পান তাঁর বুক চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে।

দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন হারুণ। অত্যন্ত সুপুরুষ, বুদ্ধিদীপ্ত, উজ্জ্বল চোখমুখ। একসময় তাঁকে কাছে ডাকেন শেখরনাথ। এগিয়ে এসে হাঁরুণ তাঁর পা ছুঁতেই তাঁকেও বুকে জড়িয়ে নেন তিনি।

অডিও সিস্টেম ঘোষণা করা হয়, ঢাকা ফ্লাইটের যাত্রীরা যেন এয়ারক্রাফটে গিয়ে উঠে পড়েন, উড়ানের আর দেরি নেই।

ধীরে ধীরে হারুণ আর খুকুকে বুকের ভেতর থেকে মুক্ত করে সেই চামড়ার

ব্যাগটা থেকে সোনার হার, একজোড়া রুলি আর একটা হীরের আংটি বার করেন। মেয়েকে সেই হার আর রুলি দিয়ে বলেন, 'তোকে তো কিছুই দেওয়া হয়নি। তোর বিয়ের জন্যে তোর মা এগুলো বানিয়ে রেখেছিল।' হীরের আংটিটা হারুণকে দিয়ে বলেন, 'এটা প'রো। মাপ ঠিক হবে কিনা জানি না। যদি না হয় সোনার দোকানে নিয়ে গিয়ে ঠিক করে নিও।'

এরপর অনেকক্ষণ চুপচাপ।

অডিও সিস্টেমে আরেক বার ঘোষণা হতেই হারুণ বলেন, 'এবার আমাদের যেতে হবে।'

আস্তে মাথা নাড়েন শেখরনাথ।

হারুণ ফের বলেন, 'একবার ঢাকায় আসুন। যাবার সব ব্যবস্থা আমি করে দেব।'

শেখরনাথ বলে, 'তার আগে ছেলেমেয়েদের নিয়ে তোমরা এস।'

'আসব।'

হারুণরা সিকিউরিটি এনক্লোজারের দিকে এগিয়ে যান। সেদিকে তাকিয়ে শেখরনাথ মনে মনে বলেন, বেশ ছেলেটি। রক্তের ভেতর জমানো বহুকালের সংস্কারগুলির কথা এই মুহূর্তে তাঁর মনে থাকে না।

জাহান্নামের গাড়ি

পার্ক সার্কাসের একধারে পুরনো আমলের এই ছিরিছাঁদহীন একতলা বাড়িটার বয়স যে কত, ক্যালকাটা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনও হয়তো তার হদিশ দিতে পারবে না। সত্তরও হতে পারে, আশি নব্বই হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। লম্বা ধাঁচের পর পর চারটে বেঢপ ঘর, যার কোনওটাই আস্ত নেই—সব ভাঙাচোরা, নোনা-লাগা, শ্যাওলা-ধরা। চারপাশের দেওয়াল থেকে আস্তর খসে খসে ইট বেরিয়ে পড়েছে। প্রতিটি ঘরের মেঝেতে ছোট-বড় অজস্র চিড়।

বাড়িটার একদিকের দু'খানা ঘর নিয়ে পঞ্চাশ বছর ধরে আছে মাসুদ জান গাড়িওলা আর তারই কাছাকাছি বয়সের একটা মোটর, যার চাকাগুলো বিরাট বিরাট, সামনে বড় বড় গোল হেডলাইট, মাথায় ক্যানভাসের হুড, ডানধারে ড্রাইভারের সিটের লাগোয়া জানালাটার পাশে আড়াই প্যাঁচওলা বিউগলের ধরনে হর্ন—পুরনো ভিনটেজ কার যাকে বলে তা-ই। গাড়িটার আদি চেহারা মোটামুটি একই রকম রয়েছে। তবে তার ইঞ্জিন, মাড গার্ড, স্টিয়ারিং, সিটের গদি বহু বার পালটাতে হয়েছে। মাসুদ জান বাড়ির যেধারে থাকে তার সামনের ফাঁকা জায়গায় টুটোফুটো টিনের চালা বানিয়ে তার তলায় গাড়িটাকে রাখা হয়। হাত-পা বা শ্বাসপ্রশ্বাসের মতো এটা তার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে, অচ্ছেদ্য কোনও বন্ধনে। মাসুদ জান নিজেও বলে, এই গাড়ি তার কলিজার টুকরা।

অনেক বছর আগে, তার যৌবনে, একটা শাদিও হয়েছিল মাসুদ জানের। গোটা দুই ছেলেমেয়েও জন্মেছিল। তারা কেউ টেকে নি, কবেই মরে ফৌত হয়ে গেছে। কিন্তু মাসুদ জান আছে, আর আছে তার এই গাড়িটা। এছাড়া এত বড় দুনিয়ার আর কেউ নেই তার। বিবি, বেটা বা বিটিয়ার মুখ আজকাল ভাল করে মনেও পড়ে না। তাদের স্মৃতি একেবারে ঝাপসা হয়ে গেছে।

বাড়িটার বাকি দু'খানা ঘর নিয়ে থাকে ফজলু মিঞা, তার বিধি রেহানা এবং তাদের দু'টো বাচ্চা। বাজারে ফজলুর ছোটখাট ফলের কারবার।

মাসুদ জান এ বাড়ির চিরস্থায়ী বাসিন্দা হলেও অন্য ঘর দু'টোয় মাঝে মাঝেই ভাড়াটে বদলে যায়। পঞ্চাশ বছরে কত জন যে এল তার কোনও লেখাজোখা নেই। তিনি সাল আগে এসেছিল ফজলুরা। ওরা মানুষ ভাল—বিনয়ী, ছা-পোষা, নির্ঝঞ্ঝাট। মাসুদ জানকে খুবই খাতির করে।

বাড়িটার সামনে দিয়ে পনেরো ফুট চওড়া একটা গলি জিলিপির প্যাঁচের মতো পাক খেতে খেতে চলে গেছে। ওটার এক মাথায় ট্রাম রাস্তা, আরেক মাথায় রেল-লাইন। দু'ধারে ইটের দেওয়াল আর টিনের চালের সারবন্দি ঘরবাড়ি। সে সবের ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ হঠাৎ সাবেক কালের কিছু একতলা, দোতলা বা তেতলা, যেগুলোর খড়খড়ি লাগানো জানালার মাথায় বাহার খোলার জন্য আধখানা চাঁদের আকারে লাল-নীল-সবুজ রঙের কাচ বসানো। প্রায় প্রতিটি বাড়ির সামনের দিকে নানা ধরনের দোকানপাট—কোনওটা সস্তা রুটি-মাংসের, কোনওটা পান-বিড়ির, কোনওটা ইলেকট্রিক সাজ-সরঞ্জামের, কোনওটা বা মুদিখানা। এছাড়া রয়েছে চায়ের দোকান, দাওয়াখানা, মোটর মেরামতি আর লেদ মেশিনের ছোটখাট কারখানা।

এলাকাটা পনেরো বিশ বছর আগেও বেশ নিরিবিলি ছিল। এখন লোকজন প্রচুর বেড়ে গেছে। রাস্তায় সারাক্ষণ গিজগিজে ভিড়। সকাল থেকে মাঝরাত পর্যন্ত হই-হল্লা, কারণে অকারণে ঝগড়াঝাঁটি, খিস্তিখেউড়। যেদিকে তাকানো যাক, পচা আবর্জনা ডাঁই হয়ে আছে। তীব্র দুর্গন্ধে এখানকার বায়ুমণ্ডল দিবারাত্রি বিষাক্ত হয়ে থাকে।

রোজ অনেকটা বেলা পর্যন্ত ঘুমোয় মাসুদ জান। কিন্তু আজ অন্ধকার থাকতে থাকতেই উঠে পড়েছে। তারপর স্নান চুকিয়ে সামনের দিকের টিনের চালার তলায় যেখানে তার গাড়িটা থাকে তার পাশে একটা চৌপায়ায় বসে আছে। কাল রাতে ফজলুদের ঘর থেকে তিনখানা হাতল-ভাঙা চেয়ার চেয়ে এনে চৌপায়াটার সামনে সাজিয়ে রেখেছিল। তা ছাড়া চার-পাঁচটা কোল্ড ড্রিংকসের বোতলও কিনে এনেছিল ; সেগুলো ঘরের ভেতর রয়েছে। আজ সকালে যে কোনও সময় রঘুবন্ত সিং এই গরিবখানায় পা রাখবেন। রঘুবন্ত রাজপুত ক্ষত্রিয়, অঢেল পয়সাওলা, রইস লোক। প্রচুর জমিজমার মালিক তিনি ; তা ছাড়া নানা রকমের কল-কারখানা আর 'বিজনেস'ও আছে। মাসুদ জানের পুরনো গাড়িটার খবর পেয়ে কাল পাটনা থেকে কলকাতার একটা নাম-করা হোটেলে এসে উঠেছেন। তাঁর পাঠানো একটা লোক কাল রাতেই এসে জানিয়ে দিয়ে গিয়েছিল আজ সকালে তিনি সবান্ধবে এসে হাজির হবেন। তাঁর খাতিরদারির জন্য চেয়ার আর কোল্ড ড্রিংকসের ব্যবস্থা করে রেখেছে মাসুদ জান।

হিন্দুদের বড় পুজোর ধুমধাম ক'দিন আগে শেষ হয়েছে। তারপর থেকেই এ বছর

হিম পড়তে শুরু করেছে। উত্তুরে হাওয়া বয়ে যাচ্ছে এলোমেলো। সেই হাওয়ায় ঠাণ্ডা আমেজ জড়ানো, গায়ে লাগলে সিরসির করে। এই সিরসিরানিটুকু ভারি সুখদায়ক। খানিক আগে রোদ উঠে গিয়েছিল। তবু একটু লক্ষ করলে দেখা যাবে, অনেক দূরে আকাশের গায়ে চিকন সাদা ওড়নার মতো এখনও সামান্য কুয়াশা লেগে রয়েছে।

চারপায়ায় বসে মাঝে মাঝেই রাস্তার দিকে তাকাচ্ছিল মাসুদ জান, পরক্ষণেই তার দুই চোখ ফিরে আসছিল পুরনো গাড়িটার দিকে। এখন তাকে দেখলে টের পাওয়া যাবে, ভেতরে ভেতরে কোথায় যেন চাপা উত্তেজনা চলছে। নাকি অস্থিরতা, কিংবা অন্য কিছু?

তার বয়স কবেই সত্তর পেরিয়ে গেছে। প্রায় চার হাতের মতো লম্বা। বয়সের কারণে শরীরের মাংস ঝরে ঝরে মাসুদ জানকে খুব রোগা আর ঢ্যাঙা দেখায়। দুই হাতের মোটা মোটা শিরা, কণ্ঠা এবং গালের হাড় ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে যেন। একসময় রং ছিল টকটকে। চামড়া কুঁচকে, ঢিলে হয়ে মাকড়সার জালের মতো সরু সরু, সূক্ষ্ম কালচে দাগে ভরে গেছে সারা গা। এই বয়সেও লম্বা, ঘন, ঢেউখেলানো দাড়িতে মেহেদি মাখানো। চোখে সরু করে সুর্মার টান। স্নানের পর সুর্মা আর মেহেদি লাগানো তার বহুকালের অভ্যাস। ছেচল্লিশ সাতচল্লিশ বছর আগে মোতি বাঈ, গর্দানি বাঈ বা জহুরা বাঈ এবং তাদের বাবুদের সামনের ওই গাড়িতে তুলে যখন গড়ের মাঠে হাওয়া খাওয়াতে নিয়ে যেত তখন থেকেই এই অভ্যাসের শুরু। যে গাড়ির সওয়ার পরমাশ্চর্য সব বাঈজীরা, যাদের জমকালো সাজের বাহার আর রূপের ঝলক চোখ ধাঁধিয়ে দিত, তার চালকের গায়ে থাকবে সাদামাঠা, ম্যাড়মেড়ে জামা-প্যান্ট, তা তো আর হয় না। আরোহিণীরাই তাদের সঙ্গে মানিয়ে যায়, এমন পোশাকের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।

এই মুহূর্তে মাসুদ জানের পরনে সাদা ঢোলা পাজামা যার তলার দিকটা চাপা, আর লম্বা ঝুলের শেরওয়ানি। মাথায় জর্জেটের পাগড়ি, যেটার এক দিক কুঁচিয়ে জাপানি পাখার মতো উঁচু করে রাখা হয়েছে। ওইভাবে সেজেই বছরের পর বছর বাঈজীদের গাড়ি চালিয়ে এসেছে সে।

এরকম সাজসজ্জা করে কেউ নিজের বাড়িতে বসে থাকে না। মাসুদ জান যে সেটা করেছে তার কারণ একটাই। প্রথম নজরেই যেন রঘুবন্ত সিং টের পেয়ে যান মামুলি এক ড্রাইভারের কাছে তিনি আসেননি।

ভাল করে লক্ষ করলে দেখা যাবে, মাসুদ জানের পাগড়ি বা শেরওয়ানির নানা জায়গায় পিঁজে পিঁজে সুতো বেরিয়ে পড়েছে। বার বার রিপু করিয়েও সেগুলোর দুর্দশা ঠেকানো যায়নি। বেশ বোঝা যায় সে খুব কষ্টে আছে। আজকাল তার গাড়িটার কদর নেই। পঞ্চাশ বছর আগের সেই বাবু, বিবি আর বাঈজীরা কি আছে যে এর মর্যাদা দেবে? এখন নতুন নতুন মডেলের গাড়ি বেরিয়েছে; সে সব নিয়ে লোকে মাতোয়ারা। অন্য সব পুরনো জিনিসের মতো তার এই মোটর আর সে স্রেফ বাতিলের দলে। ইদানীং কেউ তার খোঁজও নেয় না। গাড়ি না চালাতে পারলে যা হয়, রোজগার প্রায় বন্ধ। বছরে দু'বার পুরনো গাড়ি অর্থাৎ ভিনটেজ কারের যে র‍্যালি হয় তাতে নাম দেয় মাসুদ জান। ফার্স্ট প্রাইজটা তার বাঁধা। দু'বার প্রাইজ হিসেবে কাপ আর কিছু

নগদ টাকা পাওয়া যায়। তাছাড়া ব্যাঙ্কে কিছু টাকা জমানো রয়েছে, তার সুদও যৎকিঞ্চিৎ মেলে। এইভাবে কোনওরকমে দিন কেটে যাচ্ছে। তবে সব মিলিয়ে তার যেটুকু আয় তার বেশ খানিকটা গাড়ির পেছন খরচ হয়ে যায়।

চালু রাখার জন্য মাঝে মাঝেই গাড়িটাকে রাস্তায় বার করে মাসুদ জান। আর তখনই পুরনো ক্ষয়কাশের রোগীর মতো হাজারটা উপসর্গ ধরা পড়ে। গ্যারাজে নিয়ে গেলে ওরা বলে এটা পালটাও, ওটা পালটাও। গাড়িটা তার জেরবার করে ছাড়ছে। শুভাকাঙ্ক্ষীরা বহুবার পরামর্শ দিয়েছে এই জঞ্জালটা বিদায় কর। ভিনটেজ কারের শখ যাদের, তারা কেউ কেউ গাড়িটা কিনতেও এসেছিল কিন্তু মাসুদ জানের একটাই শর্ত, গাড়ির সঙ্গে তাকেও ড্রাইভার হিসেবে নিতে হবে। যত দিন সে বেঁচে আছে সেটা অন্য কেউ চালাক, একেবারেই পছন্দ নয় তার। কিন্তু গাড়ি পছন্দ হলেও সেই সঙ্গে তার চালকটিকে নিতে কেউ রাজি হয়নি।

রঘুবন্ত সিং ঠিক কী চান, মাসুদ জানের জানা নেই। সে জন্য কিছুটা উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে। নিজের শর্ত তাকে জানিয়ে দেবে সে। রঘুবন্তজি যদি রাজি হন, সমস্যা নেই। তবে গাড়িটা কেনাই যদি একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তাঁকে খালি হাতে ফিরে যেতে হবে।

রঘুবন্ত সিংরা এলেন বেশ খানিকটা বেলা করেই। ততক্ষণে সকালের গা থেকে কুয়াশার ওড়না মুছে গেছে ; রোদের তাত আর জেল্লা আরও কিছুটা বেড়েছে।

এই আমলের ঝকঝকে মডেলের একটা গাড়ি বাড়ির সামনে এসে থামতেই সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়েছিল মাসুদ জান। মোটর থেকে তিনজন নামতে সে কয়েক পা এগিয়ে যায়। দু'জনের পরনে বিহারি ধরনে পরা ধুতির ওপর গরম পাঞ্জাবি, পায়ে মোটা চামড়ার পাম্প-শু। তাদের মজবুত চেহারা, চামড়া ঘেঁষে ছোট ছোট করে ছাঁটা চুল। একজনের মুখ চৌকো, আরেকজনের লম্বাটে। দু'জনেরই চোখেমুখে হিংস্রতা যেন লুকনো রয়েছে। তৃতীয় লোকটির ঘাড়ে-গর্দানে ঠাসা বিশাল শরীর ; গোলাকার মুখ, লালচে চোখ, কাঁধ পর্যন্ত লতানো চুল। পরনে দামি সিল্কের চুস্ত আর কারুকাজ-করা পাঞ্জাবি যার বোতামে হীরের ঝলক। দু'হাতের আটটা আঙুলের তিনটে আংটিতেও হীরে বসানো ; বাকিগুলোতে চুনি, পান্না, গোমেদ ইত্যাদি। গলায় সোনার সরু হার, বাঁ হাতের কবজিতে সোনার ব্যাণ্ডে বিদেশি দামি ঘড়ি। তার সারা শরীর থেকে ভুর ভুর করে দুর্লভ সেন্টের গন্ধ উঠে আসছে। ইনিই যে রঘুবন্ত সিং সেটা মাসুদ জানের সত্তর বছরের অভিজ্ঞ চোখ মুহূর্তে শনাক্ত করে ফেলে। হঠাৎ পয়সা হওয়া লোকেদের গায়ের গন্ধ, তাকানো, হাঁটার চালে এমন কিছু থাকে যে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। অন্য দু'জন যে তার অঙ্গরক্ষক বা বডিগার্ড এবং মোসাহেব, একালের ভাষায় চামচা, সেটাও টের পাওয়া যায়।

রঘুবন্তদের সঙ্গে আরও একজন রয়েছে। সে ওঁদের ড্রাইভার, গাড়ি থেকে সে নামেনি। কাল রাতে এই লোকটাই তাকে খবর দিয়ে গিয়েছিল। মাসুদ জান বিনীতভাবে বলে, 'আদাব। আইয়ে আইয়ে—'

রঘুবন্ত মাসুদ জানের পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে নিয়ে বলে, 'আপ মাসুদ

জান?'

লোকটার গা থেকে টাকার গরম বাষ্প বেরিয়ে এলেও দেখা যাচ্ছে কিঞ্চিৎ সহবত জানে। তার মতো বয়স্ক মানুষকে তুমি করে যে বলেনি, তাই যথেষ্ট। মাসুদ জান মাথা ঝুঁকিয়ে বলে, 'জি—'তারপর খাতির করে তিনজনকে এনে চেয়ারে বসায়। দৌড়ে ঘর থেকে ঠাণ্ডা পানীয়ের বোতলগুলো নিয়ে এসে চাবি দিয়ে খুলে সবার হাতে একটা করে দেয়।

রঘুবন্ত সিং বোতল নেন বটে, তবে পানীয় স্পর্শ করেন না। বোতলটা নিচে নামিয়ে রেখে ঘাড় ফিরিয়ে টিনের চালার তলায় গাড়িটা দেখতে থাকেন। বলেন, 'আপনার এই পুরনো মোটরটার খবর আমার এক বন্ধুর কাছে পেয়েছি।'

মাসুদ জান বলে, 'জি—'

'শুনেছি হর সাল গাড়িটা পুরানা কার রেসে ফার্স্ট হয়।'

'জি—'

'আখবরে এর ছবিও বেরিয়েছিল। বন্ধু সেটাও আমাকে দেখিয়েছে।'

'জি—'

হঠাৎ উঠে গিয়ে চারপাশ ঘুরে গাড়িটার হর্ন, সিট, হেডলাইট খুঁটিয়ে দেখে এসে ফের চেয়ারে বসতে বসতে রঘুবন্ত বলেন, 'মোটরটা তোয়াজে রেখেছেন দেখছি।'

মাসুদ জান খুশি হয়ে পুরনো, বহুবার-বলা সেই কথাগুলো আউড়ে যায়, 'জি বাবুসাব, গাড়িটা আমার কলিজার টুকরা—'

রঘুবন্ত বলেন, 'এটা আমার পছন্দ হয়েছে।'

'বহুৎ বহুৎ সুক্রিয়া বাবুসাব।'

কেউ তার গাড়ির তারিফ করলে দিল তর হয়ে যায় মাসুদ জানের। উচ্ছ্বাসের গলায় লাগাতার সে যা বলে যায় তা এইরকম। তার গাড়ির খানদান, চাল, ঐতিহ্য, এসব বোঝার মতো মানুষ আজকাল নেই বললেই চলে। রুচি-টুচি সব পালটে গেছে। এখন ঠুনকো, পলকা, কারুকার্যহীন জিনিসের দিকে লোকের ঝোঁক। আভিজাত্য বা বনেদিআনা ব্যাপারগুলোর দাম কানাকড়িও নয়। বাবুসাব রঘুবন্ত সিংয়ের মতো সত্যিকারের সমঝদার অনেক সাল বাদে সে দেখতে পেল। অজস্র বার ধন্যবাদ জানিয়ে মাসুদ জান জিজ্ঞেস করে, 'বাবুসাব, এবার বলুন গাড়িটার ব্যাপারে আপনি কী ভেবেছেন?'

রঘুবন্ত বলেন, 'ওটা আমি কিনতে চাই।'

একটু চুপ করে থাকে মাসুদ জান। তারপর বলে, 'ঠিক হ্যায় বাবুসাব। আমার বহুৎ উমর হয়ে গেছে। মৌত তো একদিন আসবেই। মরার আগে গাড়িটা একজন সমঝদার আদমির হাতে পড়লে ভাল লাগবে। লেকেন—'

'কী?'

'আমার একটা শর্ত আছে।'

তার কথা ভাল করে না শুনেই হাত তুলে রঘুবন্ত সিং বলেন, 'দামের জন্যে ভাববেন না। যা কিম্মত চাইবেন তাই পাবেন—'

মাসুদ জান বলে, 'টাকার কথা ভাবছি না বাবুসাব—'

থমকে যান রঘুবন্ত। কী ভেবে জিজ্ঞেস করেন, 'তা হলে?'

'গাড়ির সঙ্গে আমাকে নিতে হবে।'

'মতলব?'

মাসুদ জান তার শর্তটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেয়। অন্য ড্রাইভার এ গাড়ি চালাক, সেটা একেবারেই চায় না সে। যতদিন বেঁচে আছে, নিজেই চালিয়ে যাবে।

তীক্ষ্ণ চোখে ধীরে ধীরে মাসুদ জানকে আরেক বার লক্ষ করেন রঘুবন্ত। বলেন, 'আপনি গাড়ি চালাতে পারবেন?'

মাসুদ জান জানায়, তার শরীরে যে তাকত এখনও অবশিষ্ট রয়েছে তাতে আরও দশটা সাল অক্লেশে ড্রাইভ করতে পারবে।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে রঘুবন্ত বলেন, 'মঞ্জুর।'

'বহুৎ সুক্রিয়া। বাবুসাব, এই গাড়িতে চড়লে বুঝবেন আরাম কাকে বলে। নিজের জিনিস বলে মনে করবেন না বাড়িয়ে বলছি। এমন উমদা, খানদানি চিজ নসিবে না থাকলে মেলে না।'

আচমকা বিপুল শরীরে তুফান তুলে হেসে ওঠেন রঘুবন্ত। মাসুদ জান যা বলেছে তেমন মজাদার কথা বুঝিবা আগে আর কখনও শোনেন নি।

'কী হল বাবুসাব?' রীতিমত হকচকিয়ে যায় মাসুদ জান।

রঘুবন্ত হাসতেই থাকেন। দেখাদেখি তাঁর দুই মোসাহেবও পাল্লা দিয়ে হাসে।

ভীষণ জড়সড় হয়ে মাসুদ জান জিজ্ঞেস করে, 'আমার কি কোনও কসুর হল বাবুসাব?'

দুই হাত এবং মাথা প্রবলবেগে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে রঘুবন্ত বলেন, 'মিঞা, আপনার কি ধারণা আমি ওই লক্কড় টিনের খাঁচাটায় চড়ব?'

যে মানুষ খানিক আগে গাড়িটার এত তারিফ করেছেন তাঁর মুখে এমন একটা মন্তব্য শুনে মন ভীষণ খারাপ হয়ে যায় মাসুদ জানের। বলেন কিনা লক্কড় টিনের খাঁচা! বিষণ্ণ সুরে সে বলে, 'গোস্তাকি মাপ করবেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'হাঁ হাঁ, করুন।'

'যদি না-ই চড়েন, গাড়িটা কিনতে চাইছেন কেন?'

'চম্পার জন্যে। সে চড়বে।'

ব্যাপারটা মাসুদ জানের মাথার ভেতর গুলিয়ে যায়। সে অবাক হয়ে বলে, 'চম্পা!'

রঘুবন্ত একটু জোর দিয়ে বলেন, 'হাঁ, চম্পা—'

'সে কে?'

এবার ডান পাশে যে চৌকো মুখওলা লোকটা বসে ছিল, রঘুবন্ত সিং তার দিকে ফিরে বলেন, 'গণপত, মিঞাকে সমঝিয়ে দাও তো চম্পা কে।'

গণপত পরিষ্কার করে সংক্ষেপে বুঝিয়ে দেয়। চম্পা হল রঘুবন্ত সিংয়ের রাখনি অর্থাৎ রক্ষিতা। পাটনা থেকে পঞ্চাশ মাইল পুবে যে পুরনো ইণ্ডাস্ট্রিয়াল টাউনটা রয়েছে, যার নাম কামতাপুর, সেখানে রঘুবন্তজির তিনটে রাইস মিল, একটা সুগার ফ্যাক্টরি আর একটা প্ল্যাস্টিকের কারখানা রয়েছে। ওখানে নয়া দোতলা বাড়ি বানিয়ে চম্পার থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন তিনি। পুরনো গাড়ির ভারি শখ চম্পার। তার

আবদার মেটাতে ভূ-ভারত টুঁড়ে টঁড়ে শেষ পর্যন্ত মাসুদ জানের এই গাড়িটার খোঁজ পেয়েছেন তিনি।

গণপতের কথা শেষ হতে না হতেই রঘুবন্ত সিং আরেকটু জুড়ে দেন। চম্পা হল খানদানী ঘরানার মেয়ে। তার মা হীরাবাঈ, দাদী পান্নাবাঈ, তার মা পিয়ারীবাঈ—সাতপুরুষ ধরে লখনৌয়ের বাঈমহল্লা এরা আলো করে ছিল। যা কিছু পুরনো, প্রাচীন, জমকালো এবং অভিজাত, সে সব তাদের পছন্দ। তা হীরের গয়নাই বল, কি কাশ্মীরের পশমিনা, কি জরির ফুল-বসানো বেনারসি শাড়ি বা সাবেক কালের চাঁদির ফরসি অথবা জাফরি আর জানালায় রঙিন কাচ-বসানো বাড়ি, ঝাড়লণ্ঠন, রুপোর কারুকার্যময় বাসন কিংবা গাড়ি। এমন বনেদি যার বংশলতিকা তার দু-একটা শখ না মেটাতে পারলে নিজের কাছেই ছোট হয়ে যেতে হয়।

রঘুবন্ত থামেননি, একনাগাড়ে বলে যান, 'মিঞা, আপনাকে গাড়ি নিয়ে কামতাপুরে চম্পার কোঠিতে গিয়ে থাকতে হবে। রোজ বিকেলে সে হাওয়া খেতে বেরোয়। যেখানে যেতে চায়, ঘুরিয়ে আনবেন।'

এতক্ষণ গাড়ির আলোচনায় এতটাই ডুবে ছিল মাসুদ জান যে খুব ভাল করে রঘুবন্তকে লক্ষ করেনি। মার্কামারা শরাবি আর লম্পটদের চেহারায় আলাদা রকমের একটা ছাপ থাকে। পঞ্চাশ বছর ধরে এই জাতীয় লোক ছাড়া সৎ, সাচ্চা, চরিত্রবান মানুষ খুব একটা দেখেনি সে। রঘুবন্ত যে পয়লা নম্বরের একটি লুচ্চা সেটা তার কথায় টের তো পাওয়া গিয়েছিলই, তার চোখেমুখেও লাম্পট্যের স্থায়ী মোহর দাগানো রয়েছে।

মনে মনে একটু হাসে মাসুদ জান। তার গাড়িতে চিরকাল বেশ্যা আর বাঈজীরাই চড়েছে। এই শেষ বয়সে রঘুবন্ত সিংয়ের 'রাখনি'ও চড়বে। নাঃ, পরম্পরা ঠিকই থাকছে।

মাসুদ জান বলে, 'জানি বেয়াদপি হয়ে যাচ্ছে। তবু জানতে ইচ্ছে করছে, আপনি কি কামতাপুরে থাকেন না?'

রঘুবন্ত বলেন, ' না, আমি পাটনায় বেশির ভাগ সময় থাকি। মাঝে মাঝে কামতাপুরে যাই।'

পয়সাওলা বড়লোকেরা নানা জায়গায় মেয়েমানুষ রাখে। রঘুবন্ত পাটনায় আরেকটি 'রাখনি' পোষেন কিনা সেটা জিজ্ঞেস করতে সাহস হয় না মাসুদ জানের।

রঘুবন্ত এবার বলেন, 'তা হলে বাত পাক্কা হয়ে গেল, আপনি কামতাপুরে আসছেন।'

মাসুদ জান ভাবে, গাড়িটা এখানে পড়ে পড়ে তো নষ্টই হয়ে যাচ্ছে। যতদিন সে বেঁচে আছে, প্রাণ ধরে এটা কিছুতেই হাতছাড়া করবে না। হঠাৎ ওপরওলার মেহেরবানিতে রঘুবন্ত সিংয়ের মতো রইস আদমি যেচে বাড়িতে চলে এসেছেন এবং তার শর্তে রাজি হয়ে গেছেন। শেষ বয়সে তার আর তার গাড়িটার মোটামুটি গতি হতে চলেছে। একটাই শুধু অক্ষেপ, পঞ্চাশ বছর যে শহরে কাটলো সেটা ছেড়ে চলে যেতে হবে।

হঠাৎ মাসুদ জানের মনে হল, সে আমলের গর্দানীবাঈ, জহুরাবাঈ কি হীরাবাঈরা

মানুষ হিসেবে ছিল চমৎকার। দরাজ দিলের অধিকারিণী এই সব আওরতেরা তার সঙ্গে আপনজনের মতো ব্যবহার করত। কেউ ডাকত ভাইসাব, কেউ বলত চাচা। আর দু'হাতে কত টাকা যে তাকে বখশিস দিয়েছে তার হিসেব নেই। কিন্তু একালের চম্পার রুচি কেমন, হালচাল কী ধরনের, সহবত জানে কিনা, বয়স্ক লোকেদের কতটা সম্মান দেয়—এসব কিছুই জানা নেই মাসুদ জানের। তার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া যদি সম্ভব না হয়? সেটা হবে খুবই মুশকিলের ব্যাপার।

মাসুদ জান স্থির করে ফেলে, কলকাতার সঙ্গে সম্পর্ক একেবারে চুকিয়ে দিয়ে সে কামতাপুরে চিরকালের মতো চলে যাবে না। কিছুদিন সেখানে গিয়ে থেকে দেখবে। তারপর যদি মন বসে যায় তখন দেখা যাবে।

রঘুবন্ত সিং বলেন, 'কী হল, চুপ করে আছেন যে? আপনার শর্ত তো আমি মেনেই নিয়েছি।'

মাসুদ জান বলে, 'ঠিক আছে বাবুসাব, আমি কামতাপুর যাব। কবে যেতে বলেন?'

'যত তাড়াতাড়ি হয়। আজ পারলে আজই চলে যান।'

'আজ হবে না। সাত রোজ পরে যাব।'

একটু চিন্তা করে রঘুবন্ত বলেন, 'আচ্ছা, তাই হবে। এবার বলুন গাড়ির দাম কী দিতে হবে?'

মাসুদ জান বলে, 'এখন আমি কিছুই নিচ্ছি না। আগে কামতাপুর যাই, তারপর এ নিয়ে কথা হবে।'

রঘুবন্ত চতুর লোক। সে বলে, 'সমঝ গিয়া। কালতাপুর গিয়ে শহর, সওয়ারনী পসন্দ হলে দাম ঠিক করবেন, তাই তো?'

মাসুদ জান হাসে, উত্তর দেয় না।

রঘুবন্ত বলেন, 'মঞ্জুর। যা চাইছেন, তাই হবে। এতদূর যাবেন, রাস্তার খরচ আছে। কিছু অ্যাডভান্স দিয়ে যাই?'

মাসুদ জান বলে, 'আপকা মেহেরবানি।'

রঘুবন্ত পকেট থেকে একতাড়া নোট বার করে গুনে গুনে দু'হাজার টাকা বাড়িয়ে দেন।

মাসুদ জান মাত্র তিনখানা একশ' টাকার নোট নিয়ে বাকিটা সবিনয়ে ফিরিয়ে দিতে দিতে বলে, 'অত দরকার হবে না।'

রঘুবন্ত এ নিয়ে আর একটি কথাও বলেন না। কামতাপুরে কিভাবে যেতে হবে, চম্পার বাড়িটা শহরের কোন মহল্লায়, সব জানিয়ে দিয়ে বলেন, 'আমি চম্পাকে খবর পাঠিয়ে দেব। আপনার কোনওরকম অসুবিধা হবে না।' বলতে বলতে উঠে পড়েন।

রঘুবন্ত এবং তাঁর মোসাহেবদের সঙ্গে রাস্তা পর্যন্ত চলে আসে মাসুদ জান। ওঁরা যতক্ষণ না গাড়িতে ওঠেন সে দাঁড়িয়ে থাকে।

দুই

ঠিক সাত দিন বাদে ধবধবে পাজামা-শেরওয়ানি পরে মাথায় নিখুঁত করে পাক দিয়ে দিয়ে পাগড়ি বেঁধে, একটা চামড়ার সুটকেশে কয়েকটা জামাটামা পুরে নিজের গাড়িটা

নিয়ে বেরিয়ে পড়ে মাসুদ জান। তার আগে ফজলুর হাতে ঘরের চাবি দিয়ে বলেছিল, সপ্তাহখানেকের জন্য সে বাইরে যাচ্ছে। ফজলু আর তার বিবি যেন তার ঘরের দিকে নজর রাখে।

খুব ভোরে, তখনও ভাল করে আলো ফোটেনি, কুয়াশায় চারিদিক ঝাপসা, রাস্তায় ক্বচিৎ দু-একটা গাড়ি বা মানুষ, দু'ধারের হিমে-ভেজা বাড়িঘর অস্পষ্ট ছবির মতো দাঁড়িয়ে—রওনা দিয়েছিল মাসুদ জান। যতই তোয়াজে রাখুক, এটা তো ঠিক, তার মোটরটার বয়স হয়েছে। ফলে স্পিড তোলার সঙ্গে সঙ্গে সেটার ইঞ্জিন থেকে জোরে শ্বাস টানার মতো সাঁই সাঁই আওয়াজ উঠে আসছিল। মাঝেমাঝেই গাড়ির পুরো বডিটা কেঁপে কেঁপে উঠছিল। নিশ্চয়ই কোথাও কোথাও পার্টস আলগা হয়ে গেছে। সেগুলো পালটানো দরকার।

গাড়িটার এতটুকু গোলমাল দেখা দিলে তটস্থ হয়ে ওঠে মাসুদ জান। সর্বক্ষণ তার একমাত্র চিন্তা, কী করে ওটাকে সতেজ, নিখুঁত আর টগবগে রাখা যায়। সে চায় গাড়িটার চাল হবে মসৃণ, রাস্তা দিয়ে রাজকীয় মহিমায় অন্য সব যানকে ম্লান করে ছুটে যাবে।

আজ কিন্তু গাড়িতে ওঠার পর থেকেই অন্যমনস্ক হয়ে আছে মাসুদ জান। শ্বাসকষ্টের মতো ইঞ্জিনের আওয়াজ বা ঢিলে হয়ে যাওয়া পার্টসের ঝকর ঝকর শব্দ তার কানে ঢুকছিল না। তার চোখের সামনে পঞ্চাশ বছর আগের টুকরো টুকরো দৃশ্য এবং কিছু মানুষজনের মুখ ফুটে উঠছিল।

তাদের বাড়ি ছিল ইলাহাবাদ থেকে পঁচিশ মাইল উত্তরে একটা গাঁওয়ে যার নাম আজমপুরা। ছেলেবেলায় আব্বাকে হারিয়েছিল সে। আম্মার যখন এন্তেকাল হল তখন তার বয়স বিশ। এক দূর সম্পর্কের চাচা কলকাতায় এক খাঁটি সাদা চামড়ার সাহেবের গাড়ি চালাত। সে-ই গাঁ থেকে মাসুদ জানকে পার্ক সার্কাসের ওই বাড়িটায় নিয়ে আসে। নিজের হাতে ছ'মাস তালিম দিয়ে তাকে ড্রাইভিংটা ভাল করে রপ্ত করিয়ে দেয়। সেটা ইংরেজি উনিশ শ চল্লিশ সাল। কলকাতা তখন খাস ব্রিটিশদের খাসতালুক। বিলেতে সেই সময় জোরদার লড়াই চলছে। তার আঁচ অল্প অল্প লাগতে শুরু করেছে এই শহরে।

তালিম দেওয়ার পর মাসুদ জানের চাচা তাকে এক জাঁদরেল সাহেবের কাছে লাগিয়ে দিয়েছিল। তাঁর নাম মিস্টার ব্রাউন। যে গাড়িটা চালিয়ে সে আজ কামতাপুর চলেছে, ব্রাউন সাহেব সেই চল্লিশ সালে ওটা কিনেছিলেন। এই গাড়িটা চালানোর জন্যই তাকে বহাল করা হয়েছিল। তারপর পঞ্চাশ বছর ধরে এটাই চালিয়ে আসছে সে। সেদিক থেকে মাসুদ জানকে একনিষ্ঠ বলা যায়। সারা জীবনে দ্বিতীয় কোনও গাড়ির স্টিয়ারিংয়ে তাকে হাত দিতে হয়নি।

ব্রাউন সাহেবের মতো দু'কান-কাটা বদমাস তামাম দুনিয়ায় খুব বেশি জন্মায়নি। তাঁর মেমসাহেব অর্থাৎ মিসেস ব্রাউন তখন বিলেতে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কী একটা গোলমাল চলছিল। ফলে মিসেস ব্রাউন দেশে চলে যান। সাহেবপাড়ার গুজব তিনি আর ইণ্ডিয়ায় ফিরে আসবেন না।

ব্রাউন সাহেব এমনিতে লোক খারাপ ছিলেন না। মাইনে ছাড়াও দেদার বখশিস

দিতেন। দিনের বেলাটা একরকম কেটে যেত কিন্তু সন্ধের পর তাঁর মাথায় লুচ্চামি ভর করত। প্রচুর মদ টেনে মাসুদ জানকে নিয়ে এই গাড়িটায় বেরিয়ে পড়তেন। ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের রেন্ডিখানা থেকে ডবকা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ছুকরি বা সোনাগাছি কি প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিটের বেশ্যাখানা ঢুঁড়ে উচক্কা বয়সের মেয়েমানুষ তুলে নিয়ে চলে যেতেন ময়দানে কি গঙ্গার ধারে। তখন কলকাতার রাস্তায় গ্যাসের বাতি জ্বলত। তার স্নিগ্ধ নরম আলোয় রাতের শহরটাকে খোয়াবের হুরীর মতো মনে হ'ত। তারই মধ্যে চলন্ত গাড়ির ব্যাকসিটে মাঝরাত পর্যন্ত নিজের জামাকাপড় খুলে এবং মেয়েমানুষগুলোকে উদোম করে, তাদের ধামসে, চটকে ব্রাউন সাহেব যে হুল্লোড় চালাত, এই সত্তর বছর বয়সেও সেসব ভাবলে কানের লতি গরম হয়ে ওঠে মাসুদ জানের। মনে আছে, পারতপক্ষে সে পেছন ফিরে তাকাত না ; ঘাড় টান টান করে সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে দম বন্ধ করে স্টিয়ারিংয়ে হাত রেখে বসে থাকত।

সেই আমলে কেল্লায় প্রতি ঘন্টায় ভোঁ দিয়ে সময় ঘোষণা করা হ'ত। বারোটা বাজলে ফেরার পালা। প্রথমে ব্রাউন সাহেবের লিটল রাসেল স্ট্রিটের বাড়িতে চলে আসত মাসুদ জান। রাত আটটা বাজলেই দু'টো বেয়ারা গেটের সামনে হামেহাল মজুদ থাকত। তারা ক্লান্ত, টলটলায়মান ব্রাউন সাহেবকে প্রায় চ্যাংদোলা করে বাড়ির ভেতর নিয়ে যেত। এরপর যেদিন যে মেয়েকে যেখান থেকে তোলা হ'ত সেখানে তাকে পৌঁছে দিত মাসুদ জান। সন্ধেয় যে মেয়েগুলো থাকত তাজা, টগবগে, মধ্যরাতে তাদের দিকে তাকানো যেত না। আঁচড়ানো, কামড়ানো, ক্ষতবিক্ষত মাংসের একেকটা পিণ্ড হতে উঠত তারা।

সবাইকে নামিয়ে পার্ক সার্কাসে ফিরতে ফিরতে রোজই একটা বেজে যেত। চাচা রমজান আলি স্নেহপ্রবণ, চমৎকার মানুষ। মাসুদ জান যতক্ষণ না ফিরত, সে অপেক্ষা করত। তারপর খেয়েদেয়ে পাশাপাশি দুই চারপায়ায় দু'জন শুয়ে পড়ত।

প্রথম প্রথম লজ্জায় ব্রাউন সাহেবের বেলেল্লা কাণ্ডকারখানার কথা রমজান আলিকে বলেনি মাসুদ জান। পরে অবশ্য যতটা সম্ভব রেখে ঢেকে জানিয়েছে।

সব শুনে রমজান আলি বলেছে, 'বেটা, পেটের জন্যে আমরা গাড়ি চালাই। ড্রাইভারদের মনিবের ব্যাপারে বহিরা (কালা) আর আন্ধা হতে হয়। গাড়ি চালানো ছাড়া অন্য কোনওদিকে তাকাবে না, পেছনের সিট থেকে যদি কোনও আওয়াজ আসে কানে তুলবে না।'

রমজান আলির প্রতি মাসুদ জানের আনুগত্যের তুলনা নেই। চোখ নামিয়ে সে বলেছে, 'জি—'

'কাজ করে মাসের শেষে তলব নেব—ব্যস। এছাড়া মনিবের সঙ্গে কিসের রিস্তেদারি? সে কী করল, না করল, সেদিকে আমাদের নজর দেবার দরকার নেই।'

'জি।'

যে দু'টো বছর মাসুদ জান ব্রাউন সাহেবের গাড়ি চালিয়েছে, সেই সময়টা সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত তার কাজ থাকত না। শুয়ে, বসে, ঘোর আলস্যে দিন কেটে যেত।

দু'বছর বাদে হঠাৎ ব্রাউন সাহেবকে বিলেতে চলে যেতে হল। যাওয়ার আগে গাড়িটা বেচে দিয়ে গেলেন বউবাজারের বিখ্যাত বাঈজী মোতিবাঈকে। ব্রাউন সাহেব

পয়লা নম্বরের লুচ্চা হলেও গান বাজনার সমঝদার ছিলেন ; বিশেষ করে গজলের। মাঝে মধ্যে মোতিবাঈয়ের এক বাবুর সঙ্গে তার জমকালো কোঠিতে গিয়ে গান শুনে আসতেন।

জীবনের প্রথম গাড়ি বলেই হয়তো ওটার ওপর ভীষণ মায়া পড়ে গিয়েছিল মাসুদ জানের। সে ব্রাউন সাহেবের কাছে আর্জি জানিয়েছিল, মোতিবাঈকে বলে তাকে ড্রাইভারের কাজটা যেন দেওয়া হয়। আর্জি মঞ্জুর হয়ে গিয়েছিল। তার দু'নম্বর মনিব মোতিবাঈয়ের মতো সুন্দরী জীবনে আগে আর কখনও দেখেনি মাসুদ জান। যেন বেহেস্তের কোনও হুরী। বয়স পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ ; তার চেয়ে কম করে তের চোদ্দ বছরের বড়।

মোতিবাঈয়ের সমস্ত শরীরটা যেন গোলাপের নির্যাস দিয়ে তৈরি। পদ্মের পাপড়ির মতো চোখের পাতাদুটো স্বপ্নের ঘোরে বুঝিবা সারাক্ষণ আধ-বোজা হয়ে আছে। নিখুঁত, ভরাট মুখ। দুই ভুরুর মাঝখান থেকে পাতলা ফুরফুরে নাক নেমে এসেছে। রক্তাভ ঠোঁট। ডান গালে ছোট একটি তিল মুখটাকে যেন অলৌকিক করে তুলেছে। নিভাঁজ, মসৃণ গলা। দাঁত যেন মোতির সারি। কোঁচকানো চুল কোমর ছাপিয়ে নেমে গেছে।

মোতিবাঈয়ের পরনে সবসময় থাকত রংবেরংয়ের রেশমি সালোয়ার কামিজ বা চুড়িদার। তার নাকছাবিতে, গলার চওড়া হারে বা ব্রেসলেট কি আংটিতে শুধু পান্না আর হীরের দ্যুতি। পোশাকেও থাকত দামি দামি পাথরের ঝলক। সারা গা থেকে ভুর ভুর করে উঠে আসত আতরের খুশবু।

ব্রাউন সাহেবের মতোই মোতিবাঈয়ের কাছে তার ডিউটি ছিল সন্ধের পর। সারাদিন পার্ক সার্কাসের বাড়িতে কাটিয়ে মোতিবাঈয়ের কোঠিতে চলে যেত সে। ব্রাউন সাহেবের আমলে যে ব্যবস্থা ছিল এবারও তার হেরফের হয়নি। ডিউটি শেষ হলে গাড়িটা নিয়ে মাসুদ জান পার্ক সার্কাসে চলে আসত। পরদিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত ওটা তার কাছেই থাকত।

ব্রাউন সাহেবের কাছে যখন মাসুদ জান ছিল, মোটামুটি পরিষ্কার পাজামা আর কুর্তা পরেই গাড়ি চালাত। কিন্তু মোতিবাঈয়ের নজর ছিল অনেক উঁচু। তার গাড়ি যেমন ঝকঝকে তকতকে থাকবে, তেমনি তার চালকের পোশাকও দামি এবং ফিটফাট হওয়া চাই। মাসুদ জানকে চার সেট ধবধবে শেরওয়ানি, কুঁচি-দেওয়া পাজামা আর পাগড়ি কিনে দিয়েছিল সে। প্রথম দিনই জানিয়ে দিয়েছে, রোজ পাটভাঙা পোশাক পরে আসতে হবে। আজকের পাজামা-টাজামা কাল পরলে চলবে না। এর জন্য ধোবিখানার সব খরচ মাইনে ছাড়াও আলাদা করে দেওয়া হবে। তাছাড়া দাড়ি-টাড়ি পরিষ্কার রাখা চাই। পাগড়ির ডান ধারে জাপানি পাখার মতো যে অংশটা উঁচু হয়ে থাকে তার কুঁচিতে যেন এতটুকু খুঁত চোখে না পড়ে। পায়ের জুতোদুটো রোজ পালিশ করে চকচকে রাখতে হবে।

মোতিবাঈয়ের গলার আওয়াজটা ছিল সেতারের বোলের মতো মিষ্টি, সতেজ আর সুরেলা। প্রথম দিন সে আরও বলেছিল, 'ভাইয়া মাসুদ জান, তোমাকে আরও দু-একটা কথা খেয়াল রাখতে হবে।'

মোতিবাঈয়ের রূপ ছিল আগুনের হলকার মতো, তার দিকে তাকিয়ে থাকলে চোখ ঝলসে যেত। মুখ নামিয়ে মাসুদ জান শুধু বলেছে, 'জি—'

মোতিবাঈ এবার বলেছে, 'রাত্রিবেলা, দশটার পর আমি আর আরেকজন তোমার গাড়ি চড়ে বেড়াতে বেরুব।'

'জি—'

'তুমি স্রেফ সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে।'

'জ়ি—'

'পিছনের সিট থেকে যদি কোনও আওয়াজ কানে যায় বিলকুল শুনবে না।'

অর্থাৎ চাচা রমজান আলি যে সব নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে সেগুলোই ফের শুনতে হয়েছিল। রমজান আলির মতো মোতিবাঈও বুঝিয়ে দিয়েছে, গাড়ির ব্যাক সিটের আরোহীদের সম্পর্কে তাকে কালা এবং অন্ধ হয়ে থাকতে হবে। মুখ আরও নিচু হয়ে গিয়েছিল মাসুদ জানের। আবছা গলায় এবারও সে বলেছে, 'জি—'

মনে আছে, মোতিবাঈয়ের একটি রইস বাবু ছিল। লোকটা বাঙালি, অঢেল টাকা তার। জোড়াবাগান না শোভাবাজার কোথায় যেন তাদের রাজমহলের মতো বিশাল বাড়ি। লোকটিকে দেখতেও রাজা-বাদশার মতো। নাম দর্পনারায়ণ মল্লিক। মোতিবাঈয়ের পাশে তাঁকে চমৎকার মানাত। এই দুনিয়ার ওপরওলা যেন একজনের জন্যে আরেকজনকে সৃষ্টি করেছেন।

মল্লিকবাবু আসতেন জুড়িগাড়ি হাঁকিয়ে ঠিক সূর্যাস্তের পর। তাঁর সিল্কের পাঞ্জাবি আর ধাক্কাপাড় কোঁচানো ধুতির ভাঁজ থেকে দামি বিলিতি সেন্টের যে গন্ধটা উঠে আসত আধ মাইল জুড়ে সেটা বাতাসকে মাতিয়ে রাখত। ব্রাউন সাহেবের মতো তিনিও প্রচুর মদ খেতেন, চোখদুটো সারাক্ষণ লালচে আর ঢুলুঢুলু, পা দুটো টলটলায়মান। ঠোঁটের কোণে শরাবীর হাসি। তবে এটা মানতেই হবে, মদ খেলেও ব্রাউন সাহেবের মতো তিনি উদ্দাম বেলেল্লাপনা কখনও করতেন না।

মোতিবাঈ থাকত দোতলায়। মল্লিকবাবু এসে জুড়িগাড়ি থেকে নেমে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে চোখের কোণ দিয়ে একবার মাসুদ জানের দিকে তাকাতেন। ততক্ষণে সে পার্ক সার্কাস থেকে বউবাজারে এসে শিরদাঁড়া টানটান করে বসে আছে। মাসুদ জান এর মধ্যে জেনে গেছে, মোতিবাঈয়ের হাত ঘুরে যে টাকাটা মাইনে হিসেবে সে পায় সেটা মল্লিকবাবুই দিয়ে থাকেন। এমনকি মোতিবাঈ যে গাড়িটা ব্রাউন সাহেবের কাছ থেকে কিনেছে তাও ওঁরই পয়সায়। কাজেই তাঁকে দেখলেই খাড়া উঠে দাঁড়িয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে সেলাম ঠুকত মাসুদ জান।

মনে আছে, মল্লিকবাবু আসার অনেক আগেই সালমা-চুমকি বসানো ঘাঘরা কি পেশোয়াজ পরে জড়োয়া গয়নায় গা মুড়ে, একেক দিন একেক ছাঁদের চুল বেঁধে তার পাশে সোনার কাঁটা আর টাটকা বেলফুলের মালা জড়িয়ে অপেক্ষা করত মোতিবাঈ।

মল্লিকবাবু এলে বেয়ারা বাবুর্চি বা ড্রাইভারদের পক্ষে দোতলায় যাওয়া ছিল পুরোপুরি নিষিদ্ধ। জাফরিওলা বারান্দা আর লাল-নীল কাচের বন্ধ জানালার ওধারে থেকে দু-এক টুকরো গজল বা ঠুমরির কলি চুঁইয়ে চুঁইয়ে বেরিয়ে আসত। মোতিবাঈয়ের যে কণ্ঠস্বরে সারাক্ষণ সেতারের বোল শোনা যেত, গান গাওয়ার সময়

সেটা আশ্চর্য মোহময় হয়ে উঠত।

সাড়ে আটটা, ন'টা পর্যন্ত গান বাজনার পর মোতিবাঈ মল্লিকবাবুকে নিয়ে মাসুদ জানের গাড়িতে উঠে বেড়াতে বেরুত। কোনওদিন তারা যেত কার্জন পার্কের দিকে, কোনওদিন ইডেন গার্ডেনে, কোনওদিন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পাশের রাস্তাগুলোতে।

ব্রাউন সাহেবের মতো বেহেড লুচ্চা ছিলেন না মল্লিকবাবু। কোনওদিন তাঁকে মাত্রাছাড়া হুল্লোড়বাজি করতে দেখেনি মাসুদ জান। ব্যাক সিটে পাশাপাশি ঘন হয়ে বসে ফিসফিস করে গল্প করতেন তাঁরা। মাঝেমাঝে হাসির দু-চারটে ঝলক, বা আস্তে আস্তে কোমল খাদে গলা নামিয়ে রেওয়াজি গলায় মাতিয়ে দেওয়া মোতিবাঈয়ের একটু-আধটু গান।

মোতিবাঈয়ের এক নৌকরের কাছে মাসুদ জান শুনেছিল, মল্লিকবাবুর বাড়িতে সুন্দরী স্ত্রী আছে। তবু বাঈজি না পুষলে নাকি বড়লোকি চাল বজায় থাকে না। সেকালের পয়সাওলা মানুষগুলোর এটাই ছিল রেওয়াজ।

তবে গাড়ি চালাতে চালাতে একটা ব্যাপার মাসুদ জানের কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল ; মোতিবাঈ আর মল্লিকবাবু পরস্পরকে ভালবাসেন। এই ভালবাসাটা পয়সা দিয়ে কেনাবেচার জিনিস নয়, একজনের প্রতি আরেক জনের টানটা যথেষ্ট আন্তরিক।

মোতিবাঈয়ের কাছে বছর চারেক ছিল মাসুদ জান। এই দিনগুলো তার জীবনে সবচেয়ে সুখের সময়। মোতিবাঈ আর মল্লিকবাবুর কাছ থেকে মাইনে ছাড়াও কত জিনিস যে পেয়েছে—দামি দামি পোশাক, গরম কোট, কাশ্মিরি শাল, আংটি, ঘড়ি—তার হিসেব নেই। এই চার বছরের মধ্যে শাদিও হয়েছিল তার। বিয়ের সময় তার বিবিকে হার-চুড়ি- আংটি, এমনি নানা জেবর দিয়ে মুড়ে দিয়েছিল মোতিবাঈ। তাছাড়া গণ্ডা গণ্ডা রেশমি সালোয়ার-কামিজ, সাজের নানা জিনিস থেকে শুরু করে ঘরকন্নার জন্য থালা-বাসন, চুলা-চাক্কি, সবই গাড়ি বোঝাই করে পাঠিয়ে দিয়েছে। শাদি করা মানে খরচ বেড়ে যাওয়া। সেদিকেও নজর ছিল মোতিবাঈয়ের ; মাসুদ জানের মাইনে দেড়গুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল সে।

কিন্তু চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে চারটে বছর যেন হুস করে মিলিয়ে গেছে। তারপরই অঘটনটা ঘটে। গেল প্রচুর মদ খাওয়ার কারণে লিভারটা পচতে শুরু করেছিল মল্লিকবাবুর। ডাক্তাররা বহুবার তাঁকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন ; মদ্যপান বন্ধ না করলে তিনি বাঁচবেন না। এই সব সতর্কবাণী তাঁর এক কান দিয়ে ঢুকে আরেক কান দিয়ে বেরিয়ে গেছে। ফলে যা হবার তাই হল ; হুইস্কিই তাঁকে শেষ করে ফেলল। ডাক্তাররা অনেক চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু মল্লিকবাবুকে বাঁচানো যায়নি। তাঁর মৃত্যুর পর একেবারে ভেঙে পড়েছিল মোতিবাঈ। তিনদিন বিছানা থেকে ওঠেনি সে, একটানা কেঁদেই গিয়েছিল।

বাঈজী হয়ে কেউ যে তার মৃত বাবুর জন্য শোকে এমন বিধ্বস্ত হতে পারে ; দুনিয়ায় আগে কখনও শোনা যায়নি। বউবাজারের অন্য বাঈজীরা থ হয়ে গেছে। গালে হাত দিয়ে ভেবেছে, দেখালে বটে মোতিবাঈ, এ যে শাদি-করা বিবিকেও হার মানিয়ে দিলে!

যাই হোক, মোতিবাঈ শেষ পর্যন্ত শোকটা সামলে উঠেছিল। এদিকে তার জীবনের শূন্য স্থানটা পূরণ করার জন্য কলকাতার বাবুদের লাইন লেগে গিয়েছিল। কেননা মোতিবাঈয়ের মতো বেহেস্তের হুরী আর তার মতো চমকদার গানের গলা বাঈজীপাড়ায় আর একটাও ছিল না। কিন্তু মল্লিকবাবুর এই শহরে মন টিকছিল না তার। এখনকার পাট চুকিয়ে দিয়ে একদিন লখনৌ চলে গিয়েছিল সে। যাওয়ার আগে নানা আসবাবের সঙ্গে গাড়িটাও বেচে দিয়েছিল।

এবার ওটার মালকিন হয়েছিল বাঈজী মহল্লার আরেক বাসিন্দা জহুরাবাঈ। গাড়িটা যে মাসুদ জানের এক টুকরো কলিজা সেটা মোতিবাঈ জানত। তাই জহুরাকে হাত ধরে অনুরোধ করেছিল, তাকে যেন ড্রাইভার হিসেবে রেখে দেয়।

বউবাজারে মোতিবাঈ যেখানে থাকত তার দু'খানা বাড়ির পর ছিল জহুরার বাড়ি। সে মাসুদ জানকে আগে থেকেই চিনত এবং তাকে শান্ত, ভদ্র, ভালমানুষ বলে জানত। মোতিবাঈয়ের অনুরোধ রেখেছিল জহুরা।

জহুরার বয়স তখন চল্লিশের ওপরে। একসময় যথেষ্ট সুন্দরী ছিল। কিন্তু পরে সারা শরীরে প্রচুর চর্বি জমিয়ে চেহারাটা বেঢপ করে তুলেছে। বিপুল পরিমাণে মদ্যপানের কারণে গলার স্বরটা হয়ে গিয়েছিল খসখসে। সে দারুণ বদমেজাজি ধরনের মেয়েমানুষ। পান থেকে চুন খসলে সবাইকে ধমকে, চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় তুলে ফেলত। চাকর-বাকর, বাবুর্চি থেকে শুরু করে যে তবলচি বা সারেঙ্গিওলা তার গানের সঙ্গে সঙ্গত করত, সবাই সর্বক্ষণ তার ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকত।

তবে এটা মানতেই হবে, মোতিবাঈয়ের চেয়ে এতটুকু খারাপ গাইত না জহুরা। বরং তার খসখসে গলায়, বিশেষ করে গজলটা যেন আরও বেশি করে খুলত। শুনলে মনে হ'ত, বুকের ভেতরটা আনচান করে উঠছে।

ব্রাউন সাহেব আর মোতিবাঈয়ের আমলে মাসুদ জানকে গাড়ি চালাতে হ'ত রাত্তিরে। জহুরার কাছে এসে তার ডিউটির সময়টা বদলে গিয়েছিল। তখন দুনিয়া জুড়ে তুমুল লড়াই চলছে। পুরোদমে তার ধাক্কা এসে লেগেছে কলকাতাতেও। আমেরিকান টমিতে সারা শহর বোঝাই। রাস্তায় রাস্তায় সারাক্ষণ মিলিটারি ট্রাক গাঁক গাঁক করে ছুটছে। প্রতিটি পার্কে আত্মরক্ষার জন্য ট্রেঞ্চ আর বড় বড় বাড়ির সামনে উঁচু উঁচু ব্যাফল ওয়াল। শহরটাকে ঘিরে কত যে আর্মি ব্যারাক তার লেখাজোখা নেই। সন্ধের পর রাস্তায় বেরুনো অসম্ভব ব্যাপার। তখন ব্ল্যাক-আউট চালু হয়েছে, কর্পোরেশন থেকে রাস্তার আলোগুলিতে ঠুলি পরিয়ে দিয়েছে। সেই তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ সালে কলকাতা যেন এক ভুতুড়ে শহর। তাছাড়া টমিরা সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে আকণ্ঠ মদ গিলে সারা কলকাতা তোলপাড় করে ফেলত। রাস্তায় মেয়েটেয়ে দেখলে, তা সে যে বয়সেরই হোক না, ট্রাক বা জিপে জোর করে তুলে নিয়ে উধাও হয়ে যেত। ফলে ভয়ে কোনও মেয়ে সন্ধের পর পারতপক্ষে বাইরে বেরুত না।

তাই হাওয়া খাওয়ার সময়টা পালটে নিয়েছিল জহুরাবাঈ। চেহারাটা যতই চর্বির ঢিবি হয়ে যাক না, তারও একজন বাবু ছিল। সব ডেকচিরই তো ঢাকনা থাকে। এই বাবুটি মারোয়াড়ি, যুদ্ধের বাজারে মিলিটারিতে নানারকম মাল সাপ্লাই দিয়ে লাখ লাখ টাকা কামিয়েছে। তার নাম লছিন্দর ঝুনঝুনওলা। বয়স পঞ্চাশ-বাহান্ন। জহুরা যদি

চর্বির ঢিবি হয়, লচ্ছিন্দর হল মেদের আস্ত একটি পাহাড়।

অঢেল পয়সা হলে যা হয়, একটি নামজাদা রক্ষিতা বা খানদানী বাঈজী না পুষলে জাতে ওঠা যায় না। তাই দালাল লাগিয়ে বউবাজারের গলিতে জহুরাকে খুঁজে বার করেছিল সে। ব্রাউন সাহেব ছিলেন পয়লা নম্বরের লম্পট কিন্তু লুচ্চামিতে লচ্ছিন্দর তাঁর নাক এবং কান কেটে নিতে পারত। লোকটা মদ মাংস ডিম বা মাছ কিছুই খেত না। একেবারে ঘোর নিরামিষাশী। তাছাড়া পান বিড়ি সিগারেটও ছিল তার কাছে অস্পৃশ্য। যার মধ্যে আমিষ বা নেশার জিনিস এক রত্তিও ঢোকেনি, তেমন একটি পবিত্র শরীর নিয়ে যখন সে বাঈজীপাড়ায় আসত তখন লচ্ছিন্দর একেবারে আলাদা মানুষ। ভরদুপুরে জহুরাকে গাড়িতে তুলে বেরিয়ে পড়ত। যে যে দিকে মিলিটারিদের চলাচল কম, মাসুদ জানকে হুকুম দিতে সেই সেই সব জায়গায় নিয়ে যেতে। সামনের দিকে চোখ রেখেও টের পেত ব্যাক সিটে দু'হাতে মাঝবয়সী জহুরার শরীরটা সমানে খোবলাচ্ছে লচ্ছিন্দর। তাছাড়া জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলার সঙ্গে সঙ্গে আরও যেসব আওয়াজ ভেসে আসত তাতে মাথা ঝিম ঝিম করতে থাকত মাসুদ জানের।

ব্রাউন সাহেব মেয়েমানুষ নিয়ে যা করত সবই রাতের অন্ধকারে। কিন্তু লচ্ছিন্দর প্রকাশ্য দিবালোকে লুচ্চামির চূড়ান্ত করে ছাড়ত। লোকটা কথা বলত খুব কম। তার দুই হাত আর শরীরই যা করার করত। সারা দুপুর ফুর্তি লুটে বিকেলে তাকে গঙ্গার ঘাটে নামিয়ে দিতে হ'ত। সেখানে জামাকাপড়-সুদ্ধু গোটাকতক ডুব দিয়ে, গা থেকে সব পাপ মুছে, নিজেকে আগাগোড়া শুদ্ধ করে ফিরে যেত তার জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। পরের দিন, তার পরের দিন, তারও পরের দিন, নিয়মিত রোজই এক ঘটনা ঘটে যেত।

বছর ছয় সাতেক জহুরাবাঈদের কাছে ছিল মাসুদ জান। তারপর বাঈজী সম্পর্কে অরুচি ধরে গেল লচ্ছিন্দরের। এতকাল আমোদ-ফুর্তি করে ইহকালের সেবা করেছে, এবার পরকালের দিকে নজর দিল সে। ব্যবসা-ট্যবসার ফাঁকে সময় পেলেই হরিদ্বার, দ্বারকা, পুরী কি রামেশ্বরে নিজের বিয়ে-করা স্ত্রীকে নিয়ে ছুটত। উত্তরকাশীতে এক বড় যোগীর কাছে মন্ত্র নিয়েছিল। বছরে বার চারেক তার কাছে না গেলেই নয়।

এদিকে দেশে আজাদি এসে গেছে। জহুরাবাঈয়ের বয়সও হয়ে গিয়েছিল যথেষ্ট। লচ্ছিন্দর ধর্মকর্মে মন দেওয়ার পর রোজগার বন্ধ হল তার। পঞ্চাশ বছরের বাঈজী, যার চুল আধাআধি পেকে গেছে, শরীরে যৌবনের ছিটেফোঁটাও আর অবশিষ্ট নেই, এই বয়সে তাকে কে পুষবে? ফলে খরচ কমানো দরকার। জমানো যে টাকা ক'টা আছে তাই দিয়ে বাকি জীবনটা তো কাটাতে হবে।

জহুরা তার গাড়িটা একটা যুবতী বাঈজীর কাছে বেচে দিল এই শর্তে, মাসুদ জানকে ড্রাইভার হিসেবে রাখতে হবে। শর্তটা অবশ্য আগের দু'বারের মতো তার আর্জিতেই করা হয়েছিল।

মাসুদ জানের তিন নম্বর মালকিন হল চামেলি বাঈ। তার পয়সার লালচ ছিল মারাত্মক। একটা নয়, দু দু'টো বাবু ছিল তার। এটা কোনও ঢাক ঢাক গুড় গুড় ব্যাপার নয়। দুই বাবুকেই সে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিল ; একজনের টাকায় তার পোষাবে না। যদি এতে কারও আপত্তি থাকে অন্য বাঈজীর কাছে যেতে পারে। চামেলি বাঈয়ের

একনিষ্ঠতা নিয়ে ওদের শুচিবাই ছিল না। দু'জনেই তার প্রস্তাব মেনে নিয়েছিল।

চামেলি বাঈয়ের এক বাবু আসত দুপুরের দিকে। খানিকটা সময় বাড়ির ভেতর কাটিয়ে তাকে নিয়ে মাসুদ জানের গাড়িতে বেরিয়ে পড়ত সে। বিকেল পর্যন্ত বেড়িয়ে সূর্যাস্তের আগে আগে ফিরে আসত। সন্ধের পর আসত তার দু'নম্বর বাবু। দু-চারটে গান শুনে সে-ও মাসুদ জানের গাড়িতে তাকে নিয়ে বেড়াতে বেরুত। ফিরতে ফিরতে মাঝরাত। দুপুর থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত প্রায় একটানা গাড়ি চালিয়ে একেক দিন প্রাণ একেবারে লবেজান হয়ে যেত তার।

তবে একটা কথা মানতেই হবে, যে সব বাঈজীর কাছে সে কাজ করেছে তাদের দিল ছিল দরাজ, হাত ছিল মুক্ত। জহুরা বাঈয়ের কাছে যে তলব সে পেত তা দ্বিগুণ করে দিয়েছিল চামেলি।

চামেলি বাঈয়ের কাছে নৌকরি করার সময় তার বিবি আর বাচ্চারা মারা যায়। পর পর এতগুলো শোকে ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল মাসুদ জান। যতদিন সে চাকরি করেছে সেই একবারই আপনজনদের মৃত্যুশোক কাটিয়ে উঠতে মাস দেড়েকের ছুটি নিয়েছিল। তারপর সামলে উঠে ফের গাড়ি চালানো শুরু করে।

চামেলি বাঈদের কাছেও বেশিদিন থাকা হয়নি। বড় জোর বছর তিনেক। তার দুই বাবুর কারোরই বড় বড় ঢাউস হেডলাইটওলা, বিউগল শেপের হর্নলাগানো আদ্যিকালের মোটর আদৌ পছন্দ নয়। ততদিনে নতুন নতুন মডেলের ঝকঝকে সব গাড়ি বাজারে এসে গেছে। তেমন গাড়িতে চড়ার শখ চামেলিবাঈয়েরও। সে ঠিক করে ফেলেছিল, পুরনো মোটরটা বেচে দেবে। দু-চারজন খদ্দেরের আনাগোনাও শুরু হয়েছিল। তাদের কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছিল গাড়িটাই শুধু কিনবে, ড্রাইভারের দরকার নেই। চালাবার লোক ওদের আছে। মাসুদ জান ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। শুরু থেকেই গাড়িটা চালিয়ে আসছে সে। এটার ওপর মায়া পড়ে যাওয়া ছাড়াও হঠাৎ অন্যের হাতে ওটা চলে গেলে চাকরির জন্য এই বয়সে কার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে? ব্রাউন সাহেবকে বাদ দিলে পার্ক সার্কাসের ওই বাড়ি আর বউবাজারের বাঈজীপাড়ার বাইরে আর কাউকেই সে চিনত না।

ঘোর উৎকণ্ঠায় যখন দিন কাটছে সেইসময় চামেলি বাঈয়ের কাছে গিয়ে সেলাম করে খুবই বিনীতভাবে মাসুদ জান বলেছে, 'মালকিন, আমার একটা কথা আছে।'

চামেলি জিজ্ঞেস করেছে, 'কী কথা?'

'গাড়িটা তো আপনি বেচে দিচ্ছেন। আমাকে যদি দেন—'

'তুমি কিনবে?'

'জি—'

রীতিমত অবাকই হয়ে গিয়েছিল চামেলিবাঈ। জানতে চেয়েছে, 'কিনবে যে, দাম দেবে কী করে?'

মাসুদ জান জানিয়েছিল, এতদিন নানা জনের কাছে নৌকরি করে যে তলব পেয়েছে তার থেকে কিছু কিছু করে বাঁচিয়ে আট হাজার টাকা জমিয়েছে। কিছু ঘড়ি আংটি বখশিসও পেয়েছিল। তাছাড়া মৃত বিবির জেবরও আছে। সেসব বেচে দিলে আরও দু-আড়াই হাজার পাওয়া যাবে।

সমস্ত শুনে চামেলি বাঈ বলেছে, 'মতলব, তুমি দশ সাড়ে দশ হাজার দিতে পার।'

'জি—'

'পুরা টাকাটা দিলে তোমার হাতে তো কিছুই থাকবে না।'

এ কথার কী আর উত্তরর দেবে মাসুদ জান? সে চুপ করে থেকেছে।

একটু চিন্তা করে চামেলি বাঈ এবার বলেছে, 'একজন গাড়িটার দাম দিতে চেয়েছে সাত হাজার, একজন সাড়ে সাত হাজার। আমি জানি ওটার ওপর তোমার মায়া পড়ে গেছে। তুমি আমাকে তিন হাজারই দিও। বাকি টাকাটা হাতে রাখবে।'

কৃতজ্ঞতায়, খুশিতে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল মাসুদ জান। অনেকক্ষণ কথা বলতে পারেনি সে। যে আওরত গলার স্বর আর শরীর বেচে পয়সা কামায় তার ভেতর এত বড় একটা দিল যে থাকতে পারে তা কোনওদিন ভাবতে পারেনি। একসময় মাসুদ জান টের পায় তার দু চোখে জলে ভরে গেছে। কপালে আদাবের ভঙ্গিতে হাত ঠেকিয়ে বলেছে, 'মালকিন, আপনার মেহেরবানি সারা জিন্দগীতে ভুলব না। লেকেন—'

'লেকেন কী?'

'তিন হাজার দিলে আপনার বহুত নুকসান হয়ে যাবে। আমি আপনাকে চার হাজার দেব। জেবরগুলো আমার বিবির ইয়াদগার। আপনার মেহেরবানিতে ওগুলো আমার কাছে থেকে যাবে। তা ছাড়া আট হাজারের চার হাজার গেলে আরও চার হাজার থাকবে।'

চামেলিবাঈ হেসে বলেছে, 'ঠিক হ্যায়।'

'আপনার যদি কখনও এই গাড়িটা চড়তে ইচ্ছে হয়, হুকুম করবেন। আমি গাড়ি নিয়ে হাজির হয়ে যাব।'

'শুনে খুব খুশি হলাম। তেমন মর্জি যদি সত্যিই হয়, তোমাকে খবর দেব।'

'আদাব—'

'আদাব।'

চামেলিবাঈয়ের করুণায় গাড়িটার মালিকানা শেষ পর্যন্ত তারই হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই পুরনো মোটর চড়ার লোক তেমন পাওয়া যাচ্ছিল না। বউবাজারের আধবুড়ো বাঈজীরা মাঝে মাঝে তার গাড়িটা ভাড়া করে তাদের বাবুদের নিয়ে চড়েছে। মাঝেমধ্যে শখ হলে ছুকরি বাঈজীরাও তাকে ডেকে পাঠাত। সব মিলিয়ে মাসে দশ পনেরো দিনের মতো ভাড়া খাটত গাড়িটা। একা মানুষের পক্ষে তাতেই ভালভাবে চলে যেত। কিন্তু যত দিন যাচ্ছিল ওটার চাহিদা ক্রমশ কমে আসছিল।

গাড়িটা মাসুদ জানের দিলের বা জানের টুকরা হতে পারে, কিন্তু শুরু থেকে দুশ্চরিত্র শরাবী লুচ্চা আর বেশ্যা-বাঈজী ছাড়া ওটায় একবার উঠেছিল তিন ডাকু। ডাকাতি করে পালানোর সময় পুলিশের তাড়া খেয়ে তার গাড়িতে জোর করে উঠে পড়েছিল তারা এবং গলায় ছোরা ঠেকিয়ে বরানগরের ওধারে একটা গলির মুখে ওদের ছেড়ে আসতে বাধ্য করেছিল। এই নিয়ে মাসুদ জানের ওপর দিয়ে পুলিশের হুজ্জুত কম যায়নি। নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে তার জান বেরিয়ে যাবার যোগাড় হয়েছিল।

যে সব বাঈজী তার গাড়ি চড়েছে তাদের মধ্যে মোতিবাঈ আর জহুরাবাঈ ছিল

সত্যিকারের কলাকার। পয়সার জন্য শরীর বেচলেও গান ছিল তাদের পয়লা পেয়ার। রোজ ভোরে উঠে তবলচি আর সারেঙ্গিওলাদের নিয়ে ঘন্টা তিন চারেক রেওয়াজ করত। তাদের যারা বাবু ছিল তারা গানবাজনার সমঝদার। কিন্তু পরে যে বাঈজীরা তার গাড়ির সাওয়ার হয়েছে তারা স্রেফ ভাদ্রমাসের কুত্তী। তারা বাঈজী হওয়ার মতো কাবিল নয়। শরীর ছাড়া ওরা আর কিছু বুঝত না। ওদের চাই টাকা, অঢেল অপর্যাপ্ত টাকা। আর সেটা স্রেফ শরীর ভাঙিয়ে। গানের চর্চা যে তারা করত না তা নয়। সেসব সস্তা চটকদার সিনেমার গান। কালোয়াতি বা ওস্তাদি গানের ধারে কাছে তারা ঘেঁষত না।

মাসুদ জানের চাপা একটা আপসোস আছে। গাড়িটা তার জানের টুকরা হলেও ওটায় কোনও ভাল, সৎ, পবিত্র মানুষ কখনও চড়েনি।

এই যে জীবনের সত্তরটা বছর কাটিয়ে, চুলদাড়ি যখন ধবধবে সাদা আর ঢিলে চামড়ায় লক্ষকোটি ভাঁজ, কলকাতা ছেড়ে সে কামতাপুরে চলেছে ; সেখানেও তার গাড়িতে চড়বে রঘুবন্ত সিংয়ের রক্ষিতা চম্পা। তার নসিবই এই ; সৎ ভালমানুষকে এ জীবনে সওয়ার হিসেবে আর পাওয়া গেল না।

সময়ের উজান টানে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগের সেই দিনগুলোতে ফিরে গিয়েছিল মাসুদ জান। হঠাৎ তার খেয়াল হল, কলকাতা থেকে অনেক দূরে ন্যাশনাল হাইওয়েতে চলে এসেছে।

পার্ক সার্কাস থেকে যখন সে বেরিয়েছিল গোটা শহর সারা গায়ে হেমন্তের ঘন কুয়াশা জড়িয়ে ঘুমিয়ে আছে। এখন কুয়াশার চিহ্নমাত্র নেই। সূর্য সোজা মাথার ওপর উঠে এসেছে।

হাইওয়ের দু'ধারে অবারিত ফসলের খেত। যতদূর চোখ যায়, সেই দিগন্ত পর্যন্ত পাকা ধানের সোনালি লাবণ্যে ছেয়ে আছে। আর কয়েক দিনের মধ্যেই ফসল কাটা শুরু হয়ে যাবে।

ধানবনে ঢেউ তুলে উলটো পালটা বয়ে যাচ্ছে উত্তুরে হাওয়া। সমস্ত চরাচর জুড়ে নুয়ে-পড়া পাকা ধানের আওয়াজ উঠছে—ঝুন ঝুন। মাথার ওপর উড়ছে ঝাঁকে ঝাঁকে ভিনদেশি টিয়া। ধান পাকার খবর পেয়ে তারা আকাশ পাড়ি দিয়ে এখানে চলে এসেছে।

এই ভরদুপুরেও রোদের তাত তেমন নয়। উত্তুরে বাতাসে যে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আমেজটুকু এখনও রয়েছে তা বড়ই আরামের।

স্মৃতির ভেতর থেকে উঠে এসে একবার চারপাশে তাকায় মাসুদ জান। লম্বা হাইওয়েটা মোটামুটি ফাঁকাই। মাঝে মাঝে উলটো দিক থেকে গাঁক গাঁক করে লরির কনভয় পাশ দিয়ে কলকাতার দিকে চলে যাচ্ছে।

এতক্ষণে তার খেয়াল হল, ভীষণ খিদে পেয়েছে। ভোরে নিজের হাতে চা বানিয়ে খেয়েছিল ; সেই সঙ্গে দু'খানা বাসি রুটি। তাছাড়া এতটা বেলা পর্যন্ত পেটে আর কিছু পড়েনি।

হাইওয়ের ধারে ধারে পাঞ্জাবিদের যে অনেক ধাবা আছে, মাসুদ জান তা জানে।

আরও ঘন্টাখানেক পর একটা ধাবা পাওয়া গেল। সেখানে গাড়ি থামিয়ে, হাত-মুখ ভাল করে ধুয়ে, পেট ভরে রুটি-তড়কা আর বড় এক গেলাস লস্যি খেয়ে আবার চলার শুরু।

বিকেলের কিছু আগে আগেই পশ্চিম বাংলার বর্ডার পেরিয়ে বিহারে পৌঁছে গেল গাড়িটা। কিভাবে, কোন রাস্তা ধরে বর্ডার থেকে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি কামতাপুরে যাওয়া যাবে তার পরিষ্কার একটা ছক বুঝিয়ে দিয়েছিলেন রঘুবন্ত সিং। সেইমতো হাইওয়ে থেকে বাঁ দিকের পথটা ধরল মাসুদ জান।

মাইল তিরিশেক চলার পর সূর্য যখন পশ্চিম আকাশের অনেকটা পাড়ি দিয়ে দিগন্ত ছুঁতে চলেছে, রোদের রং যখন বাসি হলুদের মতো ম্যাড়মেড়ে সেই সময় দেখা গেল ডান দিকের মাঠ ভেঙে দু'টো লোক মাথার ওপর হাত তুলে নাড়তে নাড়তে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে। তারা সমানে চিৎকার করছিল, 'মোটর রুখিয়ে, মোটর রুখিয়ে—'

প্রথমটা ভীষণ চমকে উঠেছিল মাসুদ জান। এখানে চারিদিক সুনসান। হাইওয়ের ফ্যাকড়া এই রাস্তাটার দু'ধারে পশ্চিম বাংলার মতো পাকা ধানের খেত। অনেক দূরে দূরে আবছা দু-একটা গাঁ। মানুষজন কেউ কোথাও নেই। তবে প্রচুর পাখি উড়ছে আকাশ জুড়ে। এর মধ্যে ওই লোকদুটো মাটি ফুঁড়ে কোত্থেকে যে বেরিয়ে এল, কে জানে। ওদের কোনও রকম বদ মতলব আছে কিনা তাও বোঝা যাচ্ছে না।

একটু দুশ্চিন্তা যেমন হচ্ছিল, তেমনি তার পাশাপাশি কিছুটা কৌতূহলও বোধ করছিল মাসুদ জান। শেষ পর্যন্ত ভাবল, দেখাই যাক না, লোকদুটো তার কাছে কী চায়। গাড়ির গতি খানিকটা কমিয়ে দিল সে। তেমন বুঝলে ফের স্পিড বাড়িয়ে দেবে।

চার-পাঁচ মিনিটের মধ্যে লোকদুটো ধানখেত পেরিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে গাড়িটার পাশে চলে আসে। কাছাকাছি আসতে দেখা যায় দু'জনেই দেহাতি মানুষ, বয়স ষাটের ওপরে। একজনের পরনে খাটো ধুতি আর হাফ-হাতা জামা। আরেক জনের ধুতির ওপর মোটা কাপড়ের পাঞ্জাবি। তাদের জামা-কাপড় ছিঁড়ে ফর্দাফাঁই, সারা গা রক্তে মাখামাখি। একজনের মাথা ফেটে অনেকটা জায়গা হাঁ হয়ে আছে। আরেক জনের কপাল ঢিবির মতো ফুলে রয়েছে আর থুতনির মাংস ডেলা পাকিয়ে ঝুলে পড়েছে। সেখান থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত গড়িয়ে আসছে। শুধু মুখ এবং মাথাই নয়, ভাল করে লক্ষ করতে মাসুদ জানের চোখে পড়ল, তাদের হাতে, পায়ের গোছে এবং কাঁধে অগুনতি চোটের দাগ। দু'জনেরই চোখেমুখে আতঙ্কের চিহ্ন। বোঝা যায়, লাঠি বা অন্য কোনও ভারী ভোঁতা হাতিয়ার দিয়ে লোকদুটোকে এলোপাথাড়ি পেটানো হয়েছে।

এই বয়সের দুটো মানুষকে এমন মারাত্মকভাবে কেউ মারতে পারে তা যেন ভাবা যায় না। অসীম উৎকণ্ঠায় মাসুদ জান জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছে তোমাদের? এভাবে জখম হলে কী করে?'

দুটো লোকের মধ্যে একজন বেশ ঢ্যাঙা আর রোগা। আরেক জনের গোলগাল, ভারী চেহারা। ঢ্যাঙা লোকটা হাতজোড় করে বলে, 'মিঞা সাব, আমাদের জন্যে চিন্তা করবেন না। চারগো বদনসিব লড়কীকো কিরপা করকে বঁচাইয়ে।'

এবার গাড়িটা পুরোপুরি থামিয়ে দেয় মাসুদ জান। রক্তাক্ত, ভয়ঙ্করভাবে জখম লোকদুটো নিজেদের কথা বলছে না ; চারটি মেয়েকে বাঁচানোর জন্য ব্যাকুলভাবে শুধু আর্জি জানাচ্ছে। জীবনে ওদের এই প্রথম দেখল সে। ওরা কোথায় থাকে, কী করে, পরিচয়ই বা কী, কিছুই জানা নেই। তার ওপর যে চারটে মেয়েকে বাঁচানোর জন্য ছুটে এসেছে তাদের তো চোখেই দেখেনি।

মাসুদ জান বিমূঢ়ের মতো একের পর এক প্রশ্ন করে যায়, 'যে লেড়কীদের কথা বলছ তারা কারা? ওদের বাঁচাতে হবে কেন? কোনও বিপদে পড়েছে কী?'

'হাঁ, বহুৎ ভারী খতরা। আমাদের সঙ্গে এখনই চলুন। নইলে ভুচ্চরের ছৌয়া জগনলাল ওদের তুলে নিয়ে যাবে।' তুলনায় খাটো চোহারার লোকটা মাসুদ জানের একটা হাত চেপে ধরে।

প্রথমে অচেনা দু'টো লোক, তারপর অদেখা চারটে মেয়ে, এখন তার ওপর কে এক ভুচ্চরের বাচ্চা জগনলাল এসে গেল! মাথার ভেতর সব গুলিয়ে যায় মাসুদ জানের। সে বলে, 'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

লোকদু'টো শ্বাসরুদ্ধ মতো একসঙ্গে বলে ওঠে, 'আমাদের গাঁওয়ে চলুন। নিজের চোখেই সব দেখতে পাবেন। চলিয়ে, তুরন্ত চলিয়ে—'

লোকদু'টোর তীব্র আকুলতা মাসুদ জানকে ভেতরে ভেতরে এবার নাড়া দিয়ে যায়। তার ওপর কৌতূহলটা তো ছিলই। ওদেব কথা থেকে যেটুকু আঁচ পাওয়া গেছে তাতে মনে হচ্ছে ওদের সঙ্গে গেলে বিপদের ঝুঁকি আছে। তবু অদৃশ্য কেউ যেন জানিয়ে দিল, এই বয়স্ক গাঁওবালা দু'টোর সঙ্গে যাওয়াটা খুবই জরুরি। মাসুদ জান জিজ্ঞেস করে, 'তোমাদের গাও কোথায়?'

ঢ্যাঙা লোকটা ঘুরে দাঁড়িয়ে ধানখেত যেখানে শেষ হয়েছে সেদিকে আঙুল বাড়িয়ে বলে, 'উঁহা—'

অবাক হয়ে মাসুদ জান বলে, 'এই ধান জমিনের ওপর দিয়ে ওখানে যাব কী করে?'

ঢ্যাঙা লোকটা জানায় রাস্তা ধরে সামনের দিকে খানিকটা গেলে ডান ধারে একটা কাঁচা মেঠো পথ অর্থাৎ 'কাচ্চী' পাওয়া যাবে। ওটা দিয়ে মোটরে করে তাদের গাঁয়ে পৌঁছুতে দশ মিনিটও লাগবে না।

'লেকেন—'

'কী?'

'তোমাদের যা হাল, যেভাবে খুন ঝরছে তাতে এখনই হাসপাতালে যাওয়া দরকার।'

'আমাদের কথা পরে ভাবব, আগে লেড়কী চারটে তো বাঁচুক।'

এত করে বলা সত্ত্বেও মাসুদ জানের সংশয়টা যে পুরোপুরি কেটেছে তা বলা যায় না। তবু একটু দ্বিধান্বিতভাবে সে বলে, 'ঠিক হ্যায়, আমার গাড়িতে উঠে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল।' বলে পেছন দিকের দরজাটা খুলে দেয়।

লোকদু'টো খানিক ইতস্তত করে বলে, 'আমাদের খুন লেগে যাবে আপনার গাড়িতে—'

'তোমরাই তো বললে লেড়কীগুলোকে বাঁচাতে হবে। লাগুক খুন, উঠে পড়।'

লোকদু'টো বুঝিবা আগে কখনও মোটরে চড়েনি। তারা উঠে ব্যাক সিটে জড়সড় হয়ে বসে থাকে। মাসুদ জান গাড়িতে ফের স্টার্ট দেয়। অজানা এক গ্রামের দিকে যেতে যেতে প্রশ্ন করে করে ওদের কাছ থেকে যা জানা যায় তা এইরকম। যে মাথায় বেশি লম্বা তার নাম ধনপত, অন্যজন হল গণেরি। তাদের গাঁয়ের নাম মনচনিয়া। পাশাপাশি তাদের বাড়ি। দু'জনেরই কয়েক বিঘা করে জমিজমা আছে। সেখান থেকে বছরে দু'বার যে ফসল ওঠে তাতে মোটামুটি চলে যায়। বংশ পরম্পরায় ধনপত আর গণেরি চাষবাস নিয়েই আছে। তারা লেখাপড়া জানে না, বিলকুল আনপড়।

ধনপতের দুই মেয়ে, দু'টিরই বিয়ে হয়ে গেছে। এক মেয়ে থাকে ঝরিয়ায়, অন্যটি হাজারিবাগে। গণেরির একটাই ছেলে। শখ করে তাকে তিন মাইল দূরের স্কুলে পাঠিয়েছিল। ম্যাট্রিক পাস করার পর সে স্রেফ জানিয়ে দিয়েছে, জমি চষার মতো ছোট কাজ করবে না। আজকাল পিছড়ে বর্গের অর্থাৎ পিছিয়ে-থাকা মানুষদের জন্য অনেক চাকরি-বাকরির ব্যবস্থা আছে। সরকারি বিজলি কোম্পানিতে একটা কাজ জুটিয়ে সে বৈশালী চলে গেছে। সেখানে নিজের পছন্দমতো বিয়ে করেছে, বাপের সঙ্গে সম্পর্ক নেই বললেই চলে। গণেরির ঘরবালী মারা গেছে বছর সাতেক আগে। দুনিয়ায় সে একেবারে একা। ধনপতের ঘরবালী অবশ্য এখনও জীবিত ; তবে বাত এবং অন্য সব রোগে একেবারে অথর্ব হয়ে পড়েছে।

আজন্ম তারা পড়শিই শুধু নয়, ঘনিষ্ঠ বন্ধুও। সারাদিন দু'জনে নিজেদের জমিতে বা বাড়িতে কাজ করে। সন্ধের পর গাঁয়ের পণ্ডিত এবং পুরোহিত ব্রাহ্মণ ঝমনলাল ঝা'র বাড়িতে তুলসীদাসী রামায়ণ পাঠের যে জমায়েত হয় সেখানে গিয়ে মাঝরাত পর্যন্ত পাঠ শোনে। মোটামুটি এই হল তাদের দৈনন্দিন কাজকর্মের তালিকা। এর মধ্যে বড় রকমের কোনও চমক ও চোখধাঁধানো ঘটনার সুযোগ নেই। বছরের পর বছর এইভাবে, খুবই ঢিমে তালে সময় কেটে যাচ্ছে।

কিন্তু আজ সকালে যা ঘটল, তাদের যাট-বাষট্টি বছরের জীবনে কোনওদিন ওরা তা চিন্তাও করতে পারেনি। ব্যাপারটা যতটা চমকদার, তার চেয়ে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর।

তাদের গাঁ থেকে তিন-চার মাইল দূরে বড় একটা গঞ্জ রয়েছে ; নাম ভোগবানি। তার পাশ দিয়ে বয়ে গেছে বরখা নদী। গঞ্জটাকে ঘিরে মাঝারি মাপের জমজমাট একটা টাউন গড়ে উঠেছে। ভোগবানির একধারে প্রচুর বাড়িঘর নিয়ে শহর ; আরেক দিকে নদীর পাড় ঘেঁষে ধান চাল গেঁহুর সারি সারি আড়ত। এখানেই অনেকটা ফাঁকা জায়গা জুড়ে সপ্তাহে একদিন বিরাট হাট বসে। চলে সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত একটানা।

ফি হাটবারেই ধনপত আর গণেরি ভোগবানিতে কেনাকাটা করতে যায়। আজও ভোর হতে না হতেই বেরিয়ে পড়েছিল। ওরা যখন হাটের কাছাকাছি চলে এসেছে সেই সময় রোদ উঠে গেছে। তবে তখনও তেমন লোকজন আসেনি ; সেভাবে বিকিকিনিও শুরু হয়নি।

হাটের মূল জায়গা থেকে বেশ কিছুটা দূরে একটা বহুকালের পুরনো গুদাম টুটোফাটা টিনের চাল মাথায় নিয়ে কোনও রকমে দাঁড়িয়ে আছে। এক কালে ওটা ছিল এক মারোয়াড়ীর। সে মারা গেলে বহুকাল ফাঁকা পড়ে থাকার পর কিছুদিন হল

জগনলাল ওটার দখল নিয়ে নেয়।

জগনলাল এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় বন্দুকবাজ। তার অনেক সাকরেদ। এরা মোটা টাকা নিয়ে মানুষ খুন করে। চুনাওয়ের সময় নেতাদের হয়ে ভোটের কাজও করে থাকে। ওদের দাপটে তিরিশ-চল্লিশ মাইলের ভেতর যত লোকজন রয়েছে সবাই তটস্থ হয়ে থাকে। পুলিশের সঙ্গে, বড় বড় নেতাদের সঙ্গে জগনলালের ওঠাবসা।

মনচনিয়া গাঁ থেকে হাটে ঢুকতে হলে ওই ফাঁকা গুদামটার পাশ দিয়ে যেতে হয়। ধনপতরা যখন ওটার সামনে এসে পড়েছে সেই সময় হঠাৎ ভেতর থেকে অনেকগুলো মেয়ের কান্না আর চিৎকার ভেসে আসতে থাকে, 'বাঁচাও—বাঁচাও—'

প'ড়ো গুদামটার পাশ দিয়ে আগে বহুবার হাটে গেছে ধনপতরা ; জগনলাল আর তার সাকরেদদের বারকয়েক ওখানে দেখেছেও কিন্তু আগে কখনও কোনও মেয়ে চোখে পড়েনি বা তাদের গলাও শোনা যায়নি। দু'জনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

মেয়েগুলো একনাগাড়ে চেঁচিয়ে যাচ্ছিল, 'কে আছ, আমাদের এখান থেকে বার করে নিয়ে যাও। নইলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

তারা যে বাঙালি সেটা কথা শুনেই বোঝা যাচ্ছিল। বাংলা ভাষাটা বলতে না পারলেও মোটামুটি বুঝতে পারে ধনপতরা। এই ফাঁকা গুদাম ঘরে কোত্থেকে বাঙালি মেয়েরা এসে জুটল ভেবে পাচ্ছিল না তারা। ওদের করুণ, আর্ত চিৎকার ধনপতদের বুকের ভেতর পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিচ্ছিল। একবার ধনপতরা ভেবেছে, এ সব ঝঞ্ঝাটে, বিশেষ করে যার মধ্যে জগনলাল জড়িয়ে আছে, মাথা না গলানোই বুদ্ধিমানের কাজ কিন্তু নিজেদের অজান্তেই তারা থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

চিন্তিতভাবে গণেরি জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী করা যায় বল তো?'

ধনপত বলেছে, 'বুঝতে পারছি না।'

'আমার কী মনে হয় জানো?'

'কী?'

'মেয়েগুলোকে বাঁচানো দরকার।'

'লেকেন জগনলাল কিরকম খতরনাক আদমি তা তো জানো।'

কিছুক্ষণ ভেবে গণেরি বলেছে, 'দুনিয়ার সবাই তা জানে। তাই বলে মেয়েগুলোর সর্বনাশ হয়ে যাবে?'

আস্তে আস্তে মাথা নেড়েছে ধনপত কিন্তু কোনও উত্তর দেয়নি। গণেরি এবার গুদামটার খুব কাছে গিয়ে উঁকিঝুঁকি মেরে ফিরে এসেছিল কিন্তু কাউকেই দেখতে পায়নি। সে বলেছে, 'মনে হচ্ছে, জগনলালের সঙ্গে যে ভুচ্চরের ছৌয়াগুলো ঘোরে তারা এখন কেউ নেই।'

ধনপত বলেছে, 'হাঁ। থাকলে লেড়কীগুলো অমন করে চিল্লাতে পারত না।'

গণেরি বলেছে, 'চল। ভেতরে গিয়ে একবার দেখি।'

ধনপতের সাহস হচ্ছিল না। ভয়ে ভয়ে সে বলেছে, 'লেকেন—'

'কী?'

'জগনলাল টের পেলে—'

ধনপতকে থামিয়ে দিয়ে গণেরি এবার বলেছে, 'এস তো—' আসলে মেয়েগুলোর

কাতর লাগাতার চিৎকার তাদের খুবই বিচলিত করে তুলেছিল। তা ছাড়া ধনপতের তুলনায় সে অনেক বেশি সাহসী।

গুদামটার সামনের দিকে অনেকটা ফাঁকা জায়গা। বহুকাল লোকজনের যাতায়াত ছিল না বলে প্রচুর আগাছা গজিয়ে উঠেছে। অবশ্য কিছু গাছপালা ঝোপঝাড় ছেঁটে সরু পায়ে চলার পথ তৈরি করা হয়েছে। ওটা যে জগনলালদের কাজ সেটা বোঝা যায়।

আগাছার ঝোপ পেরুলে টিনের চালের বিশাল গুদামটার সামনের দিকে লোহার গুল-বসানো প্রকাণ্ড দরজা। পুরনো হলেও এখনও বেশ মজবুত। দরজাটার বাইরে মোটা শেকল তুলে রাখা ছিল। ধনপতদের মনে হয়েছিল, কেউ বেরিয়ে গিয়ে ওভাবে গুদামটা বন্ধ করে দিয়েছে, যাতে ভেতরকার মেয়েগুলো বেরুতে না পারে। যে-ই শেকল তুলে দিক সে যে কাছেই কোথাও গেছে সেটা টের পাওয়া যাচ্ছিল। কেননা বেশি দূর গেলে নিশ্চয়ই তালা দিয়ে যেত।

শেকল খুলতেই ভেতরকার কান্নকাটি এবং চিৎকার মুহূর্তে থেমে যায়।

বাইরে থেকে গণেরি বলে, 'চুপ করে গেলে কেন? কে আছ, বেরিয়ে এস—'

তবু সাড়াশব্দ নেই।

এবার দু'জনে ভেতরে ঢুকে যায়। সঙ্গে সঙ্গে চারটে মেয়ে—ষোল থেকে কুড়ির ভেতর বয়স—হুড়মুড় করে তাদের পায়ের ওপর আছড়ে পড়ে। ওদের চোখেমুখে প্রচণ্ড আতঙ্কের ছাপ। মনে হয়, বেশ কয়েক দিন তারা খায়নি, ঘুমোয়নি। গণেরি বলে, 'এতক্ষণ ধরে তোমাদের ডাকাডাকি করছি, জবাব দিচ্ছিলে না কেন?'

মেয়েগুলোর মধ্যে যে বয়সে সবার বড় সে রুদ্ধস্বরে বলে, 'আমরা ভেবেছিলাম ওই লোকটা ফিরে এসেছে।'

'কোন লোকটা?'

'ওই বড় বড় মোচওলা—আমাদের যে পাহারা দিচ্ছিল—'

'সে কোথায় গেছে?'

'হাটে কেনাকাটা করতে—'

'তোমরা এখানে এলে কী করে?'

মেয়েটা বলেছে, 'আমাদের আগে বার করে দূরে কোথাও নিয়ে চলুন। লোকটা এসে পড়লে কেউ বাঁচব না। আপনাদেরও ভীষণ বিপদ হবে।'

তখন ভাল করে সব দিক ভাবার মতো সময় ছিল না। গণেরি এবং ধনপত একসঙ্গে বলেছে, 'ঠিক হ্যায়, চল আমাদের সঙ্গে—'

কিন্তু বেশি দূর যাওয়া সম্ভব হয়নি, গুদামের সামনের আগাছা-ভরা জায়গাটা পেরুবার আগেই পাকানো গোঁফওলা লোকটা ফিরে এসেছিল। তার হাতে প্রকাণ্ড একটা কাপড়ের ব্যাগ-বোঝাই জিনিসপত্র। হয়তো খাবার দাবারই হবে।

তার চেহারা পাক্কা দুশমনের মতো। বয়স ত্রিশ-একত্রিশ। জোড়া ভুরু, ঘন কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। হিংস্র চোখদু'টো দেখলে টের পাওয়া যায় খুনখারাপি করাটা এর কাছে কোনও ব্যাপারই নয়। পরনে ছিল চাপা ফুলপ্যান্টের ওপর হাফ-হাতা, মোটা গেঞ্জি।

গণেরি আর ধনপত লোকটাকে দেখেই মেয়েগুলোকে বলেছিল, 'দৌড়

লাগাও—'

চারটে মেয়ে আর ধনপতরা দু'জন, ছ'জনে উর্ধ্বশ্বাসে আগাছার জঙ্গল ভেঙে ছুটতে শুরু করেছিল। লোকটা ততক্ষণে তাদের উদ্দেশ্য বুঝে নিয়েছে। চোখের পলকে হাতের ব্যাগটা ছুঁড়ে ফেলে, একটা লাঠি জুটিয়ে নিয়ে অকথ্য গালাগাল দিতে দিতে তাড়া করে এসেছিল।

গণেরি আর ধনপতের মতো ষাট-বাষট্টি বছরের দুই বুড়ো এবং যুবতী চারটে মেয়ের পক্ষে কত জোরে দৌড়নো সম্ভব? গুদামের চৌহদ্দি ছাড়ালে রাস্তা, পরপর অনেকটা জায়গা জুড়ে ন্যাড়া মাঠ। মাঠটা পেরুলে ধানখেত। ধানখেতে পড়ার আগেই তাদের ধরে ফেলেছিল লোকটা। সে বুঝতে পেরেছিল, ধনপত আর গণেরি মেয়েগুলোকে উদ্ধার করে নিয়ে যাচ্ছে। তার সমস্ত আক্রোশ গিয়ে পড়েছিল ওদের ওপর। এলোপাথাড়ি লাঠি চালিয়ে যাচ্ছিল সে। ধনপতরা খুনই হয়ে যেত কিন্তু গণেরি পায়ের কাছে একটা ভারী পাথরের টুকরো পেয়ে যায়। সেটা তুলে নিয়ে শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে অন্ধের মতো ছুঁড়ে মারে। সেটা সোজা গিয়ে লাগে লোকটার মুখে। তীব্র গোঙানির মতো আওয়াজ করে ঘাড় গুঁজে সে মাঠের ওপর পড়ে যায়। তার পক্ষে উঠে দাঁড়ানো সম্ভব হয়নি। বেঁচে আছে কি মরে গেছে, কে জানে।

এরপর মেয়ে চারটেকে নিজেদের গাঁয়ে নিয়ে আসে ধনপতেরা। পথেই জেনে নিয়েছিল, ওদের বাড়ি বাংলা মুল্লুকে। একজনের মুর্শিদাবাদে, একজনের হুগলিতে, তৃতীয় আর চতুর্থ জনের বর্ধমান এবং মেদিনীপুরে। আগে কেউ কাউকে চিনত না। খুব গরিব ঘরের মেয়ে তারা। নৌকরি দেবার নাম করে বদ লোকেরা তাদের কলকাতায় নিয়ে আসে। সেখানে জগনলালের কাছে ওদের বেচে দেওয়া হয়। জগনলাল একটা মোটরে করে পরশু মেয়েগুলোকে ভোগবানিতে এনে ওই গুদামটায় তুলেছে। দুশমনের মতো চোহারার লোকটার পাহারায় ওদের রেখে সে গেছে পাটনায়। মেয়েরা শুনেছে, তাদের নাকি বোম্বাইতে কার কাছে বেচে দেওয়া হবে। সেই খদ্দেরকে সঙ্গে করে দু-একদিনের মধ্যে জগনলাল পাটনা থেকে ফিরে আসবে।

গণেরি আর ধনপত শুনতে শুনতে শিউরে উঠেছিল। জগনলাল এতকাল বন্দুকবাজি করে বেড়িয়েছে। সে যে আওরতের ব্যবসায় নেমেছে, কে ভাবতে পেরেছিল!

মেয়েগুলোকে মনচনিয়ায় এনে ধনপতের বাড়ির একটা ঘরে রেখে ওরা বড় সড়কে চলে এসেছিল। এই রাস্তাটা দিয়ে বাংলা মুল্লুকের দিকে রোজ শ'য়ে শ'য়ে গাড়ি যায়। ওদের ইচ্ছা, এমন একটা গাড়ি ধরে মেয়েগুলোকে যার যার মা-বাপের কাছে পাঠিয়ে দেয়। বেশির ভাগ গাড়িকেই থামানো যায়নি। দু-একটা যা থেমেছে, হাজার কাকুতি মিনতিতেও তাদের রাজি করাতে পারেনি। ভগোয়ান রামচন্দ্রজির করুণায় শেষ পর্যন্ত তারা মাসুদ জানকে পেয়েছে।

কথা শেষ করে ধনপত বলে, 'এখন জরুর বুঝতে পারছেন, কেন আপনাকে জবরদস্তি আমাদের গাঁওয়ে নিয়ে যাচ্ছি। কিরপা করে লেড়কীগুলোকে ওদের ঘরে পৌঁছে দিন। আমাদের গাঁয়ে থাকলে ওদের বাঁচাতে পারব না।'

কী করবে, মনে মনে স্থির করে ফেলেছিল মাসুদ জান। একটু হেসে বলে, 'তোমরা

তো আমাকে চেন না। কোন ভরসায় চারটে লেড়কীকে আমার হাতে তুলে দিতে চাইছ? আমি আচ্ছা আদমি না-ও হতে পারি।'

গণেরি বলে, 'আপনাকে দেখেই বুঝেছি—সাচ্চা আদমি। যদি খারাপ হন, বুঝব সেটা ওদের নসিব।'

যে সারাটা জীবন নষ্ট লোকদের গাড়িতে তুলে ঘুরে বেড়িয়েছে তাকে কিনা ওরা ভালমানুষ ধরে নিয়েছে! এক ধরনের অপরাধ-বোধ কিছুক্ষণের জন্য মাসুদ জানকে বিষণ্ণ করে রাখে। পরক্ষণে ভাবে, পেটের জন্য কত কী-ই তো মানুষকে করতে হয়। সে সজ্ঞানে জীবনে কোনও অন্যায় করেনি।

মাসুদ জান টের পায়, 'সাচ্চা আদমি' শব্দ দুটো তার মধ্যে তুমুল আলোড়ন ঘটিয়ে চলেছে। একসময় সে বলে, 'মেয়েগুলোকে তো আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিতে চাইছ। জগনলাল জানতে পারলে তোমাদের মুশকিল হয়ে যাবে যে—'

গণেরি বলে, 'তা হবে। আমাদের উমর ষাট পেরিয়ে গেছে মিঞাসাব। আর ক'দিনই বা বাঁচব! দু-এক সাল আগেই না হয় একটা ভাল কাজের জন্যে মরলাম।'

গাঁয়ে এসে মোটরটা থামার সঙ্গে সঙ্গে ধনপতের বাড়ির কোণের দিকের ঘর থেকে চারটে মেয়েকে বার করে এনে ওরা ব্যাক সিটে তুলে দেয়। বলে, 'ভাইসাব, এক্ষুণি গাড়ি চালিয়ে দিন।'

ধনপতদের তাড়ার কারণটা বুঝতে পারছিল মাসুদ জান। গাড়িতে স্টার্ট দিতে দিতে লক্ষ করে, হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছে গণেরি আর ধনপত। তারা বিড় বিড় করে বলে, 'ভাগোয়ান আপনার ভাল করবেন।'

আপন মনে মাসুদ জান বলে, 'খোদা মেহেরবান। তাঁর দোয়ায় তোমাদেরও ভাল হবে।'

হাইওয়ের দিকে যেতে যেতে সে ভাবে, এখন তার প্রথম কাজ হল চারটে মেয়েকে তাদের মা-বাপের কাছে পৌঁছে দেওয়া। একদিনে চার জায়গায় যাওয়া সম্ভব হবে না, কম করে দু-তিনদিন লেগে যাবে। তারপর কলকাতায় ফিরে রঘুবন্ত সিং যে টাকাটা রাহা খরচ হিসেবে দিয়ে গিয়েছিলেন সেটা তাঁর পাটনার ঠিকানায় ফেরত পাঠিয়ে দেবে। গাড়িতে ধনপত আর গণেরির মত সাচ্চা, সৎ মানুষেরা এই প্রথম উঠেছে। এরপর লুচ্চা, বেশ্যা আর বাঈজীদের কোনওদিনই সেটায় তোলা যাবে না।